প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম

বিজ্ঞান সমাজ ধর্ম

বিজ্ঞান সমাজ ধর্ম

বিজ্ঞান সমাজ ধর্ম

প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

বিজ্ঞান সমাজ ধর্ম ঃ প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম ॥ ই. ফা. বা. প্রকাশনা ঃ ৮১৪/১ ॥ ই.ফা.বা. গ্রন্থাগার ঃ ৩০১ ॥ প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ১৯৮২ ॥ দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ জানুয়ারী ১৯৮৭, জমাদিউল আউয়াল ১৪০৭, মাঘ ১৩৯৩ ॥ প্রকাশনায় ঃ অধ্যাপক আবদুল গফুর, প্রকাশনা পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, বায়তুল মুকাররম ঢাকা-২ ॥ প্রচ্ছদ অংকনে ঃ হাসান সাইয়ীদ ॥ মুদ্রণে ঃ আমাদের বাঙলা প্রেস লিঃ, ৩২/১, আজিমপুর রোড, ঢাকা-৫ ॥ বাঁধাইয়ে ঃ হারুন এণ্ড সন্স, ২৯/৪, পাঁচ ভাই ঘাট লেন, ঢাকা-১

মূল্য ঃ ৭৫'০০

BIJNAN SAMAJ DHARMA (Science Society Religion : A Collection of Essays) written in Bengali by Principal Abul Quasem and published by the Islamic Foundation Bangladesh.

January 1987

Price : Taka 75·00 (Inland) ; U.S. $: 5·00 (Foreign)

আমাদের কথা

'বিজ্ঞান সমাজ ধর্ম' প্রিন্সিপাল আবুল কাসেমের বিচিত্র-ধর্মী প্রবন্ধের সংকলন। বইয়ের শিরোনাম থেকেই বোঝা যায়, বিজ্ঞান, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, ধর্ম প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে লেখকের বিভিন্ন রচনা এখানে স্থান পেয়েছে। বিষয়ের বিচারে বৈচিত্র্য থাকলেও প্রত্যেকটি রচনাই ইসলামের নিরিখে রচিত। আর ইসলামের নিরিখে রচিত হলেও এ বইয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এর লেখক বস্তুনিষ্ঠভাবে বিচার করে প্রতিটি বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেছেন। আমাদের দেশে তো দূরের কথা, সারা মুসলিম বিশ্বেও এ ধরনের ইনডাকটিভ পদ্ধতিতে ইসলামের বিশ্লেষণ খুব বেশী নেই। এই হিসাবে এই গ্রন্থখানির অপরিসীম মূল্য রয়েছে। আধুনিক শিক্ষিত সমাজের সংশয়ী অংশের জন্য পুস্তকখানি ইসলাম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা অর্জনে খুবই সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

যুগ-যুগান্তের নানা বিভ্রান্তি এবং শতাব্দীর পর শতাব্দীর দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পর মানুষ আজ যখন আবার ইসলামের পূত-পবিত্র আদর্শের কথা চিন্তা করতে শুরু করেছে, তখনও এক শ্রেণীর মানুষ যুক্তি ও মুক্তবুদ্ধির নামে ইসলামের আদর্শকে প্রাণপণে বিরোধিতা করে চলেছে। তারা যদি সত্যি সত্যি মুক্তবুদ্ধি ও বিজ্ঞানের অভিসারী হয়ে থাকে, তবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে লিখিত প্রিন্সিপাল আবুল কাসেমের রচনা তাদেরকে নিঃসন্দেহে আলোর সন্ধান প্রাপ্তিতে সহায়তা করবে।

যুগ-জিজ্ঞাসার নিরিখে রচিত এই মহামূল্যবান গ্রন্থখানি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮২ সালে। গ্রন্থখানি দেশের বুদ্ধিজীবী মহলে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করে। প্রকাশের অল্পদিনের মধ্যে নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ায় গ্রন্থখানির জনপ্রিয়তাও প্রমাণিত হয়। বহুদিন ধরে এর নতুন সংস্করণ প্রকাশের চেষ্টা থাকা সত্বেও বিভিন্ন কারণে এর পুনঃপ্রকাশ যথেষ্ট বিলম্বিত হয়ে গেছে। অবশেষে পুস্তকখানির নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে দেখে আমরা রহমানুর রহীমের দরবারে জানাই লাখো শোকরিয়া।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ॥ ২০/১২/১৯৮৬

আবদুল গফুর
প্রকাশনা পরিচালক

প্রসঙ্গ-কথা

(১ম সংস্করণের প্রকাশকালে লিখিত)

প্রিন্সিপাল আবুল কাসেমের 'বিজ্ঞান সমাজ ধর্ম' নামক এ নবগ্রন্থের কিছু লেখা যদিও ইতিপূর্বে বিবিধ সাময়িকীতে প্রকাশিত ও পুস্তিকারূপে বহুল পঠিত, তবু বর্তমান শিরোনামে গ্রথিত এই প্রকাশনায়, গ্রন্থটি সুনির্দিষ্ট বক্তব্য, দার্শনিকতা ও মৌল চিন্তাভাবনার সফল উপস্থাপনার মাধ্যমে লেখকের এদেশের শীর্ষ-কাতারের চিন্তানায়করূপে যে পরিচিতি, তা সুসংহত করল। বিজ্ঞান-সমাজ-ধর্ম যে পরস্পর নির্ভরশীল সত্তা, যা মানব-নিয়তির গতি-প্রকৃতির সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে সম্পর্কিত এবং এই জীবনসত্যে ইসলামের ধর্মাদর্শ যে একান্তভাবে সঙ্গতিশীল—প্রিন্সিপাল কাসেম সাহেবের এই মৌলিক ভাবনাসম্পদ পাঠক মহলকে আমাদের ঐতিহ্যগত এই বোধে পুনরায় আস্থস্থ করবে। সমকালীন জীবন-জিজ্ঞাসার প্রায় প্রতিটি কূটতত্ত্বের উল্লেখযোগ্য বিশ্লেষণ-কর্মে এ-গ্রন্থটি একজন মহান জীবনসাধকের তন্ময় ফসলরূপে সমকালের চিত্তে বীজ বপন করতে সক্ষম হবে বলে বিশ্বাস করি। এমন একটি গ্রন্থের প্রকাশনায় আমরা অংশগ্রহণ করতে পেরে সত্যই নিজেদের ভাগ্যবান জ্ঞান করছি।

বর্তমান আর্থিক বছরের সীমাবদ্ধ সরহদ্দে দ্রুত মুদ্রণকাজ নিষ্পন্ন করতে গিয়ে আমাদের প্রকাশনা-কর্মীদের হিমসিম-খাওয়া দশায় দোষ-ত্রুটি ও বিচ্যুতি যা কিছু হয়েছে, সে জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। উদ্দিষ্ট পাঠকবৃন্দের সন্তুষ্টি আমাদের পাথেয় মাত্র।

ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র,
ঢাকা বিভাগ
২৬ জুন ১৯৮২

আফজাল চৌধুরী
পরিচালক

ভূমিকা

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষে মানুষে কোন ভেদ নেই। তাই ভাষা, রক্ত, ভূগোল, অর্থনীতি প্রভৃতি কারণের ফলে মানব জীবনে যে বৈষম্যের সৃষ্টি হয়, এবং যার ফলে বিষময় জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি হয় এতে তার কোন প্রশ্রয় নেই। ইসলামের মৌল নীতির আলোকে জাতীয়তার ভিত্তিকে আদর্শিক বলে গণ্য করতে হয়। তবে দীর্ঘ দিনের অভ্যাসের ফলে মুসলিম মানস ইউরোপের বুকে জাত ও ইউরোপীয় জাতিগুলো দ্বারা পরিশীলিত জাতীয়তাবাদকে অবশ্য গ্রহণীয় মতবাদ বলে গ্রহণ করে নিজেদের নানা জাতিতে বিভক্ত করেছে।

খৃস্টীয় ৭ম শতাব্দীতে এদেশে মুসলিম দরবেশদের আগমন থেকে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত মুসলিমেরা প্রথমে আগন্তুক এবং পরে শাসক জাতিরূপে পরিচিত ছিল। জীবনের প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাদের স্বাতন্ত্র্য ছিল স্পষ্ট ও প্রকট। বিদেশী বণিকশক্তির দ্বারা পরাজিত হয়েও তারা তাদের এ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে ছিল বদ্ধপরিকর। তবে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তাদের বাধ্য হয়েই ইসলাম-বিরোধী নানা রীতিনীতিকে গ্রহণ করে প্রবল শক্তিশালী বিদেশী শক্তির সঙ্গে সমঝোতা করতে হয়েছে। তাতে এদেশীয় মুসলিম জীবনে দেখা দিয়েছে চরম অধঃপতন। ১৭৫৭ সাল থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত কালকে মরহুম মওলানা আকরম খাঁ বলেছেন,—এ দেশীয় মুসলিম জীবনের পতন যুগ। এ পতন যুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম জীবনে যে নবজাগরণ দেখা দেয়—তাও আবার পরবর্তীকালে দু'টো ভিন্নমুখী ধারায় প্রবাহিত হয়। আপাত দৃষ্টিতে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অগ্রগামী এবং পঞ্চদশ শতকে ইউরোপের বুকে ফলিত রূপ লাভে সমর্থ সভ্যতা সংস্কৃতির ধারায় জীবনকে পুনর্গঠনের জন্য স্যার সৈয়দ আহমদ ও নওয়াব আবদুল লতীফ যে আন্দোলনের প্রবর্তন করেন তারই চরম পরিণতি দেখা দেয় ঢাকার বুকে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা কাজী আবদুল ওদুদের জীবনে। অপরদিকে শেখ আহমদ সির-হিন্দির বিদ্রোহ থেকে এদেশে ইসলামের সত্যিকার রূপের পুনঃ প্রবর্তনের জন্য যে আন্দোলন দেখা দেয় তারই বংশধররূপে এ অঞ্চলে তীতুমীরের, মোহাম্মদী আন্দোলন বা হাজী শরীয়ত উল্লাহ্‌র ফরাজী আন্দোলনের প্রবর্তন

হয়। এদেরই পরবর্তী পুরুষ হচ্ছেন বাংলার উলেমা সমাজের শিরোমণি মওলানা আকরম খাঁ প্রমুখ নেতা। তাদের ধ্যান-ধারণা উদ্‌বোধিত সাহিত্যিকগণের দ্বারা কলকাতায় পরবর্তীকালে রিনেসাঁ সোসাইটি গঠিত হয়। যদিও আপাতদৃষ্টিতে একে ইউরোপীয় রিনেসাঁরই সন্তান বলা হয় তবুও তার সঙ্গে ইউরোপীয় রিনেসাঁর রয়েছে আকাশপাতাল প্রভেদ। এ রিনেসাঁ ইউরোপীয় রিনেসাঁর মত ইসলাম পূর্ব-যুগের কোন সংস্কৃতিকে জীবনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে অগ্রসর হয়নি, বরং উল্টোদিকে ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির পুনর্জাগরণের জন্য সচেষ্ট হয়েছে। মুসলিম সাহিত্য সমাজ বা রিনেসাঁ সোসাইটি উভয়েরই লক্ষ্য মুসলিম জীবনের জাগরণ ও অগ্রগতি হলেও তাদের মধ্যে এক অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বও ছিল। মুসলিম সাহিত্য সমাজের লক্ষ্য ছিল প্রয়োজনবোধে ইসলামকে বর্জন করেও এ মানব গোষ্ঠীকে অগ্রসর হতে হবে—অপর দিকে রিনেসাঁর লক্ষ্য ছিল মুসলিম জীবনের সংস্কারের মাধ্যমেই সে পথে অগ্রসর হতে হবে। এভাবেই এদেশীয় মুসলিম জীবন দোলায়মান থাকাকালে ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ হয়ে যায়।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইহার পুনঃ প্রবর্তন হলেও কার্যত বিভাগ পরবর্তীকালে তার বিপক্ষে নানা মতবাদ ও দল দেখা দেয়। প্রিন্সিপাল আবুল কাসেমের উদ্যোগেই তমদ্দুন মজলিস গঠিত হয়ে সত্যিকার ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে গবেষণায় লিপ্ত হয়। তমদ্দুন মজলিসের সঙ্গে পরবর্তীকালে ইসলামী জীবন দর্শনের সত্যিকার নেতা আবুল হাশিম ও অন্যান্য মনীষী যুক্ত হয়ে ইসলামের নানাদিককে যুক্তি ও বিজ্ঞানের আলোকে প্রকাশ করার সাধনায় মনোনিবেশ করেন। আল্লামা আবুল হাশিমের নেতৃত্বে এ সমাজের চিন্তানায়কগণ ইসলামী দর্শন. রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি ইসলামের বিভিন্ন শাখাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে পাঠ করে তাদের ফলিতরূপে উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তাকে এ অঞ্চলের লোকদের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন। আজীবন বিজ্ঞানের ছাত্র ও শিক্ষক হিসাবে কৃতিত্বের অধিকারী প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম দেশ বিভাগের গোড়া থেকেই বিজ্ঞান ও দর্শনের সঙ্গে ইসলামের সম্বন্ধ ও উপযোজনের তুলনামূলক সমালোচনা করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, ইসলাম ধর্মের বাণী বিজ্ঞানের পরিপন্থী নয়। এ ক্ষেত্রে তার প্রচেষ্টা সত্যিই নবযুগের অন্যতম পদক্ষেপ। ইসলামের মূলভিত্তি কলিমা। তার মূলমন্ত্রই হচ্ছে আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন ইলাহ্‌ বা উপাস্য নেই; মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহ্‌র রসূল।

তার নানাদিকের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে প্রত্যয়ই মূলভিত্তি। সে প্রত্যয় একটা সামগ্রিক ধারণা। তাতে বুদ্ধি, বোধি, ইচ্ছাশক্তি, আবেগ প্রভৃতি নানা বৃত্তির কার্যকারিতা রয়েছে। আধুনিক দর্শন ও বিজ্ঞান একান্তভাবেই শুধুমাত্র শুষ্কবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই আবার দর্শন ও বিজ্ঞানে স্থায়ী কোন নীতির মৌলিক বিষয় নেই। এক যুগের গবেষণার ফল অন্য যুগে ভ্রান্ত ও অচল বলে প্রমাণিত হয়। প্রিন্সিপাল আবুল কাসেমের প্রামাণ্য বিষয় হচ্ছে যেহেতু তত্ত্বীয় দিক থেকে দর্শন বা বিজ্ঞানের সব নীতিকে অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করা যায় না—এজন্য সেগুলোর সঙ্গে ইসলামের বিরোধ দেখা দিলে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না। অপরদিকে ইসলামের কোনদিকই যুক্তি বিরোধী নয়। ইসলামের মৌলিক ভিত্তি প্রত্যয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও সে প্রত্যয় যুক্তিসঙ্গত। এরূপ নীতি দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েই প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম কয়েকখানা মূল্যবান পুস্তক প্রণয়ন করেছেন। সে সকল পুস্তকে বিজ্ঞানের স্বরূপ ও বিবর্তন এবং দর্শন ও বিজ্ঞানের যেমন আলোচনা রয়েছে তেমনি সাহিত্য ক্ষেত্রে সমাজ জীবনে ও রাষ্ট্রীয় জীবনে কিভাবে ইসলামী নীতির রূপায়ণ হওয়া সম্ভবপর তার ব্লু প্রিন্টও তিনি দিয়েছেন। এজন্য এযুগে ইসলামের নানাবিধ নীতি কিভাবে সমাজ জীবনে বিজ্ঞানের বিকাশের সহায়ক হয়ে তাদের কৃতিত্ব প্রদান করতে পারে সে সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করেছেন।

ইসলামী তথা মানবতাবাদী জীবন দর্শনের অনুসারীদের নিকট এ পুস্তকখানা দিকদর্শনের মত মূল্যবান হবে।

—মোহাম্মদ আজরফ

ডঃ কাজী মোতাহার হোসেনের কথা

অধ্যাপক কাসেম সাহেবের 'আধুনিক চিন্তাধারা'র পাণ্ডুলিপি পাঠ করে খুশী হয়েছি। আসলে বইখানা নয়টি (১২টি—লেখক দ্বারা পরে তিনটি সংযোজিত) প্রবন্ধের সমষ্টি। ধর্ম, বিজ্ঞান, সমাজ ও সাহিত্য এর বিষয়বস্তু। লেখাগুলোর ভিতর দিয়ে লেখকের চিন্তাশীল মনের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। প্রকাশ ভংগীও দ্বিধাহীন ও বলিষ্ঠ। অবশ্য, 'আধুনিক' কথাটা আপেক্ষিক। আমাদের কাছে যা আধুনিক অপরের কাছে হয়ত তা-ই পুরাতন। সে যা হোক, বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলোর মধ্যে বিংশ শতাব্দীতে যে কয়েকটি বিশেষ চিন্তাধারা প্রাধান্য লাভ করেছে, তার বিবরণ পাওয়া যায়। হয়ত বাঙলা ভাষায় এ পরিচয় একেবারেই নাই—এমন কথা বলা না গেলেও এ রকম রচনা আরও অধিক সংখ্যায় প্রকাশিত হওয়ার আবশ্যকতা রয়েছে। এদিক দিয়ে অধ্যাপক কাসেম সাহেবের প্রচেষ্টা প্রশংসার যোগ্য।

'বিজ্ঞান, গণতন্ত্র ও ধর্ম' প্রবন্ধে লেখক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সদ্ব্যবহার করেছেন। তবে, এর ভিতর এমন সব কথা আছে, যা নিয়ে তর্ক উত্থাপিত হ'তে পারে। যেমন—"এক আল্লার বিশ্বাসের ফলে সমস্ত বিশ্ব-জগত একই নীতির অধীন, এই ধারণা ইসলাম সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ফলে লৌকিক ও পারলৌকিক—এই দুইটির বিচ্ছিন্নতা ইসলাম স্বীকার করে না। শুধু তাই নয়, জীবনের সব দিকের ঐক্যে বিশ্বাস করে বলেই ইসলাম ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতিতে কোন পার্থক্য স্বীকার করে না।" এর প্রথম বাক্যটায় বিশেষ খটকা লাগে না, কিন্তু পরের দু'টি বাক্যতেই যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ ব্যক্ত করা হয়েছে, তা যুক্তি-সহ কিনা সেটা বিবেচ্য। অবশ্য পরে এর কিছু ব্যাখ্যাও করা হয়েছে, তবু খুব পরিষ্কার হয়েছে বলা যায় না।

বিবর্তন ও শ্রেণী-সংগ্রাম বিষয়ক দুটি প্রবন্ধই বেশ সরস ও প্রাঞ্জল হয়েছে। এতে পুঁজিবাদ, মার্কসবাদ প্রভৃতির সংগে সংশ্লিষ্ট অনেক তথ্য ও তর্ক-যুক্তি উত্থাপিত হয়েছে। আমার মনে হয়, এ-দুটো প্রবন্ধে পাঠকের সামনে অনেক চিন্তার খোরাক পরিবেশন করা হয়েছে, তাতে পাঠক উপকৃত হবেন।

'সমাজ ও নারী' প্রবন্ধটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। লেখক নারী প্রগতি ও নারীর মর্যাদা সম্বন্ধে অনেক ভাববার কথা বলেছেন। সংগে সংগে সমাজের 'আত্মঘাতী' প্রবণতা সম্বন্ধেও লেখক সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন; আর প্রেম, ভালবাসা, পর্দা ইত্যাদি বিষয়েও নিজস্ব মত ব্যক্ত করেছেন। পাঠকদেরে প্রবন্ধটা ভাল করে পড়ে দেখবার অনুরোধ করি। লেখকের সংগে অনেকের মতভেদ হতে পারে, তবু লেখকের দৃষ্টিভংগির সংগে পরিচয় থাকলে হয়ত বা কোনও মধ্য পন্থার সন্ধানও মিলতে পারে।

'সাহিত্যে আদর্শের স্থান' প্রবন্ধে নানা উদাহরণ দিয়ে সাহিত্যের যে একটা কল্যাণময় দিক আছে তার আলাচনা করেছেন। টলস্টয়-গোর্কি, রবীন্দ্র-নজরুল প্রমুখ বিখ্যাত সাহিত্যিকের লেখায় কাসেম সাহেব কোনও এক অনির্বচনীয় মহাশক্তির নির্দেশ বা ইংগিত দেখতে পেয়েছেন। তা ছাড়া সুসাহিত্য বা সৎ-সাহিত্যের লক্ষণ সম্বন্ধেও কয়েকটা মূল্যবান পরিচিত কথা বলেছেন। এই প্রসংগে ফরমায়েশী সাহিত্য, সাহিত্যের লক্ষ্য, জীবন দর্শন, সার্বজনীনতা, সাহিত্যের শ্রেণীবিভাগ ইত্যাদি অনেক বিষয় আলোচনা করেছেন। এ প্রবন্ধটার সাহিত্যিক মূল্য যা-ই হোক, এর যথেষ্ট ব্যবহারিক মূল্য আছে বলেই মনে হয়।

জনাব কাসেম সাহেবের প্রবন্ধগুলি বেশ বৃহৎ আকারের, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক তথ্য-প্রমাণাদি সহ বিস্তারিত আলোচনাই এদের বৈশিষ্ট্য। লেখকের চিন্তাধারা আধুনিক কালের পাঠকের সামনে, বিশেষ করে এদেশের পাঠকদের সামনে প্রকাশ করে তিনি পাঠক সমাজের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। এজন্য অধ্যাপক কাসেম সাহেবকে আমার সাদর অভিনন্দন জানাই।

কাজী মোতাহার হোসেন
৭-৩-৬০.

প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁর কথা

অধ্যাপক আবুল কাসেম সাহেব লিখিত 'আধুনিক চিন্তাধারা' পড়লাম। মনে হল, অনেক কাল পর আমাদের সাহিত্যের একটি চিন্তা-উত্তেজক বই হাতে পড়ল। খবরের কাগজ, ছোট গল্প, আর হালকা উপন্যাস আমাদের মধ্যে গম্ভীর বিষয়ক বই পড়ার অভ্যাস অনেকখানি কমিয়ে দিয়েছে।

দীর্ঘকাল পর্যন্ত তরল লঘু পথ্য খেলে অবশেষে ভাত চিবানোকেও কঠিন কাজ মনে হয়, উদর তো প্রথম প্রথম জবাবই দিয়ে বসে।

খাদ্য হিসাবে তরল লঘু পথ্যের নিঃসন্দেহ দাম আছে; কিন্তু ভাত রুটির দাম তারো চেয়ে বেশি। সুতরাং আমাদের মধ্যে চিন্তামূলক গম্ভীর সাহিত্যের আদর যে রোজ রোজ কমে আসছে, সমাজের পক্ষে এ শুভ লক্ষণ নয়।

অধ্যাপক আবুল কাসেম সাহেবের গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে: বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক বিবর্তন, বিজ্ঞানের গতি-প্রকৃতি, বিজ্ঞান বিবর্তন ও সামাজিক পরিবর্তন, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে শ্রেণী-সংগ্রাম, সাহিত্যে আদর্শের স্থান, সমাজ ও নারী, বিজ্ঞান ও ধর্ম ইত্যাদি।

বিষয়গুলি নিঃসন্দেহ রকমে গম্ভীর, কৌতূহল-উদ্দীপক এবং বাস্তব ক্ষেত্রে একান্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিজ্ঞানের বিবর্তন প্রসংগে গ্রীক যুগ, মুসলিম যুগ, নিউটন যুগ, ক্লাসিক্যাল যুগ ও আধুনিক যুগের বিজ্ঞান কথা যথাসম্ভব সরল ও সরস ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। আজকাল কোন সমস্যার কথা উঠলেই তার বৈজ্ঞানিক পটভূমির অন্বেষণ শুরু হয়। সমাজের পরিবর্তন, বিবর্তন ও শ্রেণী-সংগ্রাম প্রভৃতি সমস্যাকে গ্রন্থকার আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে আলোচনা করেছেন। সাহিত্য কেবল বিলাস—না তার কোন সু-নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে, আমাদের নারী প্রগতির ধারা কোন্ পথে, বিজ্ঞান ও ধর্মের সম্বন্ধ প্রভৃতি প্রশ্নের পর্যালোচনা আমাদের কাছে নিতান্ত মনোজ্ঞ মনে হয়েছে।

গ্রন্থকারের আলোচ্য বিষয়ের বেশীর ভাগই সমস্যামূলক। সমস্যা মানেই অমীমাংসিত প্রশ্ন। কাজেই পাঠকদের সকলেই গ্রন্থকারের সংগে একমত হবেন, এ আমরা মনে করি না। গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় আরো ভালভাবে বলা যেত না, তাও আমরা বলতে পারি না। তবে এটুকু বোধ হয় জোর করেই বলা যায় যে, পাঠক এ বইয়ে চিন্তার প্রচুর এবং চিত্তাকর্ষক খোরাক পাবেন, বইয়ের দামের টাকাটা পানিতে গেল বা পড়ার সময়ের অপচয় হ'ল এমন কথা ভেবে আফসোস করতে হবে না।

ইব্রাহীম খাঁ
৩/১১/৫৯

আগের পরিচিতি

'বিজ্ঞান সমাজ ধর্ম' এই বৃহদাকার বইটি ইসলামিক ফাউণ্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে ইহার কয়েকটি প্রবন্ধ নিয়ে 'আধুনিক চিন্তাধারা' নাম নিয়ে সোয়া শ' পৃষ্ঠার বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৪ সনে মার্চ মাসে। উহার দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয় ১৯৭৬ সনে জানুয়ারীতে। মূল বইয়ের পাণ্ডুলিপি পড়ে বিজ্ঞানী শ্রদ্ধেয় ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন ও প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ দুটি মুখবন্ধ লিখে দিয়েছিলেন। ঐ মুখবন্ধও তখন ঐ বইয়ের ভূমিকা রূপে প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমান বইটির মূল্যায়ন ও উহার বিবর্তনের ধারাবাহিকতার পরিচিতির সুবিধার জন্য মুখবন্ধগুলি ও প্রাথমিক বক্তব্য এই সাথে যুক্ত করা হল। 'বিজ্ঞান সমাজ ধর্ম' বইতে গুরুত্বপূর্ণ আরো বহু প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে।

আধুনিক মানুষের মনকে হর-হামেশা বিব্রত ও বিক্ষুব্ধ করছে এমন কয়েকটি প্রধান সমস্যা এ পুস্তকে আলোচিত হয়েছে। আমি যেভাবে সমস্যাগুলিকে দেখেছি, অনুভব করেছি ও চিন্তা করেছি—সেভাবেই যুক্তি ও বিশ্লেষণ দেবার চেষ্টা করেছি। এই যুক্তি ও বিশ্লেষণ ত্রুটিপূর্ণ নয় একথা বলার মত ধৃষ্টতা আমি পোষণ করি না। এতে যথেষ্ট ভুল থাকাই স্বাভাবিক। সুধী-বন্ধুরা এই ত্রুটি নির্দেশ করে তৃতীয় সংস্করণকে সুন্দর ও সমৃদ্ধ করার কাজে সাহায্য করলে আমি কৃতজ্ঞ থাকব।

১৯৬০ সনে বইটির পাণ্ডুলিপি তৈরী হয়েছিল এবং ঐ সনেই পাকিস্তান লেখক সংঘ বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের দ্বারা যথানিয়ম পরীক্ষা করিয়ে বইটি প্রকাশ করার ভার নিয়েছিল। লেখক সংঘ কর্তৃক বইটি প্রকাশে বিলম্ব হওয়ায় আমি পাণ্ডুলিপিটি ফেরত নিতে বাধ্য হই। এই কারণেই বইটি প্রকাশে দীর্ঘ তিন বছরের মত বিলম্ব হল।

'বিজ্ঞান সমাজ ধর্মে'র একটা বড় অংশ 'আধুনিক চিন্তাধারা'কে উর্দুতে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে ৭০ এর দশকে বাঙলা একাডেমী আমাকে দু'হাযার টাকা সম্মানী দিয়ে উর্দুতে অনুবাদ করেছিল। রাজনৈতিক পরিবর্তনে সে অনুবাদ এ পর্যন্ত ছাপা হয় নাই।

[ষোল]

প্রবীন সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ প্রিন্সিপাল জনাব ইব্রাহীম খাঁ সাহেব এবং ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন সাহেব বইটির মুখবন্ধ লিখে দিয়ে আমাকে উৎসাহিত ও কৃতজ্ঞ করেছিলেন। মুখবন্ধ দুইটি ১৯৫৯-৬০ সনের লেখা। ইহার পর আমি আরো সংশোধন ও পরিবর্তন করে বইটিকে অধিকতর ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করেছি। তা ছাড়া পূর্বের পাণ্ডুলিপির সংগে আরো বহু প্রবন্ধ যোগ করেছি।

আবুল কাসেম
১লা মার্চ, ১৯৬৪

প্রাথমিকা

একটি আধুনিক উপলব্ধি

আজ বিশ শতকের শেষভাগে এসে আমাদের জ্ঞানের গভীরতা ও পরিধি এতই ব্যাপক ও সত্যাশ্রয়ী হয়ে পড়েছে যে, যুগ যুগ ধরে প্রচলিত বহু সম্মানিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত ধারণাকে আর টিকায়ে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। বিজ্ঞান, সমাজ-ধর্ম সবই এর আওতায় বিবর্তিতরূপে উদ্ভাসিত হচ্ছে।

উদাহরণ দিয়ে বলা যায়ঃ লব্ধ-প্রতিষ্ঠ বিজ্ঞানীরা বাইবেলের মত বহু সম্মানিত কিতাবকে আজ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় পরিত্যাজ্য বলে ঘোষণা করছেন। আর একইরূপ পরীক্ষায় আরবের নিরক্ষর নবীর উপর অবতরিত কুরআন সত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অসাধারণ উৎসরূপে প্রমাণিত হচ্ছে।

এই সত্য বিগত ১৯ শতক পর্যন্ত পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধবাদীদের জ্ঞানের চোখে সঠিকভাবে ধরা পড়ে নাই। আমি এই সূত্রে ফ্রান্সের বিশ্বখ্যাত শরীরবিজ্ঞানী মরিস বুকাইলির অনন্যসাধারণ পুস্তক **বাইবেল, কোরআন, বিজ্ঞান** [The Bible, The Quran and Science by Maurice Bucaille] এবং পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানীদের একই প্রকারের আধুনিক গবেষণা সমৃদ্ধ অন্যান্য লেখার দিকে জ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বুকাইলির বইটির ধারাবাহিক অনুবাদ সাপ্তাহিক রোববারে আর সুচিন্তিত ও আংশিক আলোচনা ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয়েছে। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী জনাব আখতারুল আলম সাহেব বইটির বিষয়বস্তুকে এই দুই পত্রিকার মারফত বাঙলাদেশীদের কাছে সুপরিচিত করে তুলেছেন।

অবিকৃত কিতাব কুরআনে বর্ণিত সৃষ্টির পরিপূরক তথ্য এবং তত্ত্বও আজ আধুনিক বিজ্ঞান পরিবেশন করে বিজ্ঞানীদের এবং জ্ঞানান্বেষী আমাদের সকলকে শুধু চমৎকৃত নয়—বিমোহিতও করছে। বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন গবেষণায় ও আলোচনায় এই সত্যের উদ্‌ঘাটন হয়েছে। উদ্‌ঘাটন হয়েছে সুদৃঢ় ও ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত ডারউইন তত্ত্বের মৌলিক অসংগতি নির্ণয়ের বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনাও।

আধুনিক জ্ঞানে ধৃত বিশ্বের প্রকৃত রূপের আলোকচ্ছটাও আজ বৈজ্ঞানিকেরা গভীর প্রত্যয়ের আলোকে আমাদেরে চমৎকৃত করে তুলছেন। ১৯৭৯ সনে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী প্রফেসার আবদুস সালামের ইসলাম ও বিজ্ঞান লেখাটি এই বইয়ে বর্ণিত আমার বক্তব্যের সবল প্রমাণ দেবে। [দেখুন : Review of Religions No 9, September 1984]

এই বৈজ্ঞানিকের প্রতিবেদনে আমরা আরো জেনে অবাক হচ্ছি যে, আইনস্টাইনের স্থান-কাল নিয়ে সৃষ্টি-গঠন শুধু চারমাত্রিক নয় আরো ৭ মাত্রা যুক্ত হয়ে ১১ মাত্রিক সংগঠন বলে বিবেচিত হচ্ছে। শুধু তাই নয় বিজ্ঞানী বলছেন, বিশ্বের ইলেকট্রন, প্রোটন, ফোটন ও নিউট্রিনোগুলির ভর ও শক্তির যোগফল থেকে তাদের পারস্পরিক মাধ্যাকর্ষণীয় শক্তিকে বিয়োগ করলে বিশ্বের ভর (mass) শূন্যে পর্যবসিত হবে। এই সূত্রে মহাবিশ্ব শূন্যতার কোয়ান্টাম পরিবর্তনের ফলরূপে পরিগণিত হয়। এই শূন্যতাকে অনস্তিত্বের (nothingness) অবস্থায় বিমূর্তিত বলে ধারণা দিচ্ছে। এটাই বিশ্বকর্তা কর্তৃক শূন্য থেকে বিশ্বসৃষ্টির দার্শনিক ধারণার প্রমাণ যোগাচ্ছে। যোগাচ্ছে একত্ববাদের গভীর প্রত্যয়। আধুনিক বিজ্ঞান বিশ্ব প্রকৃতিতে ঐক্যের সন্ধান উন্মোচন করে এই মৌলিক প্রত্যয়কে আরও সুদৃঢ় করছে।

সমাজ-বিজ্ঞানের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শাখা অর্থনীতিতেও আজ অচিন্তনীয় বিপ্লব সাধিত হচ্ছে—কুরআনিক অর্থনৈতিক মূলধারাকে অবলম্বন করে। টেকনলজি সমৃদ্ধ পুঁজিবাদ এককালে পৃথিবীকে একদিকে উন্নত, মোহিত ও প্রলুব্ধ করছিল ; কিন্তু তারই নৈতিকতাহীন বস্তুতান্ত্রিকতার মারাত্মক কুফলজনিত বিষাক্ত পরিবেশের প্রতিক্রিয়ায় যে আপাত কল্যাণকর বিপ্লবী সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা হল তাও আজ সমাজ-বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় পরিত্যক্ত হচ্ছে মানবিক ক্ষেত্রে অকল্যাণকর বলে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ ও অকার্যকর বলে। তাই আজ সাম্যবাদের বৃহত্তম দেশ চীন রাষ্ট্রনির্ভর অর্থব্যবস্থাকে ভেঙে সাজায়ে সাম্যবাদী জগতকে অবাক করে গোটা চৈনিক সমাজকে পুনর্বিন্যস্ত করছে।

ফল হচ্ছে এই যে, ব্যক্তি-স্বার্থ নির্ভর পুঁজিবাদ ও নির্মম রাষ্ট্রনির্ভর সাম্যবাদ বিফল প্রমাণিত হওয়ার ফলে কুরআন নির্দেশিত ব্যক্তি-মর্যাদা সমৃদ্ধ ও নৈতিকতা নির্ভর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই যে এই বিশৃঙ্খল অর্থনৈতিক জগতে সুনিপুণ সমাধান দিতে পারে বলে আজ প্রবলভাবে প্রতিভাত হচ্ছে।

রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রেও মধ্যযুগীয় রাজতন্ত্রের অবসান লগ্নে পুঁজিবাদের আওতায় এতদিনের জনপ্রিয় গণতন্ত্র বিভিন্ন দেশে শোষণ ও দুর্নীতির হাতিয়ার হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে এবং বহু দেশে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও রাষ্ট্রকেন্দ্রিক একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠায় এই গণতন্ত্র স্থান ত্যাগ করছে। নৈতিকতাহীন আর অত্যাচারের প্রতীক এই একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধেও আজ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজ বিজ্ঞানীরা সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। প্রভাবশালী গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের সুদীর্ঘকালের প্রতিষ্ঠিত এই দুই দৈত্য আজ কোন না কোন সমাজবিজ্ঞানীদের দ্বারা অনেক দেশে দুষ্ট ক্ষত হিসাবে চিহ্নিত হচ্ছে। তাই সত্য ধর্ম ও নৈতিকতা প্রভাবিত মানব কল্যাণ অভিসারী আল্লার প্রতিনিধিত্বমূলক খিলাফতি রাষ্ট্রতন্ত্রের দিকে মানুষ আবার সবলভাবে ঝুঁকে পড়তে শুরু করেছে—অনেকটা অনন্যোপায় হয়ে অন্য কোন সুষ্ঠু পথ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না বলে। সাম্য-মৈত্রীর প্রতীক খিলাফত—ভ্রাতৃতন্ত্র বা নীতিতন্ত্র বৈ আর কিছু নয়।

বিজ্ঞান-সমাজ ও ধর্মে আমার উপরে পরিবেশিত এইসব বিষয় ও সমস্যাগুলির আধুনিক ব্যাখ্যা ও পরিষ্কার ধারণা দিবার চেষ্টা করেছি। এ দুরূহ কাজে কতটুকু সফল হয়েছি তার বিচারের ভার বিজ্ঞ পাঠকদের উপর। এর মধ্যে বহু ভুল থাকাই স্বাভাবিক। সেই ভুলের আবরণ খুলে দিয়ে তাদের সুচিন্তিত সংশোধনের আলোকে এই বইয়ের তৃতীয় সংস্করণকে উন্নীত করার কাজে সাহায্য করলে আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

বাঙলা একাডেমী বইটির কারণে গবেষণার ক্ষেত্রে ১৯৮২ সনের ব্যাংক ও সাহিত্য পুরস্কার দিয়ে আমাকে অশেষ উৎসাহিত করেছে। ইসলামিক কালচারাল সেন্টারের আগের ডিরেক্টার কবি আফজাল চৌধুরী বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী প্রফেসার সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়ের সমালোচনাটি পরিবেশন করে বইটির মান বৃদ্ধি করেছেন। তাছাড়া এই বইয়ের বিভিন্ন অংশের জন্য লিখিত প্রিন্সিপাল মোহাম্মদ আজরফ, প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ, ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালের অর্থনীতির প্রধান ডঃ তোফাজ্জল হোসেন এর মুখবন্ধ ও অভিমত বইটির গুরুত্ব বর্ধনে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। এ জন্য এদের সকলের কাছে আমি ঋণী।

প্রথম সংস্করণের মত দ্বিতীয় সংস্করণও সম্মানিত পাঠক সমাজের কাছে সুগৃহীত হলে আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত বলে মনে করব।

৩২/২ আজিমপুর রোড, ঢাকা
১২/১০/৮৫

আবুল কাসেম

সূচীপত্র

বিজ্ঞান ১-২৪

১. বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক বিবর্তন ১

২. বিজ্ঞানের গতি-প্রকৃতি ১৪

সমাজ ও বিজ্ঞান ২৫-৭০

১. বিজ্ঞান, বিবর্তন ও সামাজিক পরিবর্তন ২৭

২. বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে শ্রেণী সংগ্রাম ৩৯

৩. বিজ্ঞান, গণতন্ত্র : কমিউনিজম ও ইসলাম ৬১

দর্শন ও বিজ্ঞান ৭১-১৪৬

১. যুক্তি, প্রমাণ ও বিজ্ঞান ৭৩

২. সৃষ্টি সম্পর্কিত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ৮০

৩. দর্শন, বস্তুবাদ ও বিজ্ঞান ৯৯

৪. কয়েকটি প্রশ্ন ১১১

৫. বিবর্তনবাদ ও আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ১২১

সমাজ ও ধর্ম ১৪৭-২১০

১. একমাত্র পথ ১৪৯

২. আধুনিকতা ও ঐতিহ্যবোধ ১৮৮

৩. বিশ্ব-অশান্তি ও ধর্ম ১৯৩

৪. কুরআনের আলোকে সার্বজনীন ও চিরন্তন আদর্শ ১৯৯

৫. অমরত্বের সাধনা ২০৩

সাহিত্য ও ধর্ম ২১১-২২৮

১. সাহিত্যে আদর্শের স্থান ২১৩

২. সাহিত্য সৃষ্টি ও উদ্দেশ্য ২২৪

সমাজ ও নারী ২২৯-২৪৮

১. নারী প্রগতি ও নারীর মর্যাদা ২৩১

কোরআনিক অর্থনীতি ২৪৯-৩১০

অভিমত-২৫৩

২৫৫ ১. অর্থনীতি ও আধুনিক সমাজ
২৬০ ২. মূলনীতি
২৬৯ ৩. জীবন, ব্যক্তি ও সমাজ
২৮০ ৪. জমি সমস্যা
২৮৮ ৫. শিল্প সমস্যা
২৯৬ ৬. রাষ্ট্রীয়করণ বনাম রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ
৩০১ ৭. সুদ, ব্যাংকিং ও ইনস্যুরেন্স
৩০৯ ৮. পরিশিষ্ট—অর্থনীতি সম্বন্ধে কোরআনের রেফারেন্স

৩১১-৩৬২ ইসলামী রাষ্ট্রনীতি
৩১৪ ১. আদর্শ রাষ্ট্রের রূপ
৩২৭ ২. আদর্শ সরকার
৩৩৯ ৩ খিলাফতের গঠন, নির্বাচন ও কর্তব্য
৩৫০ ৪. ইসলামী মেনিফেস্টো (ঘোষণা)

৩৬৩-৩৭২ আরো দু'টি মেনিফেস্টো
৩৬৫ ১. কৃষক ভাইয়ের জমি চাই
৩৬৮ ২. শ্রমিক ভাইয়ের অংশ চাই

৩৭৩-৪৪০ পরিশিষ্ট-২
৩৭৬ ১. আদর্শ খিলাফতের নমুনা
—মৌলানা আবুল কালাম আজাদ
৩৯০ ২. ইসলামী রাষ্ট্র সম্পর্কে
—আবুল মনসুর আহমদ
৩৯৩ ৩. ইসলামী নীতির কারণে
—তফাজ্জল হোসেন
৩৯৬ ৪. খুলাফায়ে রাশিদীনের আদর্শ
—মৌলানা নূর মোহাম্মদ আজমী
৪২৩ ৫. কুরআনের উত্তরাধিকার আইন ও সোভিয়েত রাশিয়া
—আবুল কাসেম
৪২৫ ৬. অভিমত
অধ্যাপক সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়
৪৪১ ভুল-শুদ্ধি

বিজ্ঞান

সূচী

১. বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক বিবর্তন ১
২. বিজ্ঞানের গতি-প্রকৃতি ১৪

১

বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক বিবর্তন

আধুনিক যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানের অসাধারণ সাফল্যের যুগ। অতীতে যাই ঘটুক না কেন, আজ মানুষের ধ্যান-ধারণা, সভ্যতা, তমদ্দুন, জ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও সিদ্ধান্তের দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। তাই বহুদিন থেকে সকলের মনে, এমন কি বিজ্ঞানীদের মনেও প্রশ্ন জেগেছে ঃ বিজ্ঞান আমাদের কোথায় নিয়ে চলেছে ?

প্রশ্নটির জবাব ও বিজ্ঞানের গতিধারা বুঝতে হলে বিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে একটু পর্যালোচনা করা আবশ্যক।

বিজ্ঞানের ইতিহাসকে আমরা মোটামুটি ৫টি অংশে ভাগ করতে পারি। যথা ঃ

১. গ্রীক-যুগ (খৃঃ পূঃ ৬২৪—৭৫০ খৃঃ)
২. মুসলিম-যুগ (৭৫১—১৫৫০ খৃঃ)
৩. গ্যালিলিও-নিউটনীয় যুগ (১৫৫১—১৮০০ খৃঃ)
৪. ক্লাসিক্যাল-যুগ (১৮০১—১৮৯০ খৃঃ)
৫. শিল্প-যুগ (১৮৯১—১৯২৫ খৃঃ)
৬. আধুনিক-যুগ (১৯২৬—বর্তমান কাল পর্যন্ত)

গ্রীক-যুগ (খৃঃ পূঃ ৬২৪—৭৫০ খৃঃ)

আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে গ্রীকরা প্রকৃতির গুপ্ত রহস্য উদ্ঘাটনে মনোনিবেশ করেন। পৃথিবী যে চেপ্টা নয়—গোল, থেইল্স (খৃঃ পূঃ ৬২৪—৫৪৭) ও পিথাগোরাস (খৃঃ পূঃ ৫৮০—৫০০) এটা প্রচার করেছিলেন। থেইল্স্ অপরিচিত হলেও পিথাগোরাস জ্যামিতির ছাত্রদের কাছে সুপরিচিত। জেনে সত্যি অবাক হতে হয়, খৃষ্টজন্মের চার শ' বছরেরও আগে এনাকজোগোরাস ও ডেমোক্রিটাস পরমাণুতত্ত্ব বর্ণনা

করেছিলেন। শুধু তাই নয়, কোন বস্তুর যে ধ্বংস নেই এবং বস্তুর একটা কণাকেও যে সৃষ্টি করা যায় না— আধুনিক বিজ্ঞানের এই রক্ষণ-বিধি যাকে বিজ্ঞানে বলা হয় conservation of mass তা গ্রীক বিজ্ঞানীরা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছিলেন। চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের প্রকৃত কারণও এরা ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গ্রীকদের সম্মানিত দেবতা সূর্য ও চন্দ্রকে যথাক্রমে অগ্নিশিলা ও মাটি বলে আখ্যায়িত করার অপরাধে এনাকজোগোরাসকে এথেনস্ থেকে নির্বাসিত করা হয়েছিল।

এরিস্টটলের (খৃঃ পূঃ ৩৮৪–৩৩২) নাম শিক্ষিত লোক মাত্রই শুনেছেন। গ্রীকদের মধ্যে তিনি ছিলেন জ্ঞানের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। তিনি সাধারণ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেক তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশন করেছিলেন। তাঁরও আগে এরিস্টার্কাস নামক এক বড় চিন্তাবিদ পৃথিবীই যে সূর্যের চারদিকে ঘোরে তখনকার সময়ে এ অত্যাশ্চর্য তত্ত্ব প্রকাশ করেছিলেন। এরিস্টটল এর বিরুদ্ধাচরণ করেন; ফলে এরিস্টার্কাসের তত্ত্ব উদ্ভট ও অযৌক্তিক বলে বিস্মৃতির অন্তরালে তলিয়ে যায়। তদুপরি আলেকজান্দ্রিয়ার টলেমী (৭০–১৪৭ খৃস্টাব্দ) এরিস্টটলকে সমর্থন করে এক সুপরিকল্পিত তত্ত্বের দ্বারা পৃথিবীকেন্দ্রিক তত্ত্বই যে সত্য তার প্রমাণ উপস্থাপন করেন। তাঁর তত্ত্বভিত্তিক সৌরজগতের বিন্যাসকে বলা হয় টলেমীয় বিন্যাস (Ptolemaic System)। এরিস্টার্কাসের প্রায় ২০০০ বছর পর কোপার্নিকাস (১৪৭৩—১৫৪৩ খৃঃ) সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহদের ঘূর্ণন-তত্ত্বকে আবার সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বিন্যাসকে তাই বলা হয় কোপার্নিকাস বিন্যাস (Copernicus System)। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কোপার্নিকাস ছিলেন খ্যাতনামা পর্যটক কলম্বাসের সম-সাময়িক।

আর্কিমিডিসের (২৮৭–২১২ খৃঃ পূঃ) নাম অনেকেই শুনেছেন। তিনিও গ্রীকযুগের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ছিলেন। পানিতে কেন ভারী জিনিস হালকা মনে হয়, তার প্রথম সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তিনি।

গ্রীক যুগের শেষের দিকে প্রায় সাড়ে ন শো' বছর বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোন অগ্রগতি সূচিত হয়নি। বরং গ্রীকরা জগতকে যা প্রদান করেছিলেন,

তারও অবলুপ্তি ঘটতে চলেছিল। এই দীর্ঘ অন্ধকার যুগের অবসান ঘটিয়ে যে যুগ আধুনিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রা সুগম করেছিল তা-ই মুসলিম যুগ বলে খ্যাত। মুসলিম যুগ প্রায় দীর্ঘ আটশ' বছর স্থায়ী ছিল এবং এই সময় অঙ্কশাস্ত্র, ভূগোল, জ্যোতিষশাস্ত্র, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র প্রভৃতির বিশেষ বিকাশ সাধিত হয়েছিল।

মুসলিম-যুগ (৭৫১—১৫৫০)

মুসলমানেরা রসায়নশাস্ত্রের জন্মদাতা ছিলেন বললে মোটেই অত্যুক্তি হয় না। জাবির ইব্‌ন-হাইয়ান ও রাজী ছিলেন রসায়নশাস্ত্রে সে যুগের নিউটন। এক হাজার শতাব্দীতে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আল-হাজেন পদার্থ-বিজ্ঞানে যা দান করে গেছেন তা আধুনিক বিজ্ঞানেরও পরম সম্পদ। তিনি আলোকবিজ্ঞানের উপর সাত খণ্ড গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই সময়ে মুসলিম বিজ্ঞানীদের গবেষণা দ্বারাই সর্বপ্রথম টেলিস্কোপের কার্যধারা আবিষ্কৃত হয়েছিল। অঙ্কশাস্ত্রে বাইনোমিয়েল তত্ত্ব, নানাবিধ সমীকরণ এবং আরো বহু বিষয় মুসলিম বিজ্ঞানীদের অসাধারণ কীর্তি। এলজেব্রা ও কেমিস্ট্রী এই দুটি শব্দই আরবী 'আল-জবর' ও 'আলকেমী' শব্দ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। চিকিৎসাশাস্ত্রে মুসলমানেরা এত উন্নতি করেছিলেন যে, এক সময় গোটা ইউরোপের কাছে এই শাস্ত্রের জন্য মুসলিমদের লেখা বইগুলো একমাত্র পাঠ্য বলে বিবেচিত হত। এই শাস্ত্রে ইব্‌নে সিনার নাম জানেন না এমন শিক্ষিত লোকের সংখ্যা ইউরোপ আমেরিকায়ও খুব বেশী নেই। ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা, ইতিহাস প্রভৃতি জ্ঞানের রাজ্যে—আলবেরুনী, ইব্‌নে বতুতা, আবদুল্লা আল ইদ্রিসী (১১৬৫), ইয়াকুত আলরুমী (১০৯৪) প্রমুখের নাম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে।

সবচেয়ে বড় কথা হল ঃ বিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিক অর্থাৎ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পদ্ধতি (experimental methods) সর্বপ্রথম মুসলিম বিজ্ঞানী-রাই প্রবর্তন করেছিলেন। গ্রীক যুগে এটা কারও জানা ছিল না। খলিফা আল-হাকামের সময়ে (৯৯৬—১০২১) কায়রোতে প্রতিষ্ঠিত সরকারী সাহায্যপুষ্ট বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার (laboratory) এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এশিয়ার বাগদাদ, ইউরোপের কর্দোভা প্রভৃতি নগরী সে যুগে বিশ্বের জ্ঞান-চর্চার সর্বপ্রধান কেন্দ্র ছিল। মুসলমানদের আর একটি প্রধান কীর্তি হল ঃ অবলুপ্তপ্রায় গ্রীক ও ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের আহরণ,

অনুবাদ ও সংরক্ষণ। এ না হলে অনেক আগেই এই দুই মহাসভ্যতার বহু দানের চিহ্ন পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকত না।[১]

বিশ্বখ্যাত ঐতিহাসিক পিকে হিট্রির ভাষায় আট শতকের মধ্যভাগ থেকে তের শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত আরবী ভাষা-ভাষীরা গোটা বিশ্বের সভ্যতা ও তমদ্দুনের (সংস্কৃতির) ক্ষেত্রে আলোর প্রধান দিশারী ছিলেন। প্রাচীন বিজ্ঞান ও দর্শন তাদের মাধ্যমেই পুনর্জীবিত, প্রসারিত ও সংযোজিত হয়েছিল— যার ফলে পশ্চিম ইউরোপে রেনেসাঁর উদ্ভব সম্ভব হয়েছিল।

বিজ্ঞানী ব্রিফল্টের মতে আরব সংস্কৃতির কাছে বিজ্ঞান বিশেষভাবে ঋণী। প্রাচীন জগত ছিল প্রাক-বৈজ্ঞানিক। গ্রীক-জ্যোতিষ ও অলংকার শাস্ত্র ছিল নিয়ম-পদ্ধতি ও সূত্রের বন্ধনে আবদ্ধ। ফলে এটা কোন সংস্কৃতির অংগরূপে কোন সময় গৃহীত হয়নি। সুনিয়ম অনুসন্ধান, জ্ঞানের সুরক্ষণ, সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, ব্যাপক পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-মূলক তৎপরতা ছিল গ্রীকদের স্বভাব-বিরুদ্ধ। (আরবদের) নতুন অনুসন্ধান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার কারণে গণিতের অসাধারণ বিকাশের ফলেই ইউরোপে আধুনিক বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়েছিল। আরবগণই নবতর অনুসন্ধান, ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও নতুন পদ্ধতির সংগে ইউরোপকে পরিচিত করে তুলেছিল।

বলা বাহুল্য, ইহা সর্বত্র স্বীকৃত যে, মধ্যযুগে আরবী ভাষা ছিল খুবই উন্নত। শিক্ষা-দীক্ষা, বিজ্ঞান-সাহিত্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রভৃতি অন্যান্য সব ক্ষেত্রে সভ্য সমাজের প্রধান বাহন তথা আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে এটা মানব জাতিকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

---

১. "About the eight century A. D."—says Prof. F. K. Richtmyer and Prof. E. H. Kennard in their Introduction to Modern Physics (4th Edition 1947) "as an Indirect *result of religious* activity the Arabs began to cultivate *chemistry*, *mathematics* and *astronomy* in large part by translating into Arabic the works of the Greeks but also in few instances by making *oiginal contributions*. About years 1,000, Alhazen produced a work on *Optics* in seven books. This treatise sets forth a clear description of the optical system of the eyes, discusses the laws of concave and convex mirrors both spherical & cylindrical and carries the subject of refraction a little further by recognizing that the proportionality between the angles of incidence and refraction holds only for small angles." It is said that Muslims invented the telescopic arrangements log before Galileo.

এখানে আর একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জ্ঞানের সাধনা সর্বপ্রথম গীর্জা-মন্দিরে আরম্ভ হলেও ধর্মের পুরোহিতেরা কালে এমন অন্ধ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন যে, বিজ্ঞানের সত্যোদ্ধারকে এরা অনেক সময় সর্বপ্রকারে বাধা দিয়েছিলেন। গ্রীক আমলে ত বটেই— পরবর্তী যুগে খৃস্টান-পাদ্রী ও খৃস্টান শাসকেরাও অনেক নামজাদা বিজ্ঞানীর অমানুষিক উৎপীড়ন,—এমন কি মৃত্যুরও কারণ হয়েছিলেন। বিখ্যাত বিজ্ঞানী গ্যালিলিওর জীবনী এর করুণতম সাক্ষ্য।

কিন্তু জ্ঞানের ইতিহাসে এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা হল এই যে, ইসলাম বিজ্ঞানের সত্যোদ্ধার ও গবেষণাকে শুধু যে বাধা দেয়নি তা-ই নয়, বরং বিজ্ঞানীদের বিপুলভাবে উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছে। জ্ঞানী ও সুধী ব্যক্তিরা মনে করেন ঃ কুরআনে বারবার বিশ্বের সর্বত্র সত্যানুসন্ধানের তাকীদই এর প্রধান কারণ।

গ্যালিলিও-নিউটনীয় যুগ (১৫৫১—১৮০০)

ইতালী দেশীয় বিজ্ঞানী গ্যালিলিওর জীবনকাল হল ১৫৬৪ থেকে ১৬৪২ খৃস্টাব্দ। তিনিই প্রথম ঘড়ির দোলক আবিষ্কার করেন। ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে তিনিই প্রথম টেলিস্কোপ আবিষ্কার করে জ্যোতিষশাস্ত্রে ব্যবহারিক পদ্ধতি প্রবর্তন করেন।

গ্যালিলিও ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি। ইতালীর পিসা নামক স্থানে অবস্থানকালে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা অতীতের বহু ভুল ধারণার বিরুদ্ধে লেখেন। ফলে তাঁকে কারাগারে বন্দী-জীবন ভোগ করতে হয় এবং বাধ্য হয়েই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে তিনি বিরত থাকেন। পরবর্তীকালে তিনি সৌরজগতের টলেমীয় বিন্যাস যে সত্য নয়—বরং কোপানিকাস বিন্যাসই যে সত্য, সেটা যুক্তি-তর্কের দ্বারা প্রমাণ করে একটি পুস্তক রচনা করেন।

কিন্তু এটাই হয়ে ওঠে তাঁর কাল। বিচারে তাঁকে অশেষ অপমান ও মৃত্যুকাল পর্যন্ত কারা ভোগ করতে হয়। কিন্তু কারাগারে থেকেও তিনি অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবিষ্কার করেন। এই যুগের নামকরা বিজ্ঞানী-দের মধ্যে জ্যোতিষশাস্ত্রের দিকপাল কেপলার (Kepler ১৫৭১—১৬৩০), চুম্বক তত্ত্বের বিজ্ঞানী গিলবার্ট (Gilbirt ১৬০০ খৃস্টাব্দে "De magnet" নামক পুস্তকের লেখক), আলোকবিজ্ঞানের প্রতিসরণের নিয়ম আবিষ্কারক

স্নেল (Snell, ১৫২১—১৬২৬), ব্যারোমিটারের মূলনীতি নির্ধারক টরিসেল্লি (Torricelli, ১৬০৮—১৬৪৭), জার্মানীর পাম্প বিজ্ঞানী গেরিক (Guericke, ১৬০২—১৬৮৬), উদস্থিতি Hydrostatics বিদ্যার দিকপাল পাসকেল (Pascal, ১৬২৩—১৬৬২) প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নিউটন ছিলেন আগের যুগের সব বৈজ্ঞানিকের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব-কালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের অন্যতম। আলো-বিজ্ঞানে তাঁর সুদূর-প্রসারী গবেষণা, গতি বিজ্ঞানে তাঁর অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা, এই বিজ্ঞানে মৌলিক নিয়ম আবিষ্কার, সর্বোপরি তাঁর বিশ্বপ্রসারী মহাকর্ষ-তত্ত্ব— এক কথায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ দান সত্যই তাঁকে বিজ্ঞানের এই উচ্চতম আসনে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে।

নিউটন ছিলেন জাতিতে বৃটিশ।

এই মহাবিজ্ঞানী ছিলেন আল্লাহ্‌তে ও ধর্মে অটল বিশ্বাসী। ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর বহু লেখা সাতিশয় মূল্যবান ও যৌক্তিক দিশারী হিসাবে চিন্তাবিদদের দ্বারা সমাদৃত হয়ে আসছে। এই কালের নামকরা বিজ্ঞানী হলেন রবার্ট বয়েল (Robert Boyle, ১৬২৭—১৬৯১), ঢেউতত্ত্বের উদ্‌গাতা রবার্ট হুক (Robert Hook, ১৬৩৫—১৭০৩), ক্যালকুলাস শাস্ত্রের প্রবক্তা লিবনিতজ্‌ (Libnitz ,১৬৪৬—১৭১৬), গ্যাসের গতি-তত্ত্বের ও হাইড্রোডিনামিকসের নামকরা গবেষক বার্নাওলী (Bernoulli ১৭০০—১৭৮২) প্রমুখ।

এই যুগেই আমেরিকার বিখ্যাত রাজনীতিবিদ বিজ্ঞানী বেন্‌জামিন ফ্রাংকলিন (১৭০৬—১৭৯০) ধন-বিদ্যুৎ ও ঋণ—বিদ্যুৎ (positive and negative electricity) আবিষ্কার করেন।

এই যুগের শেষের দিকে তিন জোড়া তত্ত্ব প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে চিন্তা জগতে আলোড়নের সৃষ্টি করে। আলো ঢেউয়ের আকারে বিস্তার লাভ করে— না কণার আকারে চলে (Wave Theory vs. Corpuscular Theory), তাপ কি তরল পদার্থের মত কিছু— না অণুর গতি-জনিত শক্তি (Caloric vs. Kinetic Theory), ইলেকট্রিসিটি কি একটা তরল পদার্থ— না দুটি তরল পদার্থের সমষ্টি (One-fluid Theory vs. Two-fluids Theory)— এই সবই ছিল তখন বিজ্ঞানের মহাসমস্যার বিষয়।

ক্লাসিক্যাল যুগ

এর পর এল ক্লাসিক্যাল যুগ (১৮০১–১৮৯০ খৃঃ)। এই যুগে ইলেক-ট্রিসিটির তরল-পদার্থতত্ত্ব পরিত্যক্ত হল এবং তার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হল ইলেকট্রনতত্ত্ব (Electron Theory)। এই তত্ত্ব অনুযায়ী ইলেকট্রন নামক বিদ্যুৎ-কণার গতিতেই ইলেকট্রিসিটির উন্মেষ। অনুরূপভাবে তাপ-বিজ্ঞানের কেলরিক তত্ত্ব বর্জিত হয় ও গতিতত্ত্ব (Kinetic Theory) সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। গতিতত্ত্ব অনুসারে পদার্থের অণুর আগ-পাছ কম্পনের মাধ্যমে তাপ স্থানান্তরিত হয়।

কিন্তু আলো ঢেউয়ের আকারে চলে, না কণার আকারে চলে তা নিয়ে মতবিরোধ চলতেই থাকে। ক্লাসিক্যাল যুগে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীতে ঢেউতত্ত্ব সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এমনও মনে হয়েছিল—কণা-তত্ত্ব বুঝি এবার পরিত্যক্ত হতে চলেছে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর গবেষণা কণা-তত্ত্বকে পুনর্জীবিত করে তোলে-- Quantum Theory বা শক্তি-কণা-তত্ত্বের আকারে। শুধু তাই নয়, বিংশ শতাব্দীতে এ দুটি পরস্পর-বিরোধী তত্ত্ব একটা মহাতত্ত্বে বিলীন হয়েছে। তাতে বলা হচ্ছে ঃ আলো, তাপ বা শক্তি-কণা সবই ঢেউ এবং শক্তি-কণা এই দু'রূপ গ্রহণ করে বিভিন্ন দিকে ধাবিত হতে পারে। এই মিলনের ফলে বিজ্ঞানে একটি নতুন শাখার সৃষ্টি হয়, যাকে বলা হয় ঢেউগতি-বিজ্ঞান অর্থাৎ কোয়ান্টাম মেকানিকস (Wave Mechanics বা Quantum Mechanics)।

ক্লাসিক্যাল যুগের শত শত বিজ্ঞানীর মধ্যে মাইকেল ফেরাডে ও ম্যাক্স-ওয়েল শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিলেন। এই দু'জন বিজ্ঞানী ইলেকট্রিসিটি সম্বন্ধে বিপুলভাবে গবেষণা কার্য চালান ও বহু সুদূরপ্রসারী বিদ্যুৎ-তত্ত্ব পরিবেশন করেন। ম্যাক্সওয়েল অঙ্কের মাধ্যমে তাঁর বিখ্যাত ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক তত্ত্ব (Electro-magnetic Theory) প্রকাশ করেন। তাতে তিনি বলেন ঃ বিদ্যুতের চলার সময়ে যে চুম্বক-শক্তির উন্মেষ হয় এবং দু'য়ের প্রতিক্রিয়ায় যে শক্তি উৎপন্ন হয়, তা বৈদ্যুতিক ঢেউয়ের আকারে আলোর সমান গতিতে সর্বদিকে প্রসারিত হয়। এই তত্ত্বকে অবলম্বন করেই পরবর্তীকালে ম্যাক্সওয়েল-লরেন্টজ্ সমীকরণ লিখিত হয় ; আর এই সমীকরণকে ভিত্তি করেই বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইনস্টাইন আংকিকভাবে গবেষণা

করে তাঁর বিখ্যাত আপেক্ষিক-তত্ত্ব (Theory of Relativity) প্রকাশ করেন।

ক্লাসিক্যাল যুগের আর একটা বড় আবিষ্কার হল শক্তি-সংরক্ষণ-বিধি (Law of Conservation of Energy)। এর মূল কথা হল ঃ বস্তুর মত শক্তিরও ধ্বংস ও সৃষ্টি নেই, এটাও অবিনশ্বর। এ যুগের বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের মধ্যে ছিলেন ঃ থার্মডিনামিক্সের প্রতিষ্ঠাতা কার্নট (Carnot ১৭৯৬—১৮৩২), তাপ বিজ্ঞানী জুল (Joule, ১৮১৮—১৮৮৯), আলোক বিজ্ঞানী ইয়ং (Young, ১৭৭৩—১৮২৯) ও ফ্রেজনেল (Freznel, ১৭৮৮—১৮২৭)। এই কালের বিজ্ঞানী গিলভানি (Gilvani) ১৭৮৬ খৃস্টাব্দে ইলেকট্রিক কারেন্ট আবিষ্কার করেন। তাঁর ও ভলটার গবেষণায় ব্যাটারীর আবিষ্কার সম্ভব হয়। এমপিয়ার (Ampere, ১৭৭৫—১৮৩৬) ইলেকট্রিসিটির বহু মৌলিক আবিষ্কার সম্পন্ন করেন। মোর্স (Morse, ১৭৯১—১৮৭২) ও গ্রাহাম বেল (Graham Bell, ১৮৪৭—১৯০০) টেলিগ্রাফ আবিষ্কার করেন। আর হেনরী (Henry, ১৭৯৯—১৮৭৮) প্রথম ইলেকট্রিক মটর প্রস্তুত করেন।

শিল্প-যুগ ও আধুনিক যুগ (১৮৯১-১৯২৫)

এই যুগে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ঃ জে-জে থমসন, প্ল্যাংক, রনজেন, ডি-ব্রগলি, আইনস্টাইন, রাদারফোর্ড, মিলিকান, জিন্স্, মিঃ কুরী ও মাদাম কুরী প্রমুখের নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। এই যুগেই জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অর্থাৎ শিল্পকারখানায় বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে কাজে লাগানো ব্যাপকভাবে শুরু হয়।

১৮৯৫ খৃস্টাব্দে রনজেন এক্স-রে আবিষ্কার করেন। ১৮৯৬ খৃস্টাব্দে ইটালীর মার্কনী প্রথম বেতার সংকেত দূরস্থানে প্রেরণে সক্ষম হন। ইলেকট্রিসিটির মূল কণা ইলেকট্রন (Electron) আবিষ্কার করেন জে.জে. থমসন ১৮৯৭ খৃস্টাব্দে। ১৯০৫ খৃস্টাব্দে আলবার্ট আইনস্টাইন তার আপেক্ষিক-তত্ত্ব প্রকাশ করেন এবং এর দ্বারা প্রমাণ করেন যে, একটি সুনির্দিষ্ট নিয়মে বস্তুকে শক্তিতে পরিণত করা যায়। এ থেকেই প্রমাণিত হয়, সামান্য পরিমাণ বস্তু থেকে অফুরন্ত শক্তি তৈরি করা যেতে পারে। প্লাংক (Plank) ১৯০০ খৃস্টাব্দে কোয়ান্টাম তত্ত্ব পরিবেশন করেন। এর পর ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম প্রভৃতি আবিষ্কৃত হওয়ার পর প্রমাণিত হয় যে,

একটি পদার্থ শক্তি উদ্‌গীরণ করে অন্য একটি মৌলিক পদার্থে পরিণত হতে পারে। অতঃপর ১৯১১—'১৩ খৃস্টাব্দের দিকে রাদারফোর্ড, বোহর প্রমুখ বিজ্ঞানী পরমাণুর (atom) গঠন কিরূপ তার তত্ত্ব নির্ধারণ করেন। এতে বলা হয়ঃ প্রতিটি পরমাণুর কেন্দ্রে আছে নিউক্লিয়াস্—আর বাইরে একাধিক পথে ইলেকট্রনমণ্ডলী (সৌর জগতের গ্রহগুলির মত) নিউ-ক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে অনবরত প্রদক্ষিণ করছে। বেকারেলের (Becquerel) গবেষণার পর কুরী-দ্বয়ের (Mr. & Mrs. Curies) রেডিয়াম ও পলো-নিয়ামের আবিষ্কারের দ্বারা তেজস্ক্রিয়তা (radioactivity) সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয়।

১৯১১ খৃস্টাব্দে কসমিক আলো বা মহাজাগতিক রশ্মি আবিষ্কৃত হয়।

১৯২৪ খৃস্টাব্দে ডি-ব্রগলী প্রমাণ করেনঃ বস্তুর দ্বৈত রূপ আছে, কণার রূপ ও ঢেউয়ের রূপ। ১৯২৭ সালে জার্মানীর হাইজেনবার্গ-এর বিখ্যাত অনিশ্চয়তা তত্ত্ব (Uncertainty, that is, Indeterminacy Principle) প্রকাশিত হয়। তাতে প্রমাণিত হয়, মূলত কোন কণা বা ঢেউয়ের অবস্থান ও গতি একই সংগে জানা সম্ভবপর নয়—সবটাতেই একটা না একটা অনিশ্চয়তা থাকতে বাধ্য।

১৯৩২ খৃস্টাব্দে চাদউইক নামক আর একজন বিজ্ঞানী পরমাণুর মধ্যে অবস্থিত নিউট্রন কণা আবিষ্কার করেন। আর এই সময় থেকেই নিউক্লিয়ার ফিজিক্স (Nuclear Physics) নামক বিজ্ঞানের একটি আধুনিক শাখার কাজ আরম্ভ হয়।

এই সমস্ত আবিষ্কারের ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে জার্মানীতে বস্তু থেকে অফুরন্ত শক্তি সৃষ্টি করে যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য গবেষণা চলতে থাকে। এই সময়েই আইনস্টাইনসহ জার্মানীর অনেক নাম-করা বিজ্ঞানী জার্মানীর ভাগ্যবিধাতা হিটলারের ভয়ে আমেরিকায় ও রাশিয়ায় পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। প্রধানত এই বিজ্ঞানীদের সাহায্যেই আমেরিকা সর্বপ্রথম আণবিক বোমা তৈরি করে জাপানের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে।

পরবর্তীকালে আমেরিকা ও রাশিয়া মারণাস্ত্র তৈরীর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে হাইড্রোজেন বোমা, রকেট, মিসাইল, স্পুটনিক প্রভৃতি সৃষ্টি করে এবং পরবর্তী প্রচেষ্টা হিসাবে চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ প্রভৃতি গ্রহ

অধিকারের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আত্মনিয়োগ করে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রধানত জার্মান বিজ্ঞানীদের সাহায্য নিয়েই রাশিয়াও রকেটের সাহায্যে মহাকাশের অভিযানে সফলতা অর্জন করেছে।

এ প্রসংগে একটা বিষয় বিজ্ঞানের প্রকৃতি নির্ধারণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে যা দেখা যায়, স্পর্শ করা যায় বা অনুভব করা যায়—তাই নিয়েই বিজ্ঞানীরা গবেষণা করতেন। খুব বেশী হলে দূরবীন বা অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দূরের বস্তু ও নিকটস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী ও কণা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলত।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান আর এক নতুন জগতে প্রবেশ করে। এখানে যা নিয়ে গবেষণা তা পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের বহির্ভূত—এমনকি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও এই সমস্ত কণা বা শক্তি প্রত্যক্ষ করা অসম্ভব—পরোক্ষভাবে এগুলির ধারণা করা যায় মাত্র। এগুলিকে বুঝতে হয় কল্পনা ও তত্ত্বের দ্বারা, বস্তুর অতীত সূক্ষ্মতর মননশীলতার দ্বারা। আর এভাবেই বিজ্ঞান বস্তু হতে বস্তুর অতীত এক সূক্ষ্ম জগতে (Abstract world) পাড়ি দিয়েছে।

মহাবিশ্বের এই abstract বা বিমূর্ত রূপ প্রথম প্রকটিত হয় ম্যাক্স-ওয়েলের ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক তত্ত্বে। Abstract অঙ্কের মাধ্যমে এর উৎপত্তি। এটা আরো পরিস্ফুট হয় আইনস্টাইনের (১৮৭৯ – ১৯৫৫) অঙ্ক-নির্ভর আপেক্ষিক তত্ত্বে। তারপর বছর বছর যে অসংখ্য বিষয় নিয়ে গবেষণা ও মনসমীক্ষা চলছে তাতে এত দিনের পরিচিত বস্তু-জগত নিশ্চিত-ভাবে তার বস্তুরূপ হারিয়ে ক্রমে সূক্ষ্মরূপ গ্রহণ করছে।

তাই একজন বিখ্যাত দার্শনিক বলেছেন ঃ "উনবিংশ শতাব্দীর বস্তুর ছিল প্রকৃতই বস্তুবাদী (materialistic) রূপ। কিন্তু বস্তু এখন এমন অবস্থায় দাঁড়িয়েছে যাকে না ধরা যায়- না দেখা যায়। আধুনিক বস্তু আকারহীন, দুর্বোধ্য—স্থান-কালের মধ্যে এটা একটা অতি সূক্ষ্ম সত্তা, বিদ্যুতের কণা বা কোন সম্ভাব্য ঢেউ— যা শূন্যে বিলীয়মান। প্রায়ই বস্তু আর বস্তু বলেই মনে হয় না—এটা হয়ে দাঁড়ায় অনুভবকারী চেতনার কাল্পনিক ছায়া মাত্র।

বৈজ্ঞানিক মায়ার্সন বলেন ঃ

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারলেও ইহা

সীমাবদ্ধ ও আংশিক হতে বাধ্য ; কারণ যুক্তি আমাদিগকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যায় যা সত্যই আয়ত্তের বাইরে।

আর আইনস্টাইনের ভাষায় ঃ

এইভাবে আমরা আমাদের অস্তিত্বের যৌক্তিক ধারণার শেষ সীমান্তে আসিয়া পড়ি। [Eienstien—Out of My Later Years]

বৈজ্ঞানিক বিধির গুরুত্ব

বিজ্ঞানের আলোচনায় আমরা বিধি, নিয়ম, তত্ত্ব, কল্পনা (principles. laws, theories. hypothesis) প্রভৃতির সঙ্গে পরিচয় লাভ করেছি। এখন প্রশ্ন জাগে এগুলির গুরুত্ব ও আবশ্যকতা কি ?

স্মরণাতীত কাল থেকে বিজ্ঞানের যে সাধনা চলে আসছে সে সাধনার মূলে আছে একটা বিশ্বাস ঃ সমস্ত বিশ্ব একটা একক সত্তা, পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন সত্তা নয় এবং এই মহাবিশ্বে যে সমস্ত ঘটনা অহরহ সংঘটিত হচ্ছে তা সবই কতকগুলা নিয়মের দ্বারা চালিত হচ্ছে —যথেচ্ছভাবে নয় (not whimsically)। সৃষ্টির ঐক্য ও নিয়মের সামঞ্জস্য সম্বন্ধে এই বিশ্বাস যদি সর্বদা বিদ্যমান না থাকত তবে বিজ্ঞানের উন্নতি কোন দিনই সম্ভবপর হত না। একটি অসমঞ্জস প্রকৃতিতে গবেষণার কোন সূত্রই বৈজ্ঞানিকেরা তালাশ করে পেতেন না।

উপরে যে নিয়মের কথা বলা হল তাকেই বিজ্ঞানে বলা হয় নিয়ম বা বিধি (laws or principles)। বৈজ্ঞানিক সাধনা শুধু কোন ঘটনা আবিষ্কারে নয়—সুষ্ঠুভাবে তার ব্যাখ্যাতেও। কিন্তু কিভাবে আমরা একটা ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে পারি ?

কয়েকটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক ঃ

১. কেন চন্দ্র অনবরত পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে ?

কারণ প্রকৃতিতে একটা নিয়ম আছে ঃ একটা গতিশীল বস্তু যে পর্যন্ত বাইরের বাধা না পায় সে পর্যন্ত অনবরত চলতে থাকবে। যেহেতু চন্দ্র শূন্যে বিদ্যমান—সে কোন বাধার সম্মুখীন হয় না, তাই সে বিরামহীনভাবে চলে। এই বাধাহীন গতি ও পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে এর গতি ঘূর্ণনে পরিণতি লাভ করে। এ হল নিউটনের গতির ১ম নিয়ম ও মাধ্যাকর্ষণ (মহাকর্ষ) নিয়মের সম্মিলিত ফল।

২. ভারী লোহার জাহাজ ভাসে কেন ?

কারণ, নিয়ম আছে ঃ খোল করা লোহার পাতের তৈরী জাহাজ যে পরিমাণ পানি সরিয়ে দেয়, তার ওজন জাহাজের ওজন থেকে বেশী হ'লে জাহাজ ভাসবে। এই নিয়ম 'আর্কিমিডিসের বিধি' নামে খ্যাত।

সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম বা বিধি দ্বারাই আমরা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে থাকি। এখানেই বৈজ্ঞানিক নিয়ম আবিষ্কারের গুরুত্ব। যে পর্যন্ত একটা ঘটনা নিয়ন্ত্রণকারী নিয়ম আমরা আবিষ্কার করতে না পারি, সে পর্যন্ত উক্ত ঘটনাকে সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি না। আর সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা দিতে না পারলে তাকে আমরা সুসংবদ্ধ জ্ঞান তথা বিজ্ঞান বলতে পারি না। এই জন্যই বৈজ্ঞানিকেরা একটা ঘটনা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে তার নিয়ন্ত্রণকারী নিয়ম আবিষ্কারের জন্য উঠেপড়ে লাগেন। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল থেকে এই নিয়মটি নিরূপণ করা সম্ভব হয়। যদি কোন জানা নিয়ম উক্ত ঘটনার নিয়ামক বলে তাঁরা প্রমাণ করতে না পারেন, তবে তাদের কল্পনা বা hypothesis-এর—আশ্রয় নিতে হয়। আর এজন্যই বিজ্ঞানে কল্পনা অপরিহার্য। কল্পনাটি যদি জানা ঘটনাবলীর বিপরীত হয়—তবে তা পরিবর্তিত এমনকি পরিত্যক্তও হয়; কিন্তু কল্পনাটি যদি সংশ্লিষ্ট সমস্ত ঘটনাকে বিনা ব্যতিক্রমে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হয়—তবে তাই প্রাকৃতিক নিয়ম বলে সর্বত্র গৃহীত হয়।

তত্ত্ব বা Theory-এর স্থান কল্পনা ও নিয়মের মধ্যস্থলে। এটা কিছুটা নির্ভর করে কতগুলি কল্পনার উপর আর কিছুটা পূর্বে আবিষ্কৃত নিয়ম-বিধির উপর।

এই সমস্ত নিয়মের মূল কারণ কি তা নিয়ে গবেষণা করা বিজ্ঞানী-দের সামর্থ্য ও আয়ত্তের বাইরে। কিন্তু একটি সত্য দিন দিন প্রকট হয়ে উঠছে ঃ এ পর্যন্ত যত নিয়ম আবিষ্কৃত হয়েছে তার মূলেও আছে মাত্র কয়েকটা মৌলিক নিয়ম। কোন কোন বিজ্ঞানী যুক্তিসঙ্গতভাবেই চিন্তা করেন ঃ অদূর ভবিষ্যতে এমন সময় হয়ত আসবে যখন একটা মাত্র মহানিয়মের দ্বারা সৃষ্টির সমস্ত ঘটনা ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর হবে। মহাবিশ্বের ঐক্য ও সামঞ্জস্যই শুধু এর ইংগিত বহন করে না, পূর্বে আবিষ্কৃত বহু নিয়ম পরবর্তীকালের মৌলিক নিয়মের দ্বারা স্থানচ্যুত হওয়ায় এটা খুব সম্ভাব্য হয়ে উঠেছে।

দর্শন কিন্তু নিয়মের নিয়ামক বা মূল কারণ কি তার গবেষণায় আরো অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারে। আর এই দিকেই নিউটন, হোয়াইটহেড, এডিংটন, আইনস্টাইন প্রমুখ বিখ্যাত বিজ্ঞানী সুস্পষ্ট ধারণা দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ এই নিয়মগুলার মূলে আছে 'এক মহা কারণ।'

প্রফেসর হোয়াইটহেড তাই বলেন ঃ

বিজ্ঞান যে পর্যন্ত কার্যকারণ সম্বন্ধকে নীতি হিসাবে গ্রহণ করে এবং তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং তদনুযায়ী এই সিদ্ধান্ত পোষণ করে যে, এই দৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্বয়ম্ভূ (Self-created) হতে পারে না—সে পর্যন্ত এটা নিশ্চিত সত্য যে, বিজ্ঞান আমাদের এক অদৃশ্য 'কারণ-সত্তার' দিকেই চালিত করছে। যদি এই কারণ-সত্তাকেই আমরা সৃষ্টিকর্তা বা আল্লাহ্ বলি তা'হলে বিজ্ঞানই নাস্তিকতাকে অচল ও অসম্ভব করে দিয়েছে।

এ সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিতে গিয়ে আইনস্টাইন বলেছিলেন ঃ "ধর্মহীন বিজ্ঞান খোঁড়া এবং বিজ্ঞানহীন ধর্ম অন্ধ।"

২

বিজ্ঞানের গতি-প্রকৃতি

আধুনিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রার সূচনা হয়েছিল কয়েক শতাব্দী পূর্বে। এই জয়যাত্রা চলল অপ্রতিহত গতিতে—নব নব আবিষ্কারে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল মানুষের জ্ঞান-ভাণ্ডার। বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োজনের ফলে সে হল বিপুল শক্তির অধিকারী। বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা লাভের এই বিপুল গতি ও অভিনব প্রকৃতি সত্যই বিস্ময়কর।

গতিশীল বিজ্ঞানের প্রথম সংঘাত হল হাজার হাজার বছরের পুরনো চিন্তাধারা, ধর্মবিশ্বাস, নীতি, দর্শন প্রভৃতির উপরে। নতুন ক্ষমতায় বলীয়ান মানুষ নতুন দৃষ্টিভংগীতে বিচার করতে চাইল তার ধর্ম, সংস্কার, সংস্কৃতি, দৈহিক ও সামাজিক মূল্যবোধকে। সংঘর্ষে পরিণামে বিজ্ঞানেরই জয় হল। তাসের ঘরের মত ধসে পড়ল পুরাতন আদর্শ ও চিন্তাধারা। মানুষের চিন্তাজগতে বিজ্ঞান সৃষ্টি করল নৈরাজ্যের যুগ। উনবিংশ শতাব্দীর আলোচনা ও আবিষ্কার বিজ্ঞানকে করল বস্তুবাদী (materialistic)। আত্মশক্তিতে দৃপ্ত বিজ্ঞান সগর্বে ঘোষণা করল ঃ

১. অলৌকিকতা (miracle) বা আকস্মিকতা বলে কিছু নেই। এই সবই সীমাবদ্ধ জ্ঞান থেকে উদ্ভূত কুসংস্কারের ফল।
২. প্রত্যেক ঘটনা বস্তুগত কারণেই ঘটে। বিনা কারণে জগতে কিছুই ঘটতে পারে না, অর্থাৎ কার্যকারণ সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য।
৩. সৃষ্টিতে অজ্ঞেয় বলে কিছুই থাকতে পারে না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির সংগে সংগে মানুষ সৃষ্টির রহস্য ভেদ করতে অধিক থেকে অধিকতর সক্ষম হচ্ছে।
৪. মানুষের ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানই প্রকৃত ও চরম।

প্রথমে মনে হয়েছিল, বিজ্ঞানের এই সব দাবী সত্যিই যুক্তিসংগত। তার নতুন শক্তির প্রভাবে অন্যসব মতবাদ ও বিশ্বাস তুচ্ছ প্রতীয়মান হয়েছিল।

কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান তথা বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান নতুন নতুন আবিষ্কার ও তত্ত্বের দ্বারা উনবিংশ শতকের বা তৎপূর্ববর্তী বিজ্ঞানের যুক্তি ও দাবিকে অনেকাংশে অস্বীকার করে বসেছে। নিজেদের আবিষ্কারই বিজ্ঞানীদের আজ হতভম্ব করে দিচ্ছে। যতই তাঁরা অগ্রসর হচ্ছেন, ততই তাঁরা নতুন নতুন রহস্যজালে আবদ্ধ হচ্ছেন। একটি ক্ষুদ্র রহস্য ভেদ করতে গিয়ে দৃঢ়তর রহস্যের সম্মুখীন হচ্ছেন। যতই তাঁরা অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী হচ্ছেন ততই তাঁদের জ্ঞানের ক্ষুদ্রতা ও অসম্পূর্ণতা প্রকট হয়ে উঠছে।

আধুনিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে যাঁরা ওয়াকিফহাল নন; তাঁদের কাছে এটা অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে; কিন্তু বিজ্ঞানে যে বিরাট বিপ্লব ঘটেছে এবং তার প্রলয়ংকরী ঝাঁকুনিতে বিজ্ঞানের পুরনো সৌধ ভেঙে খানখান হয়ে গিয়ে যে নতুন ও সুন্দর সৌধের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে, সে সম্পর্কে যাঁরা ওয়াকিফহাল তাঁদের কাছে এটা সাধারণ সত্য হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।

আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি ও মূলনীতি নির্ধারক হল পদার্থ বিজ্ঞান (Physics)ও জীববিজ্ঞান (Biology)। বস্তু ও জীব নিয়েই বিজ্ঞানের কারবার। আর বস্তু ও জীবের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণই এই দুই বিজ্ঞানশাখার কাজ।

অতীতে জীব-বিজ্ঞান ডারউইন-তত্ত্বকে অবলম্বন করে যাই বলুক—আজ এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, জীবন বস্তুধর্মী যন্ত্র নয়। জীবন একটি মৌলিক ব্যাপার, অধিকন্তু এটা সৃষ্টিশীল ও উদ্দেশ্যমূলক। এ থেকেই সৃষ্টিশীল বিবর্তনতত্ত্বের উৎপত্তি।

> The mode of behaviour of a living organism is fundamentally different from that of a machine and can never be explained in terms of it. Life, it seems, is fundamental, —moreover it is creative, and uses and moulds the forms of living organism as instruments to further its purposes and serve its end. Hence arises the theory of **creative evolution** as the expression of a purposive force or principle which, manifesting living organisms seeks to achieve ever higher qualities of life in the effort to realise some objective at which we can at present only deemly guess.

জীবদেহের কার্যপ্রকৃতি মূলত যন্ত্রের কার্যপ্রকৃতি থেকে পৃথক। জীবপ্রকৃতি মেশিনের স্বরূপ দ্বারা ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। মনে হয়, জীবন

একটি মৌলিক সত্তা। অধিকন্তু জীবন সৃষ্টিশীল। এটা জীবদেহের স্বরূপগুলিকে এমনভাবে তৈরি ও ব্যবহার করে—যাতে তার উদ্দেশ্য ও স্বার্থ সিদ্ধ হয়। এই কারণে সৃষ্টিধর্মী বিবর্তনবাদের উদ্ভব হয়েছে। এই তত্ত্ব এমন একটি উদ্দেশ্যশীল শক্তি বা নীতির প্রমাণ দেয়, যা জীবদেহ থেকে একটি আপাত দুর্জ্ঞেয় উদ্দেশ্যের দিকে পরিচালিত করার তাকীদে ক্রমশ উন্নততর জীবনের বিকাশ সাধন করছে।

অন্যদিকে পদার্থ বিজ্ঞান অণুপরমাণুকে ভেঙ্গে বস্তুকে এমন পর্যায়ে এনেছে, যাতে একে আর মৌলিকভাবে বস্তু বলে চিনবারও উপায় নেইঃ বস্তুর বস্তুত্বই যেন আজ উবে গেছে।

অনিশ্চয়তাবাদ প্রমাণ করেছেঃ সূক্ষ্ম জগতে একই সময়ে একটি বস্তু বা ঘটনার সব দিকের পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভ অসম্ভব। একদিক জানতে গেলে অন্যদিকে ভুল আসতে বাধ্য। কোন বস্তুর অবস্থান ও গতি একই সঙ্গে বা একটি বিশেষ মুহূর্তে জানা সম্ভব নয়। এ ছাড়া কোন ঘটনাই পরীক্ষক ও পরীক্ষণীয় যন্ত্রের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা যে সকল সত্য উদ্ধার করা হয়েছে বলে দাবি করা হয় তার কোনটাই পূর্ণ বা অবিকৃত সত্য নয়, বরং প্রভাবিত ও পরিবর্তিত রূপ মাত্র।

শক্তি-কণাতত্ত্ব (Quantum Theory)[১] বিজ্ঞান জগতে ব্যাপকতর বিপ্লব সাধন করেছে। বহু যুগ থেকে যে বিশ্বাস ও জ্ঞানের উপর বিজ্ঞানের ভিত্তি গড়ে উঠেছে সে ঢেউতত্ত্ব (Wave Theory)[২] এবং অবিরামতত্ত্বের (Theory of Continuity) স্থায়ী আসন আজ টলটলায়মান। ঢেউতত্ত্ব অনুসারে অতি ক্ষুদ্র অবিচ্ছিন্ন ঢেউয়ের সাহায্যে আলো স্থানান্তরে গমন করে। কণাবাদ প্রমাণ করেছেঃ আলো কণার আকারে একটার পর একটা চলে যায়—ঢেউয়ের মত অবিরাম গতিতে নয় (not continually but one quantum after another) জগতের ক্ষুদ্র কণাগুলার সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা (freedom) আছে বলেও প্রমাণিত হয়েছে।

---

১. এই তত্ত্ব প্রমাণ করেছে—আলো ইত্যাদি শক্তি কণার আকারে একটার পর একটা চলে যায় -ঢেউয়ের আকারে অনবরতভাবে যায় না।

২. ঢেউতত্ত্ব প্রমাণ করেছে, আলো ইত্যাদি ঢেউয়ের আকারে এক স্থান হতে অন্য স্থানে যায়।

অনিশ্চয়তাবাদের সাহায্যে কণাবাদ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, পরমাণু জগতে একটি বিশিষ্ট কণার গতি, অবস্থান ও গুণাবলী একই সংগে জানা সম্ভবপর নয়; যে আংশিক জ্ঞান লাভ করা যেতে পারে তারও সত্যতা সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নেই।

সম্ভাবনাতত্ত্বের (Theory of probability) সাহায্যে কণাগুলির সংখ্যা ও গুণাবলী সম্বন্ধে একটা অনুমান করা যেতে পারে মাত্র। তবে তাতেও স্বভাবত কিছু না কিছু ভুল ও অনিশ্চয়তা থেকে যাবে। আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে এই ভুল উপেক্ষণীয় হলেও পরমাণু জগতে এর প্রভাব বিরাট। সুতরাং আজ প্রমাণিত হয়েছে: বিজ্ঞান আত্মশ্লাঘার যে সৌধ অসম্পূর্ণ ও আংশিক জ্ঞানের সাহায্যে গড়ে তুলেছিল তার ভিত্তি ছিল চোরাবালির উপর। যে বিজ্ঞানী বিশ্বরহস্য উদ্ঘাটনের কথা স্পর্ধাভরে ঘোষণা করেছিলেন—আজ তাঁকে বাধ্য হয়ে বলতে হচ্ছে—'আমরা কোন বস্তুর বা ঘটনার প্রকৃত অবস্থা (exact reality) কখনই জানতে পারব না। শুধু অনুমান করেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে।'

প্রমাণিত হয়েছে, বস্তু বা ঘটনাকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে মুক্ত করা সম্ভব নয়; অথচ বিজ্ঞানীরা তাকে আলাদাভাবে বাহ্য প্রভাব-মুক্ত ধরে নিয়েই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। আলোক-বিজ্ঞানের (Optics) একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। এ ক্ষেত্রে আমরা ভবিষ্যত অবস্থা নির্ণয়ের জন্য একটা মাত্র আলো-রেখা (A ray of monochromatic light) অথবা একটা মাত্র কণার কল্পনা করি—যা একটা বিশিষ্ট স্থানে অন্যান্য আলো তরঙ্গ বা কণা থেকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে অবস্থান করে। এটা নিছক কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ কোন আলোরেখা বা কণা বিচ্ছিন্নভাবে কোন সময়েই অবস্থান করে না। অনেক সময় ভুল উপপাদ্য থেকে আমরা আরম্ভ করি, তাই ভুল বা আংশিক সিদ্ধান্তেই পৌঁছি।

কোন ঘটনাকে সম্পূর্ণ জানতে হলে তার মূলে যা আছে তা এক ইউ-নিটকে সম্পূর্ণ আলাদা করে বিচার করতে হয়। কিন্তু আলাদা করে দেখা অসম্ভব ব্যাপার। আধুনিক জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ডি. ব্রগলির (De Broglie) ভাষায়:

The concept of a physical unit thus becomes completely clear and properly defined only if it is regarded as a unit completely independent of the rest of the world. But since such an independence obviously cannot be realised, the concept of a physical unit, taken in absolute strictness, is found in its turn to be an idealization,—in other words to be a case which is never vigorously adapted in reality—
(Matter and Light—P.297)

কোন পদার্থের ইউনিটের সঠিক সংজ্ঞা দিতে হলে তাকে বিশ্বজগতের অন্যান্য সকল বস্তুর প্রভাবমুক্ত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে ধরে নিতে হয়। কিন্তু প্রভাব-মুক্তি বাস্তবে সম্ভবপর নয়। তাই ইউনিটের ধারণা নিছক একটা কল্পনা মাত্র। অন্য কথায় এটা কখনো বাস্তবে যথার্থভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়।

তাই বিজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ আইনস্টাইনও বলেন: যুক্তিই আমাদের জীবনের শেষ কথা নয়:

Here we face, therefore, the limits of the purely rational conception of our existence. (Out of My Later Years—P. 22)

আজ বিশ্বজগতের স্বরূপ সম্বন্ধেও প্রশ্ন উঠেছে। এটা কি নিরবচ্ছিন্ন স্থান (space) হিসাবে না আলাদা ও স্বাধীন কণার সমষ্টি হিসাবে অবস্থান করছে তা এখনও নির্ধারিত হয়নি। ঢেউতত্ত্বের ভিত্তি অখণ্ড নিরবচ্ছিন্ন স্থান কল্পনার উপর—আর কণাবাদ স্বাধীন ব্যক্তি-সত্তার (free individuality) উদ্গাতা। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে দেখা যায়, এদের কোন একটাই স্বাধীনভাবে সব কিছুর পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে পারে না— বরং এই দুই মতবাদের সমন্বয়েই তা সম্ভব। প্রতি কণাই তরংগাকারে বিদ্যমান—এই ধারণাকে নিরপেক্ষ বিচারের ফল বলে অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন।

বিজ্ঞান ও দর্শন

এ পর্যন্ত গেল পরীক্ষামূলক ও বিশ্লেষণমূলক বিজ্ঞানের কথা। এ থেকেই বিজ্ঞানের দার্শনিক দিক সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে আসতে হয়। সিদ্ধান্তগুলি এরূপ দাঁড়ায়:

১. মানুষের শক্তি ও জ্ঞানের পরিধি অসীম নয়। বিজ্ঞানীর ভাষায়—'আমাদের জ্ঞান অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারলেও তা সীমাবদ্ধ ও আংশিক হতে বাধ্য। কারণ যুক্তি আমাদের যে অবস্থায় নিয়ে যেতে চায় তা সত্যই আয়ত্তের বাইরে।'[১]

২. নিশ্চয়তাবাদ (Principle of Determinism) আজ পরিত্যক্ত হয়েছে। পরমাণু জগতে কোন জিনিসই সঠিকভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে জানা সম্ভবপর নয়। এই বৈজ্ঞানিক সত্য সামাজিক জগতেও একইভাবে প্রযোজ্য। যন্ত্র আবিষ্কারক বা গবেষকরা যেমন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণে প্রভাব বিস্তার করে প্রকৃত ফলকে পরিবর্তিত করে—তেমনি সমাজ পর্যবেক্ষণকারীরাও (দার্শনিক-রাজনীতিবিদরাও) স্বীয় বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী ও পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হন। ফলে তাঁরা অনেক সময় সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সত্যের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন না। তাঁদের সিদ্ধান্ত তাই আংশিক সত্য বহন করে। এইজন্য অনেক মনীষীর সিদ্ধান্তই একতরফা হয় এবং ফলে ক্ষতিকর হয়েও দাঁড়ায়। উদাহরণ হিসেবে ফ্রয়েডের একতরফা যৌনতত্ত্ব[২] ও নীটশের অতিমানব তত্ত্বের[৩] কথা বলা যায়।

অন্যদিকে পূর্ব অভিজ্ঞতা ও ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানদ্বারা ভবিষ্যত সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু বলাও অসম্ভব। প্রমাণিত হয়েছে ঃ যে সব দার্শনিক কোন ঘটনাকে তার পূর্বের ঘটনাবলীর নিশ্চিত ফল বলে দার্শনিকতা করেন—তাঁরা প্রায়ই ভুল করেন। এইসব সিদ্ধান্ত ও ভবিষ্যদ্বাণী আংশিক সত্য হতে পারে মাত্র। তাই বিখ্যাত দার্শনিক ও সমাজবিদ কার্লমার্কসের অর্থনৈতিক নিশ্চয়তাবাদকে[৪] (Economic Determinism)

---

১. For although scientific knowledge can advance indefinitely, it must, by its essential character, be limited and partial on account of the very goal which reason sets it. For strictly speaking--the goal is unattainable,—(Introduction to the Reality and Determinism in Quantum Physics By Meyerson).

২. এই তত্ত্ব বলে ঃ যৌন কারণেই মানুষের বিভিন্ন চিন্তা ও কার্যধারা নির্ণীত হয়।

৩. এতে বলা হয়েছে, বিভিন্ন যুগে মুষ্টিমেয় প্রতিভাবান ব্যক্তির চিন্তাধারা ও কার্যধারা দ্বারাই সমাজের রূপ ও ইতিহাসের গতিধারা নির্ণীত হয়।

৪. এতে বলা হয় ঃ অর্থনৈতিক কারণেই সমাজের রূপ এক অবস্থা থেকে অন্য নির্দিষ্ট অবস্থায় অবশ্যই পরিবর্তিত হয়। এই সত্যানুসারে আদি সমাজ সামন্তত্যে

বৈজ্ঞানিক বিচারে নির্ভুল বলা যেতে পারে না। এ জন্য সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদের স্তর পার হয়ে সমাজ অবশ্যই সমাজতন্ত্রে পরিণতি লাভ করবে বলে তিনি ঐতিহাসিক বস্তুবাদের[১] ভিত্তিতে যে ভবিষ্যদ্বাণী করে-ছিলেন তা অধিকাংশ স্থলে মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে।

৩. মানুষের যেমন সামাজিক সত্তা আছে— তেমনি তার ব্যক্তি-সত্তাও আছে। তাই সমাজে মানুষ কণার সঙ্গে তুলনীয়। সমাজ থেকে ব্যক্তিকে আলাদা করা অসম্ভব বটে, কিন্তু তারও কণার মত স্বাধীনতা রয়েছে। তাই ব্যক্তি-সত্তা ও সামাজিক-সত্তা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সম্ভাবনা পদ্ধতিতে (Probability) সমাজে ব্যক্তিসমষ্টির কার্যাবলীর আনুমানিক ফল মাত্র গণনা করা যায়। ব্যক্তি-সত্তার স্বাধীন ফলাফল সমাজের উপর পড়ে, কারণ সে-ও সমাজের একজন। আংশিক হলেও এ প্রভাব সামাজিক কার্যধারাকে পরিবর্তিত করতে সক্ষম। এর কারণ প্রাণহীন কণার যেমন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে কিছুটা স্বাধীনতা আছে, মানুষ প্রাণবান হওয়ায় এই স্বাধীনতার মাত্রা অনেক বেশী। কাজেই সমাজের প্রভাব যেমন ব্যক্তির উপর পড়ে, ব্যক্তির প্রভাবও তেমনি সমাজের উপর পড়ে। আর এতে সমাজের রূপ পরিবর্তনে সহায়তা হয়। ব্যক্তি প্রতিভাবান হলে সমাজের উপর তার প্রভাব প্রচণ্ড আকার ধারণ করতে পারে।

আগেই বলা হয়েছে জীব বিজ্ঞান সৃষ্টিশীল বা উদ্দেশ্যমূলক বিব-র্তনকে মেনে নিয়েছে। এই 'সৃষ্টিশীল ও উদ্দেশ্যশীল' কার্যধারা নির্জীব ও নির্মল সত্তার দ্বারা সম্ভবপর নয়—সম্ভব সৃষ্টিশীল মহামনের দ্বারা। সুতরাং বলা যায়, আধুনিক বিজ্ঞান একটা মহিমান্বিত মহান সত্তার দিকেই আমাদের জ্ঞানকে চালিত করছে।

এবং সামন্ততন্ত্র পুঁজিবাদে পরিণত হয়েছে। আবার পুঁজিবাদই অবশ্যই সমাজতন্ত্রে বা কম্যুনিস্ট সমাজ ব্যবস্থায় পরিণতি লাভ করে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৬০ সনের জানুয়ারী মাসে ভারতের বিখ্যাত বামপন্থী সাহিত্যিক খাজা আহমদ আব্বাসের সংগে মস্কোতে আলাপে এক প্রশ্নের উত্তরে ক্রুশ্চেফ বলেছিলেন: কম্যুনিস্ট সমাজ ব্যবস্থা কি কোনদিন রূপ লাভ করবে বলে মনে হয় ?

১. বস্তুগত কারণেই অর্থনৈতিক অবস্থার সৃষ্টি আর অর্থনৈতিক কারণে এক যুগ হতে অন্য যুগে সামাজিক অবস্থার রূপ বদলায়। এতেই ইতিহাসের প্রকৃতি নির্ণীত হয়। এর ফলেই সামন্তবাদী, পুঁজিবাদী, সমাজতন্ত্রী প্রভৃতি সামাজিক ব্যবস্থার বিকাশ ঘটে। এইভাবে সামাজিক পরিবর্তনের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বলা হয়। এই মতবাদ কার্লমার্কস প্রবর্তন করেন।

ঐক্যের সন্ধানে আধুনিক বিজ্ঞান

প্রকৃতির বৈচিত্র্যকে সম্মিলিত এক ধারণায় সহজীকরণের চিন্তা বহু-কালের। এই মহৎ কাজে পদার্থ বিজ্ঞানের ইতিহাসে উজ্জ্বলতম নক্ষত্রের মত বিরাজ করছে তিনটি নাম—নিউটন, মেক্সওয়েল ও আইনস্টাইন।

প্রায় তিনশ বছর আগে নিউটন পৃথিবীর আকর্ষণ বল এবং মহাকাশে বিচরণশীল বিভিন্ন গ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্র প্রভৃতির মধ্যে বিরাজিত বলের সুসমঞ্জস প্রদর্শন করেন। অন্য কথায় আমরা এইভাবে তার কাছে পাই একটি বিরাট আবিষ্কার—মাধ্যাকর্ষণ-মহাকর্ষ তত্ত্ব—পৃথিবী ও আকা-শের মধ্যে একই আইনের মহামিলন। এই আকর্ষণ বলের কারণেই তো সূর্যের চারদিকে গ্রহের ও গ্রহের চারদিকে বিভিন্ন চাকে (orbit) উপগ্রহের 'ঝুলন্ত ও ঘুরন্ত' সুনিপুণ বিন্যাস।

এর দু'শ বছর পরে মেক্সওয়েল ইলেক্‌ট্রিসিটি ও মেগ্‌নেটিজমের (চুম্বকত্ব) মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আরো দেখান ঃ আলো হল এই ঐক্যের তথা মিলনের একটি বহিঃপ্রকাশ।

আরো পরে ১৯০৫ সালে আইনস্টাইন স্থান-কালের ধারণাকে একীভূত করেন এবং তিনি আরো দেখান যে, নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ এই স্থানকালের বিন্যাসের জ্যামিতিক বক্রতার দ্যোতক।

আইনস্টাইনের তখন চিন্তা হল ঃ মেক্সওয়েলের ইলেকট্রো মেগ্‌নেটিজমের সঙ্গে কি নিউটনীয় মাধ্যাকর্ষণের ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে—যেভাবে মেক্স-ওয়েল দ্বারা ইলেকট্রিসিটি ও মেগ্‌নেটিজমের মধ্যে ঐক্য প্রদর্শন সম্ভবপর হয়েছিল ? —যদি তাই হয় তবে মেক্সওয়েলের ইলেকট্রো-মেগনেটিজম কি স্থান-কালের বিন্যাসের বক্রতার গুণ দ্যোতনা করবে—যেমন আইনস্টাই-নের গবেষণায় স্থান-কালের বিন্যাসে মাধ্যাকর্ষণ জ্যামিতিক বক্রতার প্রমাণ দিয়েছে ? এতে সবক্ষেত্রে ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব বলে তিনি আভাস দেন, আর এটাই ছিল আইনস্টাইনের শেষ স্বপ্ন। এই স্বপ্ন ছিল খুবই যৌক্তিক ও বাস্তবমুখী। ঐক্যের এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়ার দিকে ইতিমধ্যে বিজ্ঞান অনেক দূর এগিয়ে গেছে।[১]

---

১. বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আব্দুস সালাম এই বিষয়ে অনেক কাজ করেছেন। এই পাকিস্তানী পদার্থবিদ ১৯৭৯ খৃস্টাব্দে অন্য দুজন পদার্থবিদ স্টেভেন উইনবার্গ ও শেলডন গ্লেশোর একই সঙ্গে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। প্রফেসার সালাম আইনস্টাইনের মতই গভীরভাবে ধার্মিক এবং একান্তভাবে আল্লায় ও সৃষ্টির ঐক্যে বিশ্বাসী। তিনি আইনস্টাইনের নীচের বাক্য স্মরণ করিয়ে সঠিক ধার্মিকতার দিক নির্দেশ করেন—"The serious research scholar in our materialistic age

বস্তুর মৌলিক গঠন

বস্তুর ঐক্য ধারণা বুঝতে হলে আমাদের বস্তুর মৌলিক গঠন সম্বন্ধে ধারণা থাকা দরকার।

আমাদের চারদিকে যে অসংখ্য বস্তু দেখি তা সমস্তই চারটি মৌলিক ক্ষুদ্রতম কণা দিয়ে তৈরী। আর সেই চারটি কণার কার্যধারা নিয়ন্ত্রণের জন্য রয়েছে চারটি মৌলিক বল। কণাগুলি পরস্পর কাছাকাছি আসলেই বলগুলি ক্রিয়া করে।

চারটি কণা হল—

১. প্রোটন (P)

২. নিউট্রন (N)

৩. ইলেকট্রন (e)

৪. নিউট্রিনো (r)

আর চারটি মৌলিক বল (force) হল—

(ক) মাধ্যাকর্ষণ বল :

চারটি কণাই তাদের ভর (mass) এর আনুপাতিক বলের দ্বারা পরস্পর আকৃষ্ট হয়। এই বলের দ্বারাই গ্রহ, নক্ষত্র গেলাক্সি প্রভৃতির কার্য-ধারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অন্য কথায়, এই বলই আমাদের এই বিশ্বের যাবতীয় রূপ (features) নির্ধারণ করে।

(খ) ইলেকট্রোমেগনেটিক বল :

চারটি কণার মধ্যে প্রোটন ও ইলেকট্রন—এই দু'টি বিদ্যুৎসম্পন্ন (electrically charged), আর অন্য দুটি নিউট্রন ও নিউট্রিনো বিদ্যুতান্বিত নয়—তারা নিরপেক্ষ। প্রোটন ইলেকট্রনকে পরস্পর আকর্ষণ করে—এইভাবে তাদের মধ্যে উৎপন্ন ইলেকট্রোমেগনেটিক বলের পরিমাণ তাদের ইলেকট্রিক চার্জের পরিমাণের সমানুপাতিক। বস্তুর পরমাণুগুলিকে একত্র বেঁধে রাখার জন্য প্রোটন-ইলেকট্রন বলই দায়ী। বলা বাহুল্য, এই বলের কারণেই দুনিয়ার সমস্ত জানা ঘটনা (phenomena) নিয়ন্ত্রিত হয়।

---

is the only deeply religious human being". তিনি আরো বলেন, "You see Einstein defined religion as the discovery of basic laws. He was deeply religious in the sense of wanting to discover the fundamental laws by which the Lord had created the world." Illustrated Weekly of India, Feb, 1981.

(গ) দুর্বল নিউক্লিয়ার ফোর্স (Weak Neuclear force)

চারটি কণা খুবই ঘনিষ্ঠ হলে ($১০^{-১৬}$ সে. মি. এর কম দূরত্বে)[১] তারা একটি দুর্বল বলের দ্বারা পরস্পর ক্রিয়ারত হয়। বিশ শতকের প্রথম দিকে এই বল আবিষ্কৃত হয়, এই বলই বিটা রেডিয়েশনের (B-radiation) উদ্ভব করে এবং এটা দুনিয়ার ও বিশ্বের সর্বত্র ভারী মৌলের (মৌলিক পদার্থের) অস্তিত্বের জন্য দায়ী।

(ঘ) সবল নিউক্লিয়ার ফোর্স

দুর্বল নিউক্লিয়ার চার্জ ছাড়াও প্রোটন ও নিউট্রন সবল নিউক্লিয়ার চার্জ বহন করে। এইগুলি $১০^{-১৩}$ সে. মি. এর চেয়ে নিকটে যখন আসে তখন তারা পরস্পর এই সবল ফোর্সের দ্বারা আকৃষ্ট হয়। হিলিয়াম, লিথিয়াম, কার্বন, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি মৌলের নিউক্লিয়াসগুলিকে একত্র ধরে রাখে এই শক্তিমান বল। প্রচণ্ড তাপে সূর্যের ভিতরে এই বল মুক্তি পায় বলে আমরা আলো পেয়ে থাকি। পারমাণবিক বোমায় ও অন্যান্য নিউক্লিয়ার শক্তি উৎপাদনের কাজেও এই বল ব্যবহৃত হয়। অন্যকথায় ফিসনের (Fission) মাধ্যমে মহাপ্রলয়ঙ্করী ধ্বংস ও উন্নয়নের কাজে ব্যবহারযোগ্য অফুরন্ত শক্তির আধার হিসাবে এটা কাজ করে থাকে।

মাত্র চার রকম মৌলিক কণা ও বলের আবিষ্কার পদার্থের রূপ হৃদয়ঙ্গমের কাজে সহজতর মনে হলেও ইলেকট্রিসিটি ও মেগনেটিজমের ঐক্য আবিষ্কারে এবং আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের সূত্র ধরে বিজ্ঞানীরা চারটি বলকে একটি মহাবলরূপে চিহ্নিত করার সন্ধানে আশা ও উৎসাহ লাভ করেন। আইনস্টাইনের শেষ স্বপ্ন বলে আমরা এই অবস্থাকেই ইংগিত করেছিলাম। আসলে প্রকৃতিতে ঐক্যের এই মহান বিশ্বাস বিজ্ঞানের রাজ্যে আজ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, একাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী আল-বেরুনী ও আরো বহু পরের গেলিলিও পৃথিবীর ঘটনার সঙ্গে আকাশের ঘটনার যে সংযোগ আবিষ্কার করেছিলেন—নিউটন, মেক্সওয়েল, হাইজেন বার্গ, স্রডিনগার, ডাইরাক প্রমুখ বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন আবিষ্কারের মাধ্যমে উহা আমাদের ঐক্য-চেতনার দিকে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে এসেছে। উপরে

১. $১০^{-১৬}$ সে.মি = $\frac{১}{১০০০০০০০০০০০০০০০০}$ সেণ্টিমিটার

শেষের দিকে বর্ণিত তিন জন বৈজ্ঞানিক দেখিয়েছিলেন ঃ যে রাসায়নিক বল জীবন ও মনস্তাত্ত্বিক কাজে কার্যকরী তা-ও ইলেকট্রোমেগ্নেটিজম ও কোয়ান্টাম তত্ত্বের মিলন নির্ভর।

আগেই বলেছি; আইনস্টাইন মাধ্যাকর্ষণ ও ইলেকট্রোমেগনেটিজমের মিলনে একটি মাত্র মহাবলের উন্মেষ আশা করেছিলেন অর্থাৎ আধুনিক ভাষায় তিনি ইলেকট্রিক চার্জের সাথে মাধ্যাকর্ষণ চার্জের (gravitational charge=ভর) মিলনে একটি মাত্র একক বলের আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন, তিনি আগেই গ্রেভিটেশনাল চার্জের সাথে (অন্য কথায় ভরের সাথে) স্থান-কালের বক্রতার মিলন প্রমাণ করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি একইভাবে ইলেকট্রিক চার্জকেও স্থান-কালের অন্য কোন জ্যামিতিক রূপের সাথে মিলনের আশা করেছিলেন।

এখানেই আসে আগে বর্ণিত দুর্বল ও শক্তিশালী নিউক্লিয়ার বলের কথা। আইনস্টাইনের মৃত্যুর পরবর্তী গবেষণায় প্রমাণিত হচ্ছে যে, ইলেকট্রো মেগনেটিক চার্জ, দুর্বল ও শক্তিশালী এই চার্জগুলি প্রত্যেকটির রূপ প্রায় একই এবং তিনটি চার্জই শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট এককে অবস্থান করতে পারে। এইভাবেই ইলেকট্রোমেগনেটিজম ও নিউক্লিয়ার ফোর্সের একীকরণ সম্ভব। আবার সব শেষে দ্বিতীয় স্তরে এই মিলিত বল মাধ্যাকর্ষণ বলের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে সব বলকে একীভূত করবে এবং তার ফলে আইনস্টাইনের স্থান-কালের জ্যামিতিক রূপায়ণের মধ্যে একায়ন সম্ভব করবে। এভাবেই আমরা মহান একত্ববাদের (তৌহিদের) ধারণায় পৌঁছতে পারি।

সমাজ ও বিজ্ঞান

সূচী

১. বিজ্ঞান, বিবর্তন ও সামাজিক পরিবর্তন ২৭
২. বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে শ্রেণী সংগ্রাম ৩৯
৩. বিজ্ঞান, গণতন্ত্র, কম্যুনিজম ও ইসলাম ৬১

১
বিজ্ঞান, বিবর্তন ও সামাজিক পরিবর্তন

বিপ্লবের ধারণা খুব পুরাতন নয়। বিবর্তনও সবে মাত্র আধুনিককালে তার স্পষ্টতর রূপ গ্রহণ করেছে। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে পুরনো যা, পচা যা, তাকেই ভেঙ্গে দূর করে অল্প সময়ে নতুনতর কিছু সৃষ্টির ভিত্তি রচনা করাই বিপ্লব (revolution)—আর ধীরে ধীরে অস্পষ্টতর রূপে পূর্বতন অবস্থা থেকে নতুন অবস্থায় পরিবর্তিত হওয়ার নাম বিবর্তন (evolution)। বিপ্লব বন্যার স্রোত, বিবর্তন ক্ষীণ জলধারা। একটি দুরন্ত, দুর্বার-নতুনের প্রতিষ্ঠা-স্বপ্নে উন্মাদ, অন্যটি শান্ত এবং ধীরগতি। একটি উগ্র ও চরমপন্থী—অন্যটি সন্ধিশীল।

সুদূর অতীতের বাইবেল, গীতা প্রভৃতি ধর্ম পুস্তকে উল্লেখিত শব্দ দু'টির ভাবধারা পরিলক্ষিত হয়। লণ্ডন মসজিদের সুবিখ্যাত ইমাম খাজা কামালউদ্দীন সাহেবও বিবর্তন সম্বন্ধে কুরআনের বহু উদ্ধৃতি দিয়ে একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। মধ্যযুগের বিখ্যাত দার্শনিক ইমাম গায্যালী, জার্মান কবি গেটে প্রমুখ চিন্তানায়কদের লেখাতেও বিবর্তনের রূপ ও প্রকৃতি নির্ণয়ের প্রচেষ্টা সত্যই আমাদের অবাক করে দেয়।

বিবর্তনের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি

জীবজগতের অস্তিত্ব ও বর্তমান রূপ গ্রহণ সম্পর্কে বৃটিশ বিজ্ঞানী ডারউইন যে বিবর্তনবাদ (Theory of Evolution) প্রতিষ্ঠা করেন তা নানা কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দর্শনে, বিজ্ঞানে, ধর্মতত্ত্বে এর প্রভাব অসাধারণ। যদিও ডারউইনবাদের বহু বিষয় আজ বিজ্ঞানীদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছে, তবু পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত রূপ নিয়ে বিবর্তনবাদ এখনও সগৌরবে সর্বত্র বিরাজ করছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, জীবনের প্রথম উৎপত্তি, বিবর্তনের শেষ অবস্থা (যেমন মানুষের উদ্ভব) প্রভৃতি সম্বন্ধে এটা বহু কল্পনাকে (hypothesis) ভিত্তি করে বিরাজ করছে। সর্বোপরি বিবর্তনের দ্বারা একটা শ্রেণী থেকে সম্পূর্ণ

ভিন্ন শ্রেণীতে কোন জীবের পরিবর্তিত হওয়ার কোন প্রমাণ বিজ্ঞান এখনও দিতে পারেনি। আমাদের অলক্ষ্যে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ধীরে ধীরে যে সামান্যতম পরিবর্তন ঘটে, তা-ই বিবর্তন,—বিবর্তনের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিবর্তনবাদীদের এটাই মত। অতি ধীর পরিবর্তনের জন্যই বিবর্তন আমাদের চোখে পড়ে না। এমন কোন যন্ত্রও আবিষ্কৃত হয়নি, যার দ্বারা এর পরিমাণ নির্ণয় করা যেতে পারে।

সমাজ, বিবর্তন ও বিপ্লব

এটা অনস্বীকার্য যে, আমাদের চিন্তাধারা ও সামাজিক রূপ নিত্য পরিবর্তিত হচ্ছে। এই পরিবর্তনের জন্য বিপ্লব ও বিবর্তনই দায়ী। মানুষের ইতিহাস নানা সমস্যার ইতিহাস। সমস্যা সমাধানের জন্য নানা মতবাদের উৎপত্তি। মতবাদও সমস্যাগুলির সমাধান করতে চায় সমাজের ও ভাবধারার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। সুতরাং বিবর্তন ও বিপ্লব (কিংবা দু'টির একটি) ছাড়া মতবাদের প্রয়োগ অসম্ভব। বিপ্লব সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে আধুনিক বস্তুবাদের কথা এসে পড়ে। আধুনিক বস্তুবাদের অন্যতম প্রধান ব্যাখ্যাতা কার্লমার্কস ও এঙ্গেলস্ তাঁদের মতবাদকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিপ্লবকেই একমাত্র অস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন—বিবর্তনকে নয়।

> Hence the transition from Capitalism to Socialism and the liberation of the working class from the yoke of Capitalism cannot be effected by slow changes, by reforms, but only by a qualitative change of the capitalist system by revolution,—Dialectical and Historical Materialism.

এখন দেখা যাক, এই আধুনিক বস্তুবাদী বিপ্লবের রূপ কি?—উৎপাদন-যন্ত্রের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে শ্রেণীর উদ্ভব, ডায়েলেক্‌টিক্‌সের নিয়মে সে শ্রেণীগুলির মধ্যে বিরোধ এবং বিরোধের জন্য সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে বিপ্লবের সৃষ্টি—এই ধারা অনুযায়ী পুঁজিবাদের অবসান ও সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। যুগে যুগে উৎপাদন-যন্ত্রের পরিবর্তন ঘটে। যথা : কৃষিনির্ভর সামন্ত-যুগের পর এলো কল-কারখানা নির্ভর পুঁজিবাদের যুগ। মার্কসীয় বস্তুবাদের মতে, সামন্ত যুগে যেমন জমিদার ও কৃষক এই দু'টো বিরোধী শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল—তেমনি পুঁজিবাদের যুগেও পুঁজিবাদী ও শ্রমিক এই দু'টো বিবদমান শ্রেণীর উদ্ভব হয়।

ডাইলেক্‌টিক্‌সের অর্থ হল সংঘর্ষবাদ। জার্মানীর বিখ্যাত ভাববাদী দার্শনিক হেগেল এর প্রবর্তন করেন। মার্কস এই তত্ত্বকে তাঁর বস্তুবাদে প্রয়োগ করেন। এই তত্ত্বানুসারে প্রত্যেকটি বস্তু ও ঘটনায় দুটি বিপরীত সত্তা থাকে, এই দু'টা দ্বন্দ্বশীল সত্তার মধ্যে যে সংঘর্ষ বা ক্রিয়া হয় তাতে নতুন বস্তু বা অবস্থার উদ্ভব হয়। মার্কস এই তত্ত্বকে সমাজে প্রয়োগ করে বলেন: সমাজের মধ্যে দু'টি বিরুদ্ধ স্বার্থের শ্রেণী বর্তমান থাকে (যেমন, মালিক ও শ্রমিক)। এদের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য, ফলে হয় নতুন সমাজের সৃষ্টি। এভাবে পুঁজিবাদী ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষের ফলে যে বিপ্লব হয় তাতে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। উনিশ শতকের সমাজ বিজ্ঞানীরা তখনকার সময়ে বৈজ্ঞানিক সত্যের দ্বারা বিপ্লবের প্রকৃতি নির্ণয়ের প্রচেষ্টা করেছিলেন। বস্তুর প্রকৃতি অস্বীকার মানে বস্তুবাদকেই অস্বীকার করা। তাই বস্তুর পরিবর্তনের প্রকৃতি দ্বারাই সামাজিক পরিবর্তনের প্রকৃতি নির্ণয় বস্তুবাদের ভিত্তিতেই অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল।

বস্তুর তিন অবস্থা—কঠিন (Solid), তরল (Liquid) ও বায়বীয় (Gaseous)। বরফ উত্তাপ পেলে পানি হয়, পানি উত্তাপ পেলে হয় বাষ্প; উত্তাপের ক্রমবৃদ্ধিতে এমন একটা অবস্থা উপস্থিত হয় যখন পানি তার তরল অবস্থা থেকে বাষ্পীয় অবস্থায় চলে যায়—এই অবস্থা গুণগত।[১] এই হঠাৎ পরিবর্তনই বিপ্লব—কঠিন থেকে তরল, তরল থেকে বাষ্প। কার্লমার্কস এই বস্তুগত সত্যের উপরই তাঁর বিপ্লবের চিন্তাকে দাঁড় করেছিলেন।

বস্তুবাদী দর্শনের ভুল

তাই উনিশ শতকের বস্তুবাদী বিপ্লবের প্রকৃতি ছিল নিম্নরূপ:

১. বরফ থেকে পানি যেমন প্রথমে তরল, তারপর বাষ্পীয় অবস্থায় আসে, তেমনি ফিউড্যাল সমাজ ব্যবস্থা থেকে প্রথমে পুঁজিবাদ তারপর সমাজতন্ত্র আসবে—পুঁজিবাদের আগে সমাজতন্ত্র নয় এবং প্রতিটি বিবর্তিত অবস্থাই আগের অবস্থা হতে উন্নত হতে বাধ্য। এইজন্যই স্ট্যালিন বলেছিলেন: আদি কম্যুনিস্ট সমাজ ব্যবস্থা থেকে দাস যুগ উন্নত ছিল।[২]

---

১. Selected works: Karl-Marx: P. 72.

২. Slave system was a natural phenomenon—since it represents an advance on the Primitive Communal System! (Selected Works: Karl Marx: P. 73)

২. দ্বান্দ্বিক শক্তি এমন স্তরে আসে, যখন হঠাৎ বিপ্লব সংঘটিত হয়।

৩. সামাজিক বিপ্লব সংঘর্ষময়—এক শ্রেণী কর্তৃক অন্য শ্রেণীর উৎখাত।

প্রথম সিদ্ধান্ত ত্রুটিপূর্ণ। কঠিন থেকে প্রথমে যে তরল হতে হবে এর কোনও অর্থ নেই। এটা বৈজ্ঞানিক সত্য যে, কোন কোন পদার্থ কঠিন অবস্থা থেকে তরল অবস্থায় না গিয়েও বাষ্প হয়, যেমন কর্পূর, আয়োডিন, নিশাদল ইত্যাদি। এরা কঠিন অবস্থা থেকে সরাসরি বাষ্পীয় অবস্থায় চলে যায়। ইংরেজীতে এই প্রক্রিয়াকে (Sublimation) উর্ধ্বপাতন বলে। সমাজেও এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

ইসলামের ইতিহাসে দেখতে পাই—তখন সেই দাস-সামন্ত যুগে পুঁজিবাদ বা পুরা সামন্ত-সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ছাড়াও এক সমাজতান্ত্রিক সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল।[১] রাশিয়াতেও পুঁজিবাদীদের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার পূর্বেই সমাজতন্ত্র আনা সম্ভব হয়েছে। ১৯৪০ -৫০ খৃস্টাব্দের চীনকে নিশ্চয়ই পুঁজিবাদী সমাজ বলা চলে না। এটা নিশ্চয়ই কমবেশী সামন্ততন্ত্রই ছিল। তবুও পরবর্তী সময়ে চীন সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল পুঁজিবাদকে প্রতিষ্ঠা করে নয়—তাকে উচ্ছেদ করে।

অতএব সিদ্ধান্ত দাঁড়ায়ঃ

কঠিন অবস্থা থেকে যেমন তরল অবস্থায় না গিয়েও বায়বীয় অবস্থায় যাওয়া যায়, তেমনি ফিউড্যাল—সমাজকে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় না নিয়েও অন্য সমাজে (যেমন—সমাজতন্ত্রে) পরিবর্তিত করা যায়।

বিপ্লবের অবস্থা

দ্বিতীয় বিষয়েও অনেক বস্তুবাদী ভুল করে থাকেন। তাদের মতে এমন স্তর অর্থাৎ পুঁজিবাদ পূর্ণ অবস্থায় পৌঁছলেই বিপ্লব হয় ও তার ফলে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়। পুঁজিবাদের প্রায় পূর্ণ বিকাশ হয় জার্মানী, ইংল্যান্ড ও আমেরিকায়। কিন্তু এই সব দেশে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত বাংলায় সর্বহারা শ্রেণীর উদ্ভব হলেও বিপ্লব আসেনি।

১. দেখুন— ফ্রান্সের কম্যুনিস্ট নেতা রোজের গারোদীয় প্রবন্ধঃ কম্যুনিস্ট পার্টির মুখপত্র, ঈদ সংখ্যা, কলকাতার স্বাধীনতা ১৯৪৭।

বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তও তাই ঃ সাধারণ অবস্থায় পানিকে উত্তাপ দিলে প্রায় ১০১ ডিগ্রিতে পানি বাষ্পে রূপান্তরিত হয় বটে, কিন্তু উত্তাপ না দিলেও পানিকে খালি জায়গায় রেখে দিলে (এমন কি ছায়াতেও) তা ধীরে ধীরে বাষ্প হয়ে উড়ে যায় অর্থাৎ বাষ্পের যে গুণগত পরিবর্তন (revolution) তা সাধারণ অবস্থাতেও হতে পারে। অপরপক্ষে যে পানি ১০০ ডিগ্রিতে ফুটে বাষ্প হওয়ার কথা—তাকে চাপে (pressure) রাখলে অধিক উত্তাপেও তা ফুটবে না। আমেরিকা, ইংল্যান্ড বা জার্মানীর অবস্হা এর দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। এই সব দেশে পুঁজিবাদ তার পূর্ণ অবস্থায় গেলেও বিপ্লব সংঘটিত হয়নি। আবার চাপ কমালে পানিকে কম অবস্থাতেও বাষ্পে পরিণত করা যায়। এই জন্যও পর্বতের উপর বায়ুর চাপ কম বলে সেখানে পানি কম উষ্ণতায় ফুটে বাষ্প হয়। রাশিয়া ও চীনের অবস্থা এরই সামাজিক ব্যাখ্যা। প্রধানত সামন্ত সমাজ ব্যবস্থা কায়েম থাকতেই এই সব দেশে বিপ্লব ঘটানো হয়েছে।

বস্তুবাদীদের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদই (Economic Determinism) বিজ্ঞান-বিরোধী ভুলের জন্য দায়ী। বস্তুবাদের সব চাইতে গুরুত্ব যেখানে বেশী, সেখানেই তার দুর্বলতা রয়েছে। যে ঐতিহাসিক-বস্তুবাদের (Historical Materialism) জন্য বস্তুবাদের এত নাম, যার দ্বারা অতীতের বিভিন্ন সমাজব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, তার মারাত্মক ত্রুটি হল ঃ এতে মানুষের স্বাধীন সত্তার বিশেষ স্বীকৃতি নেই। উৎপাদনের উপায়গুলির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ও ভাবধারা বদলাতে বাধ্য, মানুষের এখানে হাত নেই। এই নিয়ন্ত্রণবাদই মানুষকে একটি অবস্থার (system) দাস হিসেবে গণ্য করে। ফলে এই বিশ্বাস জন্মানোর চেষ্টা হয়েছিল ঃ সামন্তপ্রথা পুঁজিবাদে রূপান্তরিত হতে বাধ্য। কারণ নিয়ন্ত্রণবাদ অনুযায়ী মানুষ পুঁজিতন্ত্রের স্তর পার না হয়ে সমাজতন্ত্রে যেতে পারে না।[১] বস্তুগত ঐতিহাসিক কারণেই তা ঘটতে বাধ্য।

---

১. In the social production of life, men enter into definite relations that are indispensable and independent of their will.

Or, It is not the consciousness of men that determines their being, but on the contrary, their social being that determines cosciousness. (Selected Work: Karl Marx) P. 75. সিলেক্টেড ওয়ার্কস-এর এই কপিটি আমি পাকিস্তান আমলে বিশ শতাব্দীর চল্লিশ দশকে যোগাড় করেছিলাম। —লেখক

আসল কথা : মানুষের যেমন চাপ ইত্যাদি কমিয়ে বাড়িয়ে বস্তুর পরিবর্তনের হার, পরিমাণ ও সীমা (rate, quantity and limit) নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি আছে—তেমনি সমষ্টিগতভাবে সামাজিক স্তর-গুলোর পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ করার শক্তিও মানুষের আছে। মানুষের সীমাহীন শক্তি নেই সত্য (বৈজ্ঞানিকদেরও নেই), কিন্তু সমাজের অবস্থা, রুচি প্রভৃতির নিয়ন্ত্রণ ও পরিবর্তনে তার বিরাট শক্তি রয়েছে। মানুষ শুধু উৎপাদন যন্ত্রের লেজুড় বিশেষ নয়।

সুতরাং সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় : অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদ ত্রুটিপূর্ণ। অর্থ-নৈতিক শক্তি ও অন্যান্য শক্তিকে ভিত্তি করে অবস্থার পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি মানুষের আছে। পানি যেমন না ফুটেও বাষ্প হতে পারে, রক্তাক্ত বিপ্লব ছাড়াও সমাজে বা ভাব-জগতে বিপ্লব ঘটতে পারে।

শ্রেণী বিপ্লব

নতুন বস্তুবাদের তৃতীয় সিদ্ধান্ত "বিপ্লব সংঘাতময় ও দু'টি বিরুদ্ধ শ্রেণীর একটি আর একটি দ্বারা উৎখাত"—এ কথাও সব সময় বিজ্ঞান-সম্মত নয়। বস্তুবাদীরা পুঁজিবাদ থেকে উদ্ভূত পুঁজিপতি ও সর্বহারা (capitalist and proletariat) এই দুই শ্রেণীর সংঘাতকেই বিপ্লবের মূল হিসাবে ধরে নিয়েছেন। আর এইজন্যই কৃষক সমাজকেও প্রতিক্রিয়া-শীল বলা হয়েছিল।[১]

কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস অন্য রকম সাক্ষ্য দেয়। সাধারণত সর্ব-হারাদের দল পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এগিয়ে আসে এবং পুঁজি-পতিরাও তাদের দমাতে আসে সত্য, কিন্তু এই সঙ্গে আরও কয়েকটি কথা মনে রাখতে হবে।

শুধু সর্বহারা নয়, অনেক বুর্জোয়া পাতি-বুর্জোয়া (এমন কি জমিদার বা পুঁজিপতিদের ছেলেমেয়েরাও) দেখা যায় আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সর্বহা-রাদের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসতে—পুঁজিপতিদের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হতে। সর্বহারারা সাধারণত অশিক্ষিত ও কম শিক্ষিত হয়। এদের নেতৃত্বের সম্ভাবনা খুবই কম, অথচ বিপ্লবী কোন দল আদর্শ ছাড়া হয় না। আবার শিক্ষিত লোক (সুতরাং প্রায়ই সর্বহারা নয়) ছাড়া

১. If by chance, they (peasants) are revolutionary they are so only in view of their impending transfer into the proletariat— (Communist Manifesto).

কোন মতবাদকে সম্যক হৃদয়ংগম ও প্রচার কঠিন। এইজন্যই দেখি পৃথিবীর বিভিন্ন কম্যুনিস্ট সংগঠনের মূলে, নেতৃত্বে এবং পার্টির সদস্য সংখ্যায় অনেক বুর্জোয়া বা পাতি-বুর্জোয়া আছেন। ভারতে ও পৃথিবীর অন্যত্র কম্যুনিস্ট নেতৃবৃন্দ যাঁরা আছেন তাঁদের পারিবারিক ইতিহাস নিলেই এটা স্পষ্টতর হবে। অন্যান্য পার্টি সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রই বুর্জোয়া, পাতি-বুর্জোয়া শ্রেণী থেকে এলেও কেন তারা কৃষক শ্রমিকের দাবিতে এগিয়ে আসে—তা প্রণিধানযোগ্য। বিখ্যাত কম্যুনিস্ট নেতা লিও-সাও-চি (এক সময়ে চীনের প্রেসিডেন্ট) তাঁর বই 'কম্যুনিস্ট পার্টি'তে স্পষ্টভাবে বলেছেন: বুর্জোয়া ও পাতি-বুর্জোয়ারা চীনা বিপ্লবে কম্যুনিস্টদের নেতৃত্ব দিয়েছেন—শ্রমিকেরা নয়। পক্ষান্তরে দেখা যায়, অনেক সর্বহারাও নানা কারণে 'পুঁজিপতি' বা 'দালাল' প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষাবলম্বন করে থাকে। শিল্পে সব চাইতে অগ্রসর আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের অধিকাংশ শ্রমিক এখন যাদের সমর্থন করে, সেটা বিশ্লেষণ করলেই এটা বুঝতে কষ্ট হবে না। (যদি বলা হয়—পুঁজিপতিদের সমর্থন করতে এরা বাধ্য হয়, তা হলে বলতে হয়—পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে পুঁজিপতিদের প্রভাব সব সময়ে থাকবেই এবং প্রভাব থাকলেই যদি বিপ্লবের পক্ষে অধিকাংশ সমর্থন পাওয়া না যায়, তা হলে বিপ্লবের ভবিষ্যত কোথায়?)

কাজেই সিদ্ধান্তে আসা যায়: সংঘর্ষ শুধু দু'টি শ্রেণীর মধ্যে হয় না; আদর্শ বা স্বার্থের প্রভাবে একই অর্থনৈতিক শ্রেণীর মধ্যেও হতে পারে। বুর্জোয়ারা যেমন আদর্শের জন্য সর্বহারাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করতে পারে, তেমনি সর্বহারাদের একাংশ পুঁজিপতিদেরও পক্ষ নিয়ে সংগ্রামে যোগদান করতে পারে। স্বার্থগত বা অন্যান্য কারণে পুঁজিপতি-পুঁজিপতিতে যে লড়াই হয় ইতিহাসই তার সাক্ষ্য দেবে।

শ্রেণী সংঘর্ষের ধারণা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ থেকে আনা হয়েছে। কার্ল মার্কস দ্বান্দ্বিক মতবাদটি আত্মাহ্য় বিশ্বাসী হেগেল থেকে ধার করে তাকে বস্তুবাদী রূপ দিয়েছিলেন।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ

(Dialectical Materialism) সামাজিক পরিবর্তনের এবং বিভিন্ন সংঘর্ষের কারণ নির্দেশের জন্য ব্যবহৃত হয়। অথচ বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে, বিশ্বের সব কিছুর মূলে আছে তিন রকম মৌলিক সত্তা:

১. সমধর্মী, ২. বিপরীত ধর্মী, ৩. নিরপেক্ষ।

সৃষ্টির মূল উপাদানেও ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন হিসাবে এই তিনটি সত্তা আছে।

ঘটনার মূলে আছে যেমন বিকর্ষণ বা সংঘর্ষ তেমনি আছে আকর্ষণ বা বন্ধুত্ব। কোন বস্তু বা জীবের নিরপেক্ষতা ও ঘটনাকে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করে। উপরে বর্ণিত মৌলিক সত্তার বহিঃপ্রকাশ হিসাবেই আমরা এই তিনটি অবস্থা পাই।

শুধু বিরুদ্ধ শ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষ হয় এটা যেমন অবান্তর সিদ্ধান্ত, তেমনি শুধু সংঘর্ষের দ্বারা ঘটনা ঘটে বা কোন পরিবর্তন হয় তাও যুক্তিসংগত নয়। দু'টি সাম্রাজ্যবাদী বা রাজতন্ত্রী শক্তিতেও সংঘর্ষ হয়। প্রথম মহাযুদ্ধ দুটি সাম্রাজ্যবাদী শিবিরেরই যুদ্ধ। পুঁজিবাদী-সমাজতন্ত্রবাদীতেও বন্ধুত্ব হয়—যেমন হয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রাশিয়া ও পুঁজিবাদী আমেরিকার মধ্যে। এ ব্যাপারে মার্শাল স্টালিনের একটি কথা স্মরণ-যোগ্য। ১৯৪৮ খৃস্টাব্দের ১৭ই মে-তে আমেরিকার এক কালের ভাইস প্রেসিডেন্ট্ হেন্‌রি ওয়ালেসের কাছে তিনি লিখেছেন: আদর্শগত এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পার্থক্য সত্ত্বেও রাশিয়া এবং আমেরিকার মধ্যে শান্তিময় সহ-অবস্থান শুধু যে সম্ভব তাই নয়—এটা অপরিহার্যও বটে।

> The Government of the U. S.S. R. believes that despite the differences in economic systems and ideologies the co-existence of these systems and the peaceful settlement of the differences between the U. S. S. R. and the U. S. A. are not only possible but absolutely necessary in the interest of universal peace.

কম্যুনিস্ট নেতা ক্রুশ্চেফের মতও ছিল তাই। অন্যদিকে সাম্যবাদী সাম্যবাদীতে সংঘর্ষ হয়—যেমন হয়েছিল সাম্যবাদী যুগোস্লাভিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে—আরও পরে ঘটছে রাশিয়া ও চীনের মধ্যে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে পূর্ব জার্মানী, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, চেকোস্লোভাকিয়া প্রভৃতি পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোকে রাশিয়ান বাহিনীর আক্রমণ ও কব্‌জাকরণ এ কথার জাজ্বল্যমান প্রমাণ দেবে।

সুতরাং বিরুদ্ধ শ্রেণীর সংঘর্ষ দ্বারা সব কিছুর ব্যাখ্যা অযৌক্তিক ও কুসংস্কার বিশেষ। এতে কোন ঘটনা সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান তো জন্মেই না বরং ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়।

বিপ্লব. গৃহযুদ্ধ ও যুদ্ধ

বিপ্লব সম্বন্ধে বলা হয়— এটা বাইরে থেকে বা অন্যদেশ থেকে আমদানী করা চলে না। "The export of revolution is nonsense"—Stalin. পানি যেমন উত্তপ্ত হলে পাত্রের প্রতিটি বিন্দু হতে বুদ্বুদ আকারে বের হয়ে পড়ে, বিপ্লবও তেমনি যে দেশে হবে, সেই দেশে উত্তপ্ত হয়ে সংঘর্ষের আকারে ফেটে পড়বে। কিন্তু কথা হচ্ছে— সামাজিক পরিবর্তন এই বিপ্লব ছাড়া হতে পারে কি না। রাশিয়ার দৃষ্টান্ত দিলে বলতে হয়— বিপ্লবের দ্বারা সমাজের অবস্থান্তর হয়। কিন্তু এর দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, এই অবস্থান্তরের অন্য কোনও পন্থা নেই। পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, পূর্ব জার্মানী প্রভৃতি দেশে পূর্বোক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী বিপ্লব হয় নাই, —সমাজের পরিবর্তন হয়েছে শক্তির প্রভাবেই। গত মহাযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ে পূর্ব ইউরোপে রাশিয়ার শক্তি প্রয়োগ দ্বারা সামাজিক অবস্থান্তর আনা সম্ভবপর হয়েছে। বস্তু-বাদী আদর্শ তাতে ক্রিয়া করেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু শুধু বস্তুবাদী আদর্শ তো পশ্চিম জার্মানী বা ইতালী-ফ্রান্সে তা সম্ভব করতে পারেনি। চীনেও সর্বাত্মক বিপ্লব হয়নি, হয়েছে অন্তর্বিদ্রোহ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধই একে লালন করে সাফল্য দিয়েছে। তাতেও সমাজের অবস্থান্তর সম্ভব হয়েছে। তিব্বতে তো বলতে গেলে বিপ্লব আমদানী করা হয়েছে। অনেকটা সাম্রাজ্যবাদী নীতিতেই সেখানে বিপ্লব ঘটানো হয়েছে। অনেকে বলেন, ইংল্যাণ্ডের যে বহু ভারী শিল্প জাতীয়করণ করা হয়েছে, তাতেও সমাজের অবস্থান্তর ঘটেছে। কিন্তু এই অবস্থান্তর রক্তাক্ত সংঘর্ষের দ্বারা হচ্ছে না। সুতরাং বলা যায়ঃ মানব জাতির উদ্দেশ্য বর্তমান খারাপ সামাজিক অবস্থাকে ভাল সামাজিক অবস্থাতে রূপান্তরিত করা। এই রূপান্তরিত-করণ বিপ্লব, অন্তর্বিদ্রোহ, বাইরের প্রভাব, গণতান্ত্রিক বিবর্তন প্রভৃতির দ্বারা হতে পারে। উদ্দেশ্য মহত্তর দিকে সমাজের অবস্থান্তর। যে পরিবেশে যা কার্যকরী ও মানব সমাজের জন্য কম ক্ষতিকর, সেই পরিবেশে তা গ্রহণ করাই বিজ্ঞানসম্মত কাজ। যেখানে সেখানে যখন তখন এজন্য 'বিপ্লব' 'বিপ্লব' করা অনেক সময় প্রতিক্রিয়াশীলতার লক্ষণ। (ভারতে রনদীভ নীতির মারাত্মক অসাফল্য প্রণিধানযোগ্য।) বিজ্ঞানের একটা দৃষ্টান্ত এখানে বিবৃত করা যায়। পরিবহন (Conduction), পরিচলন (Convection), বিকীরণ (Radiation) প্রভৃতি চালিত

করে Boiling (স্ফুটন), Evaporation (বাষ্পায়ন—ভাপায়ন) প্রভৃতি উপায়ে তরল পদার্থের রূপান্তর ঘটান সম্ভব। সব সময় Boiling (স্ফুটন) করানো নিশ্চয়ই বিজ্ঞানসম্মত নয়।

আদর্শ ও বিপ্লব

অনেকে মনে করেন, সামাজিক বিপ্লবই বড় কথা, আত্মিক বিপ্লব কিছুই নয়। কিন্তু কোন রকম পূর্বতন ধারণার (bias) বশবর্তী না হলে এটা স্বীকার করতে হবে যে, সামাজিক বিপ্লবের আগেই দরকার হয় আত্মিক বিপ্লবের। ভারতে এখনও বিপ্লব হয়নি। অথচ বুর্জোয়া ও পাতি-বুর্জোয়াসহ অনেক কর্মী বিভিন্ন বামপন্থীদলের আদর্শকে গ্রহণ করে বিশ্রাম ও আরাম-আয়েশকে পরিত্যাগ করে পুলিশী জুলুম, দারিদ্র, জেল প্রভৃতিকে বরণ করে নিয়েছেন। এর প্রধান কারণঃ এরা বই-পুস্তক, নেতা, পত্রিকা, আলোচনা প্রভৃতির মারফত আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এ রকম সংগ্রামী হয়ে পড়েছেন। অর্থাৎ আদর্শের দ্বারা এদের মধ্যে আত্মিক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। এদের মধ্যে অনেকেই পূর্বে যা পছন্দ করতেন না, এখন তা পছন্দ করছেন, পূর্বে যা করতে ভয় পেতেন, এখন তা করতে সাহসের অন্ত নেই। আত্মত্যাগ ও স্বার্থত্যাগ দ্বারাই এরা এত বলীয়ান হয়েছেন। —এদের মধ্যে আত্মিক অবস্থান্তর বা বিপ্লব হয়েছে বলেই সংগঠনের মারফত সামাজিক বিপ্লব আনতে সক্ষম হবেন—নতুবা নয়। পৃথিবীর যে কোন দেশের বিপ্লবী কর্মীদের সম্বন্ধে একথা প্রযোজ্য। সুতরাং সামাজিক পরিবর্তনে শুধু শ্রেণী-স্বার্থ নয়—আদর্শই একটা বড় হাতিয়ার।

ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান ও বিপ্লব

আদর্শ ছাড়া বিপ্লবী ব্যক্তি ও মনের সৃষ্টি হয় না। বিপ্লবী ব্যক্তি ছাড়া বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান সম্ভবপর নয়। বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান ছাড়া আবার বিপ্লব হতে পারে না। সুস্থ আদর্শ ও সুপরিচালিত প্রতিষ্ঠান ছাড়া বিপ্লব সম্ভব হয় না—বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। এ জন্যই ফরাসী বিপ্লব সুস্থ পরিবর্তন আনতে পারেনি—বিশৃঙ্খলাই এনেছিল।

বিপ্লব ও যুক্তি

বিবর্তনে লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে যুক্তি খাটিয়ে অগ্রসর হওয়া চলে, কিন্তু বিপ্লবে রোমাঞ্চ ও অন্ধ উদগ্রতা (Fanaticism) অপরিহার্য।

বিরাট ধ্বংসের মধ্য দিয়ে হঠাৎ পরিবর্তনের জন্য যারা মরণের পথে অগ্রসর হয়, তারা ব্যক্তিগত লাভ-লোকসান বড় করে দেখার অবসর পায় না। বৃহত্তর পরিবর্তনই যাদের কাম্য তারা অগ্রসর হয় গভীর ভাবানুভূতির মধ্য দিয়ে— সে, যে প্রকারেই হোক।

বিপ্লবের উদ্দেশ্য

বিপ্লব ছেলেখেলা নয়। ধ্বংসের মধ্য দিয়ে সৃষ্টির প্রয়াস। জীবনকে সুন্দর করার জন্যই বিপ্লব— শুধু ধ্বংস করার জন্য নয়। এইজন্য সামাজিক পরিবর্তন এর লক্ষ্য। সুতরাং এ উপায়ও হওয়া উচিত উদ্দেশ্যের পরিপোষক— অনর্থক ধ্বংসাত্মক নয়।

রাষ্ট্রশক্তি ও বিপ্লব

বিপ্লব সাধারণত সরকার বিরোধী হতে বাধ্য। তাই রাষ্ট্রের শক্তি বুঝে বিপ্লবে অগ্রসর হওয়া উচিত। রাষ্ট্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে উত্থান করতে গেলে শুধু জনমতই নয়, সংগঠিত জনশক্তিরও প্রয়োজন। যেখানে সুসংগঠিত রাষ্ট্রশক্তি রয়েছে সেখানে সহজে বিপ্লব হয় না। ভারতের রণদীভ নীতির অসাফল্যের এটাই প্রধান কারণ। অসময়ের বিপ্লব মানবতাবিরোধী ও প্রতিক্রিয়াশীল। কারণ এতে উদ্দেশ্য সাধিত তো হয়ই না, বরং বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়ে একদিকে জনগণের দুর্দশা ডেকে আনা হয়— অন্যদিকে প্রতিষ্ঠিত সরকারকে দমননীতিতে এমন সুযোগ দেওয়া হয়, যার ফলে দেশের মুক্তি অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে যায়। যারা অসাফল্যের মধ্যেও সাফল্য খুঁজে সব সময় বিপ্লবী সংঘর্ষ করতে চান, তাদের কাছে অযৌক্তিক বলে কিছুই নেই। তারা হিটলার বা মুসোলিনীর উত্থানের মধ্যেও প্রগতি ও সফলতা দেখতে পান।

বিপ্লব ও বিবর্তনের প্রকৃত রূপ

বিপ্লব ও বিবর্তন দুটাই আত্মিক পরিবর্তনে কার্যকরী। এককভাবেও দুটি কাজ করতে পারে। তবে বিবর্তনের কাজ সব সময়েই চলে। বিপ্লবের পূর্বের অবস্থায় বিবর্তন অপরিহার্য। সামাজিক পরিবর্তন সাধনে বিপ্লব একটি প্রধান উপায়, কিন্তু একমাত্র উপায় নয়। সমাজের অবস্থা বুঝে বিভিন্ন পন্থা গ্রহণ করতে হয়। হঠাৎ ও আমূল পরিবর্তনের জন্য বিপ্লবই প্রকৃত পন্থা, কিন্তু বিপ্লব সব সময়ে সম্ভবপর নয়।

মতবাদ, সংগঠন ও রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রয়োগে একে বিলম্বিত বা ত্বরান্বিত করা যায়। সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনই মানুষের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, বিপ্লব নয়; কারণ বিপ্লব উপায়মাত্র। অনর্থক রক্তপাত বা ধ্বংস ব্যতীত সময়ের অপব্যবহার না করে যদি অন্যান্য উপায়ে পরিবর্তন আনা যায়, তবে তাই করা উচিত—তা সামরিক বা বাইরের শক্তির প্রভাবেই হোক, আর গণতান্ত্রিক বিবর্তনেই হোক। প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির সাহায্যে ধীরগতিশীল বিবর্তনকেও ত্বরান্বিত করা সম্ভব। অনেক সময় ত্বরান্বিত বিবর্তন বিপ্লবের-চাইতে ভাল ফল দিতে পারে। সামাজিক পরিবর্তনের পূর্বে ব্যক্তির মনে বিপ্লব আনয়ন অপরিহার্য। বিপ্লবী ব্যক্তিদের নিয়ে গড়ে ওঠে বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান, বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিবেশ অনুযায়ী সামাজিক পরিবর্তন সম্ভবপর হয়ে ওঠে। আর তাদের দ্বারাই বিপ্লবী আদর্শ সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পায়।[১]

রক্তাক্ত সংঘর্ষ ছাড়াও বিপ্লব হয় এবং এইরূপ বিপ্লবের সাহায্যেও আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা সম্ভব হয়—যদি উপযুক্ত পরিবেশে বিপ্লবী মানুষ ও বিপ্লবী সংগঠন সমাজে এই উদ্দেশ্যে আগে থেকে তৈরী থাকে।

---

১. সত্তরের দশকে ইরানের বিপ্লব ঘটেছিল প্রথমে আত্মিক বিপ্লবের মাধ্যমে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে। যদিও ইরাকী আক্রমণ ও স্বদেশ তুদেহ্ পার্টির প্রভাবে গঠিত খালক দলের অন্তর্ঘাতী কর্মধারার ফলস্বরূপ সেখানেও পরবর্তীকালে বহু-জীবনের হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছে অন্তর্বিদ্রোহ দমনের পরিবেশে।

২

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে শ্রেণী সংগ্রাম

মার্ক্সবাদের দৃষ্টিতে শ্রেণী সংগ্রাম

মানুষের ইতিহাসে শ্রেণী সংগ্রামই সামাজিক পরিবর্তনের একমাত্র কারণ বলে একটি ধারণা শিক্ষিত সমাজের একাংশের মধ্যে প্রচলিত আছে। এই ধারণা মার্ক্সবাদের সৃষ্টি। বলা বাহুল্য, শ্রেণী সংগ্রাম বলতে মার্ক্সবাদ একমাত্র অর্থনৈতিক শ্রেণী সংগ্রামকেই বুঝিয়েছে।

অতীতে যা-ই থাকুক না কেন, বর্তমানে বহু দেশেই অর্থনৈতিক শ্রেণী সংঘাতের উৎকটরূপ প্রকাশ পাচ্ছে। একদল লোক মানুষের জীবন ধারণের সম্বল অর্থকে হস্তগত করে হয়েছে ধনী—যাদের বলা হয় বুর্জোয়া, পুঁজিপতি, শোষক ইত্যাদি। আর একদল এদেরই হাতে শোষিত হয়ে ক্রমশ হচ্ছে সর্বহারা—প্রলেতারিয়েত, —ফলে দুই দলে বেধেছে তীব্র সংগ্রাম।

মার্ক্সবাদের মোটামুটি ধারণা হল: অর্থনীতিই সব ঘটনার মূলে। আর সব উপ-প্রতিষ্ঠান (super-structure) মাত্র। সুতরাং উপ-প্রতিষ্ঠান সমস্যা গৌণ। অতএব অর্থনৈতিক শ্রেণী সংগ্রামই মানুষের সামাজিক পরিবর্তনের জন্য মূলত দায়ী। এই সংগ্রামে সংখ্যাগরিষ্ঠ সর্বহারারা জয়ী হবেই—আর সেই জয়ের ফলে হবে সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা।

মার্ক্সবাদী দৃষ্টিতে উৎপাদন ব্যবস্থাই যে বিভিন্ন যুগের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা. আইনের ধারণা, শিল্প ও ধর্ম সব কিছুর মূল, তা নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যাবে:

> Therefore the production of immediate material means of subsistence and consequently the degree of economic development attained by a given people or during a given epoch form the foundation upon which the state institutions, the legal conceptions, the art and even the religious ideas of the people concerned have been evolved and in the light of which these things must therefore be explained, instead of vice versa as had hitherto been the case.

(Frederick Engels, London, March 17, 1883, See Karl Marx—Selected Works—P. 12).

আর এই যে অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর সব কিছু নির্ভরশীল এবং সমাজের পরিবর্তন অর্থনৈতিক কারণে যে অন্ধভাবে চলবে তাও ঐতিহাসিকভাবে অবধারিত। এখানে মানুষের ইচ্ছাশক্তি প্রায় অকেজো। শুধু তাই নয় মানুষের বোধশক্তিও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দ্বারা সম্পূর্ণ স্থিরীকৃত হয়। তাই মার্ক্স বলেছেন ঃ

In the social Production of their life men enter into definite relations that are indispensable and independent of their will....

আবার তিনি বলেন ঃ

It is not the consciousness of man that determines their being, but on the contrary their social being that determines their consciousness.

সুতরাং মার্ক্সবাদের মতে অর্থনীতিই ইতিহাস সৃষ্টি করছে, মানুষের বোধশক্তি, সংগ্রাম, নৈতিকতা সব কিছু নির্ধারণ করছে এবং বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (যেমন সমাজতান্ত্রিক সমাজ, পুঁজিবাদী সমাজ প্রভৃতি) সৃষ্টি করছে।

তাই কার্ল মার্ক্স তাঁর বিশ্ববিখ্যাত কম্যুনিস্ট মেনিফেস্টোর প্রথম পংক্তিতে ঘোষণা করেছিলেন শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাসই মানুষের এ পর্যন্ত সমস্ত সমাজের ইতিহাস ঃ

The History of all hitherto existing society is the history of class struggles.

Freeman and slave, patrician and plebeian, lord and serf, gild-master and journeyman, in a word, oppressor and oppressed, stood in constant opposition to one another, carried on an uniterrupted now hidden open fight— a fight that each time ended—either in a revolutionary reconstitution of society at large or in the common ruin of the contending classes— (Communist Manifesto).

আবার লেনিন বলেছিলেন— সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক প্রভৃতির যে কোন বিষয়ে যে কেউ কথা বলুন না কেন, তার পেছনে রয়েছে শ্রেণী স্বার্থ ঃ

Peoples always were and always will be the stupid victims of deceit and self-deceit in politics until they learn to discover the interest of some class behind all moral, religious, political and social phrases, declarations and promises.

অন্যত্র ইউরোপের বিভিন্ন দেশের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন– শ্রেণী সংগ্রামই সব ঘটনার মূল শক্তি হিসাবে কাজ করে ঃ

More and more revealed the struggle of classes as the basis and the motive force of whole development.

কাজেই অর্থনৈতিক শ্রেণী সংগ্রামই যে মানুষের ও সমাজের সব কিছুর মূল নির্ধারক সে সম্বন্ধে মার্ক্সবাদীদের কোনও অস্পষ্টতা থাকার কথা নয়। কম্যুনিস্ট মেনিফেস্টোর ভিত্তিও হল অর্থনৈতিক শ্রেণী সংগ্রাম। এই অর্থনৈতিক শ্রেণীসংগ্রামকে ভিত্তি করে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সৃষ্টি। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ধারণা অনুযায়ী বস্তুগত বা অর্থনৈতিক কারণে অতীতে বিভিন্ন রকমের সমাজব্যবস্থা কায়েম হয়েছে। এইভাবে এসেছে দাস সমাজব্যবস্থা, সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, তারপর পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা ইত্যাদি।

বাস্তবের সংগে কি তফাৎ

মার্ক্সবাদীরা মনে করেন আধুনিক বস্তুবাদই মার্ক্সবাদ। সুতরাং বাস্তবে যা ঘটে বস্তুবাদ তার বিপরীত হতে পারে না। যদি বিপরীত হয়, তবে বলতে হবে মার্ক্সবাদ অযৌক্তিক ও অসমর্থনযোগ্য এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে আজ আমাদের শ্রেণী সংগ্রামকে বিচার ও বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে।

এঙ্গেল্‌স্‌-এর ব্যাখ্যা

শ্রেণী সংগ্রামই যে সর্বকালের ইতিহাসের রচয়িতা নয়, তা মার্ক্স বুঝতে না পারলেও, তাঁরই সংগী ও সহযোগী এঙ্গেল্‌স্‌ নানা প্রশ্নের এবং সমালোচনার সম্মুখীন হয়ে তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই মার্ক্স-এর মৃত্যুর মাত্র পাঁচ বছর পরেই কম্যুনিস্ট মেনিফেস্টোর ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে ইংরাজী সংস্করণে এঙ্গেল্‌স্‌ একটি নোট সংযুক্ত করে লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন যে– আদি সমাজে (primitive communist society) শ্রেণী সংগ্রাম ছিল না– সুতরাং History of all hitherto existing

society বলতে লিখিত ইতিহাসকে বুঝতে হবে। সমস্ত লিখিত ইতিহাস, শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস ও সমস্ত অলিখিত ইতিহাস শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস নয়—এই কথার হাসি উদ্দীপক ত্রুটির কথা বাদ দিলেও বলা যায়ঃ এঙ্গেল্‌স্ এইভাবে স্বীকার করেছেন যে, শ্রেণী সংগ্রাম ছাড়াও সমাজ চলে। এর অর্থ দাঁড়ায়ঃ অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব ছাড়া এমন অনেক শক্তি আছে যার দ্বারা সমাজের পরিবর্তন সাধিত হয় বা ইতিহাস সৃষ্টি হয়। অন্য কথায় বলতে গেলে-যে শক্তি (অর্থনৈতিক ছাড়া) আদি সমাজে প্রচলিত ছিল—তা পরবর্তী সমাজেও প্রচলিত না থাকার কোনও কারণ নেই—সে যে কোন পরিমাণে হোক না কেন। এঙ্গেল্‌স কিন্তু তখন এটা বুঝতে পারেন নি; তাই তিনি শ্রেণী সংগ্রামকে শুধু আদি সমাজ থেকে বাদ দিয়েছিলেন। তাঁর উচিত ছিল মেনিফেস্টোর উক্ত অংশ সংশোধন করে লেখা—শ্রেণী সংগ্রাম ত বটেই অন্যান্য শক্তিও নতুন নতুন সমাজের সৃষ্টিতে কাজ করে।

অবশ্য এঙ্গেল্‌সের মনে এই নিয়ে দ্বন্দ্ব ও সন্দেহের অন্ত ছিল না। তাই তিনি অন্যত্র স্বীকার করতে বাধ্য হন অর্থনীতি যে একমাত্র ঘটনা নির্ধারক এ কথাটি অর্থহীন, ভাব-বিলাসী ও উদ্ভট (meaningless abstract and absurd phrases)। এমন কি অর্থনৈতিক শক্তি ছাড়া অন্য শক্তিগুলিও অনেক ক্ষেত্রে প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু একটু পরেই তিনি বলেছেন, অন্য শক্তিগুলি এত ক্ষীণ যে, শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক আন্দোলনই ঘটনার নিয়ামক হয়ে উঠে ঃ

> According to the materialistic conception of history the determining element in history is ultimately the production and reproduction in real life. More than this neither I, nor Marx have asserted. If, therefore, somebody twists this into the statement that the economic element is the only determining one, he transforms it into a *meaning-less, abstract and absurd phrase*. The economic situation is the basis but the various elements of the superstructure— political forms of the class struggle and its consequences, constitutions established by the victorious

class after a successful battle etc. — form of law and then even the reflexes of all these actual struggles in the brains of the combatants: political, legal, philosophical theories, *religious ideas*, and their further development into the systems of dogma— also exercise their influence upon the course of the historical struggles and in many cases *preponderate* in determining their form. There is an interaction of all these elements in which, amid all the endless host of accidents (i. e. of things and events, whose inner connection is so remote or so impossible to prove that we regard it as absent and can neglect it) the economic movement finally asserts itself as necessary.

এখানে এঙ্গেল্‌স্‌ বুঝাতে পারছেন, অর্থনীতিই যে সব কিছুর একমাত্র নিয়ামক তা অবান্তর অর্থহীন কথা। অর্থনীতি ছাড়া অন্যান্য বিষয়ও যে অনেক ক্ষেত্রে প্রধান হিসাবে কাজ করে ঐতিহাসিক সংগ্রামের রূপ নির্ণয়ে— তাও তিনি স্বীকার করেছেন। কিন্তু তিনি একথা বলে আবার দ্বন্দ্বে পড়েছেন। তিনি এবং মার্ক্স যে বহু স্থানে অর্থনীতিকে এবং শ্রেণী সংগ্রামকে সমাজের সব কিছুর নিয়ামক বলেছেন— তা এই কথার সংগে মিলে না। উপরের উদ্ধৃতিকে একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলে বুঝা যাবে, এর আগাগোড়া স্ববিরোধিতায় পূর্ণ। এই পরস্পরবিরোধী ধারণার সম্মুখীন হয়ে তিনি তাই বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, শেষ পর্যন্ত অর্থনীতিই সব কিছুর নিয়ামক হিসাবে প্রকাশ পায়।

এঙ্গেল্‌স্‌ যে রকম দ্বন্দ্বেই পড়ুন না কেন, একটি কথা স্পষ্ট যে, তিনি পরোক্ষে হলেও স্বীকার না করে পারেন নি যে অর্থনৈতিক কারণ ছাড়াও এমন অন্যবিধ কারণ রয়েছে যার দ্বারা ইতিহাসের গতি নির্ধারিত হয়।

চীনের অভিজ্ঞতা

মার্ক্সবাদের বিকাশে চীনের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত মূল্যবান।[১]

শ্রেণীসংগ্রাম সম্বন্ধে চীনের যে অভিজ্ঞতা তা সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে চীনের কম্যুনিস্ট নেতা লিউ-শাও-চি'র বিখ্যাত বই 'চীনের কম্যুনিস্ট পার্টি'তে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মার্ক্সবাদের মতে বিপ্লবই সামাজিক পরিবর্তনের অমোঘ পন্থা— আর এই বিপ্লব সাধিত হবে সর্বহারা শ্রমিকদের দ্বারা। অর্থনৈতিক কারণে শ্রমিকরাই এই বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবে, পার্টির নেতৃত্ব করবে এবং রাষ্ট্রশক্তি দখল করবে। মার্ক্সের মতে —নিম্ন মধ্যবিত্ত, দোকানদার, মিস্ত্রী, এমন কি কৃষকরাও সর্বহারা নয়, আর এইজন্যই তারা বিপ্লবী নয় বরং প্রতিক্রিয়াশীল এবং রক্ষণশীল।[২] ঘটনাক্রমে তারা বিপ্লবী হলেও সর্বহারা হবার নিশ্চিত ভয়েই তা হয়। তাই তিনি বলেছেন ঃ ঐতিহাসিক নেতৃত্ব আজ সর্বহারা শ্রমিকদের হাতেই চলে গিয়েছে— That the historical leadership has passed to the proletariat. অন্য দিকে তিনি বলেন, সর্বহারারাই শুধু প্রকৃত বিপ্লবী শ্রেণী ঃ The proletariat alone is the really revolutionary class.

কিন্তু মার্ক্সবাদের এই তত্ত্ব চীনে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। সেখানে শ্রমিকরা পার্টি বা বিপ্লব কোনটারই নেতৃত্ব তো দেয়ই নি— এমন কি সংগ্রামে তারা উল্লেখযোগ্য অংশও গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি।

বক্তব্যটি অবিশ্বাস্য হতে পারে— কিন্তু এটা যে বাস্তব সত্য তা নিম্ন লিখিত উদ্ধৃতিগুলি থেকে স্পষ্ট হবে ঃ

১. আমাদের পার্টি গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে আছে এবং পার্টিসভ্যদের বেশীর ভাগ এসেছে বুদ্ধিজীবী, মধ্যবিত্ত ও কৃষকদের ভিতর থেকে। আর পার্টিতে শতকরা শ্রমিকদের সংখ্যা খুবই কম।...............' (কম্যুনিস্ট পার্টি, বাংলা সংস্করণ পৃঃ ১৫)।

---

১. এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বিপথগামিতার নিমিত্ত মাও-সে-তুং কমিনফরমের দ্বারা কম্যুনিস্ট পার্টি হতে পূর্বে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। আর সেই অবস্থাতেই তাঁন এবং চু-তে (Chu Ten) স্বাধীনভাবে সৈন্যবাহিনী গঠন করে বিজয় লাভ করেছিলেন। বলা বাহুল্য, এর বহু পরেই তিনি কমিনফরমের বন্ধুত্ব আদায় করেছিলেন।

২. Not revolutionary, but conservative and reactionary.— see Karl Marx. Selected Works, P. 25.

২. যে সব পার্টি সভ্য পেটি বুর্জোয়া স্তর থেকে এসেছে তারা মার্ক্স-বাদী, লেনিনবাদী শিক্ষা লাভের ভিতর দিয়ে আদর্শের দিক থেকে সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত হয়েছে, তাদের পূর্বের পেটি বুর্জোয়া চরিত্র বদলে গেছে এবং তারা শ্রমিকদের অগ্রগামী যোদ্ধার গুণ লাভ করেছে। (ঐ, পৃঃ ১৭—১৮)

৩. ঠিক যেমন ইউরোপের কতকগুলি দেশের লেবার পার্টির চরিত্র এদের সভ্যদের সামাজিক (শ্রেণীগত) উৎপত্তির উপর নির্ভর করে না— তেমনি আমাদের পার্টি সভ্যদের সামাজিক উৎপত্তির উপরও পার্টি চরিত্র নির্ভর করে না।

৪. পার্টি সভ্যদের শুধুমাত্র সামাজিক (শ্রেণীগত) উৎপত্তির উপরই সব কিছু নির্ভর করে না, সব কিছু নির্ভর করে রাজনৈতিক সংগ্রাম, রাজনৈতিক জীবন, পার্টির আদর্শগত শিক্ষা, আদর্শগত ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের উপর। (ঐ, পৃঃ ২)

৫. চীনের শ্রমিকশ্রেণী শহরের ভিতর থেকে ভীষণ অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে আছে, সেইহেতু দীর্ঘকাল পর্যন্ত তারা স্বাধীনভাবে বিপ্লবী কাজ-কর্ম করতে অসমর্থ। (ঐ, পৃঃ ২৭)

৬. চীনের বর্তমান বিপ্লব আসলে একটা কৃষক বিপ্লব। (ঐ, পৃঃ ২৭)

এ ছাড়া আরও উদ্ধৃতি দেওয়া যায়, যা শুধু মার্ক্স নয়, এঙ্গেল্‌স্, লেনিন ও স্ট্যালিনের মতের বা তত্ত্বের বিরুদ্ধে যাবে। চীনের এই সিদ্ধান্ত অভিজ্ঞতালব্ধ সিদ্ধান্ত। অন্যদিকে কার্ল মার্ক্স, এঙ্গেল্‌স্ প্রভৃতি মনীষীদের সিদ্ধান্ত হল চিন্তাপ্রসূত দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের পরিণতি। ফলে মার্ক্সবাদের এই স্ববিরোধী অবস্থা।

এম. এন. রায়ের মত

বস্তুবাদী লেনিন ও স্ট্যালিনের বিখ্যাত সহকর্মী (বুখারা বিপ্লবের নেতা) এম. এন. রায়ও শ্রেণীসংগ্রামের মার্ক্সীয় নীতির ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি তাই তাঁর 'নিউ হিউম্যানিজম' পুস্তকে লিখেছিলেন:

১. সর্বহারা নিজেরাই বিপ্লবী শক্তি নয়। নতুন সমাজের আদর্শের দিকে তাদের আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু তাদের বুদ্ধিগত, শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক পশ্চাদপদতার কারণে শ্রেণী হিসেবেই তাদের দূরদৃষ্টির অভাব থাকে। (New Humanism P. 41)।

২. অর্থনৈতিক নিশ্চয়তাবাদ (Economic Determinism) অনুযায়ী সর্বহারা হবে সব চাইতে বেশী পশ্চাৎপদ, বুদ্ধিবৃত্তি হিসাবে এবং সাংস্কৃতিক দিক দিয়েও। ......শুধু সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার পরই এদের উন্নতি আশা করা যায়। তত্ত্বের এই দিকে নজর না দিয়ে মার্ক্সবাদ সর্বহারাদের উন্নততর সভ্যতা গঠনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাই কম্যুনিস্টদের ব্যবহারিক কাজ তত্ত্বের সঙ্গে দারুণ স্ববিরোধিতায় পূর্ণ। (New Humanism P. 40)

এম. এন. রায়ের মতে ঃ শিক্ষিত মধ্যবিত্তরাই তত্ত্ব এবং আদর্শ বুঝার উপযুক্ত এবং তারাই নেতৃত্ব দিয়ে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

লেনিনও নাকি মার্ক্সবাদের এই ত্রুটি সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হয়েছিলেন এবং পার্টির মধ্যে তার সংশোধন চেষ্টা করেছিলেন।

বিখ্যাত বস্তুবাদী নেতা কমরেড ভি. বি. কানিক ভারতের শ্রেণী বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ১৯40 খৃস্টাব্দে দেখিয়েছিলেন ঃ 'ভারতের আসন্ন বিপ্লবে বহু শ্রেণীর নেতৃত্ব অপরিহার্য।[১]

আরও কয়েকটি অভিমত

স্বয়ং কার্লমার্ক্সই সমাজের কোন্ শ্রেণীর লোক ছিলেন তা জানতে চাওয়া স্বাভাবিক। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন কোন সর্বহারা শ্রমিকের ঘরে নয়, একটি ধনী পরিবারে। তাঁর পিতা ছিলেন জার্মানীর একজন আইনজ্ঞ।

মার্ক্সের জীবনসাথী তাঁর স্ত্রীও (যিনি লণ্ডনে সব সময়ে তাঁর স্বামীর সঙ্গে ছিলেন এবং হাসি মুখে সর্বপ্রকার কষ্ট সহ্য করেছিলেন) ছিলেন একটি প্রতিক্রিয়াশীল উচ্চ বংশের নারী। তাঁর বড় ভাই ছিলেন জার্মানীর একজন সম্মানিত মন্ত্রী। কার্লমার্ক্স ইচ্ছা করলে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে বিলাসিতায় জীবন যাপন করতে পারতেন।

কয়েকটি বড় চাকুরীও তিনি পেয়েছিলেন—তাঁর যা বুদ্ধি, কর্মশক্তি ও জ্ঞান ছিল তাতে তিনি যে কোন উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারতেন।

---

১. Relation of Classes in the Struggle for Indian Freedom P. 2.

কিন্তু আদর্শের পাগল ছিলেন তিনি, তাই তাঁর সমস্ত শক্তি ও প্রতিভা নিয়োজিত করেছিলেন অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নয়, তাঁর আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য। শেষ জীবনে তাঁর যে আর্থিক দুরবস্থা নেমে এসেছিল—তা তিনি স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছিলেন - কিন্তু আদর্শচ্যুত হন নাই।

একথা আর অবিদিত নেই যে, যদি তিনি এঙ্গেল্‌স্‌-এর নিয়মিত আর্থিক সাহায্য না পেতেন—তবে যে শুধু তাঁর বিশ্ব-বিখ্যাত বই 'ক্যাপিটাল' অসম্পূর্ণ থাকত তাই নয়, তাকে অকালে অভাবে মৃত্যুকেও বরণ করতে হত।

> Had it not been Engels constant and self-sacrificing financial support, Marx would not only have been unable to bring his work on capital to conclusion, but would have been inevitably perished from want. (Lenin)

অর্থাৎ মার্ক্সবাদের প্রধান সাহায্যকারী ও ব্যাখ্যাতা ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্‌ও ছিলেন খুবই ধনী এবং এই ধনী আত্মত্যাগী পুরুষের সর্বপ্রকার সাহায্যই মার্ক্সবাদ রূপ পরিগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছিল।

স্বয়ং লেনিন তাঁর "What is to be Done"-এ স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, কার্লমার্ক্স ও এঙ্গেলস্‌ ছিলেন ধনী বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী।

The theory of socialism grew out of the philosophical, historical and economic theories that were elaborated by the educated representatives of the *propertied class*, the intellectuals. According to their social status, *Marx* and *Engels themselves belonged to the Bourgeois intelligentsia*. Similarly in Russia, theoretical doctrine of social democracy arose as a natural and inevitable outcome of the intelligentsia.

বিভিন্ন দেশের কম্যুনিস্ট পার্টি এমন কি রাশিয়ার প্রথম কম্যুনিস্ট পার্টিকে বিচার করলেও দেখতে পাব, এই পার্টিকে নেতৃত্ব দিয়েছেন শিক্ষিত বুর্জোয়া বা পেটি বুর্জোয়া আদর্শবান পুরুষরা। বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের কম্যুনিস্ট পার্টিতে অনেক বুর্জোয়া জমিদার বা জোতদার যে ছিলেন ও আছেন তা আর বিতর্কের বিষয় নয়।

আরও একটি বাস্তব ঘটনা অনুধাবনযোগ্য। আমেরিকা, বৃটেন প্রভৃতি

দেশ শিল্পে খুবই অগ্রসর। আমেরিকা বর্তমানে সর্বাপেক্ষা অগ্রসর। সেখানে সর্বহারাদের বিপ্লব এ পর্যন্ত সাধিত হয়নি। যদিও রাশিয়ায় তা সম্ভবপর হয়েছে। আমেরিকায় শ্রমিকদের শতকরা প্রায় ৯০ জন কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী আমেরিকাকেই সমর্থন করেছে। তারা কোন কম্যুনিস্ট বিপ্লব ঘটাবার জন্য ইচ্ছুক নয়। শ্রমিক বলেই তারা ধনবানদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী নেতৃত্ব দেবে এ কথা সত্য বলে সেখানে প্রমাণিত হয়নি। সুতরাং ঠিক মার্ক্সীয় ধারায় বৃটেন-আমেরিকায় শ্রেণী সংগ্রাম চলছে না।

বাংলাদেশ-ভারত ও পাকিস্তানের অবস্থা কি? এখানে যত শ্রমিক সংগঠন ছিল ও আছে তার অধিকাংশ পরিচালিত হয়েছে কম্যুনিস্ট বিরোধীদের দ্বারা। ভারতের রেলওয়ে ফেডারেশনের নেতৃত্ব দিয়েছে এক সময় জয়প্রকাশের প্রজা সোস্যালিস্ট দল। বোম্বাই ও কানপুরের অনেকগুলি কারখানা কংগ্রেস সমর্থক ট্রেড ইউনিয়ন ও প্রজা সোস্যালিস্টদের নেতৃত্বে চলেছে। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের অবস্থা আরও উল্টা। এ দুটো দেশের শতকরা ৯০ ভাগ শ্রমিক ইউনিয়নগুলি কম্যুনিস্ট বিরোধীদের হাতে।

এর মানে এই নয় যে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানে কম্যুনিস্ট নেতৃত্বে শ্রমিক ইউনিয়ন ছিল না বা নেই—তা ছিল এবং বহু সংখ্যায় ছিল এবং আছে। কিন্তু আমার বক্তব্য হল, নানা কারণে সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে অনেক শ্রমিক যে মালিকের পক্ষ সমর্থন করে বা আদর্শগত কারণে কম্যুনিজমের বিরোধিতা করে তা পরীক্ষিত সত্য। সুতরাং শ্রমিক হলেই মালিকের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয় না অর্থাৎ বিভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণী হলেই বৈপ্লবিক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হবে—এ কথা বাস্তবতার সঙ্গে সব সময় খাপ খায় না। সুতরাং যে-কোনও দেশের যে-কোনও অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখি না কেন—যে অর্থে মার্ক্সবাদ শ্রেণী সংগ্রামের ধারণা দিয়েছে তা ত্রুটিপূর্ণ।

অর্থনৈতিক কারণ ছাড়াও সংগ্রাম হয়

অর্থনৈতিক কারণে যে শ্রেণীর সৃষ্টি হয়, তাদের মধ্যে যে নানা স্তরের সংগ্রাম হয় তা অবধারিত সত্য। কিন্তু এ পর্যন্ত যা আলোচনা হয়েছে, তাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে যে, অর্থনৈতিক স্বার্থ ছাড়াও সংগ্রাম হয়। আদর্শের প্রভাবে যে বুর্জোয়ারাও বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে

এগিয়ে আসে চীনের কম্যুনিস্ট পার্টির উদ্ধৃতি থেকে তা দেখানো হয়েছে। মার্ক্স-এঙ্গেল্স্-এর জীবনও এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

অতীতে সাম্রাজ্যবাদী সাম্রাজ্যবাদীতেও যুদ্ধ হয়েছে। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে এক শ' বছরের যুদ্ধ এর একটি দৃষ্টান্ত। বিভিন্ন দেশের কম্যুনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে যে সংগ্রাম তাও শ্রেণী সংগ্রাম বলে চালানো যাবে না। ধরুন, লেনিনের মৃত্যুর পর বামপন্থী ট্রটস্কীদলের সঙ্গে ডানপন্থী স্ট্যালিন দলের যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, তা নিশ্চয়ই অর্থনৈতিক শ্রেণী সংগ্রাম নয়—তা ছিল মতবাদগত সংগ্রাম। চীনের মাও-সে-তুং-এর সঙ্গে অতি বামপন্থী লিলিসান দলের কিংবা অতি ডানপন্থী চেন-তু-সিউবাদীদের যে সংগ্রাম হয়েছিল - তাও দৃষ্টিভঙ্গীজনিত কারণে বিভক্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মধ্যে—অর্থনৈতিক শ্রেণীর মধ্যে নয়।

বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানেও দেখা যায়, একই পরিবারে একজন হয়ত ছিলেন কংগ্রেসী, আওয়ামী লীগ, মুসলিম লীগপন্থী বা সোশ্যালিস্ট—অন্যজন ছিলেন কম্যুনিস্ট। তারা একই অর্থনৈতিক শ্রেণী থেকে উদ্ভূত হয়েও পরস্পরবিরোধী দল থেকে সংগ্রাম করেছেন। পাকিস্তানের জনৈক বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা ছিলেন লীগপন্থী আর তাঁর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন বিখ্যাত কম্যুনিস্ট নেতা।

আরবের দৃষ্টান্ত

অনেক মার্ক্সবাদী স্বীকার করেছেন, আরবে ইসলামের আবির্ভাবে যে পরিবর্তন সাধিত হয়, তা ছিল এক বিরাট ও ব্যাপকতর বিপ্লব। অনেকে অর্থনৈতিক কারণ দিয়ে একে ব্যাখ্যা করতে চাইলেও তাতে সক্ষম হননি। হযরত মুহম্মদ (সঃ) দরিদ্র ছিলেন বটে কিন্তু তাঁর বিয়ে হয়েছিল এক বিশিষ্ট ধনী মহিলার সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন অত্যাচারিত ও গরীব সন্দেহ নেই, কিন্তু হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওসমান (রাঃ)-এর মত বহু ধনী পদস্থ লোক ইসলামী বিপ্লবে সর্বস্ব দান করেছিলেন। হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর আহ্বান প্রধানত অর্থনৈতিক শ্রেণী-নির্ভরশীল ছিল না—এটা ছিল একটি আদর্শের প্রতি আহ্বান, সর্বপ্রকারের (অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয়) অন্যায়, অত্যাচার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ডাক। সেই সংগ্রাম যে বিপ্লব এনেছিল সেই ১৪শ বছর আগে তা ছিল সত্যই অভূতপূর্ব।

সেই ১৪শ বছর আগে আরবে একতাবদ্ধ কোন শ্রমিক শ্রেণী বা কৃষক শ্রেণী ছিল না, কলকারখানা তো তখন স্বপ্নরাজ্যের কথা। তবু (অর্থনৈতিক শ্রেণী সংগ্রাম ব্যতীত) এক বিরাট বিপ্লব ঘটে যায়, যার ফলে সেই দাস-সামন্ত যুগে মানুষের শুধু নৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন আসেনি, অর্থনৈতিক কাঠামোতেও এক সুদূরপ্রসারী বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল।

মাও-সেতুং-এর ব্যাখ্যা

এখানে বলা আবশ্যক যে, বৃটিশের মুসলিম নিপীড়ন নীতি এবং হিন্দুদের মুসলিম বিদ্বেষের কারণে পাকিস্তান আন্দোলন দানা বাঁধে। অথচ এই পাকিস্তান আন্দোলনকে এক সময় একমাত্র অর্থনৈতিক কারণ বলে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছিল। সেটা আংশিক সত্য—সম্পূর্ণ সত্য নয়। এতে অর্থনীতি ছাড়াও যে ধর্মীয়, কৃষ্টিগত এবং আরও নানা কারণ ছিল এবং তার মধ্যে যে ধর্মীয় কারণই ছিল প্রধান তা মার্কসীয় যুক্তির দ্বারা উড়িয়ে দেওয়া হত।

কিন্তু মাও-সে-তুং নিজেই বলেন: ইতিহাসের এমন সময় আসে যখন অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব হয়ে যায় গৌণ, আর রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি দ্বন্দ্ব হয়ে উঠে মুখ্য। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন: চীনের ১৮৪০ খৃস্টাব্দের আফিম যুদ্ধ, ১৮৯৪ খৃস্টাব্দের চীন-জাপান যুদ্ধ, ১৯০০ খৃস্টাব্দের বক্সার যুদ্ধ—এমন কি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে চীন-জাপানের লড়াইয়েও অর্থনৈতিক শ্রেণী-সংঘাত ছিল নেহায়েত গৌণ—রাজনৈতিক ও অন্যান্য কারণই ছিল মুখ্য।[১]

অবশ্য মাও-সে-তুংও সব সময় নির্লিপ্ত মন নিয়ে মার্ক্সবাদকে বিচার করতে পারেন নি। তিনি উক্ত প্রবন্ধেই মার্ক্সবাদকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করেছেন।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কম্যুনিস্ট মনীষীরা বাস্তব ক্ষেত্রে মার্ক্সবাদের ত্রুটি ধরতে পারছেন, অথচ তত্ত্বকে সেই অনুযায়ী সংশোধন করছেন না; তত্ত্বকে ধরে নিয়েছেন চিরন্তন সত্য হিসেবে। মার্ক্সবাদীদের মধ্যে এটাই সব রকম রক্ষণশীলতা ও স্ববিরোধিতার জন্য দায়ী।

---

১. On Contradiction: by Mao-Tse-tung: People's China No. 14. July 16. 1952.

ডিক্লাস তত্ত্ব বা শ্রেণী-চ্যুতিবাদ

মার্ক্সবাদের এই পরস্পরবিরোধী তত্ত্বকে ঢাকতে গিয়ে ডিক্লাসতত্ত্বের অবতারণা করা হয়েছিল। এতে বলা হত বুর্জোয়ারাও যে কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয় তার কারণ হল : তারা ডিক্লাস (De-classed) হয়ে যায়। কেউ কেউ Proletarization শব্দ এই স্ববিরোধিতা ঢাকার জন্য ব্যবহার করে থাকেন।

কিন্তু 'ডিক্লাস' শব্দের অর্থ কি ? এর অর্থ যদি এই হয় যে, একজন ধনী তার সর্বস্ব হারিয়ে সর্বহারা হয়েছেন, তাহলে এই শব্দ ব্যবহারে কোনও আপত্তি থাকতে পারে না। কিংবা যদি বুর্জোয়া সমাজ থেকে একঘরে হওয়া অর্থে ডি-ক্লাস শব্দ ব্যবহার করা হয়, তাতেও আপত্তি থাকার কথা নয়। আর যদি এর অর্থ এই হয় যে, ধনী থাকা সত্ত্বেও কেউ কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে অর্থনৈতিকভাবে ডিক্লার্সড হয়েছে, তাহলে তা কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নয়। একই সঙ্গে কেউ ধনী থেকে সর্বহারা হতে পারে না—এটা লজিকের বিচারে ভ্রমাত্মক যুক্তি। স্বেচ্ছায় যে সব ধনী বিপ্লবের কণ্টকর পথ বেছে নেয়, সেটা শ্রেণীচ্যুত হওয়ার জন্য নয়—আদর্শের জন্য। আদর্শই তাকে সর্বস্ব ত্যাগ করতে বাধ্য করে। অর্থনৈতিক কারণে সে দারিদ্র্যকে বরণ করে না, আদর্শগত কারণেই অর্থনৈতিক স্বার্থকে পদদলিত করে সংগ্রামের সম্মুখীন হয়। এখানে আদর্শই বড় কথা। আদর্শের কাছে অর্থনৈতিক স্বার্থের কথা এখানে গৌণ ও অকার্যকরী। লিউ-শাও-চি'র ভাষায়, এটা শ্রেণীর উপর নির্ভর করে না—করে আদর্শগত শিক্ষার উপর। সুতরাং ডিক্লাস যে অর্থে প্রয়োগ করা হয় তা একেবারেই বাজে যুক্তির উপর নির্ভরশীল। প্রলেটারিয়েজেশান সম্বন্ধেও একই কথা খাটে।

শ্রেণী সংগ্রাম, ভাষা ও সাহিত্য

ভাষাকে বিশিষ্ট শ্রেণীর ভাবের বাহন বলে মার্ক্সবাদীরা মনে করতেন। কিন্তু পূর্বতন ধারণার ভুল নিরসন করে মৃত্যুর পূর্বে স্ট্যালিন স্বয়ং ভাষার উপর একটি তত্ত্ব (Theory) লিখে বলেছেন : ভাষা কোনও শ্রেণী বিশেষের নয়। বুর্জোয়া-সর্বহারা সকলেরই ভাবের সাধারণ বাহন হল ভাষা। প্রত্যেক জিনিসেই শ্রেণী সংগ্রাম আবিষ্কার করতে যাওয়া যে ভুল, স্ট্যালিনের ব্যাখ্যাই তার সুস্পষ্ট প্রকাশ।

সাহিত্যে শ্রেণী বিশেষের ছাপ থাকবে সত্য, কিন্তু অর্থনৈতিক শ্রেণীর উর্ধ্বে কোন সাহিত্য থাকতে পারবে না—তা সত্য নয়। অর্থনৈতিক দিক ছাড়া মানুষের আরও অনেক দিক আছে—যা অতীতে সাহিত্যের উপজীব্য হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে।

রাশিয়ায় হয়তো আজ শ্রেণী সংগ্রাম নেই। তাই বলে তথায় সাহিত্য অচল হয়ে গেছে এমন কথা বলা মিথ্যা। যখন অর্থনৈতিক সমস্যা বড় হয়ে দেখা দেয়, তখন সাহিত্য তার ছাপ অধিকতর প্রকটভাবে প্রতিফলিত হবে। কিন্তু প্রেম, প্রীতি, সৌন্দর্যবোধ, আদর্শ প্রভৃতি নানা বিষয় যে সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন এবং শ্রেণী সংগ্রাম গৌণ হয়ে দাঁড়ালেও যে তা সাহিত্যকে সমৃদ্ধি ও প্রগতির পথে নিয়ে যেতে পারে—তা অস্বীকার করা মানেই বাস্তবকেই অস্বীকার করা। আমাদের দেশের সফল রবীন্দ্র বা শরৎ সাহিত্যের কথা না হয় বাদই দিলাম, খোদ রাশিয়াতেও আজ বিভিন্ন উপন্যাসে ও গল্পে রোমান্টিসিজম বিপুলভাবে আদৃত হচ্ছে।

এই সূত্রে পশ্চিম বঙ্গে ১৯৫৩ খৃস্টাব্দের ১১ই এপ্রিলে অনুষ্ঠিত 'বাংলা প্রগতি লেখক সম্মেলন'-এর ঘোষণাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে। এটা ছিল পশ্চিম বঙ্গের কম্যুনিস্ট বুদ্ধিজীবীদের প্রতিনিধি-স্থানীয় সম্মেলন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ও রাশিয়ার বিভিন্ন মনীষীরা একে সমর্থন করে এর গৌরব বর্ধন করেছিলেন। ঘোষণাটির অংশ বিশেষ নিম্নরূপ :

> আমরা চাই যে, আমাদের শিল্প-সাহিত্যের বিকাশ হবে আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের পথে। এটা ভারতবর্ষের জনগণের আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য সমস্ত দেশপ্রেমিক লেখক ও শিল্পী সচেষ্ট। আমরা আমাদের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্য গর্বিত।
> বিশ্বের সমস্ত জাতির সংগে শান্তি ও মৈত্রী সম্পর্ক স্থায়ীভাবে স্থাপন করাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা,—আমাদের সাহিত্য উদ্বুদ্ধ হবে মানবতার প্রেরণায়—। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যত বিচ্ছেদই ঘটুক, দুই বাংলার মাতৃভাষা এক, এক বাংলা সাহিত্যই তার সাহিত্য—এক বাংলা সংস্কৃতিই তার সংস্কৃতি—।' —'নতুন সাহিত্য 'বৈশাখ—১৩৬০

বলা বাহুল্য, উক্ত ঘোষণাটি সাহিত্যের গতি নির্দেশ করার জন্য করা হয়েছে বটে—কিন্তু ঘোষণাটিতে কোথাও শ্রেণী সংগ্রামের কথা নেই। অথচ অল্প কিছু দিন পূর্ব পর্যন্ত শ্রেণী সংগ্রামই সাহিত্যের একমাত্র উপাদান বলে

অন্যত্র বামপন্থী সাহিত্যে ও সাহিত্য-সভায় উচ্চারিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, ঘোষণাটি থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এটা শ্রেণী সংগ্রামকে ভিত্তি না করে—করেছে দেশের ঐতিহ্য, 'মানবতা' প্রভৃতিকে। সম্মেলনের মতে সাহিত্য হবে শিল্পসম্মত ও সুন্দর, জাতীয়, বোধ্য ও লোকহৃদয়গ্রাহী এই বিষয়গুলো সেদিন পর্যন্ত বুর্জোয়া, প্রতিক্রিয়াশীল, পুরাতন রিভাইভালিজম, Art for arts' sake প্রভৃতি নামে আখ্যায়িত হত। মোটকথা, পাক-ভারতের মার্ক্সবাদী সাহিত্যিকরাও কালে বুঝতে পেরেছেন যে, শ্রেণী সংগ্রাম নির্ভর বিষয়বস্তু এই পুঁজিবাদী সমাজেও সর্বাংশে সাহিত্যের উপাদান হতে পারে না।

ভুলের মূল কোথায়

শ্রেণী সংগ্রাম নিয়ে এই যে বিশ্ববিখ্যাত মনীষীরা ভুল করেছেন ও করছেন এর মূল কারণ কি। এর মূল কারণ হল দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ অর্থাৎ সংঘর্ষবাদ। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মতে প্রতিটি বস্তুর গর্ভে তার বিপরীত সত্তা বিদ্যমান রয়েছে। এই দুই সত্তার সংগ্রামে তৃতীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদই হল মার্ক্সবাদের দার্শনিক ভিত্তি। এই দার্শনিক মতবাদ মার্ক্সের মৌলিক অবদান নয়। যান্ত্রিক বস্তুবাদের সঙ্গে ভাববাদী হেগেলের দ্বান্দ্বিকতা (Dialectics) যোগ করে মার্ক্স এই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের রূপ দেন। একে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদও বলা হয়। মার্ক্স এই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ নিয়ে বিশ্বের সব ঘটনাকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। মানব সমাজের প্রতিটি ঘটনা বিশ্লেষণেও তিনি এই দ্বান্দ্বিকতাকে ভিত্তি করেন ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের গোড়াপত্তন করেন। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের গোড়ার কথা হল ঃ নির্জীব বস্তুই সব কিছুর মূল আর বস্তুর মধ্যকার বিপরীত দুই সত্তার জন্য সংগ্রাম অপরিহার্য। এতেই দ্বান্দ্বিকতার নিয়মে নতুন অবস্থার সৃষ্টি হয়।

সুতরাং সমাজের গতিও নির্ধারিত হয় বস্তুগত গুণের দ্বারা—অর্থাৎ জীবন রক্ষার জন্য যা দরকার—তার জন্য। বস্তুবাদের অপরিহার্য সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অর্থনীতিই সমাজের সব কিছুর নিয়ামক হয়ে দাঁড়ায়। আর সামাজিক পরিবর্তনের জন্য হয় অর্থনৈতিক শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম। ফলে অর্থনৈতিক শ্রেণী সংগ্রামই হয়ে দাঁড়ায় সামাজিক পরিবর্তনের অস্ত্র।

অতএব অর্থনীতি এবং অর্থনৈতিক শ্রেণী সংগ্রামই যে সব কিছুর মূল—এ সিদ্ধান্ত দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের ফল।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ মতবাদের সৃষ্টি হয়েছিল সুদীর্ঘ এক শতাব্দীরও পূর্বে। তখন বিজ্ঞান ছিল বাল্যাবস্থায়। বিজ্ঞানের বহু তত্ত্বই তখন আবিষ্কৃত হয়নি। বস্তু ও ঘটনার প্রকৃত সত্তা সম্বন্ধে তখনকার ধারণা ছিল নেহায়েত আবছা। বস্তুর মূল—ইলেকট্রন, প্রোটন, কোয়ান্টা প্রভৃতি সম্বন্ধে কোনও সম্যক ধারণা তখন কারও ছিল না। ফলে তখনকার সময়ের বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে মার্ক্স হেগেলের দ্বান্দ্বিকতাকে বস্তুবাদের সঙ্গে মিশিয়ে যে দার্শনিক মতবাদের সৃষ্টি করেন তার ভুল ধরতে তিনি সক্ষম হন নি।

আধুনিক বিজ্ঞান অন্তত বস্তু সম্বন্ধে বলে: এর তিন রকম মৌলিক সত্তা আছে—ধনী (Positive—প্রোটনধর্মী), ঋণী (negative—ইলেকট্রন-ধর্মী) ও নিরপেক্ষ (neutral—নিউট্রনধর্মী)।[১] এই তিনটি মৌলিক সত্তার সাহায্যে যে ঘটনার সৃষ্টি হয় তাতে তিনটি শক্তি কাজ করে—আকর্ষণ, বিকর্ষণ ও নিরপেক্ষণ। শুধু বিকর্ষণ নয়। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, সমধর্মী বস্তুর মধ্যেও সংঘর্ষ হয়, আবার বিপরীতধর্মী বস্তুর মধ্যেও হয় আকর্ষণ। নিরপেক্ষতাও বস্তু ও ঘটনাকে প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিত করে।

বস্তুত বিজ্ঞানের তথ্য যদি আমরা সমাজ বিজ্ঞানে প্রয়োগ করি তা হলে দেখতে পাই, নারী-পুরুষ বিপরীতধর্মী সত্তা, অর্থনৈতিক নয়—biological। এদের মধ্যে সংঘর্ষ না হয় এমন নয়, তবে আকর্ষণই প্রধান বৈশিষ্ট্য। চীনে বা অন্যত্র যে পেটি বুর্জোয়ারা সর্বহারাদের রাষ্ট্র গঠনের জন্য প্রাণ দিতে এগিয়ে গিয়েছিলেন, এটা বিপরীত শ্রেণীর আকর্ষণের ফল।

গত মহাযুদ্ধে রাশিয়ার সংগে প্রথমে জার্মানীর এবং পরে পুঁজিবাদী আমেরিকান গোষ্ঠীর বন্ধুত্ব এবং তুরস্ক, আয়ারল্যান্ড, স্পেন প্রভৃতি দেশের নিরপেক্ষতা মার্ক্সের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। আকর্ষণ, বিকর্ষণ ও নিরপেক্ষণ—এই তিন প্রক্রিয়াকে স্বীকার করে নিলে এর ব্যাখ্যা হয় সুস্পষ্ট ও বৈজ্ঞানিক।

---

১. বর্তমানে নিউট্রিনো নামক আর একটি মৌলিক কণা আবিষ্কৃত হয়েছে। এটমের মধ্যে এটাও নিউট্রনের মত নিরপেক্ষ। সুতরাং আকর্ষণ, বিকর্ষণ ও নিরপেক্ষ—কার্যত এই তিনটা শক্তি প্রকৃতিতে কাজ করে। 'শক্তি' শব্দটি বিজ্ঞানের বলের (force) পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে।

স্ট্যালিন ও ম্যালেনকফের এবং আরও পরে ক্রুশ্চেভের সুস্পষ্ট ঘোষণা : পুঁজিবাদ ও কম্যুনিজম এক সঙ্গে পাশাপাশি বাস করতে পারে—এটা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত কথা। এই স্ববিরোধিতার অবসান হয় তখনই, যখন আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে উক্ত তিন প্রক্রিয়াকে ঘটনার নিয়ামক হিসেবে গ্রহণ করি—শুধু সংঘর্ষকে নয়।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের আর একটি সিদ্ধান্ত হল : যেহেতু বস্তুই সব কিছুর মূলে সুতরাং মনও বস্তুর একটি উচ্চতর বিকাশ মাত্র। বস্তুগত আইনেই মনের গতি নির্ধারিত হয়। সুতরাং নৈতিকতা, ধর্ম প্রভৃতি সামাজিক (বস্তু-গত) অবস্থার উপর নির্ভরশীল।

মার্ক্স এঙ্গেল্‌স্ থেকে শুরু করে এত ধনী বুর্জোয়া যে সর্বহারাদের মংগলের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেন ও সর্বপ্রকার কষ্ট হাসিমুখে বরণ করেন তা বস্তুনিয়ন্ত্রিত মনের দ্বারা ব্যাখ্যা করা চলে না। যদি মনের আলাদা সত্তা না থাকত, তবে কেউই আত্মত্যাগ করতে পারত না—সকলেই বস্তুগত কারণেই স্ব স্ব স্বার্থের জন্য সব সময় চেষ্টিত হত।

কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান—বস্তুতে ও বিবর্তনে একটি উদ্দেশ্যমূলক সৃষ্টি-শীল সত্তার উন্মেষ করে। এর অর্থ এই যে, বস্তু নিরপেক্ষ না হলেও মন একটি মৌলিক সত্তা। সুতরাং শুধু বস্তুগত কারণেই নয়, মনোগত কারণেও আকর্ষণ, বিকর্ষণ ও নিরপেক্ষণের সৃষ্টি হতে পারে। তাই একই অর্থ-নৈতিক অবস্থার লোক বিভিন্ন আদর্শে বিশ্বাসী হয় এবং পরস্পর সংগ্রামে লিপ্ত হয়। ট্রট্স্কীপন্থী ও স্ট্যালিন পন্থীদের (উভয় দলই কম্যুনিস্ট) মধ্যে যে সংঘর্ষ হয়, তার ব্যাখ্যা রয়েছে এইখানেই। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ এর যৌক্তিক ব্যাখ্যা দিতে অক্ষম।

এঙ্গেল্‌স্ ও মাও-সে-তুং বাস্তব ক্ষেত্রে মার্ক্সের অনেক কথাকে সংশোধন করার চেষ্টা করলেও তাঁরা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের ভুল ধরতে পারেননি। তাঁরা ধরেই নিয়েছেন—দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ নির্ভুল, অমোঘ ও চিরন্তন। ফলে তাঁরা শেষ পর্যন্ত গোলকধাঁধায় পড়ে স্ববিরোধী উক্তি করতে বাধ্য হয়েছেন।

আঙ্কিক প্রকাশ

উপরে বর্ণিত তত্ত্বকে নিম্নলিখিত সমীকরণ (equation) দ্বারা সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$ax+by+cz=k \quad \ldots \quad (1)$$

এখানে, x = বিকর্ষণ

y = আকর্ষণ

z = নিরপেক্ষণ

a, b c, – বিভিন্ন সমাজ বা পরিবেশের উপর নির্ভরশীল কয়েকটি স্থির বা ধ্রুব সংখ্যা (constants)।[১]

উপরোক্ত বিভিন্ন রকম প্রক্রিয়ার নিমিত্ত ব্যক্তি জীবনে ও সমাজ জীবনে যে নতুন অবস্থার সৃষ্টি হয় তাই k ও C ফলের দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে।

ব্যক্তি জীবনে বললাম এইজন্য যে, মানুষের মনের জগতেও বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে আকর্ষণ, বিকর্ষণ ও নিরপেক্ষণ প্রভৃতি প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং তার ফলস্বরূপ ব্যক্তি জীবনেও বিবর্তন কিংবা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে।

এখানে আর কয়েকটি বিষয় অনুধাবনযোগ্য। আকর্ষণ, বিকর্ষণ ও নিরপেক্ষণ প্রভৃতি শুধু বস্তুগত বা স্বার্থগত বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। x, y, z, প্রভৃতি আত্মিক (spiritual) বিষয়ের উপরও নির্ভরশীল। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ আত্মত্যাগের কথা ধরা যাক। হযরত আবুবকর বা মার্ক্স-এঙ্গেল্‌স প্রমুখ ধনী ব্যক্তি হয়েও তাঁদের অর্থনৈতিক স্বার্থকে ত্যাগ করে আদর্শ প্রতিষ্ঠায় জীবন পর্যন্ত দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না। একটি আদর্শিক বা আত্মিক শক্তি এঁদের বস্তুগত স্বার্থের বহু ঊর্ধ্বে উঠিয়েছিল। ফলে বস্তুগত বা অর্থনৈতিক স্বার্থকে পদদলিত করে জীবন উৎসর্গ করতেও এঁদের অনেকে এগিয়ে গিয়েছিলেন। এইভাবে প্রেমেরও সহজ ও সুষ্ঠু ব্যাখ্যা করা চলে—যা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের দ্বারা সম্ভব নয়। বস্তুবাদীদের অনেকে ত প্রেমকে ব্যক্তি বিশেষের পাগলামি বলে আখ্যায়িত করতেও কুণ্ঠিত নয়।

এ ছাড়া মানুষের সহজাত (inborn) এবং প্রবৃত্তিগত (যেমন কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি) কারণগুলি স্বার্থাতীতভাবে উল্লিখিত তিনটি প্রক্রিয়ার

১. সমীকরণটিকে অন্যভাবেও রূপ দেওয়া যায়। আধুনিক দর্শন বিদ্যার আলোকে বিচার করলে মূলত আত্মগত ও বস্তুগত (Subjective & Objective) দুই প্রক্রিয়াই প্রধান হয়ে দেখা দেয়। তখন সমীকরণটি দাঁড়ায় AX+BY=C, এখানে X ও Y যথাক্রমে বস্তুগত ও আত্মগত বিষয় বুঝায়। কিন্তু X ও Y আবার পূর্বোল্লিখিত তিনটি প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। বস্তুগত বিষয়ে যেমন আকর্ষণ, বিকর্ষণ ও নিরপেক্ষণ আছে, তেমনি আত্মগত বিষয়েও সেই তিনটি প্রক্রিয়া কাজ করে। এটা নিম্নলিখিত ফাংকশানী সমীকরণের দ্বারা প্রকাশ করা যায়:

$$X=f(X, Y, Z)$$
$$Y=f'(X, y, z)$$

সৃষ্টি করতে পারে। x, y, z তাই বস্তুগত, আত্মিক বা সহজাত সব রকম প্রক্রিয়ার প্রতিনিধিত্ব করে।

আর একটি বিষয়ে বিশেষভাবে জোর দিতে হবে। সমীকরণটির x, y, z পরস্পর বিচ্ছিন্ন বা নিরপেক্ষ নয়—পরস্পর নির্ভরশীল। একটির ফল আর একটির উপর ক্রিয়া করে। নানা পারিপার্শ্বিক ও আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করে x, y, z-এর বিভিন্ন ফল হয়। কোন সময় x-এর ক্রিয়া y, z কে অতিক্রম করে মুখ্য হ'য়ে ওঠে। ফলে সব কিছু বিকর্ষণের সংঘর্ষে ঘটবে বলে মনে হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। আবার অন্যক্ষেত্রে y বা আকর্ষণও হয়ে দাঁড়ায় মুখ্য। আবার অনেক ক্ষেত্রে একই বিষয়ে তিনটি প্রক্রিয়া সমান ক্রিয়াশীল হয়।

প্রকৃত অবস্থা

প্রকৃত অবস্থা হল : শুধু অর্থনৈতিক শ্রেণী সংগ্রামই সব কিছুর মূলে—একথা সত্য নয়। অর্থনৈতিক শ্রেণীই শুধু সম্ভব, অন্য রকম শ্রেণী সম্ভব নয়—এটাও ভুল। মার্ক্সবাদ শ্রেণীকে বড় সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করেছে। আর তার ফলেই নানা ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে।

শ্রেণী হয় নানা প্রকারের : অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক, গোত্রীয়, আদর্শিক, সাংস্কৃতিক, যৌন প্রভৃতি।

অর্থনৈতিক শ্রেণী—যেমন পুঁজিপতি, পেটি বুর্জোয়া, শ্রমিক ইত্যাদি।
ভৌগোলিক " —রাশিয়ান, পাকিস্তানী, বাংলাদেশী ইত্যাদি।
আদর্শিক " —কম্যুনিস্ট, ফ্যাসিস্ট, ট্রটস্কীপন্থী, স্ট্যালিনপন্থী, টিটোইস্ট, ইসলামিস্ট ইত্যাদি।
গোত্রীয় " —মোগল, আর্য, অনার্য, নিগ্রো, আব্বাসীয় প্রভৃতি।
ব্যবসাভিত্তিক "—তাঁতী, নাপিত, শুদ্র, ব্রাহ্মণ, মুচি, মেথর, কাপড় ব্যবসায়ী, চাল ব্যবসায়ী ইত্যাদি।
ভাষাগত " —বাঙালী, উর্দুভাষী প্রভৃতি।

এখানে আরও কয়েকটি কথা বলে রাখা ভাল। বিভিন্ন শ্রেণী স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে আলাদা নয় ; একটির সংগে অন্যটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আদর্শগত শ্রেণীর মধ্যে যেমন অর্থনৈতিক প্রভাব থাকে, তেমনি অর্থনৈতিক শ্রেণীতেও আদর্শের প্রভাব থাকে, অবস্থা ও সংগঠনের প্রভাবে এক একটি এক এক সময়ে প্রধান রূপ ধারণ করে। মাও-সে-তুং তাই বলেছিলেন : 'বুয়র যুদ্ধ, বক্সার যুদ্ধ প্রভৃতির অর্থনৈতিক কারণ ছিল

গৌণ—রাজনীতি এবং অন্যান্য বিষয় ছিল মুখ্য।' বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনে ভাষাই মুখ্য—অন্যান্য গৌণ।

আর. এস. পি. এবং কম্যুনিস্ট বিরোধে আদর্শই মুখ্য, অন্যান্য গৌণ। ভারতীয় কংগ্রেস বিভিন্ন শ্রেণীর সমবায়ে গঠিত ছিল এবং বৃটিশের সংগে যে সংগ্রাম তা প্রধানত অর্থনৈতিক শ্রেণী সংগ্রাম ছিল না—সকলের মিলিত জাতীয় রাজনৈতিক সংগ্রাম।

এভাবে মানব ইতিহাসের বিভিন্ন আন্দোলন ও সংগ্রামে আমরা বিভিন্ন প্রকারের শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম দেখতে পাব। শুধু অর্থনৈতিক কারণে সব কিছু হয় না বলেই এঙ্গেল্‌স বলতে বাধ্য হয়েছিলেন—শুধু অর্থনীতি দ্বারা সব ঘটে—একথা বাজে ও অর্থহীন। সংগ্রামের বিভিন্ন উপায়কে নিম্নলিখিত সমীকরণ দ্বারা ব্যক্ত করা যায়ঃ

$$a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3+\ldots\ldots\ldots+a_nx_n=p$$

এখানে x_1, x_2 x_3……x_n অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি বহু বিষয়ের প্রতিনিধিত্ব করছে। এই সমীকরণটি শুধু সামাজিকভাবে মানুষে মানুষে সংগ্রামের বিভিন্ন দিক প্রকাশ করে। কিন্তু সামাজিকভাবে শুধু মানুষে মানুষে সংগ্রামেই শেষ কথা নয়। মানুষের শুধু অন্য মানুষের সংগে সংগ্রাম করে নিস্তার নাই, তাকে সংগ্রাম করতে হয় আরো নানারূপ জীব ও নির্জীব প্রকৃতির সংগে। কাজেই সংগ্রামকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

ক. বিভিন্ন ধরনের বিরুদ্ধ শ্রেণীর সংগে মানুষের সংগ্রাম (অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আদর্শিক প্রভৃতি)।

খ. মানুষ ব্যতীত অন্যান্য জীব-জানোয়ার, রোগজীবাণু প্রভৃতি এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক শক্তির সংগে সংগ্রাম।

গ. নিজের মনের মধ্যে অবস্থিত বিরুদ্ধ-শক্তির সংগে সংগ্রাম।

এই তিন রকম সংগ্রামের কারণগুলি বিচ্ছিন্ন নয়—পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং এগুলিকেও অংকের দ্বারা ব্যক্ত করা যায়ঃ

$$px+qy+rz=m$$

এখানে x = বিভিন্ন শ্রেণীতে সংগ্রাম,

y = মানুষ ব্যতীত জীব ও নির্জীব প্রকৃতির সংগে সংগ্রাম,

z = মনের পরস্পর বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির সংগে সংগ্রাম।

শ্রেণী সংগ্রাম ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী হল মানব জাতি এক বটে, কিন্তু বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন রকম অত্যাচারী বা জালিম শ্রেণীর উদ্ভব হয়। কোনো কোনো দল কিংবা ব্যক্তি জুলুম করে অর্থনৈতিকভাবে—কেউ বা করে রাজনৈতিক-ভাবে—কেউ বা আদর্শ বা সংস্কৃতির কিংবা ধর্মের দোহাই দিয়ে। এইজন্য সংগ্রাম বা জিহাদ করে মজলুমদের মুক্তি দেওয়ার জন্য মজলুম অ-মজলুম সকলের নিকটেই উদাত্ত আহ্বান জানানো উচিত।

লিও-শাও-চি তাঁর 'কম্যুনিস্ট পার্টি' পুস্তকে তাই বলেছিলেন : বিপ্লবী নেতৃত্ব অর্থনৈতিক শ্রেণীর উপর নির্ভর করে না—করে আদর্শ ও রাজনৈতিক শিক্ষার উপর। এর কারণ হল শুধু স্বার্থ নয়—আদর্শও মানুষকে সংগ্রামী করে তুলতে পারে। কোরানিক ভাবধারা অনুযায়ী এটাই মনোবিপ্লব।

১৯২২ সালে যখন খিলাফত আন্দোলনে বিপ্লবী চেতনার উন্মেষ হয়েছিল, তখন স্ট্যালিন এম. এন. রায়ের সংগে মস্কোতে এক আলোচনায় বলেছিলেন—প্যান-ইসলামের একটি বিপ্লবী ভূমিকা ও সম্ভাবনা আছে। এই স্বীকৃতির পেছনে যুক্তি হল : বিপ্লব শুধুমাত্র অর্থনৈতিক শ্রেণীর দ্বারা হয় না—অন্যান্য কারণেও হয়। এখানে ধর্মগত বিপ্লবী শ্রেণীর কথাই তিনি উল্লেখ করেছিলেন।

কার্লমার্ক্স তাঁর কম্যুনিস্ট মেনিফেস্টোতে শেষ পর্যন্ত জালিম ও মজলুমের (Oppressor & Oppressed) কথা বলেছিলেন—তবে তিনি অত্যাচার বা জুলুমের অর্থনৈতিক জুলুম বলেই বুঝেছিলেন—রাজনৈতিক, তামুদ্দুনিক, যৌন, ধর্মীয় প্রভৃতি নয়। জুলুম সর্বপ্রকারের হতে পারে। রাশিয়াতেও যে যৌন ব্যভিচারের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড, এমন কি মৃত্যুদণ্ডও দিতে হয়—তা ভুলে যাওয়া ঠিক নয়।

তবে একটি কথা : মজলুমদের বিরাট অংশকে সহজেই জালিমের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো সম্ভব। কিন্তু সব মজলুমেরাই জালিমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে না বা করতে পারে না। অতীতে দাস প্রথার সময়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা আত্মসমর্পণই করেছে—সংগ্রাম করেনি, বিদ্রোহ করেনি—১৩৫০ সালে বাংলায় দুর্ভিক্ষে মজলুম বাঙালীরা অসহায়ভাবে রাস্তা-ঘাটে পড়ে মরেছে। তারা বড়দের কৃপা ভিক্ষা চেয়েছে, সংগ্রাম করেনি, বিদ্রোহ

করেনি—সেই অবস্থাও তাদের ছিল না। সংগ্রামের জন্য চাই আদর্শ, নেতৃত্ব ও সংগঠন তাই সংগঠনে শুধু মজলুমরা নয় অন্যেরাও আসতে পারে—মজলুমের পক্ষে সংগ্রাম করার জন্যে।

আজ একটি কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, সাম্রাজ্যবাদ ও ধনবাদের শোষণে অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাগ অত্যন্ত বিকটভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সংগ্রামে তাই সৈনিক হিসাবে মজলুমরাই অধিক সংখ্যক এগিয়ে আসবে। উপযুক্ত নেতৃত্ব ও সংগঠন পেলে সেই সংগ্রাম প্রত্যেকটি মানব দরদীর সমর্থন পাবে। বলা বাহুল্য, এই নেতৃত্ব ও সংগঠন আসে শিক্ষিত বুর্জোয়া শ্রেণীর লোকদের তরফ থেকে।

* * *

মানুষের মনের দু'টি দিক—পরার্থপরতা ও স্বার্থপরতা। বস্তুগত স্বার্থপরতার অনেক উর্ধ্বে উঠে অনেকে সমাজের কল্যাণের জন্য নির্ভয়ে এগিয়ে যায়। মহত্তর জীবন-বোধের আস্বাদ যে পেয়েছে তার কাছে বস্তু-গত স্বার্থ, ধন-দৌলত, ভোগ সব কিছুই তুচ্ছ মনে হয়। সত্যের যে আলোকবর্তিকা তার হৃদয়ে জ্বলে ওঠে তাতে সে স্পষ্ট দেখতে পায়—জীবনের মূল্য স্বার্থান্বেষণে নয়—শোষণে নয়—জীবনের সার্থকতা মানবতার প্রতিষ্ঠায়—অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে জিহাদে।

সাম্রাজ্যবাদ, ধনবাদ ও স্বার্থপর নাস্তিক্যবাদের নিষ্পেষণে আজকার সমাজে অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক অত্যাচার জঘন্যতম পর্যায়ে এসেছে। মনুষ্য সমাজে নেমে এসেছে জঘন্য স্বার্থপরতা ও বর্বরতা। মানুষের প্রতি মানুষ শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছে। মানুষের জীবন ও আত্মা যে পবিত্র, এই মনোভাব আজ অনেক দেশেই বিলুপ্ত।

এই অবস্থা আর চলতে দেওয়া যেতে পারে না। মানুষকে তার প্রাপ্য আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। মানুষ মানুষের প্রভুও নয়, দাসও নয়—ভ্রাতৃত্বের পবিত্র সম্পর্কে সম্পর্কিত সে। মহান সত্তার একত্ব ও মানুষের ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য আজ সর্বপ্রকার শোষণ ও অত্যাচারের উৎপাটন করতে হবে। সর্বস্ব ত্যাগ করেও আজ মানব দরদীদের এগিয়ে আসতে হবে এই পবিত্রতম কর্তব্য সম্পাদনে—এই মহান বিপ্লবের শক্তি সঞ্চয়ে। তবেই না ধরার ধূলায় নেমে আসবে বেহেশতের অমৃত ধারা।

৩

বিজ্ঞান : গণতন্ত্র :
কম্যুনিজম ও ইসলাম

[নিম্নের আলোচনাটি কবি জনাব হুমায়ুন কবিরের Science, Democracy & Islam নামক পুস্তককে ভিত্তি করে লিখিত। আলোচনা থেকে বোঝা যাবে, জনাব কবিরের সংগে আমার মূলত মিল থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই মতবিরোধ রয়েছে। যে সব বিষয়ে মতবিরোধ নেই, আমি সে সব বিষয়কে নানারূপ যুক্তির অবতারণা করে আরও সুস্পষ্ট করে তোলার চেষ্টা করেছি।

জনাব হুমায়ুন কবির ভারতের সুধী মহলে বিশিষ্ট স্থান দখল করেছিলেন। ভারত সরকারের উদ্যোগে লিখিত দর্শনের ইতিহাস প্রাচ্য ও প্রতীচ্য (The History of Philosophy: Eastern and Western) নামক গ্রন্থের অন্যতম সম্পাদক হিসেবে তিনি কৃতিত্বের পরিচর্য্যা দিয়েছেন। রাজনৈতিক ও আদর্শিক দৃষ্টিভংগীর দিক দিয়ে তিনি কংগ্রেসের অনুসারী ও গান্ধিজীর পরম ভক্ত এবং আজীবন হিন্দু দর্শন ও হিন্দু জীবন পদ্ধতির সংগে সংশ্লিষ্ট। পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম লীগের কার্যধারার সংগেএকমত ছিলেন না তিনি। কম্যুনিষ্ট ও হিন্দু দর্শন সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল অপরিসীম। এ সব ব্যাপারে তিনি বহু সারগর্ভ প্রবন্ধ ও সমালোচনা লিখেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে অনায়াসে বলা চলে, জনাব কবির মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও ইসলাম সম্পর্কে তাঁর বিশেষ কোন মোহ বা সংস্কার ছিল না। এজন্যে ইসলাম সম্পর্কে তাঁর লেখা যে খুবই নৈর্ব্যক্তিক ও নিরপেক্ষ হবে, তা বলাই বাহুল্য।]

জনাব হুমায়ুন কবির ইসলামের মৌলিক নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আধুনিক কালের দুটি শ্রেষ্ঠ বিষয়—বিজ্ঞান ও গণতন্ত্রের মৌলিক নীতি বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, বিজ্ঞানের মূলনীতি তিনটি বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত :

১. বিশ্ব-জগত একটি অখণ্ড সত্তা।

২. সমস্ত প্রাকৃতিক আইন পরস্পর ঐক্যসূত্রে গ্রথিত এবং সমস্ত মৌলিক আইন অপরিবর্তনীয়।

৩. প্রত্যেকটি ব্যক্তিগত সত্তারই বিশিষ্ট্য, গুরুত্ব ও মূল্য বিদ্যমান।

বস্তুত এই তিনটি বিশ্বাস ব্যতীত বিজ্ঞান অগ্রসর হতে পারে না। এই বিশ্বাসকে ভিত্তি করেই বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক অসংখ্য গবেষণা চালিয়েছেন এবং একটি গবেষণার ফলের সংগে আরেকটি গবেষণার্য ফলের ঐক্য ও সামঞ্জস্য খুঁজে পেয়েছেন। আর এ ভাবেই একটির পর একটি আবিষ্কার বিশ্ব-জগতের একটি অখণ্ড সত্তার উন্মেষ ঘটিয়েছে।

প্রথম মূলনীতিকে ভিত্তি করে আমরা বিশ্বের যাবতীয় বস্তুরাজিকে একটি অখণ্ড সত্তার অংশ হিসাবে পরিগণিত করে থাকি। গ্রহ, উপগ্রহ, সূর্য, অসংখ্য তারকারাজি ও উল্কাপিণ্ড প্রভৃতি অসীম বিশ্বের যাবতীয় বিরাটকায় বস্তু থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রতম অণু-পরমাণু কোয়ানটা, জীব-জন্তু জীবাণু সবই এই একই মৌলিক অস্তিত্বের অংশ বা উপাদান হিসাবে তার মহা রংগমঞ্চে অভিনয় করে থাকে—বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন স্বাধীন সত্তা হিসেবে নয়। এই কারণেই বিজ্ঞানীরা (এবং দার্শনিকেরাও) সমস্ত বস্তু বা অস্তিত্বের মৌলিক উপাদান ও উৎস একই বলে ধরে নিয়েছেন এবং নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা তার অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। তাঁরা এমন একটি বস্তু বা ঘটনাও দেখতে পান না যা এই একক সত্তার বাইরে বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীনভাবে বিরাজ করে।

দ্বিতীয় বিশ্বাস প্রথম মূলনীতিরই যৌক্তিক পরিণতি। বিশ্ব-জগত যদি একই সত্তা হয়, তবে তার ক্রিয়াবলীও একই মৌলিক নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার কথা। এই নীতিকে ভিত্তি করে বিভিন্ন বস্তু ও অস্তিত্বের গতি, প্রকৃতি, গুণ সবই পরস্পর ঐক্যসূত্রে সুসমঞ্জস রূপ লাভ করে। এই নীতির আরেকটি দিক হল—বিশ্ব-সত্তার মৌলিক আইন পরিবর্তনশীল নয়। যদি পরিবর্তনশীল হত, তবে বিশ্বের মৌলিক রূপ বদলে যেত এবং এর ফলে এক যুগে বা এক দেশে আবিষ্কৃত আইন অন্য যুগে বা অন্য দেশে অচল বলে প্রমাণিত হত। আর সর্বদা এই পরিবর্তনহেতু যে অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা বিরাজ করত, তাতে বৈজ্ঞানিকেরাও গবেষণা করে কোন নির্দিষ্ট সত্যে ও সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারতেন না। অর্থাৎ এই অবস্থায় কোন কিছুকেই সত্য বলে পরিগণিত করা যেত না। নিউটনীয় যুগের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অস্তিত্বই বর্তমান যুগে পাওয়া যেত না কিংবা আর্কি-মিডিসের চাপ-তত্ত্বও একালে অলীক বলে মনে হত। ফলে সৃষ্টির যাবতীয় ক্রিয়াকাণ্ডে কোন শৃঙ্খলা পাওয়া সম্ভব হত না—খামখেয়ালীভাবে

(Whimsically) সব কিছু সংঘটিত হয়ে একটা ধারণাতীত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করত। তখন মানুষের বোধগম্য বা বোধযোগ্য যেমন কোন কিছু থাকত না, তেমনি থাকত না মানুষের জ্ঞান বলে কোন কিছু। মানুষ দুর্বোধ্য প্রকৃতির মধ্যে সর্বদা অজ্ঞান ও বর্বর থেকে যেত।

কেউ কেউ ভাবতে পারেন—প্রকৃতিতে তো আমরা সততই পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। ঋতুর পরিবর্তন ঘটছে, ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত বস্তু পরিবর্তিত হচ্ছে—জীব-জন্তুর পরিবর্তন ঘটছে ; যেমন ঃ বীজ থেকে জন্ম নিচ্ছে চারা গাছ—চারা গাছ থেকে গাছ—গাছ থেকে ফুল ও ফল। এইরূপ অসংখ্য পরিবর্তন আমরা সর্বদা অবলোকন করে থাকি।

স্বীকার করি, এ সবই পরিবর্তন। কিন্তু এতে কোন মৌলিক আইনের পরিবর্তন ঘটছে কি? উত্তর হল—না। বরং অপরিবর্তনীয় আইনের কারণেই এই সমস্ত ঘটনার উন্মেষ হচ্ছে—প্রকৃতিতে নতুন নতুন রূপের বিবর্তন সম্ভব হচ্ছে।

সকলেই জানেন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন উপযুক্ত পরিবেশে মিলিত হলে পানি উৎপন্ন হয়। এই নিয়ম সনাতন। লক্ষ লক্ষ বছর আগেও এই দুই গ্যাস উপযুক্ত পরিবেশে মিলিত হলে পানিই উৎপন্ন করত। এখনও তাই হয়, আবার লক্ষ লক্ষ বছর পরেও তাই হবে। নিয়মের পরিবর্তন হয়নি, পরিবর্তন হয়েছে বস্তুর ও তার রূপের, আর তাও হয়েছে ঐ আইন বা নিয়মকে অনুসরণ করেই।

আরও একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। উত্তাপ পেলে বরফ পরিণত হয় পানিতে, আর পানি রূপান্তরিত হয় বাষ্পে। এই নিয়মও আদি কাল হতে চলে আসছে।

সূর্যের চারদিকে পৃথিবী প্রাকৃতিক নিয়মেই ঘুরছে। এই নিয়মও পৃথিবী ও সূর্যের অস্তিত্বের সংগে স্থায়ী। আর এই নিয়মের ফলেই আমরা ঋতু পরিবর্তন দেখে থাকি। আরও মৌলিকভাবে চিন্তা করলে দেখি, বিশ্বের কোন বস্তু বা শক্তি কেউ ধ্বংস বা সৃষ্টি করতে পারে না। একে বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলে বস্তু ও শক্তির নিত্যতা (Conservation of Matter & Energy)। সামান্য একটি পরমাণু সৃষ্টি বা ধ্বংস করার ক্ষমতাও পৃথিবীর কোন বিজ্ঞানীর নেই। এই আইনকেও বিজ্ঞানীরা সর্বসম্মতিক্রমে সনাতন বলে মেনে নিয়েছেন। কেননা তাঁরা অসংখ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার

মধ্যে দেখিয়েছেন : বস্তু ও শক্তির পরিবর্তন আছে বটে, কিন্তু ধ্বংস বা সৃষ্টি নেই।

তৃতীয়ত, বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, একটা ক্ষুদ্রতম কণা বা সামান্যতম ঘটনারও বিশিষ্ট মূল্য ও গুরুত্ব রয়েছে। আর এই ক্ষুদ্রতম কণা বা সামান্যতম ঘটনা অখণ্ড বিশ্বেরই একটা মৌলিক অংশ। এই কারণেই বিজ্ঞানীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা ও কণাকে কেন্দ্র করে গবেষণা চালিয়ে বিরাট আবিষ্কারের অধিকারী হন।

বিজ্ঞান ও গণতন্ত্র

বিজ্ঞান ও গণতন্ত্রের ইতিহাস যাঁরা পাঠ করেছেন, তাঁরা জানেন—

* বিজ্ঞান ও গণতন্ত্র সমসাময়িক।
* একটির উন্নতির সংগে অন্যটির প্রতিষ্ঠা ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

গণতন্ত্রের মূলকথা হল : যে কোন আইন সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য এবং আইনের কাছে সকলেই সমান। রাজতন্ত্রে ও ডিক্‌টেটরশিপে এই মত অচল। বলা বাহুল্য, বিজ্ঞানের দ্বিতীয় মূল বিশ্বাসের প্রসারের ফলে গণতন্ত্রের এই মৌলিক নীতির প্রচলন সম্ভবপর হয়েছে। কারণ বিজ্ঞানের নিয়ম বা নীতি পক্ষপাতহীনভাবে সর্বত্র কার্যকরী হয়।

গণতন্ত্রের আর একটি প্রধান কথা হল, সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির গুরুত্ব ও বিশেষ মূল্যের স্বীকৃতি। উপরে বর্ণিত বিজ্ঞানের তৃতীয় বিশ্বাসের পরিপূরক হিসাবে এই নীতির প্রবর্তন। কারণ, বিজ্ঞান যেমন প্রতিটি ক্ষুদ্র কণা বা ঘটনাকে গুরুত্ব দেয়—আদর্শ গণতন্ত্রেও তেমনি প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে।

কিন্তু আমার মতে দু'টি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সংগে গণতন্ত্রের বিরোধ রয়েছে। এর একটি হল : গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন। সংখ্যালঘিষ্ঠের স্থান এখানে নগণ্য। অধিকন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের জয়ের মধ্যে গুণের স্বীকৃতির চেয়ে সংখ্যার স্বীকৃতিই থাকে প্রবল। অথচ দেখা যায়, অনেক ক্ষেত্রে সংখ্যার বিচারে মারাত্মক ভুল সংঘটিত হয়ে থাকে। গুরুর দিকে আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বকে অনেকে বুঝতে ও গ্রহণ করতে পারেন নি। রাশিয়ায় তো এককালে একে পুঁজিবাদী তত্ত্ব বলে বর্জন করা হয়েছিল। কিন্তু যে কোন সত্য—বৈজ্ঞানিক সত্য তো বটেই, শুধু একজন বা সংখ্যালঘিষ্ঠের

দ্বারা আবিষ্কৃত হলেও তা অবশ্য গ্রহণীয়। অধিক সংখ্যক লোক গ্রহণ করে না বলে কোন সত্য অসত্য হয়ে যায় না। জনাব কবির এখানে দ্বিধায় পড়েছেন। তিনি বিজ্ঞানের সংগে গণতন্ত্রের এই বিরোধ উপলব্ধি করেও এই স্ববিরোধিতাকে বাহ্যিক বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। দ্বিতীয় বিরোধ পরে আলোচিত হবে।

বিজ্ঞান ও ইসলাম

একথাও কারো অজানা নয় যে, বিজ্ঞানের জয়যাত্রার বহু পূর্বেই ইসলাম বিজ্ঞানের মৌলিক নীতিগুলি জগতের সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন। শুধু তাই নয়, ইসলামের আবির্ভাবের পর বিজ্ঞানের উন্নতি ইসলাম ও বিজ্ঞানের মধ্যে একটি কার্যকারণ সম্পর্ক সূচিত করে।

বিশ্বের ঐক্যবোধ ইসলামের একটি মহা অবদান। অতীতের বিভিন্ন ধর্ম বহু সৃষ্টিকর্তার স্বীকৃতি দিয়ে বিশ্ব ও সমাজকে বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্নরূপে দেখেছে। এমনকি ইহুদী ও খ্রীস্ট ধর্মও এই বহুত্বের ত্রুটি হতে সব ক্ষেত্রে মুক্ত ছিল না; কিন্তু ইসলামই প্রথম এক সৃষ্টিকর্তার অধীনে এক অখণ্ড বিশ্বের ও আইনের ধারণা দৃঢ়ভাবে প্রবর্তন করে। ইসলামের ঐক্য-ধারণা (যাকে আমরা তৌহিদ বলি) এতদূর অগ্রসর হয় যে, এর মতে পৃথিবীতে প্রকৃত ধর্মও বহু নহে, একটি মাত্র এবং সেটা ইসলাম। বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন যুগে যে সমস্ত ধর্মপ্রচারক এসেছিলেন, তাঁরাও বিভিন্ন নামে এই ইসলামই প্রচার করেছেন। তাঁরাও ইসলাম ধর্মের এক একজন পয়গম্বর ছিলেন। কুরআনের বিবৃতি অনুসারে এমন কোন দেশ বা জাতি নাই যেখানে অতীতে ইসলামের নবী প্রেরিত হয়নি। ইসলাম স্বীকার করে না যে, শুধুমাত্র এক ব্যক্তিই ইসলাম প্রচার করেছেন। ইসলামের প্রবর্তক শুধু হযরত মুহাম্মদ (সঃ) নন। হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে হযরত মূসা (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ) এবং বিভিন্ন দেশের আরও হাজারো মহাপুরুষ ইসলামের এক একজন বিশিষ্ট পয়গম্বর। তাই ইসলাম সমস্ত মানবতার ধর্ম—এটা সাম্প্রদায়িক ধর্ম নয়।

ইসলামের ঐক্য-ধারণায় প্রকৃত সত্য অবিনশ্বর ও নিত্য। এটা সময়ের পরিবর্তনে পরিবর্তনশীল নয়। আর এই সনাতন সত্য প্রচারের জন্যই বিভিন্ন যুগে পয়গম্বরগণ আগমন করছিলেন।

এক আল্লাহ্য় বিশ্বাসের ফলে সমস্ত বিশ্ব-জগত একই নীতির অধীন—এই ধারণা ইসলামই জগতে সর্বপ্রথম সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ফলে, লৌকিক ও পারলৌকিক এই দু'টির বিচ্ছিন্নতাও ইসলাম স্বীকার করে না। শুধু তাই নয়, জীবনের সর্ব দিকের ঐক্যে বিশ্বাস করে বলেই ইসলাম রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতিতেও কোন বিচ্ছিন্নতা মেনে নেয়নি। রাজনীতি অর্থনীতি সব কিছু মানুষের জীবনের সাথে জড়িত। মানুষের জীবনের বিভিন্ন বিভাগ থাকলেও কোনটা বিচ্ছিন্ন নয়—ঐক্যসূত্রে সবটাই গ্রথিত। এ জন্য একই মানব জীবন একই নীতির দ্বারা পরিগণিত হওয়া উচিত বলেই জীবনের সাথে জড়িত কোন দিককেই বিচ্ছিন্ন করে দেখা ভ্রান্তিমূলক। এই জন্য জীবনের কোন ক্ষেত্রে ধর্ম-নিরপেক্ষতার (secularism) স্থান ইসলামে নেই। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীরই এটা স্বাভাবিক ফল। কারণ বিজ্ঞানের প্রথম মূলনীতি আমাদিগকে এই শিক্ষা দিয়ে থাকে।

ইসলামে পয়গম্বরকেও অতিমানুষ বলে ধারণা করবার কোন অবকাশ নেই। কুরআন তাই স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে: হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-ও একজন মানুষ মাত্র এবং তিনিও বিশ্বের একই আইনের আয়ত্তাধীন। যখন তাঁর এক পুত্রসন্তানের মৃত্যুর সময়ে সূর্যগ্রহণ হয়, তখন কুসংস্কারাচ্ছন্ন কুরাইশরা এটাকে হযরতের অলৌকিক শক্তির প্রমাণ মনে করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে অগ্রসর হয়েছিল। সেই সময়ে হযরত (সঃ) ঘোষণা করেছিলেন—চন্দ্র-সূর্য আল্লাহ্র আইন অনুসরণ করে এবং এরা কোন নবী বা সাধারণ লোকের দুঃখে আদৌ প্রভাবিত হয় না। সেই চৌদ্দশ বছর পূর্বে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের পূর্ণ বিকাশের বহু আগে এই রকম যুক্তিবাদের (Rationalism) অবতারণা সত্যই সকলকে অবাক করে দেয়।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) শেষ নবী, তার পরে আর কোন নবী আসবেন না—এই কথা অযৌক্তিক বলে মনে হয়। কিন্তু এ ব্যাপারেও মৌলিকভাবে চিন্তা করবার অবকাশ রয়েছে। দার্শনিক স্পিনোজা জ্যামিতিক নিয়মে চিন্তার ঐক্য প্রমাণ করেছিলেন। মৌলিক চিন্তা ও যুক্তির ঐক্য প্রমাণ করে যে, পূর্ণ ক্ষেত্র প্রস্তুতির পর এটা বারবার প্রকাশের আবশ্যকতা নেই। একই সত্য বারবার বলার যৌক্তিকতা কোথায়? এইজন্য বলা হ'য়ে থাকে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর আবির্ভাবের সময় ও কিছু পরে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে চলাচল ও ভাবের ব্যাপক আদান-প্রদান শুরু হয়; পূর্বে যেমন এক দেশ অন্য দেশের নিকট অনধিগম্য ছিল, এখন তা আর রইল

না। সুতরাং ইসলামের সত্য পৃথিবীর সব দেশে পৌঁছার মত পরিবেশ তখন সৃষ্টি হয়েছিল, যা অতীতে সম্ভব ছিল না; আর এজন্য পূর্বে বিভিন্ন দেশে সত্য প্রচারের জন্য বিভিন্ন মহাপুরুষের আবশ্যক ছিল। দ্বিতীয়ত তখন লেখাপড়ার পদ্ধতি এমন স্তরে এসেছিল যে, আল-কুরআনের মত মহাগ্রন্থ অবিকৃত অবস্থায় রাখা সম্ভব হ'য়েছিল। ফলে অতীতে যেমন ধর্ম-পুস্তক বিকৃত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল (এবং হয়েছেও), এখন তা দূরীভূত হওয়ার ফলে পুনরায় ধর্মপ্রচারকের কোন আবশ্যকতা দেখা দেয়নি। তবু মৌলিক যুক্তি এক হলেও বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট তা বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন-রূপে প্রকটিত হয় বলে তার সামঞ্জস্য বিধানের নিমিত্ত যুগে যুগে সংস্কারক ও মহাচিন্তাবিদ্‌দের আগমনের আবশ্যকতা ইসলাম স্বীকার করেছে। জনাব হুমায়ুন কবির এই যুক্তি মেনে নিয়েছেন।

এখানে আর একটি কথা বলা দরকার। পূর্ণ সত্য পূর্ণরূপে প্রচারিত হবার পরও যদি নতুন পয়গম্বর আসার নীতি স্বীকৃত হত, তাহলে বহু প্রকৃত ও বহু ভুয়া পয়গম্বরের আবির্ভাবে ও বহু ধর্মের প্রতিষ্ঠায় মনুষ্য সমাজ অধিকতর ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর তিরোভাবের পরই বহু ভুয়া পয়গম্বরের আবির্ভাবে কি অনর্থ ঘটেছিল, তা ইতিহাস-পাঠকদের অবিদিত নয়।

ইসলামের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলঃ ব্যক্তিকে সে এক বিশিষ্ট স্থান দিয়েছে। কুরআনে তার বহু নজীর আছে। মহাকবি আল্লামা ইক্‌বালের 'আসরারে খুদীর' মধ্যে মানুষের এই ব্যক্তিসত্তার অসীম গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রথম দিকে বর্ণিত বিজ্ঞানের তৃতীয় মৌলিক নীতির সংগে এর মিল আছে। ইসলাম ব্যক্তিকে এত বেশী মূল্য দিলেও সমষ্টিকে খাটো করেনি। ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যে এক সুন্দর সামঞ্জস্য বিধান করে ইসলাম বিজ্ঞানের ধারণাকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মার্ক্সবাদ সমাজের কাছে ব্যক্তিকে অনুল্লেখ-যোগ্য সত্তায় পর্যবসিত করেছে। অন্যদিকে নিট্‌শের 'অতিমানব-তত্ত্ব' বা নাত্‌শীবাদের 'ডিক্‌টেটরশীপ' একমাত্র ব্যক্তির কাছে সমাজকে অত্যন্ত খাটো করেছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এই দুই তত্ত্বই যে ভুল, তা সহজেই অনুমেয়।

তৌহিদবাদ (Idea of Oneness of Allah) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মূল। আর এটাই গণতান্ত্রিক নীতি প্রতিষ্ঠার মৌলিক কারণ। একই আল্লাহ্‌র সৃষ্টি হিসাবে মানুষ ভাই ভাই, সকলের জন্য আইন ও যুক্তি সমানভাবে প্রযোজ্য—ইসলামের এই সমস্ত নীতি, আদর্শ গণতন্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেছে।

সত্য কথা বলতে কি, ইসলামই প্রথম রাজতন্ত্র ও যাজকতন্ত্রের উচ্ছেদ ক'রে প্রকৃত গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করেছিল। অনেকে মনে করেন—গ্রীস ও রোমান শাসনে প্রথম গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছিল, এটা ভুল। কারণ যে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হ'য়েছিল বলে বলা হয়, তাতে বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য বিভিন্ন ধরনের আইন প্রবর্তন করা হ'য়েছিল। রোমান সমাজেও বিভিন্ন স্তরের জন্য বিভিন্ন অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারিত হয়েছিল। আমাদের মনে হয় নেতৃস্থানীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বৃটেন-আমেরিকাতেও প্রকৃত গণতন্ত্র বিংশ শতাব্দীতেও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আমেরিকায় এখনো নিগ্রোরা সামাজিক আইনে সবরকম গণতান্ত্রিক অধিকার পায় না এবং ইংলণ্ডে এখনও সীমাবদ্ধ হলেও রাজতন্ত্র বিদ্যমান। এমন কি রাজপরিবারের লোক এবং সাধারণ লোকের মধ্যে আইন ও মর্যাদার দিক দিয়ে এখানে পার্থক্য বিরাজমান। আর ভারতের তথাকথিত গণতান্ত্রিক সমাজে বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে অনৈক্য যে কত প্রকট ও মারাত্মক, তা বলাই বাহুল্য।

জনাব হুমায়ুন কবির এ সম্বন্ধে বলেছেন : প্রত্যেকটি ধর্মই তত্ত্বগত-ভাবে আল্লাহ্‌র পিতৃত্বে ও মানুষের ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস দেখিয়েছে। কিন্তু এটা বিশ্বাসে সীমাবদ্ধ রয়েছে—বাস্তব জীবনে কার্যে পরিণত হয়নি। বর্ণ, বংশ, স্থান, ধন-সম্পদ মানুষে মানুষে যে বিভিন্নতা সৃষ্টি করেছে, তাতে ভ্রাতৃত্ব একেবারে বিলুপ্ত হ'য়েছে। কিন্তু ইসলামের সবচাইতে বড় শত্রুও স্বীকার করবেন যে, ইসলাম মুসলিমদের মধ্যে বংশ ও বর্ণের সর্বপ্রকার বিভেদ-প্রভেদ বিলুপ্ত করতে সমর্থ হ'য়েছে। তাই আফ্রিকার কুশ্রী নুবিয়ানের সংগে আরবের সম্মানিত কুরাইশের সামাজিকতায় কোন প্রভেদ নেই। বার্নাড শ একবার রহস্যচ্ছলে বলেছিলেন : গণতন্ত্রের প্রকৃত পরীক্ষা হল সামাজিক বিবাহ (Intermarrageability)। কথাটা খুবই সত্য। প্রার্থনা, আহার ও রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক স্তরের সাম্য প্রদর্শনমূলক ও ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে। কিন্তু আন্তঃবিবাহ এমন একটি পরীক্ষা যাতে ফাঁকির সুযোগ

নেই। আর একমাত্র ইসলামই বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহের সুব্যবস্থা প্রবর্তন করে প্রকৃত গণতান্ত্রিকতার উন্মেষ ঘটিয়েছে।

জনাব হুমায়ুন কবির নারীর অধিকার, ইসলামের অর্থনীতি ইত্যাদি সম্বন্ধেও আলোচনা করে ইসলামী নীতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন।

* * *

উপরে আমরা যা আলোচনা করলাম, তা থেকে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে পেঁৗছা যায়ঃ

১. বিজ্ঞানের মৌলিক নীতি তিনটি—সৃষ্টির ঐক্য, নীতির ঐক্য ও প্রতিটি ঘটনার উপর গুরুত্ব আরোপ।

২. ইসলামের মূলনীতিও তিনটি—সৃষ্টির ঐক্য, নীতি বা আইনের ঐক্য (অর্থাৎ নীতি বা আইন সকলের প্রতি সমানভাবে প্রযোজ্য) এবং ব্যক্তির উপর গুরুত্ব। সৃষ্টির ঐক্যবোধের মাধ্যমে প্রাপ্ত ইসলামের ভ্রাতৃত্ববোধের ধারণা মানব সমাজের এক মহাসম্পদ।

৩. গণতন্ত্রে বিজ্ঞানের প্রথম মূলনীতি নেই অর্থাৎ সৃষ্টির ঐক্য সম্বন্ধে কোন দার্শনিক ভিত্তি এর নেই। এতে আছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় নীতি—নীতির ঐক্য (আইনের চোখে সবাই সমান) এবং ব্যক্তির মর্যাদা। কিন্তু এই তৃতীয় নীতিতেও গণতন্ত্রের বিরাট ত্রুটি রয়েছে। তাই গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে শুধু ব্যক্তিই যে অনেক ক্ষেত্রে পঙ্গু হয় তাই নয়, সংখ্যালঘু সমাজও (যেমন আমেরিকায় নিগ্রো সমাজ) সুদীর্ঘ দিন ধরে অসাম্যমূলক ব্যবহার লাভ করতে পারে। অপর পক্ষে গণতান্ত্রিক শাসনে সংখ্যার নিকট গুণকে অবৈজ্ঞানিকভাবে অনেক ক্ষেত্রেই বলি দেওয়া হয়। কম্যুনিস্ট ডিক্‌টেটরশীপে সৃষ্টির ঐক্য শুধু বস্তুতেই সীমাবদ্ধ, মননশীলতায় নয়। ফলে, সমাজে ভ্রাতৃত্বের ধারণার চাইতে স্বার্থগত ধারণারই প্রাবল্য দেখা দেয়। এই সমাজে নীতির ঐক্যও সর্বত্র সমানভাবে প্রযোজ্য হয় না। তাই একদিকে যেমন কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রগুলিতে দাস-শিবির ব্যবস্থা বর্তমান,

অন্যদিকে প্রতিবেশী দেশ ও সংখ্যালঘু জাতিগুলির প্রতি ব্যবহার সাম্রাজ্যবাদী নীতির পরিপোষক (দৃষ্টান্ত : আফগানিস্তান, হাঙ্গেরী, উজবেকিস্তান প্রভৃতি)।[১]

কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের সবচাইতে বড় ত্রুটি হল—এখানে ব্যক্তিকে কোন মূল্য দেয়া হয় না। ব্যক্তি এখানে যন্ত্র বিশেষ। বিজ্ঞানের তৃতীয় মৌলিক নীতি এইভাবে কম্যুনিস্ট সমাজে অবর্তমান থাকায় এটা একটি অবৈজ্ঞানিক মতবাদে পর্যবসিত হয়েছে।

১· খোদ রাশিয়া তো লক্ষাধিক সৈন্য পাঠিয়ে অস্ত্রবলে আফগানিস্তানে বিপ্লব (জোরদখল) ঘটাবার অপচেষ্টা চালাচ্ছে—অমানুষিকভাবে। শক্তি বলে পোলাণ্ডেও গণবিপ্লব দমাবার সবরকম অগণতান্ত্রিক; স্বৈরতান্ত্রিক জঘন্যতর অত্যাচারমূলক ব্যবস্থা নিতেও সমাজতন্ত্রের নেতৃদেশ রাশিয়া দ্বিধাবোধ করছে না—সমাজতন্ত্র রক্ষার নামে। আশ্চর্যের বিষয় হল পৃথিবীর অধিকাংশ কম্যুনিস্ট দেশ এবং কম্যুনিস্ট পার্টিও এই অযৌক্তিক বর্বর কাজে রাশিয়াকে সমর্থন যোগাচ্ছে—যেমন সমর্থন দিচ্ছে অনেক পশ্চিমা গণতান্ত্রিক দেশ গণতন্ত্রের নেতৃদেশ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকে ফ্যাসিস্ট ইসরাইলের—ফিলিস্তিনের বাস্তুহারা হতভাগ্য জনগণকে দমন ও ধ্বংস করার বর্বর কাজে। এদের কয়েকটি বর্ণবাদী দক্ষিণ আফ্রিকাকেও প্রকাশ্যে ও গোপনে মদদ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না!

দর্শন ও বিজ্ঞান

উপসূচী

১.	যুক্তি, প্রমাণ ও বিজ্ঞান	৭৩
২.	সৃষ্টি সম্পর্কিত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব	৮০
৩.	দর্শন, বস্তুবাদ ও বিজ্ঞান	৯৯
৪.	কয়েকটি প্রশ্ন	১১১
৫.	বিবর্তনবাদ ও আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব	১২১

১
যুক্তি, প্রমাণ ও বিজ্ঞান

আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কে আলোচনার প্রথমে আমাদের যে কথাটি মনে পড়ে তা হল যুক্তি ও প্রমাণ। কারণ, যুক্তি আর প্রমাণ ছাড়া এরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা বৃথা।

যুক্তি-প্রমাণ কি

মানব ইতিহাসের শুরু থেকে যে জিজ্ঞাসা মানুষের মনে বারবার আন্দোলন সৃষ্টি করেছে, তা হল ঃ এই সৃষ্টির মূলে কি? এই চাঁদ, সুরুজ, পৃথিবী, এই যে অসংখ্য জীবজন্তু ও পদার্থ—এ সব হল কিরূপে?

এই জিজ্ঞাসার শেষ আজও হয়নি। বিজ্ঞান-দর্শন, আর ইতিহাসের সাহায্যে এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার চেষ্টা চলছে এখনো।

মন ও হৃদয়

অদ্ভুত জিনিস মানুষের মন ও হৃদয়। সীমাবদ্ধ মানুষের দেহ। যে পাঁচ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সে জ্ঞান আহরণ করে তাও নেহায়েত সীমিত।

কিন্তু পারাপার নেই তার চিন্তাশক্তির—কল্পনাশক্তির। তার হৃদয়ের যে গভীর অনুভূতি, যে উপলব্ধি— তারও নেই কোন যৌক্তিক ইতি।

জ্ঞান বিজ্ঞানের নিগূঢ় তত্ত্ব জানবার যে চেষ্টা ও যে শক্তি সে তো মন আছে বলে—চিন্তা করতে পারে বলে। প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা, সুখ-দুঃখ যা নিয়ে মানুষের জীবন—তাও সম্ভব হয়েছে মানুষের হৃদয় আছে বলে।

মন ও হৃদয় বলে যদি কিছু না থাকত তবে যুক্তি বলেও কিছু থাকতনা —প্রশ্নও উঠত না আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব নিয়ে। 'প্রমাণ চাই' বলে যে অহমিকা আমরা দেখাতে পারি তাও সম্ভবপর হত না কখনো।

কিন্তু কথা হল ঃ যে মন প্রশ্ন জাগায়—আর প্রমাণ চায়, সে মনটাই আবার কি? চোখে না দেখলে, হাতে না ছুঁলে, রূপ-রস না পেলে কিছুকে বিশ্বাস করতে আমাদের মন চায় না—সে মনকে কি আমরা কোনদিন কেউ

দেখেছি ? এমন কি অনুবীক্ষণ দিয়েও কেউ কি পরখ করতে পেরেছি—ছবি তুলতে পেরেছি —এক্সরে যন্ত্র দিয়েও ? পেরেছি কি আমরা মনের কোন গন্ধ, কোন স্বাদ, কোন শব্দ গ্রহণ করতে ?

সত্য বটে আমরা এটম, ইলেকট্রন ইত্যাদি কণাও দেখিনি, পরশ করিনি। তবু এক্সরে প্রভৃতি সুক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে আমরা এগুলির অস্তিত্বের তত্ত্ব নিতে চেষ্টা করেছি—(সেও মনের উপর নির্ভর করে)। কিন্তু এক্সরে ইত্যাদি যন্ত্রের দ্বারা কি মনের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ আমরা দিতে পেরেছি ?

তবু আমরা জানি ঃ মন আছে। আমরা চিন্তা করতে পারি— পারি কল্পনা করতে। সুতরাং জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধের মত আমরা মেনে নিয়েছি ঃ আমাদের মন আছে,—এইভাবে আমরা মনকে ধরে নিয়েছি।

কিন্তু কেন ?

১. কারণ, আমি বুঝি আমার মন আছে, তাই আমি বিশ্বাস করি অন্যদেরও মন আছে।

২. আমি বুঝি মন থাকলে চিন্তা করা যায়, চিন্তা করতে পারলে পরিকল্পনা করা যায়। পরিকল্পনা করতে পারলে সে অনুসারে কাজ করা যায়। আর সে কাজ দেখে আমরা বলতে পারি ঃ যে পরিকল্পনা মত এই কাজ করেছে—তার নিশ্চয়ই মন আছে। মন যে আছে তাও এভাবে মন দিয়েই বুঝতে হয়।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল কি ?

—আমরা কি মন দেখে মনের অস্তিত্ব স্বীকার করলাম ? না। আমরা মনের কোন সরাসরি প্রমাণ দিতে পারিনি। এ জন্য অসরাসরি (অপ্রত্যক্ষ) প্রমাণ পেয়েই আমরা মনের অস্তিত্ব মেনে নিয়েছি। অন্য কথায় পরোক্ষ প্রমাণও সত্য।

এর মানে হল— ফল দেখে আমরা কারণের খোঁজ পেয়েছি। ফল থাকলে আমরা ধরে নেই তার কারণ থাকবে। এইজন্যই পরিকল্পনা মত কাজ দেখলেই আমরা মনে করি—মন আছে।

কার্যকারণ

কিন্তু আবার প্রশ্ন ওঠে, ফল দেখলেই তার কারণ থাকতে হবে এরও কি মানে হতে পারে ? যারা আল্লাহ্য় বিশ্বাস করে না তারা আদি বস্তুর কারণ

আছে বলে কি মানবে? কাজেই ফল থাকলে তার কারণ থাকতে হবে তারও বা কি যুক্তি হতে পারে?

সুতরাং ফল দেখে মনের অস্তিত্বের প্রমাণ হল কিরূপে? —তবে হাঁ, যদি আমরা ধরে নেই কারণ ছাড়া ফল হতে পারে না, তা হলে অবশ্য মনের অস্তিত্ব প্রমাণ হয়ে যায়। কিন্তু এই যে প্রমাণ এটা নির্ভর করল ধরে নেয়ার উপর—মানে কল্পনার (hypothesis) ওপর। অন্য কথায় ফল থাকলে কারণ থাকে এ বিশ্বাসের ওপর। এবার প্রশ্ন দাঁড়াল তা হলে যুক্তি কি—প্রমাণ কি?

আগের বিশ্লেষণ বলে দেয়: যুক্তি প্রমাণও নির্ভর করে ধরে নেওয়ার (assumption) উপর। জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধের মত মূলগতভাবে কিছু ধরে না নিলে কিংবা বিশ্বাস না করলে যুক্তি চলে না—প্রমাণ আগায় না।

এটমের চারিদিকে ইলেকট্রনগুলি ঘুরছে বিভিন্ন চাকে (orbit-এ) অনবরত। বোহ্রের শুরু করা এই তত্ত্ব বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন। বিশ্বাস করেন বললাম এইজন্য যে, এটম ইলেকট্রন আর এই ঘুরন কেউ দেখেনি। শক্তিশালীতম অণুবীক্ষণ দিয়েও তা দেখা সম্ভব নয়। তবু বিজ্ঞানীরা ধরে নিয়েছেন—এটম আছে, ইলেকট্রন-প্রোটন আছে—আর এগুলি ঘুরছে সঠিক নিয়মে, সঠিক শৃঙ্খলায়।

বিজ্ঞানীরা ধরে নিয়েছেন এইজন্য যে এভাবে ধরে না নিলে কতকগুলি ঘটনা ব্যাখ্যা করা যায় না। মানে কোন ফলের কারণ নির্দেশ করা যায় না। আর এই কারণ নির্দেশ করতে গিয়েই এই ধরে নেওয়ার অপরিহার্যতা।

গতি-তত্ত্ব, ডারউইন তত্ত্ব ইত্যাদি যত তত্ত্বই আমরা বিচার করি না কেন সবটাতেই আছে এই কারণ নির্দেশের চেষ্টা। আর এই কাজে কতকগুলি বিষয় ধরে নেওয়ার চেষ্টা।

কাজে কাজেই এতে প্রমাণিত হয়, কল্পনা বা ধরে নেওয়া ছাড়া বৈজ্ঞানিক প্রমাণও অচল। মানে প্রমাণ ও যুক্তিতেই গা-ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে আছে ধরে নেওয়া বা অনুমানযোগ্য কল্পনা।

৩. একটা সাধারণ উদাহরণ নেওয়া যাক। আপনি বললেন, এই ফুলটি সাদা। আমি যদি প্রশ্ন করে বলি, তার প্রমাণ? কি উত্তর দেবেন আপনি তখন? বলবেন: এই যে আমি চোখে দেখছি সাদা

আমি আবার যদি বলি তার প্রমাণ কি? দেখাটাই কি অকাট্য প্রমাণ? আপনি এতে থতমত খেয়ে যাবেন। দেখে আপনার যে অনুভূতি হল—তাকেই আপনি সাদা বলছেন। ধরা যাক—অন্য গ্রহ থেকে একটি জীব এসে বলল—তার অনুভূতি এক নয়, ও ফুল সাদা নয়—অন্য কিছু, তখন?

৪. আপনি এখানে ধরে নিয়েছেন, ঐ ফুল দেখলে সকলের সচরাচর একই অনুভূতি—মানে সাদার অনুভূতি হয়। আপনি বিশ্বাস করেছেন—এই ফুলের ব্যাপারে সকলের অনুভূতি একই রকম হয়। কিন্তু আপনি তো স্বীকার করবেন—রঙীন চশমা দিয়ে দেখলে কিংবা খারাপ চোখ দিয়ে দেখলে ফুলটির রং অন্য রকমও দেখা যেতে পারে। তাছাড়া অনুভূতি সাদা হলেই যে ফুলটির রং সাদা হবে তার নিশ্চয়তা কই? এভাবে আপনি যতই এগিয়ে যাবেন নতুন নতুনভাবে ধরে নেবেন অনেক কিছু।

আরও একটু আগানো যাক; আসলে কি সাদা রং বলে কিছু আছে? বিজ্ঞান প্রমাণ করছে ঃ রং হল আলোর ঢেউ আর চোখের উপর তার অনুভূতি মাত্র। বিভিন্ন জীবের চোখে বিভিন্ন রকমের আলোর ঢেউ ধরা পড়া সম্ভব। তাই বিভিন্ন জিনিস বিভিন্ন জীবের চোখে বিভিন্ন রং-এর হওয়া অসম্ভব নয়।

শুধু কি তাই? দেখলেই কি কোন জিনিসের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে? তাহলে আয়নায় যে ছবি দেখেন, কিংবা মরুভূমিতে যে মরীচিকা দেখেন অথবা আমরা যে সব সময় দেখছি, সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে—কিংবা ট্রেনে চড়ে দেখি যে সব গাছপালা ঘরবাড়ি উল্টো দিকে ছুটছে?

কাজেই ধরে নিতে হয়—দেখা জিনিসও সব সময় সত্য নয়। কাজেই দেখা অনুভূতি প্রমাণের ভিত্তি নয়। দেখাটাই যদি প্রমাণ হত তবে অনেক মিথ্যাই সত্য হয়ে উঠত। এই যে সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর ঘুরার কথা—এটাও দেখে প্রমাণ নয়, ধরে নেওয়ার প্রমাণ। ধরে নেই এজন্য যে, যদি পৃথিবীকে সূর্যের চারিদিকে ঘুরাই তবে আমরা বহু ঘটনার ব্যাখ্যা করতে পারি—নতুবা নয়। এখানে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকের ঘুরার কথা আমরা ধরে নিয়েছি।

আরো হাতের কাছে সহজ উপমা ধরা যাক। দুনিয়া যে গোলাকার,

তাই বা আমরা কে দেখেছি? নানা রকম যুক্তির ভিত্তিতে আমরা ধরে নিয়েছি। ধরে নিয়েছি কেননা, দুনিয়া গোলাকার না হলে আমরা অনেক-গুলি ঘটনা দেখছি যা ঘটত না। যেমন: কোন স্থান থেকে যাত্রা করে একই দিকে এগিয়ে গিয়ে আবার সেখানেই পৌঁছানো যেত না।

জ্যামিতির কথা তো আগেই উল্লেখ করেছি। জ্যামিতি কেন— জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে কোন শাখাতেই ধরে নেওয়া ছাড়া পথ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আর একটা উদাহরণ নিন। ০ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলি আমরা ধরে নিয়েছি। এর সাহায্যে আমরা যে কোন সংখ্যা লিখতে পারি। যেমন ৯০৮১। এটা হল নয় হাজার একাশি। প্রকৃতিতে কিন্তু এটা লেখা নেই। আমরা এভাবে ধরে নিয়েছি কাজের সুবিধার জন্য। আপনি বলবেন, কেন আমরা এভাবে ধরে নিয়েছি? উত্তরে বলব, সুবিধার জন্য।

অতএব সিদ্ধান্ত দাঁড়াল: সুবিধার জন্যও ধরে নিতে হয়। আর এই ধরে নেওয়াটাই অসংখ্য প্রমাণের ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়।

বিজ্ঞানের গতি-প্রকৃতি

পুরাকালে যেমন ঋষিবাক্যকে বেদবাক্য বা অকাট্য বলে মেনে নেওয়া হত—তেমনি বিজ্ঞানের রায়কেও কিছুদিন আগ পর্যন্ত সকলে বিনা প্রশ্নে মেনে নিত। এইজন্য ঢেউতত্ত্ব, পরমাণুতত্ত্ব, তুলনি (আপেক্ষিক) তত্ত্ব, বিবর্তনতত্ত্ব ইত্যাদিকে বিনা দ্বিধায় দুনিয়াভর মানুষ মেনে নিত। এর কারণ বিজ্ঞানী আর সাধারণ মানুষের ধারণা ছিল বিজ্ঞান যা করে—বাস্তব নিয়েই করে। এই জন্য বিজ্ঞানীর সিদ্ধান্তে ভুল থাকতে পারে না।

বিজ্ঞান সম্পর্কে বিজ্ঞানী ও সাধারণ মানুষের আর একটি ধারণা ছিল: বিজ্ঞানের দ্বারা সব কিছু সম্ভব। এইজন্য অন্য কোন শক্তি মেনে নেওয়ার দরকার নেই।

বিজ্ঞান সম্পর্কে এ দুটি ধারণা (ধরে নেওয়া) মানুষকে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে সন্দিহান করে তোলে।

কিন্তু এ দুটি ধারণা কি এখনো টিকে আছে?

টিকে নেই। নেই এইজন্য যে বিজ্ঞানের এক যুগের অনেক দৃঢ় সিদ্ধান্ত অন্য যুগে মিথ্যা ও ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। অন্যদিকে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কারের এমন পর্যায়ে এসেছেন, যাতে নিত্য রহস্যের আলো-আঁধারে তাঁরা হতভম্ব হয়ে পড়েছেন। বিজ্ঞানী আজ বলছেন: বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আমাদের

অনেক দূর এগিয়ে নিতে পারলেও তা এমন পর্যায়ে নিয়ে হাযির করে যেখানে আমরা খেই হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হই। বিজ্ঞানীরাই আজ বলছেন ঃ কোন বিজ্ঞানীর পক্ষে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়।

বিজ্ঞানের আলোচনার শেষে একটি কথা বলে রাখা ভাল। বস্তু সম্বন্ধে যে ধারণা আগে ছিল তা বদলে গেছে। আমরা যা দেখি তা বস্তুর বাহ্যিক ছায়া মাত্র। রং, কাঠিন্য, গন্ধ ইত্যাদি কিছুই বস্তুর মৌলিক অস্তিত্বে বিদ্যমান নেই। বস্তুর অদৃশ্য কণাগুলির বিভিন্ন অবস্থিতি ও যোজন বিভিন্ন গুণের দুর্বোধ্য খেলা দেখায়। আমরা যা দেখি তা সিম্বল (symbol) মাত্র। কাজেই বস্তুর মৌলিক রূপ পাঁচ-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বোঝা সম্ভব নয়।[১]

অন্যদিকে অসীম বিশ্বের অতি নগণ্য ও সামান্য অংশ মাত্র আমরা দেখে থাকি। কোটি কোটি জগৎ নিয়ে গঠিত এই মহাবিশ্ব অসীমে ছড়িয়ে আছে। যা আমরা দেখি তা বিশ্বের কণা মাত্র।

তাই বলতে হয় ঃ বিশ্বের সূক্ষ্ম ভাগ কিংবা বৃহৎ ভাগ কোনটারই ব্যাপক রূপ পাঁচ-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা পাই না। তাই ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করলে বিশ্বের সামান্য অংশ মাত্রও আমাদের ধারণায় আসে না। আর যা আসে তার সাথে কল্পনা, অনুভূতি, উপলব্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তির মত অদৃশ্য ভাব ও ভাবনা যোগ না করলে কিছুরই প্রকৃতির আঁচ পাওয়া সম্ভব নয়।

আল্লাহ্ নেই—প্রমাণ কি ?

আল্লাহ্ নেই তার প্রমাণ কি ? বড় প্রমাণ দেওয়া হয় ঃ আল্লাহ্‌কে আমরা তো দেখি না—তার কথা শুনি না—তাকে পাঁচ-ইন্দ্রিয়ের কোনটা দিয়েই অনুভব করতে পারি না।

এটা হল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণের কথা। আমরা কিন্তু আগেই দেখেছি মৌলিক বস্তু-জগৎ ও মনোজগতকে পাঁচ-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ধরা অসম্ভব। তাই বলে এগুলিকে মিথ্যা বলার মত অবৈজ্ঞানিক আর কিছুই নয়।

আর এই সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য জগত সম্বন্ধে সুনিয়ম ধারণা ও জ্ঞান পেতে হলে দরকার ধরে নেওয়ার বা কল্পনার সাহায্য নেওয়ার। এভাবেই আমরা পাঁচ-ইন্দ্রিয়ের বাইরের জগতের প্রকৃতি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করতে পারি। অন্য কথায় বলা যায়, কল্পনা ছাড়া এ সম্পর্কে কোন দার্শনিক যুক্তি বা বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সম্ভব নয়।

১. বিজ্ঞান অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

এ কথাও সত্য যে, আল্লাহ্ যে মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন তার কোন সরাসরি প্রমাণ নেই। কিন্তু সেই সাথে একথাও মনে রাখতে হবে যে, যে ঢেউ-তত্ত্ব, নীহারিকা-তত্ত্ব, বিস্ফোরণ-তত্ত্ব কিংবা বিবর্তন-তত্ত্ব দ্বারা সৃষ্টির ধারা বর্ণনা করা হয়—তারও কোন সরাসরি প্রমাণ নেই। অথচ এ সমস্ত তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক বলে স্বীকৃতি পেয়ে আসছে। কাজেই প্রমাণিত হয়, পাঁচ-ইন্দ্রিয়ের ধারণাই বড় কথা নয়, তার বাইরেও অনেক কিছুর অস্তিত্বের যৌক্তিক বিবেচনাই বড় কথা। নতুবা আমাদের জ্ঞান জগৎ নিতান্ত সীমিত হয়ে থাকবে—সেই আদিম বর্বর যুগের স্তরে।

এসব যৌক্তিক কারণে অনেক লোক নাস্তিক না হয়ে হয়েছেন সন্দেহ-বাদী (agnostic)। এরা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে স্বীকার করেন না—অস্বী-কারও করেন না। এদের মতে, আল্লাহ্ থাক না থাক—এ নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই আমাদের। এতে আমাদের জীবন-ধারণে কোন প্রকার বিঘ্ন ঘটছে না। ফল কথা, আল্লাহ্ আছে কি নেই—এর কোন সরাসরি প্রমাণ পায়নি বলে অনেকের মধ্যে সন্দেহবাদের সৃষ্টি হয়েছে।

২

সৃষ্টি সম্পর্কিত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব

সৃষ্টির আদি কারণ জানার আগ্রহ মানুষের চিরন্তন। এই খাতে বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের নিত্য-নতুন প্রচেষ্টার ইতিহাস খুবই চমকপ্রদ। নীহারিকা-কল্পনা (Nebular Hypothesis) ও ডারউইনের বিবর্তন-তত্ত্ব (Darwin's Theory of Evolution) সৃষ্টির অনেক কিছু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে।

আল্লাহ্ নেই—একথা কেউ প্রমাণ করতে না পারলেও এই দুইটি তত্ত্ব নাস্তিকতাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে।

বিকাশ-তত্ত্ব

ফরাসী চিন্তাবিদ বাফন (Buffon) অনেক অনেক আগে বিরাট ধূমকেতুর আঘাতে সূর্য হতে খণ্ড বিচ্ছিন্ন হয়ে গ্রহ উপগ্রহ সৃষ্টির তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন।

কিন্তু এ বিরাট ঘটনা ঘটানো ছোট ধূমকেতুর পক্ষে সম্ভব নয় ভেবে পরবর্তীকালে এ তত্ত্বকে সংশোধন করা হয়। সংশোধনে বলা হয়, সুদূর অতীতে হয় তো আর একটা তারা (প্রায় সূর্যের মত বড় আকারের) সূর্যের কাছে আসাতে সূর্যে যে বিকাজ (reaction-বিক্রিয়া) ঘটে তাতে সিগার আকারের গ্যাসীয় পদার্থ সূর্য থেকে (উভয় দিকে) বের হয়ে আসে এবং তা খণ্ড খণ্ড জমে গিয়ে গ্রহ-উপগ্রহে রূপান্তরিত হয়।

কিন্তু কল্পনা-নির্ভর এ তত্ত্বও বলতে পারে না যে, মহাবিশ্বের কোটি কোটি তারায় গড়া ছায়াপথের বিশ্বে একটি তারা কেন এভাবে এগিয়ে এল সৌরজগৎ তৈরীর কাজে। তাই এ তত্ত্ব সম্বন্ধে নানারূপ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন বিজ্ঞানীরা।

নীহারিকা-তত্ত্ব

সেই অজানা কোটি কোটি বছর আগে কোন কারণে মহাকাশের নীহারিকা[১]

---

১. সুদূর মহাকাশের গ্যাসীয় জগত।

একত্রিত হয়ে কুণ্ডলী পাকাতে থাকে। কুণ্ডলী পাকাবার সময়ে নীহারিকা ঘন হয়ে সংকুচিত হতে থাকে এবং সাথে সাথে কৌণিক ভরবেগের নিয়মে ঘূর্ণন বেগ বাড়তে থাকে। এইভাবে মূল নীহারিকা সূর্যের রূপ লাভ করে। আর ঘূর্ণন-ধারার নীহারিকা-বাষ্পের কোন কোন অংশ সংকুচিত হতে না পেরে রিং-এর আকারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ও একীভূত হয়ে স্বীয় ঘূর্ণন সৃষ্টি করে। এ নিয়মে গ্রহ ও গ্রহ থেকে উপগ্রহ সৃষ্টি হয়। পৃথিবী ঠাণ্ডা হ'লে জীবের উৎপত্তি হয়। এ তত্ত্ব পরিবেশন করেছিলেন বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক এমানুয়েল কান্ট ও ফরাসী অঙ্কবিদ ল্যাপলাস।

আলোচনা

এসব কল্পনায় সৌরজগতের— বিশেষ করে সূর্য ও পৃথিবীর সৃষ্টি কিরূপে হয়েছে তা ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হয়েছে। এতে অনেকগুলি 'ধরে নেওয়া' কল্পনা রয়েছে। ধরে নেওয়া হয়েছে যে, পয়লা, আদিতে বস্তু ছিল নীহারিকা আকারে। দোসরা, কোন কারণে নীহারিকা ঘুরছিল। তেসরা, ঘূর্ণনকালে কোন কোন অংশ রিং-এর আকারে বিচ্ছিন্ন হল। চৌঠা, পৃথিবী ঠাণ্ডা হলে কোন কারণে জীবের উৎপত্তি হল—ইত্যাদি।

পৃথিবী সৃষ্টিরও কোটি কোটি বছর আগে—সেই আদিকালে জীবন বলতে যখন কিছুই ছিল না—তখন যে এরূপটিই ঘটেছে তা হল নিছক কল্পনা। তা দেখার, শোনার বা সে বিষয়ে কোন ইতিহাস পাওয়ার সূত্র (reference) আজ আর নেই। তবু বিজ্ঞানীরা একে সত্য বলে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু নীহারিকার গ্যাসের ঘূর্ণন লক্ষ্য করে, তার বেগ মেপে দেখা গেছে— কান্ট-ল্যাপলাসের তত্ত্ব অনুসারে সূর্যের ঘূর্ণনকাল হওয়া উচিত ½ দিন। কিন্তু বাস্তবে তা পাওয়া গেল ২৬ দিন। এই বিরাট পার্থক্য থেকে প্রমাণিত হয় এইরূপ নীহারিকা-তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক বিচারে অচল।

ভন ইউজেকারের শিমবীচি-কল্পনা

১৯৪৪ সনে জার্মান জ্যোতির্বিদ তাঁর নিয়মিত (regular) শিমবীচি কল্পনা (Kidney Bean Hypothesis) পেশ করেন। তিনি আংকিকভাবে

দেখান, সূর্যের চারিদিকে নীহারিকার গ্যাসীয় কণাগুলি ৫টি শিমবীচির

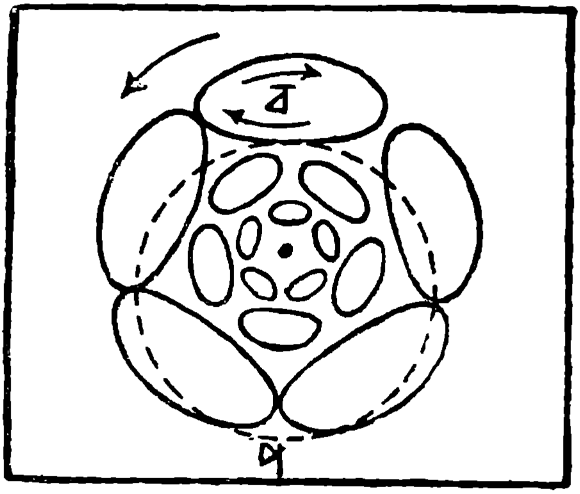

শিববীচি কল্পনা

আকারে কক্ষপথের নির্দিষ্ট দূরত্বে ঘুরতে থাকে। এই ঘূর্ণনে গ্যাসীয় কণাগুলি উপলেপের মাধ্যমে (by accretion) একত্র হয়ে গ্রহ সৃষ্টি করে।

কুইপারের তত্ত্ব

কুইপার বলেন, শিমবীচির কক্ষগুলি ছিল নিয়মিত নয়—অনিয়মিত।

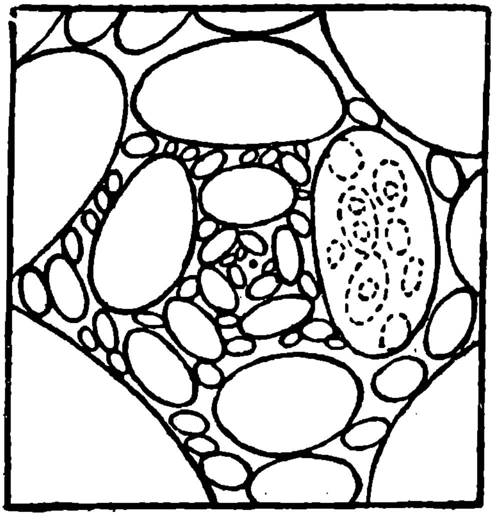

কুইপারের তত্ত্ব

তিনিও নীহারিকা থেকেই সূর্যের উৎপত্তি বলে ধরে নেন। তিনি কিন্তু গ্যাসীয় পদার্থের কণার একত্র হওয়াকে গ্রহের উৎপত্তি বলে মেনে নেন নি। তিনি মনে করেন, নীহারিকার থালায় গ্যাসের ঘূর্ণনে দুটো উল্টো বল কাজ করে—একটা হল উহার নিজের আকর্ষণ— আর অন্যটি হল সূর্যের মধ্যাকর্ষণ। নিজের আকর্ষণ একত্র করতে চায়—আর সূর্যের আকর্ষণ বিচ্ছিন্ন করতে চায়। যদি এই গ্যাসের ঘনত্ব যথেষ্ট হয় তবে এর আকর্ষণ প্রবল হয়—আর ঘূর্ণনশীল বস্তু গ্রহ আকারে দেখা দেয়। গ্রহের চারিদিকে গ্যাসীয় রিং উপগ্রহের সৃষ্টি করে—ইত্যাদি।

কুইপারের মতে ৪টা স্তরে এই গঠন চলে ঃ

১. নীহারিকার নমুনা-সূর্যে পরিণতি, এই সময় সূর্যের চারদিকে ঘূর্ণনশীল নীহারিকার রিং তৈরী হয়। তখন সূর্যের আলো ছিল না।

২. সূর্যের ঘূর্ণনশীল নীহারিকার রিং থেকে নমুনা-গ্রহ সৃষ্টি। রিংটা দুভাগে ভাগ হয়—ভিতরের ভাগ থেকে হয় পৃথিবী সহ ৪টি গ্রহ, আর বাইরের ভাগ থেকে হয় অন্য ৪টি গ্রহ।

৩. এই স্তরে সূর্য আলো বিকিরণ করতে থাকে। এতে অন্যান্য ঘটনা ঘটে।

৪. সূর্যের বিকিরণ ও নীহারিকার-রিং-এর বিকাজে (reaction) হালকা বাষ্প দূরে চলে যায়—এতে সূর্যের কাছের গ্রহদের হালকা গ্যাস হারানোর ফলে তাদের ঘনত্ব বেড়ে যায় ইত্যাদি।

এই তত্ত্ব ধূমকেতু সৃষ্টির পদ্ধতিরও বর্ণনা দেয়।[১]

হোইলির কল্পনা

বৃটিশ জ্যোতিষ-পদার্থবিদ হোইলি ১৯৫০ খৃস্টাব্দে তাঁর বিশ্ব-প্রকৃতি নামক (Nature of Universe) দুটি যমজ তারা হতে সূর্যের উৎপত্তি বলে কল্পনা করেন। এর মধ্যে একটির বিস্ফোরণে গ্রহাদি সৃষ্টি আর অন্যটি মূল সূর্য হিসাবে গড়ে ওঠে।

হোইলি কিন্তু নিজের এই কল্পনা ত্যাগ করেন ১৯৫৫ সনে 'জ্যোতি-বিদ্যার সীমারেখা' (Frontiers of Astronomy) নামের আর একটি বইতে।

১. Planets, Stars and Galaxies by Inglis (1963 Edition).

তিনি আবার নীহারিকার উপর নির্ভর করেছেন। তিনি বলেন : নীহারিকার সংকোচনে হয় সূর্যের উৎপত্তি। পয়লা হয় একটি নিউক্লিয়াস ও গ্যাসীয় থালা। পরে সূর্যের ও সম্ভবত পাশের তারকার আলোর বিকিরণ-চাপে গ্যাসীয় থালা দূরে নীত হয়। এই সময় সহজে জমার মত বস্তু নিয়ে মঙ্গল ও অন্য তিনটি ভিতরিক গ্রহ গড়ে উঠে। ভারি বস্তু নিয়ে প্রথমে গঠিত হয় বলে পৃথিবীসহ আভ্যন্তরীণ গ্রহগুলির ঘনত্ব হল বেশী, আর হালকা আরো দূরে-সরে যাওয়া গ্রহগুলির ঘনত্ব হল কম ইত্যাদি।

হোইলির সাথে ভন উইজেকার ও কুইপারের তত্ত্বের কোন কোন খানে মিল দেখা যায়।

আলোচনা

হালে আরো বহু নতুন তত্ত্ব দেবার চেষ্টা হয়েছে। বলা বাহুল্য, উপরে বর্ণিত সবকয়টি তত্ত্বই কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। নানারূপ কল্পনার সাহায্যে কোটি কোটি বছর আগে সৌরজগৎ সৃষ্টির ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টাই এ সবের মূল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যতই অবান্তর হউক না কেন মানুষের মন— বিজ্ঞানীদের মন চায় কোন ঘটনা বা বস্তুর আদি কারণ জানতে। কারণ না জানা পর্যন্ত তার শান্তি নেই। কারণ জানতে গিয়ে তাই বেশীতম যুক্তিতত্ত্বকে সে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বলে মেনে নেয়।

এই নতুনতর যুক্তির আলোকেই নাস্তিকদের এই অতি আদরের তত্ত্বগুলি আজকাল অযৌক্তিক বলে বর্জিত হচ্ছে।

বিবর্তন-তত্ত্ব

মূল ডারউইন-তত্ত্বের অনেক ভুল ধরা পড়েছে। সেগুলি সংশোধনের পর নতুনতর রূপ নিয়েছে। এই তত্ত্বে বলা হয় যে, সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর পৃথিবী এমন অবস্থায় আসে যখন জীব সঞ্চারের উপযোগী হয়। পয়লা জেলীর মত সরল জীবের উৎপত্তি হয় পানিতে। পরে ক্রমশ প্রয়োজন ও পরিবেশের প্রভাবে এক জীব হতে অন্য উন্নতর জীবে পরিণতি ঘটতে থাকে—ধীরে ধীরে লাখ লাখ বছর ধরে—অজ্ঞাতসারে। আজকের যে মানুষ বা জীবজন্তু—তা সবই সে সরলতম প্রাণীর বিবর্তিত সংস্করণ মাত্র। মানুষ ইত্যাদি হল শেষ অবস্থা। এইভাবে এক একটা শ্রেণীর শেষ অবস্থায় পরিণতি ঘটে। আর এরূপ পরিপূর্ণ শেষ অবস্থা পেলে ঐ শ্রেণী পৃথিবী

থেকে লোপ হয়ে যায় ইত্যাদি।[১] বলা বাহুল্য, বর্তমানে ডারউইনতত্ত্বের বহু অংশ ভুল প্রমাণিত হয়ে সংশোধিত হয়েছে।[২]

আলোচনা

এতেও ধরে নেওয়া হয়েছে জীবের বাঁচার অনুকূল ঠাণ্ডা অবস্থা হলে জীবের উদ্ভব হয়—প্রয়োজন ও পরিবেশের তাগিদে এক শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীতে জীবের পরিবর্তন হয়—সে অবস্থান্তরেরই শেষ অবস্থা মানুষ ও এ যুগের অন্যান্য অনেক জীবজন্তু। শেষ অবস্থা গেলে একটি শ্রেণীর বিলুপ্তি ঘটে, ইত্যাদি।

মজার কথা এই যে, যে কয়টি তত্ত্বের সংক্ষিপ্তসার আমরা পেশ করলাম—তাকে ভিত্তি করে নাস্তিকতা দাঁড়িয়ে থাকলেও তত্ত্বগুলি আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে অপ্রমাণিত করেনি। বরং নীহারিকা বা সূর্য-তারকার সৃষ্টি হল কিভাবে—কিভাবে বিভিন্ন প্রাকৃতিক আইনের উৎপত্তি হল আর কেনই বা জীব-জগৎ অজান্তে এক শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীতে বিবর্তিত হল, একটি বিবর্তনের দ্বারা শেষ অবস্থায় গেলে তা বিলুপ্ত হয় কেন, এর মূল কারণ কি—ইত্যাদির সঠিক ব্যাখ্যাও এই সব তত্ত্ব দিতে পারে নি। ব্যাখ্যা দিতে পারে নি বলেই বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের মনে সৃষ্টিকর্তার ধারণা সব সময় উঁকি দিয়ে ফিরেছে।

এ তো সত্য, কিন্তু আল্লাহ্‌র অস্তিত্বেরই বা প্রমাণ আছে কি? এই প্রশ্নই আমরা পরের পাঠে আলোচনা করব।

---

১. ডারউইন-তত্ত্বের বিস্তারিত আলোচনার জন্য বিবর্তনবাদ ও আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব অধ্যায়টি দেখুন।

২. H. H. Newman, Evolution, Genetics and Eugenics, P. 8.

আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের যৌক্তিকতা

বিভিন্ন সৃষ্টিতত্ত্ব

বিজ্ঞান আজ সমস্ত প্রমাণের দিশারী হয়ে উঠেছে। তাই বিজ্ঞান ও যুক্তিকে নির্ভর করেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। কিন্তু একথাও আমরা যেন না ভুলি যে, যুক্তি-প্রমাণ বা বিজ্ঞান সব সময় চোখে-দেখা কানে-শোনা বিষয় নয়। আরো দেখেছি বৈজ্ঞানিক প্রমাণেও অপরিহার্য হয়ে পড়ে কল্পনা ও ধরে-নেওয়াকে।

সে যাই হোক, আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমাণের যে সমস্ত পদ্ধতি বা তত্ত্ব দেওয়া যায় সেগুলিকে নীচের নামে লেখা যায়ঃ

১. অভিজ্ঞতা-ব্যাখ্যা তত্ত্ব (Experience-Explanation Theory)
২. অনুভূতি ও মনস্বভাব তত্ত্ব (Theory of Feeling and Nature of Mind)
৩. আবশ্যকতা ও নৈতিকতা তত্ত্ব (Theory of Necessity and Morality)
৪. পূর্ণতা-তত্ত্ব
৫. অসীমতা-তত্ত্ব ইত্যাদি।

এর মধ্যে অভিজ্ঞতা-তত্ত্ব প্রধানত বিজ্ঞান-নির্ভর। আমরা সে তত্ত্বই আগে আলোচনা করব।

অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা তত্ত্ব

অভিজ্ঞতা-তত্ত্ব বিজ্ঞানকে নির্ভর করে। এইজন্য বিজ্ঞানের কাজ বা ফাংশান কি তা জানা দরকার।

বিজ্ঞানের কাজ হল দু'টি :

১. কোন ঘটনাকে (phenomenon) সকল উপায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা দেখে তার রূপ নির্ণয়।
২. সে নির্ণীত ঘটনাকে কার্যকারণ সম্বন্ধ দ্বারা ব্যাখ্যা।[১]

---

১. শুধু দেখলেই বিজ্ঞানের কাজ শেষ হয় না। তার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যাও দিতে হয়। সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা দেখেন—সাধারণ মানুষও দেখে। বিজ্ঞানীরা এই গ্রহণগুলির সঙ্গত কারণ ব্যাখ্যা করতে পারেন বলেই তাঁরা বিজ্ঞানী।

কোন দেখা ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার জন্য বিজ্ঞান নীচের তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে—

ক. প্রাকৃতিক আইন (Law)

যেমন ঃ কোন বস্তুর নীচে পড়ার ঘটনাকে মাধ্যাকর্ষণ (মহাকর্ষ আইন) দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়।

খ. তত্ত্ব (Theory)

যেমন ঃ ঢেউতত্ত্ব, ডারউইন-তত্ত্ব, পরমাণু-তত্ত্ব-(Atomic Theory) ইত্যাদি দ্বারা সৃষ্টির ধারা ও পরমাণু গঠন ব্যাখ্যা করা হয়।

গ. কল্পনা (Hypothesis)

যেমন ঃ নীহারিকা কল্পনা, এভগাড্রোর কল্পনা (Avogadrors' Hypo, thesis) ইত্যাদি। ঢেউতত্ত্ব, ডারউইন-তত্ত্ব ইত্যাদির মধ্যে বহু কল্পনা ও 'ধরে নেওয়া' লুকিয়ে আছে।

বলা বাহুল্য, এই তিনটি বিষয়ের সাহায্য ছাড়া বিজ্ঞান এক পা-ও এগুতে পারে না।

এভগাড্রোর কল্পনা রসায়ন বিজ্ঞানের পরম সম্পদ। একে ভিত্তি করে রসায়নের বহু নিয়ম ও তথ্যের আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। যেমন ঃ

১. ইহা অণু ও পরমাণুর পার্থক্য স্পষ্টভাবে ধরে দিয়েছে।
২. হাইড্রোজেন, অক্সিজেন প্রভৃতি গ্যাস যে দুই-পরমাণুক (diatomic) তা প্রমাণ করেছে।
৩. গ্যাসের আণবিক ওজন যে এর ঘনত্বের দু'গুণ তা প্রমাণ করেছে।
৪. আদর্শ তাপন (উষ্ণতা) ও চাপে গ্যাসের ১ গ্রাম অণুর আয়তন যে সব সময় সমান অর্থাৎ ২২.৪ লিটার তা প্রমাণ করেছে।

আইন, তত্ত্ব ও কল্পনা ছাড়া বিজ্ঞানীরা এগুতে পারে না—একথার মানে হল ঃ বিজ্ঞানীরা সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান নন। তাঁদের জ্ঞান ও শক্তি সীমিত বলে তত্ত্ব ও কল্পনার আশ্রয় ছাড়া তাঁদের এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব। শুধু বিজ্ঞান কেন—দর্শন, অর্থনীতি ইত্যাদি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখাতেও তত্ত্ব ইত্যাদির গুরুত্ব ও মূল্য অপরিসীম। তত্ত্ব ও কল্পনার সাহায্য ছাড়া ভবিষ্যতে কোনদিন জ্ঞানের কোন শাখা এগিয়ে যেতে পারবে বলেও কোন বিজ্ঞানী বা দার্শনিক চিন্তা করেন না।

বিজ্ঞানীদের জ্ঞান ও শক্তি সীমিত বলেই মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন তাঁর 'আমার জীবনের শেষ বছরগুলি থেকে' (Out of My Later Years) বলেছেন—জ্ঞানের অনুশীলনে আমরা আমাদের অস্তিত্বের যৌক্তিক ধারণার শেষ সীমায় এসে পড়ি। অন্য কথায়, আমরা এমন অবস্থায় এসে পড়ি—যখন আর যুক্তি চলে না। কাজেই আমরা একটা মহাসত্যে পেঁাছলাম। সেটা হল ঃ

বিজ্ঞানীর (সুতরাং যে কোন মানুষের) জ্ঞান ও শক্তি অসীম নয়—অতিশয় সীমিত।

এবার বিজ্ঞানের প্রথম কাজ সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। জ্ঞান অর্জনের পয়লা থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত চিন্তাবিদ ও বিজ্ঞানীরা যা কিছু আবিষ্কার করেছেন—তাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

১. বস্তু[১] ও শক্তি (Mass & Energy)

২. আইন বা বিধি (Law)

৩. সাজানো অবস্থা (Arrangement)

পদার্থিকা, রসায়ন, জীববিদ্যা যাই বিবেচনা করি না কেন সবখানেই বিজ্ঞানীরা বস্তু ও শক্তি অবলোকন করে থাকেন। আর বস্তু ও শক্তি যে আইনের অধীনে কাজ করে তা আবিষ্কার করে থাকেন।

বিজ্ঞানের বড় আবিষ্কার হল— কি এটমের ভিতরকার সূক্ষ্মতর অবস্থা, আর কি মহাকাশের বড়তর অবস্থা - সবখানেই রয়েছে সাজানো অবস্থা ও বিন্যাস।

সূর্য ও তার চারিদিকের গ্রহ-উপগ্রহ যেমন নিখুঁতভাবে সাজানো আছে, তেমনি আছে সূর্যের চাইতেও বড়—কোটি কোটি তারকা মহা বিশ্বের সবখানে। আর এই সবগুলি মেনে চলছে কতকগুলি প্রাকৃতিক আইন।

অপরদিকে ক্ষুদ্রতর অণু-পরমাণুর ভিতরের ইলেকট্রন প্রোটন, ইত্যাদিও সুশৃঙ্খলভাবে রয়েছে সাজানো। আর তাদের গতি ও স্থিতি সর্বদাই প্রাকৃতিক আইনে নিয়ন্ত্রিত।

এক্সরে দিয়ে দানাদার পদার্থ পরীক্ষা করে দেখা গেছে, অণুপরমাণুগুলি মিলিতভাবে বিশেষ আঙ্কিক নিয়মে সুন্দর ও সুবিন্যাসে সাজানো রয়েছে।

---

১. বুঝার সুবিধার জন্য ভরকেই (mass) আমরা এখানে বস্তু রূপে বর্ণনা করেছি।

প্রতিটি জীবের বিভিন্ন অংশে ও সিসটেমে (system) থাকে এইভাবে চমকপ্রদভাবে সাজানো বিন্যাস। বিজ্ঞান সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর যন্ত্রের ও তত্ত্বের সাহায্যে এই বিন্যাসকে আবিষ্কার করে চলেছে।

বস্তু, শক্তি, আইন ও সাজানো অবস্থা সম্পর্কে বিজ্ঞানের এই যে আবিষ্কার—এর কার্যকারণ ব্যাখ্যা দেওয়া বিজ্ঞানের দ্বিতীয় কাজ।

এ সম্পর্কে আপনাআপনি প্রশ্ন জাগে ঃ

ক. বস্তু বা শক্তি এল কোথা থেকে?—বস্তু বা শক্তি বিশেষ গুণ সম্পন্নও বা হল কিরূপে?

খ. পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের দ্বারা যে সমস্ত প্রাকৃতিক আইনের আবিষ্কার হয়েছে সেগুলির মূল ও নিয়ন্তা কি? আর কেনই বা বস্তু ও শক্তি নির্দিষ্ট আইন মেনে চলে? আমরা বুঝি, যে কোন আইন একটি সুশৃঙ্খল শক্তির অস্তিত্ব প্রমাণ করে (Law Presupposes an organized power)। সে সুশৃঙ্খল শক্তি কি?

গ. বস্তুর বা বস্তুকণার সাজানো বিন্যাস (arrangement) কি করে ঘটল? সাজানো অবস্থা পরিকল্পনা ছাড়া সম্ভব নয়। পরিকল্পনা আবার মন ছাড়া হয় না। (কারণ arrangements presuppose planning and planning presupposes mind)।

এই প্রশ্নগুলির জওয়াব বিজ্ঞানকে দিতে হবে। না হলে বিজ্ঞানের দ্বিতীয় কাজ অপূর্ণ থাকে। আর এরূপ অপূর্ণ জ্ঞান বিজ্ঞানই নয়। এই প্রশ্নগুলির সম্মুখীন হয়েই তিনটি দল সৃষ্টি হয়েছে।

১. সন্দেহবাদী

২. আস্তিক

৩. নাস্তিক

সন্দেহবাদীরা বলেন ঃ এইসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দরকার নেই। উত্তর না দিলেও আমাদের জীবনধারণের কোন অসুবিধা হয় না। এই সবের সৃষ্টির কারক বা আল্লাহ্ থাকুক-না-থাকুক তা নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই। তাঁরা বলেন, আল্লাহ্ থাকতেও পারেন, নাও থাকতে পারেন—তা নিয়ে মাথা খারাপ করার কি আছে।

এঁরা নিজেদের খুব বুদ্ধিমান বলে মনে করেন বটে, কিংবা এ বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না তাও বটে—কিন্তু বাস্তবত এই প্রশ্ন হতে মুক্ত হতে পারেন না। কারণ মনের স্বাভাবিক ধর্ম হল জানার তাগিদ, জ্ঞান লাভের এটাই চাবিকাঠি। সে তাগিদ চাপা প্রশ্নকে উজ্জীবিত করে তোলে বারবার।

সে যাই হোক, এদের দৃষ্টিভঙ্গী কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত নয়। কারণ, বিজ্ঞান চায় যথাসম্ভব সবকিছু জানতে ও ব্যাখ্যা করতে। অজানাকে জানার আর অচেনাকে চেনার আগ্রহ যদি না থাকত, তবে বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্ভব হত না। সন্দেহবাদীরা অজানাকে জানতে ভয় পায়, তাই তাঁরা ভীত। তাঁরা সমস্যাকে এড়িয়ে চলতে চায়—তাই তাঁরা পলায়নী মনোবৃত্তিসম্পন্ন (escapist)। অন্যদিকে তাঁরা এগুতে চান না—তাই তাঁরা রক্ষণশীল। তাঁরা বিজ্ঞানের দ্বিতীয় কর্তব্যকে পলায়নী মনোভাবের দ্বারা বাধা দিতে চান—এজন্য এই ক্ষেত্রে তাঁরা বিজ্ঞান-বিরোধীও।

অতএব সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় সন্দেহবাদীরা বিজ্ঞানবিরোধী, ভীতু, পলায়নী এবং রক্ষণশীল। এজন্য তাঁরা বৈজ্ঞানিক যুক্তি বিচারে টিকতে পারেন না।

প্রশ্নগুলির উত্তর দেয়ার জন্য আর বাকি থাকে আস্তিক ও নাস্তিকেরা।

নাস্তিকেরা বলেন : এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া উচিত এবং তা তাঁরা দিতে পারেন। তাদের উত্তরে তাঁরা কোন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁরা এজন্য নীহারিকা-তত্ত্ব, বিবর্তন-তত্ত্ব ইত্যাদি দ্বারা সৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করতে চান।

এখন দেখা যাক, নাস্তিকেরা কি বলতে চান। তাঁরা বলেন : আদিতে যে নীহারিকা বা সূর্য ছিল তা থেকে প্রাকৃতিক নিয়মে দুনিয়া ও অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের সৃষ্টি। আবার দুনিয়া সৃষ্টির পর ধীরে ধীরে শীতল হতে হতে এমন অবস্থায় আসে যখন জীবের উদ্ভব হতে পারে। তখনই জেলি জাতীয় সরল জীবনের উৎপত্তি হয় সাগরে। সেই সরল জীবন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমানের জীবজন্তুতে পরিণত হয়েছে। সুতরাং এখানে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব অবান্তর।

বলা বাহুল্য, এগুলি মূলত ডারউইনীয় যুক্তি।

এখন যুক্তিগুলি বিচার করা যাক :

১. সৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করার জন্য এরা কল্পনা ও তত্ত্বের আশ্রয় নিয়েছেন। অনেক কিছু ধরে নিয়েই তাঁরা জীবজন্তুর বর্তমান অবস্থা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।

২. যে তত্ত্ব কয়টির উপর তাঁদের যুক্তি নির্ভরশীল সেগুলিকে যদি আমরা সত্য বা অকাট্য[১] বলে ধরে নেই—তাহলেও আগের প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া হয় না। তত্ত্বগুলি শুধু বস্তুর স্ফুরণের (development) নিয়ম (process) দেখাতে চেষ্টা করে। এতে 'ধরে নেওয়া' হয়—বস্তু ও শক্তি আগে থেকেই ছিল, তাদের যা ধর্ম (properties) তাও ছিল আগে থেকেই। যে আইন বা নিয়মের দ্বারা বস্তু ও শক্তির স্ফুরণ হয় বা নিয়ন্ত্রণ হয় তাও আগে থেকে ছিল। এমন কি যে সুশৃঙ্খল অবস্থায় পদার্থকে দেখা যায় তাও আগে হতে ছিল। কারণ বাষ্পীয় অবস্থাতেও অণু-পরমাণু থাকা স্বাভাবিক ; এবং তার ভিতরে ইলেকট্রন, প্রোটন প্রভৃতি সাজানো অবস্থায় কার্যরত থাকার কথা। বস্তু ও জীব বর্তমান স্তরে কিভাবে এল, তত্ত্বগুলি শুধু তা-ই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। মূল বস্তু ও শক্তি কোথা হতে এল, কিভাবে এল—এদের বিশেষ বিশেষ ধর্মগুলি পেল কোথায়, —আইন বা নিয়মগুলির মূল কি, আইনগুলি নিয়ন্ত্রিত হয় কিসে, সুশৃঙ্খল সংস্থানের পরিকল্পনা করল কে—ইত্যাদি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর তত্ত্বগুলি দিতে পারে নি। তত্ত্বগুলিতে গ্রহ-উপগ্রহের রূপায়ণ ও জীবের রূপান্তর কিভাবে হল, (not creation but transformation) শুধু তারই পথ দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। বস্তু আইন বা সুশৃঙ্খল অবস্থার মূল কারণ এর কোনটিতেই দেখানো হয় নি।

কাজেই বলা যায়, বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত মূল তিনটি বিষয়ের ব্যাখ্যা নাস্তিকেরা দিতে পারেন নি। আর এই ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি বলেই তাদের মতবাদ বৈজ্ঞানিক বিচারে অপূর্ণ রয়ে গেছে।

নীচের ছবিতে সৌরজগৎ ও জীব-জন্তুর উদ্ভবের পদ্ধতি দেখানো হয়েছে। এতে পরিষ্কার বোঝা যাবে, নীহারিকা ও অন্যান্য তত্ত্বে সৌর-জগৎ ও জীবজন্তু কোন্ নিয়মে বর্তমান অবস্থা লাভ করল কল্পনার ও অনুমানের সাহায্যে তা প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে। বস্তু, শক্তি ও আইন সৃষ্টির কোন ব্যাখ্যা তাতে দেওয়া হয়নি।

---

১. বলা দরকার তত্ত্বগুলির নানা রকম মারাত্মক ত্রুটি বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করছেন।

আস্তিকতা

আর বাকি থাকে আস্তিকতা। আস্তিকদের মতে বস্তু, শক্তি ও আইন এবং এদের কাজের ফলে যে সুশৃঙ্খল অবস্থান—তা সবেরই মূল হচ্ছেন আল্লাহ্। আস্তিকেরা যুক্তি দিয়ে বলেন, মানুষের জ্ঞান ও শক্তি অসীম নয়—এজন্য আল্লাহ্ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান মানুষের আয়ত্তের বাইরে। তাদের মতে আল্লাহ্ সৃষ্টিশক্তির মূল—একমাত্র হোতা। সুতরাং বস্তু,

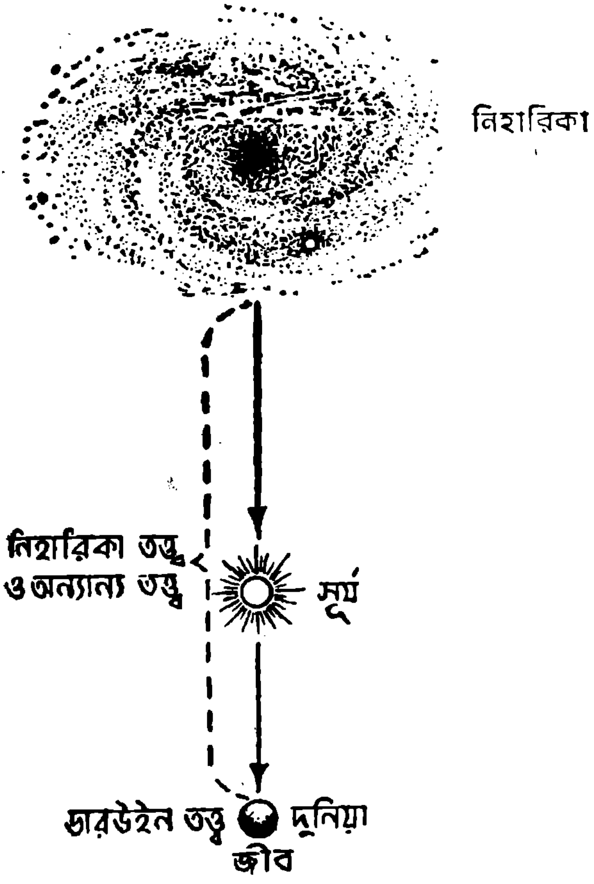

নাস্তিক্য চিন্তাধারার রূপ

শক্তি ও আইন তাঁরই সৃষ্ট। সমস্ত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাও তাঁরই। তাই যাবতীয় প্রাকৃতিক আইনের সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণ তাঁর দ্বারাই সম্ভব। সব

মনের মূলও আল্লাহ্। সুতরাং মূল পরিকল্পনা তাঁরই। ফলে তাঁরই সৃষ্ট শক্তি ও আইনের মারফত বস্তু সাজানো অবস্থায় আসে।

কাজেই বলা যায়, আল্লাহ্-তত্ত্ব স্বীকার করে নিলে বিজ্ঞানের দ্বিতীয় কাজ অর্থাৎ আবিষ্কৃত বিষয়ের সহজ ব্যাখ্যা মিলে।

এখন পাশের ছবি বিবেচনা করা যাক ঃ

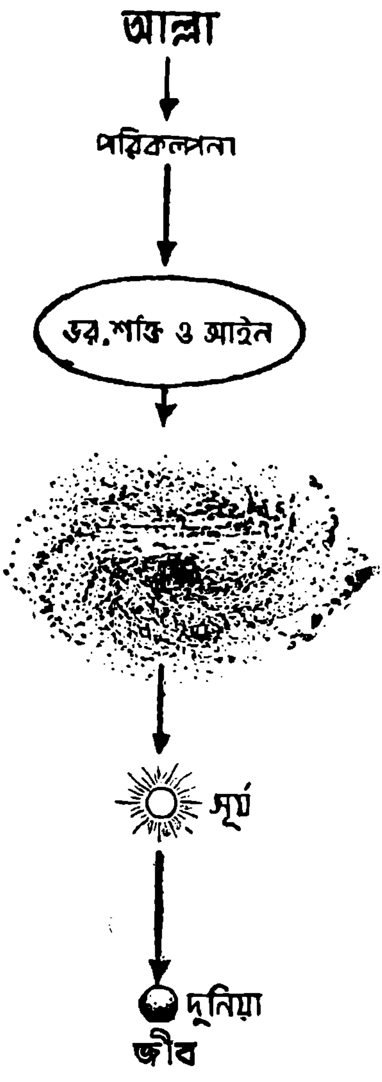

মনে করুন, চিন্ময় আল্লাহ্ তার পরিকল্পনানুসারে ভর (mass) শক্তি ও আইন সৃষ্টি করেছেন—যাতে নীহারিকা বা নেবুলা গঠিত হয়ে আইন ও গুণের প্রভাবে ঘূরন্ত ও উত্তপ্ত সূর্যের উদ্ভব হয়। এরপর অন্য তারার কাছে আসার জন্যই হোক আর যমজ তারার কারণেই হোক কিংবা অন্য কোন রকম বিস্ফোরণের বা ঘূর্ণনের ফলেই হোক, সূর্য হতে কয়েকটি খণ্ড বিচ্ছুরিত হয়ে গ্রহের সৃষ্টি করে। আর একই কারণে গ্রহ থেকে উপগ্রহের উদ্ভব হয়। এরপর পারিপার্শ্বিক অবস্থা জীবন-ধারণের উপযোগী হওয়ার পর আল্লাহ্র আইন অনুসারে জীবও বর্তমানে বিবর্তিত রূপ লাভ করে।

উপরের বর্ণনা হতে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় ঃ আল্লাহ্-তত্ত্ব ছাড়া কোন তত্ত্বই সৃষ্টির সুন্দরতর ব্যাখ্যা দিতে পারে না। এমন কি নীহারিকা-তত্ত্ব, ডারউইন-তত্ত্ব ইত্যাদিকে সত্য বলে ধরে নিলেও সৃষ্টির ব্যাখ্যা অপূর্ণ থেকে যায়, এমন কি যে তরিকায় সৃষ্টি বর্তমান অবস্থা

পেয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়—তার কারণের ব্যাখ্যাও তাতে পাওয়া যায় না। কিন্তু আল্লাহ্-তত্ত্ব মেনে নিলে সৌরজগৎ সৃষ্টি বা বিবর্তনের মূল কারণও সহজে পাওয়া যায়।

এখানে আর একটি কথা বলে রাখা দরকার। বিশ্বে সূর্যের সমান কোটি কোটি তারা মহাকাশে ছড়িয়ে রয়েছে। আমরা কল্পনা করতে পারি, হয়ত এদের অনেকগুলির গ্রহ-উপগ্রহ বিরাজমান রয়েছে। এই যে বিরাট সৃষ্টি—বিজ্ঞান কোন তত্ত্বের দ্বারা এর মূল কারণ নিরূপণ করতে পারেনি। আল্লাহ্-তত্ত্ব মেনে নিলে সব কিছুর সহজ ব্যাখ্যা ধরা পড়ে।

এইভাবে প্রমাণিত হয়ঃ পৃথিবীর ও মহা-সৃষ্টির যাবতীয় বস্তু, শক্তি ও আইনের এবং জীব-জগতের সৃষ্টির কারণ ও পুরো ব্যাখ্যা দিতে পারে একমাত্র আল্লাহ্-তত্ত্ব। এমন কি নীহারিকা-তত্ত্ব বা বিবর্তন তত্ত্বের ব্যাখ্যাও এই আল্লাহ্-তত্ত্ব ছাড়া দেওয়া সম্ভব নয়। অতএব বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত বস্তু ও ঘটনার প্রমাণের জন্য আল্লাহ্-তত্ত্ব অপরিহার্য। আর এজন্যই আল্লাহ্-তত্ত্বও একটি মৌলিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। তাই আস্তিকেরা বলেনঃ আল্লাহ্-তত্ত্ব যাঁরা অস্বীকার করেন তাঁরা বিজ্ঞানের মূল নীতিকেই অস্বীকার করে বসেন।

মানুষের অনুসৃত যুক্তি দ্বারাই উপরের সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়েছে। আগেই আমরা দেখিয়েছি মানুষের যুক্তি নির্ভর করে প্রধানত কার্যকারণ সম্পর্কের উপর। কোন কাজ দেখলেই আমরা ধরে নেই তার কোন কারণ আছে। বস্তু, শক্তি, আইন ও তার ফলে সুশৃঙ্খল অবস্থা—এগুলি বিজ্ঞানের মূল আবিষ্কার। যুক্তি বলে দেয় এগুলির মূল কারণ অবশ্যই আছে। বিজ্ঞান মহাবিশ্বের বিরাট পরিকল্পনা লক্ষ্য করেছে। পরিকল্পনার জন্য চাই মন। কাজেই সৃষ্টির আদি কারণ কোন নির্মন নির্জীব বস্তু হতে পারে না—হতে পারে মহামনের অধিকারী একটি একক সত্তা।

মানব প্রকৃতি ও আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব

মানবের বাস্তব জীবনে অনুভূতির দাম খুবই বেশী। আসলে আমাদের জীবনের শতকরা ৯০ ভাগ কাজ ও চিন্তা অনুভূতির দ্বারা চালিত হয়। অনুভূতি তথা মনের একটি ধারা হল, শ্রেষ্ঠতর অস্তিত্বের প্রতি মাথা নোয়ানো

—সে মানুষ হোক বা অন্য কোন বস্তুই হোক। এইজন্যই দেখি সৃষ্টির আদি থেকে মানুষ তার নিজের চাইতে শক্তিশালী ও জ্ঞানী মনে করে পশু, পাখী, সাপ, চাঁদ, সুরুজ এবং ঝড়-তুফানকে পর্যন্ত পূজা করেছে। তারপর বস্তু ছাড়িয়ে শক্তিশালী ও মহৎ ব্যক্তিদের এবং কল্পিত দেব-দেবতার পূজা শুরু হয়েছে। অধিকতর শক্তিমান ও জ্ঞানবানকে ভক্তি-পূজা করার মনোভাব মানুষের প্রকৃতির মধ্যে বর্তমান। অতীতের পূজা-মনোভাবকে আমরা বর্তমানের মানুষেরা যতই সমালোচনা করি না কেন—এটা ছিল স্বাভাবিক। জ্ঞানের উন্মেষের সাথে সাথে নিম্নতর বস্তু বা জীব থেকে ক্রমশ উচ্চতর বস্তু ও জীব এবং তারও পরে শক্তিশালী মানুষ ও দেবতাদি পূজায় এই মনোভাব বিবর্তিত হয়েছে। এই বিবর্তনের শেষ স্তরে মানুষ বুঝতে পেরেছে: কোন বস্তু, শক্তি বা শক্তিমান মানুষ তাদের চাইতে শ্রেষ্ঠতর নয়। এমন কি সুদূরের চাঁদ-সুরুজও নয়। তাই মানুষ সবকিছুর উপরে মূল স্রষ্টা মহান সত্তার প্রতি তাদের স্বাভাবিক অনুভূতি চালিত করে। এটা মানুষের লাখ লাখ বছরের অনুভূতির বিবর্তনের পরিণতি। অতীতের মহাজ্ঞানী মহাপুরুষ ও পয়গম্বরেরা সৃষ্টির আদি সত্তার অস্তিত্ব জানতেন না তা নয়—তাঁরা এটা যুগে যুগে প্রচার করে গেছেন এবং যাঁরা তাঁদের এই শিক্ষা গ্রহণ করতে পেরেছিলেন তাঁরা তখন থেকেই এক আল্লাহ্য় বিশ্বাস করেছেন। কিন্তু যাঁরা সেই শিক্ষা পাননি বা গ্রহণ করেন নি—তাঁরা অনুভূতির প্রাকৃতিক বিবর্তনের মাধ্যমে ক্রমশ মহাসত্যের পানে এগিয়ে এসেছেন। এই যে শ্রেষ্ঠতর সত্তার প্রতি ভক্তি-অনুভূতি এটা মানুষের মজ্জাগত—এটা যেন সৃষ্টির সাথে জড়িত। শত চেষ্টা করেও মানুষ এই প্রাকৃতিক প্রবণতা থেকে মুক্ত হতে পারে নি। যেখানে মানুষ এই সর্বমহান সত্তাকে অস্বীকার করেছে সেখানে মানুষ আরো নীচে নেমে এসে শক্তিমান মানুষকেই ভয়-ভক্তিতে পূজার বেদিতে বসিয়েছে। ফেরাউন, হিটলার, স্ট্যালিন, বুদ্ধ, যীশু প্রমুখ শক্তিধরদের ও মহৎ ব্যক্তিদের উদাহরণ বিচার করলে এই সত্য পরিষ্কার হবে। আসলে বহু যুগের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে দেখানো যাবে, মানুষকে এই অনুভূতি থেকে সরানোর চেষ্টা যেখানেই হয়েছে সেখানেই মানুষ বিফল হয়েছে—বিফল হয়েছে আরো ক্ষুদ্রতর সত্তার প্রতি ভক্ত হিসাবে মানুষকে দাঁড় করিয়ে। ঐতিহাসিকভাবে এই সত্য প্রমাণ করা যাবে।

অন্যান্য তত্ত্ব

পূর্ণতা-তত্ত্ব

বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে, কোন কিছুই পূর্ণ (perfect) নয়। মানুষ তো নয়ই—মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধিও নয়। অথচ মানুষের মন পূর্ণতার কল্পনা করে, সে অনুভব করে—বিশ্বের মূলে রয়েছে একটা পুরা সত্তা (perfect being)। অপূর্ণতার মধ্যে পূর্ণতার এই যে একটা আকুতি—এটাই আল্লাহর অস্তিত্বের ইংগিত বহন করে।

অসীমতা-তত্ত্ব

মানুষের 'অসীম' বলে একটা ধারণা আছে। অংকে এই ধারণা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। অথচ যা কিছু মানুষের বুদ্ধিতে বাস্তবত ধরা পড়ে—তা সবই সসীম। কাজেই সসীমকে ধারণ করে একটি অসীম সত্তার অবস্থান মানুষের যুক্তিবৃত্তির অনুসারী।

অবিনশ্বরতা

আইনস্টাইনের আপেক্ষিক-তত্ত্ব প্রমাণ করেছে, সবকিছু আপেক্ষিক—একক স্বাধীন (absolute) নয়। এ যেন সব কিছুই স্থান-কালের সৃষ্টি – মায়া। প্রকৃত ও খাঁটি কিছুই নয়। অথচ মানুষের যুক্তিমুখী মন এই মায়ায় প্রশান্তি পায় না। সব যদি মায়াই হল তবে এই সুন্দর, এই বিশাল সৃষ্টির অর্থ কি ! মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি, শক্তি সবই আপেক্ষিক। তাই এ ধারণা একটা একক স্বাধীন সত্তার বিশ্বাসের দিকে মানুষের মনকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

আবশ্যকতা-তত্ত্ব

মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হলেও জন্ম নেওয়ার পর থেকে সে পদে পদে অসহায় অবস্থায় পড়ে। সংসারের বিভিন্ন পরিবেশে রোগে-শোকে, সংগ্রামে-সাধনায় সে পদে পদে অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয়। পদে পদে সে বৃহত্তর শক্তির উপর নির্ভর করতে চায়। কারণ তার শক্তি সীমাবদ্ধ, তার জ্ঞান অনিশ্চিত ও তার সামর্থ্য অতি কম। ভবিষ্যতে কি হবে তা সে নিশ্চিত বলতে পারে না। প্রাকৃতিক ও সামাজিক বহু সমস্যা তাকে এমনভাবে চেপে ধরে যে, সে পথ পায় না—ভরসা পায় না নিজের শক্তিতে। অথচ আপদে-বিপদে, সংগ্রামে-সাধনায় এই ভরসা ভিন্ন সে আত্মবিশ্বাস পায় না—নিরাশার আঁধারে সে হাবুডুবু খায়। শিশুকালে মা-বাপ বড় ভাই-বোনের উপর সে

নির্ভর করে। এরা তাকে আপদে-বিপদে, অভাব-অভিযোগে রক্ষা করবে এই বিশ্বাসে সে অনেকটা নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ বোধ করে—আরো বড় হলে সে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ডাক্তার-বৈদ্য, ধর্মগুরু, সমাজ, রাষ্ট্র সব কিছুর উপর নির্ভর করতে চায়। কিন্তু এমন সময় আসে, এমন বিপদ আসে যখন জাগতিক সব সাহায্য তুচ্ছ ও অকেজো হয়ে পড়ে—সব শক্তি দুর্বল মনে হয়। এমন সময়ও আসে যখন বন্ধু-বান্ধব, রাষ্ট্র সবই তার বিরুদ্ধে কাজ করে—অথচ নির্ভর করার মত কোন জাগতিক শক্তি সে খুঁজে পায় না। এমন রোগ তাকে ধরে যখন চিকিৎসা বিজ্ঞান আর কোন কাজে আসে না। এমন নিরাশ্রয় পরিবেশে সে যদি নির্ভর করার মত কোন বিশ্বাস না পায় তখন তার জীবনের মূল্য সে খুঁজে পায় না। জীবন ও ভবিষ্যত সম্পর্কে তার আশা ও মূল্যবোধ থাকে না, বেঁচে থাকারও কোন মানে খুঁজে পায় না সে।

মনের কতকগুলি গুণ বা স্বভাব আছে। এগুলিকে অস্বীকার করা যায় না। একটি স্বভাব হল ঃ উঁচুতর শক্তি ও উঁচুতর গুণকে সম্মান করা ও ভক্তি করা। বিষয়টি আগেই আলোচিত হয়েছে। মানুষের মন-প্রকৃতির কারণেই দুনিয়ার বড় বড় ধর্মগুলি শত শত বছরের ঝড়-ঝঞ্ঝাট, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিপ্লব পার হয়ে আজো টিকে আছে। খাস রাশিয়াও তাই কয়েক যুগের বৈজ্ঞানিক প্রচার, সমালোচনা ও রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রভাব ও দমননীতি খাটিয়েও ধর্মকে উৎখাত করতে পারে নি আজও। যে জন্য পেস্টারনাকের মত মনীষীর আস্তিক্য পুস্তক বের হয় নাস্তিক্যবাদী রাশিয়ায় এবং কঠোর শাসনেও পোল্যাণ্ডে ধর্মীয় বিস্ফোরণ ঘটে।

আরো দিক আছে। মানুষের মন ও মেধা এত প্রসারিত, এত ব্যাপকতামুখী যে তাঁর জীবন সম্পর্কে সে অতি উঁচু ধারণা স্বভাবতই পোষণ করে। তাঁর প্রকৃতি, তাঁর অন্তর তাকে বলতে চায়—মরণের পরেও সে থাকবে, সংসারে মহা অত্যাচার অবিচার ভোগ করেও সে ভরসা পায় যে পরকালে সে তার সুবিচার পাবে। এই বোধ তাকে শান্ত করে, মহৎ হবার প্রেরণা দেয়, সয়ে নেবার শক্তি যোগায়।

শুধু তাই নয়। আল্লাহ্ ও পরকালের ভয় মানুষকে পাপ ও অনাচার থেকে বহুলাংশে রক্ষা করে—আর মহৎ হতে উদ্বুদ্ধ করে। মনে

রাখতে হবে, মানুষকে মানুষ করার ব্যাপারে ভয় একটা অপরিহার্য বিষয়। ভয় না থাকলে মানুষ হয়তো পশুস্তরে নেমে যেতো। আইনের ভয়, সমাজের ভয় প্রভৃতি আছে বলেই রাষ্ট্র ও সমাজ চালনা সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন সমিতি বা সংস্থা চালনায়, সেনাবাহিনী গঠন ও চালনায়, স্কুল-কলেজ ইত্যাদি পরিচালনায় নিয়ম-শৃঙ্খলা ভংগ করলে ভয়ের কারণ আছে বলেই মানুষ ঠিকমত চলে—ন্যায়সংগত কাজ করে। ভয় না থাকলে কোন সংগঠনই সম্ভব হত না। কাজেই ভয়কে যেন আমরা ভয় না করি -উদারতার যুক্তি দেখিয়ে। আর মানুষ যখন সব ভয় থেকে দূরে গোপনে কোন অন্যায় করতে ব্রতী হয় তখন কেবল আল্লাহ্ ও পরকালের ভয়ই তাকে রক্ষা করতে পারে।

এই ভয় সবাইকে সব ক্ষেত্রে বাঁচাতে পারে তা নয়—তবে অনেক ক্ষেত্রে বাঁচায়। যার মনে আল্লাহ্‌র ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস যত বেশী থাকে ততই তার এই ভয় বেশী থাকে। আর সে কারণে সে ততই অন্যায় থেকে সরে থাকে। অবশ্য তথাকথিত বকধার্মিক বা দুর্বল ধর্মানুসারীদের কথা এখানে বলছি না, বলছি প্রকৃত বিশ্বাসীদের সম্পর্কে। কারণ বকধার্মিক বা দুর্বল ধার্মিকেরা অন্য প্রকার ভয়ের প্রভাবে এই ভয়কে তুচ্ছ করে বহু অন্যায় কাজ করতে পারে। আসলে বিশুদ্ধভাবে আল্লাহ্য় বিশ্বাসের ওপর রাষ্ট্রীয় শাসনমুক্ত—নৈতিকতা শাসিত মহান ভাইয়ালি সমাজ গঠন করা সম্ভব। যদি কেউ রাষ্ট্রীয় শাসনমুক্ত সাম্যবাদী সমাজ পেতে চান তবে একমাত্র আল্লাহ্‌র বিশ্বাসভিত্তিক নৈতিকতার মাধ্যমেই তা সম্ভব—অন্য কোন উপায়ে নয়। কারণ, রাষ্ট্র না থাকলে শাসনের ভয় থাকবে না। আর এই কারণেই নাস্তিকতাভিত্তিক রাশিয়ায় বা অন্য কোন কম্যুনিস্ট দেশে আজ পর্যন্ত কম্যুনিজম কায়েম করা সম্ভব হয়নি।[১]

---

১. কম্যুনিজমের মতেঃ সব ধর্ম ও আল্লাহ্‌য় বিশ্বাস হল চরম কুসংস্কার—শোষকের হাতিয়ার। এমন কি রাষ্ট্রও। এইজন্য কম্যুনিজমের মতে কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠা হলে থানা বা সরকার বলে কিছু থাকবে না।

৩

দর্শন, বস্তুবাদ ও বিজ্ঞান

দুনিয়ার চিন্তাধারার ইতিহাসে বস্তুবাদ ও নাস্তিকতা প্রায় একই সাথে হাত ধরাধরি করে চলে আসছে।

সৃষ্টিকর্তা নেই— এটাই নাস্তিকতার মূল প্রামাণ্য বিষয়। অন্য কথায় বলা যায়ঃ বস্তুই সব কিছুর মূলে। বস্তুই মহাজগতের আদি আর বস্তুই এর অন্ত। এতে সচেতন সৃষ্টিকর্তার কোন প্রয়োজন নেই।

অতীতে ধর্মকে যারা কঠোর মনে করত কিংবা ধর্মীয় জীবন-যাপনকে কণ্টকর মনে করত, অন্য কথায়ঃ যারা খাওয়ায়, বিলাসিতায় ও দুনিয়াবি জাঁকজমকে জীবনকে উপভোগ করতে চাইত, তারাই কমবেশী ধর্মীয় বন্ধনকে ছিন্ন করে নাস্তিকতার পরিবেশ সৃষ্টি করত। মহত্তর জীবনবোধের বিরোধী আর দুনিয়ার বস্তু-উপভোগে মত্ত এইরূপ একদল লোককে তাই বলা হত বস্তুবাদী। পরবর্তীকালে একেই ইতর বস্তুবাদ নাম দেওয়া হয়।

কিন্তু এ ধরনের লোক ছাড়াও আর একদল নাস্তিকতাবাদী লোক ছিলেন, যাঁরা ভোগে নয়, চিন্তাধারায়ও কোন সৃষ্টিকর্তার যৌক্তিকতা বুঝতে পারতেন না। ১৪-১৫শ ঈসায়ী সনের দিকে বিজ্ঞানের অপূর্ব আবিষ্কারে এই চিন্তাধারার লোক এক নতুন যুক্তির সন্ধান পায়। বিজ্ঞানের আবিষ্কার শুধু যে মানুষের বিরাট শক্তির উন্মেষ ঘটিয়েছিল তাই নয়—নতুন নতুন জ্ঞানেরও সন্ধান দিয়েছিল। যে বিষয়ে মানুষ এতদিন ছিল অন্ধকারে, যার কার্যকারণ বোঝা ছিল তার পক্ষে অসম্ভব এবং বহু কিছু কারণ জানত না বলে বহু কুসংস্কারকে সে অলৌকিক শক্তি রূপে কল্পনা করত, তা এখন বিজ্ঞানীর হাতের মুঠোয় সহজভাবে ধরা দেওয়ায় বস্তুবাদীরা ভাবতে লাগল, অলৌকিক শক্তির কল্পনা অবান্তর—অন্ধ কুসংস্কার। মানুষ আগাগোড়া বস্তুনির্ভর, আর অলৌকিক শক্তির আস্তিক্য-কুসংস্কারকে কাটিয়ে উঠে বস্তু-শক্তির জ্ঞান লাভ ও ব্যবহারই মানুষের চরম ও পরম সাধনার বিষয়।

এই সময় থেকে শুরু করে গত শতকের শেষ তক ইউরোপে বিশেষ করে জার্মানী, ফ্রান্স ও বিলাতে একদল বস্তুবাদী দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটে।

এদের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল ঃ একদিকে খ্রীস্ট ধর্ম তথা সমস্ত ধর্ম-বিশ্বাসের অসারতা প্রমাণ ও বস্তু-নির্ভর জীবনের যৌক্তিক গতিধারা নির্ধারণ। এরা মনে করতেন প্রকৃতিই একমাত্র শেষ ও সত্য। এদের মধ্যে বুকনার (Buchner), মলেসকট (Moleschott), ভট ও বওয়ার (Vot & Bawer), ষ্টার্নার (Stirner), নৈরাত্মবাদী বাকুনিন প্রমুখের নাম করা যেতে পারে। এই সময়ের বস্তুবাদকে বলা হয় যান্ত্রিক বা মেকানিস্টিক (Mechanistic) বস্তুবাদ। কারণ বৈজ্ঞানিক অন্যান্য যন্ত্রপাতির মত মানুষকেও তখন এই বস্তুবাদীরা মহত্তর জীব মনে না করে—মনে করতেন বস্তুর উন্নততর বিকাশ- মেশিন বা যন্ত্ররূপে।

অপরদিকে বস্তুবাদের বিপরীত মতবাদ হিসাবে দর্শনের ভাববাদের সৃষ্টি হয়। বস্তুবাদীরা যেমন মনে করতেন বস্তুই সব—ভাববাদীরা মনে করতেন ভাবই (Idea) সবকিছুর মূল। ভাববাদী দলের মধ্যে সব চাইতে নামকরা দার্শনিক হলেন জার্মানীর হেগেল (Hegel)। হেগেল ভাববাদে বিপ্লব আনেন—তার দ্বান্দ্বিকতা ও বিপরীততার (Dialectics) তত্ত্ব পরিবেশন করে। এই মতে প্রত্যেক ভাবে বা কাজে দুইটি উল্টা বিষয় বা বিপরীত যুক্তি থাকে। এই দুই বিপরীত বিষয়ের সংঘর্ষে তেসরা একটি ভাব বা বিষয়ের পরিণতি ঘটে। এইভাবে ভাবের তথা কাজের অগ্রগতি ঘটে।

ইউরোপ যখন হেগেলিয়ান ভাববাদের জোয়ারে ভর্তি তখন ফুয়েরবাক (Feuerbach)[১] নামক আর একজন দার্শনিক বস্তুবাদের জয়গানে ইউরোপে আলোড়নের সৃষ্টি করেন। তিনি বিখ্যাত দার্শনিক হিউম, কান্ট ও হেগেলের মতবাদের বিরুদ্ধে নতুন ধরনের বস্তুবাদের পত্তন করেন। তাঁর মতেও নিরংকুশ ভাব (Absolute Idea) বা অতি-শক্তি বলে কিছুর অস্তিত্ব নেই। আমাদের মাথাই (brain) হল বস্তুর দ্বারা তৈরী—আর সেই বস্তু সৃষ্ট মাথার ফল হল আমাদের চেতনা ও চিন্তন শক্তি। তাঁর মতে বস্তু মনের ফল নয়—মনই হল বস্তুর উন্নততর বিকাশ। তাঁর মতে খ্রীস্টান গড (God) হলেন মানুষের অযৌক্তিক আয়না-বিম্বের প্রতিফলন মাত্র।

ফুয়েরবাক বলেন ঃ ধর্ম (religion) শব্দটি আসে বাঁধন (Religare) শব্দ থেকে। মানুষ প্রকৃতি বা বস্তু থেকে সৃষ্ট হলেও মানুষে মানুষে

১· তাঁর বিখ্যাত বই Essence of Christianity পঠনীয়।

রয়েছে বাঁধন—স্নেহের, ভালবাসার, মমতার ও নৈতিকতার। তাঁর মতে সৃষ্টিকর্তা-নির্ভর ধর্ম নয়—ভালবাসা, মমতার ও নৈতিকতার ধর্মই হল মানুষের ধর্ম।

এ পর্যন্ত আমরা বস্তুবাদের যে বিভিন্ন ধারার বর্ণনা দিলাম ঃ তাতে বস্তুবাদের তিনটি প্রধান রূপ পাওয়া যায় ঃ

১. ইতর বস্তুবাদ (Vulgar Materialism)

২. যান্ত্রিক বস্তুবাদ (Mechanistic Materialism)

৩. ফুয়েরবাকি বস্তুবাদ (Feuerbachian Materialism)

ইতর বস্তুবাদ মানুষকে তার মহত্তর দিক থেকে নামিয়ে ভোগসর্বস্ব পশুস্তরে নামিয়ে আনে—আর যান্ত্রিক বস্তুবাদ পরিণত করে তাকে নৈতিকতাহীন যন্ত্ররূপে। ফুয়েরবাকি বস্তুবাদের যান্ত্রিকতার মধ্যে ভালবাসা ও নৈতিকতার দুর্বল আস্তর থাকলেও তা শীঘ্রই হয়ে ওঠে বস্তুবাদী ও ভাববাদী-উভয় দলের সমালোচনার লক্ষ্য বা টারগেট রূপে।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ

উঁচু বংশজাত বুর্জোয়া পরিবারে যার জন্ম সেই বিখ্যাত দার্শনিক কার্ল মার্ক্স (Karl Marx) ও ধনী এঙ্গেলস (Angels) বস্তুবাদকে এই অশোভন অবস্থা থেকে বাঁচাবার জন্য ভাববাদী হেগেলের আশ্রয় নেন। হেগেলের মত হল ঃ বস্তু কিছুই নয়—ভাবই সবকিছু। ভাব জগতে দুই বিপরীত অবস্থা বর্তমান। এ দুটার সংঘর্ষে তেসরা অবস্থার সৃষ্টি হয়। তিনি এই দুই বিপরীত অবস্থার নাম দেন থিসিস (Thesis) ও উল্টাথিসিস (Antithesis)। আর দুটার সংঘর্ষে যা হয় তার নাম দেন সিনথেসিস (Synthesis)।

কিন্তু এখানেই এর শেষ নয়। যেহেতু প্রতিটি অবস্থার দুটা বিরুদ্ধভাব বিদ্যমান থাকে—তাই সিনথেসিসেও আবার নতুন করে থিসিস ও উল্টাথিসিসের কাজ শুরু হয়। এভাবে আবার সংঘর্ষ ও সিনথেসিসের পালা আসে। হেগেল এরূপ গোটা কাজের ধারাকে নাম দিয়েছিলেন ঃ দ্বান্দ্বিকতা বা বিপরীততা (Dialectics)।

মার্ক্স পুরাতন যান্ত্রিক বস্তুবাদের সাথে ভাববাদী হেগেলের দ্বান্দ্বিকতা যোগ করে দিয়ে বস্তুবাদের নতুন রূপ দেন। একেই বলা হয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ (Dialectical Materialism)। মার্ক্সবাদের দার্শনিক ভিত্তিই হল

এই বস্তুবাদ।[১] এই মতবাদকে ভিত করেই সমাজের বিভিন্ন ঘটনা বিচার করা হয়। বস্তুগত কারণে অর্থাৎ অর্থনৈতিক কারণে নানা রকম উৎপাদন ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। এতে মানুষে মানুষে দ্বান্দ্বিকতার নিয়মে নতুন সম্পর্কের উদ্ভব হয়। দ্বান্দ্বিকতার নিয়মেই বিভিন্ন যুগে শোষক ও শোষিতের বিকাশ ঘটে—আর দুই বিরুদ্ধ দলের মধ্যে সংঘর্ষের জন্য সৃষ্টি হয় নতুনতর সমাজ—সিনথেসিস রূপে। এইভাবে মানব ইতিহাসে দেখা দিয়েছিল দাসযুগ, সামন্তযুগ আর পুঁজিবাদী যুগ। মার্ক্স দ্বান্দ্বিকতা দিয়ে এইভাবে ইতিহাসকে বিচার করতে চাইলেন। আর এর নাম দিলেন ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (Historical Materialism)।

মার্ক্সের প্রধান শাগরেদ—কম্যুনিস্ট রাশিয়ার প্রবর্তক লেনিন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন : প্রতিটি বস্তুসত্তায় যে বিরোধিতা তার সম্বন্ধে জ্ঞান লাভই দ্বান্দ্বিকতা। (Dialectics is the study of contradiction within the very essence of things)। অন্য জায়গায় তিনি বলেন : বিরোধী উপাদানের মধ্যে সংগ্রামেই বিকাশ বা উন্নয়ন ঘটে (Development is the struggle of opposites)।

বস্তুবাদ বনাম ভাববাদের লড়াই

বস্তুবাদ ও ভাববাদের লড়াই বহু পুরাতন। বস্তুবাদী ও ভাববাদী এই দুই দলের মধ্যেও রয়েছে বহু দল ও উপদল। সব বস্তুবাদী সব বিষয়ে একমত নন। তবে একটি বিষয়ে তাঁরা একমত যে, ধরাছোঁয়ার (ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য) বস্তুই আসল ও আদিম সত্তা, আর সব কিছুর মূলে রয়েছে এই বস্তু। বস্তুর অতীত বা বস্তু-উদাসীন কিছুই নেই।

অপরদিকে ভাববাদীদের মধ্যেও দল-উপদলের অন্ত নেই। বিভিন্ন দল ভাবকেই সব কিছুর মূল বলে মনে করেন। এদের এক দলের মতে বস্তুজগৎ ভাবের বিম্ব (image) বা ছায়ামাত্র। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার বস্তুজগতকে মায়া বলতেও ছাড়েন নি। বস্তুবাদ ও ভাববাদ সম্পর্কে এঙ্গেলস বলেন :

> বস্তুগত অস্তিত্বে ও চিন্তার মধ্যে কি সম্পর্ক, আত্মা ও প্রকৃতির মধ্যে কি সংযোগ—এটা সমস্ত দর্শনের মূল প্রশ্ন। দার্শনিকেরা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে দুভাগ হয়ে গেছেন। যাঁরা ভাবকে ধরেছেন মূল

---

১. Philosophy of Marxism is Materialism—Lenin.

বলে—তাঁরা হয়েছেন ভাববাদী ও যাঁরা প্রকৃতিকে (বস্তুকে ঃ লেখক) মূল মনে করেছেন তাঁরা হয়েছেন বস্তুবাদী।

ভাববাদীরা সাধারণত একটা মহামনে বিশ্বাসী। অন্যদিকে বস্তুবাদীরা বস্তুর বাইরে কিছু দেখতে পান না—তাই তাঁরা নাস্তিক। আসলে যাঁরা মূলত প্রাণ-মনহীন বস্তুকেই সব কিছুর আদি বলে মনে করেন তাঁদের সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাসের কোন কারণ নেই। তাছাড়া বস্তুবাদের জন্ম হল বিভিন্ন ধর্মের প্রতিক্রিয়া হিসাবে। ধর্মের নামে অন্ধ-কুসংস্কার ও অবিচারে অতিষ্ঠ হয়ে ইউরোপে ও অন্যান্য জায়গায় এক সময় ধর্মবিরোধী আন্দোলন গড়ে ওঠে।

মধ্যযুগে বিশেষ করে খ্রীস্টধর্মের নামে অফুরন্ত অন্ধ-বিশ্বাস সমাজে শিকড় গেড়ে বসে। তাছাড়া রাজা-পুরোহিতেরা জোট বেঁধে ধর্মের নামে গরীব প্রজা ও জনসাধারণের উপর চরম নির্যাতন ও শোষণ চালাতে থাকেন। অথচ তাঁর বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ উঠলে ধর্মের নামে তাকে বাধা ও চরম শাস্তি দেওয়া হত। এসব কারণে গীর্জা ও গডের উপরও আন্দোলনকারীরা বিশ্বাস হারিয়ে ফেলতে থাকে প্রতিক্রিয়া হিসাবে।

হেগেলের লেখা 'নিয়মের দর্শন' (Philosophy of Law) বইয়ের সমালোচনায় মার্ক্স তাই বলেছিলেন : ধর্ম জনগণের আফিম ছাড়া আর কিছুই নয়। লেনিন তাঁর বহু প্রচারিত 'ধর্ম সম্বন্ধে' (On Religion) বইতে ধর্ম ও বস্তুবাদের বিরুদ্ধতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন : মার্ক্সবাদই বস্তুবাদ; এই হিসেবে সব যুগের বস্তুবাদীদের মত মার্ক্সবাদীরা নিরাপোসভাবে ধর্মবিরোধী। আমরা নিশ্চিতভাবে ধর্মের সাথে সংগ্রাম করব, এটাই সমস্ত বস্তুবাদের ক-খ।[১]

লেনিন অন্যস্থানে বলেন ঃ নাস্তিকতা বস্তুবাদের স্বাভাবিক ও অপরিহার্য অঙ্গ। তাই ইহা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের (তথা কম্যুনিজমের ঃ লেখক) তত্ত্ব ও প্রয়োগের অঙ্গ।[২]

---

১. Marxism is materialism. As such it is as relentlessly opposed to religion as was the materialism of the Encyclopaedists of the Eighteenth Century, or as was the materialism of Feuerbach. We must combat religion. This is ABC of all materialism and consequently of Marxism. —On Religion.

২. Atheism is a natural and inseparable part of Marxism, of the theory and practice of scientific socialism. —On Religion.

শুধু লেনিন নয় অতীত আর আধুনিক যে কোন নামজাদা মার্ক্সবাদী বা বস্তুবাদীর লেখা এবং রাশিয়া ও অন্যান্য কম্যুনিস্ট দেশের ধর্ম-বিরোধী আন্দোলন ও কাজের ইতিহাস থেকে বোঝা যাবে যে, কম্যু-নিজমে কোন ধর্ম যদি থেকে থাকে তা হল নিরাপোষ নাস্তিকতা।

মার্ক্সীয় বস্তুবাদের স্বরূপ

মার্ক্সীয় বস্তুবাদ গত শতকের মাঝভাগে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সময়ের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও দার্শনিক চিন্তাধারার উপর নির্ভর করে মার্ক্স ও এঙ্গেল্স মার্ক্সবাদী বস্তুবাদের গোড়াপত্তন করেছিলেন।

বস্তু সম্বন্ধে ধারণা দিতে গিয়ে মার্ক্স লিখেছেন: চিন্তক-বস্তু থেকে বস্তুকে আলাদা করা অসম্ভব। আর এই বস্তুই সব রকম পরিবর্তনের ভিত।[১]

এঙ্গেল্স-এর মতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুই একমাত্র সত্তা (reality)। আমা-দের চিন্তন ও চেতন শক্তিকে যতই ইন্দ্রিয়াতীত মনে হোক না কেন—ইহা বস্তু-মাথা (brain) থেকেই উৎপন্ন। বস্তু মনের সৃষ্টি নয় বরং মনই বস্তুর উন্নততম সৃষ্টি মাত্র।

> The material sensuously perceptible world to which we ourselves belong is the only reality. Our conscience and thinking however supersensuous they may seem are the product of a material bodily organ, the brain. Matter is not a product of mind, but mind itself is merely the highest product of matter.

মার্ক্সবাদ-বস্তুবাদের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে লেনিন বলেন: চেতনাশক্তি আর কিছুই নয়, বস্তুসত্তার প্রতিফলন মাত্র।[২]

তিনি অন্যস্থানে বলেন: বস্তু কিভাবে চলে ও কিভাবে চিন্তা করে তাই এই জগতের রূপ। ইন্দ্রিয় যন্ত্রের (চোখ, নাক, হাত ইত্যাদি) উপর

---

১. It is impossible to separate thought from matter that thinks. This matter is the substratum of all changes.—Selected Works.

২. Materialism in general recognizes objectively real being (matter) as independent of consciousness, sensation, experience. Consciousness is only reflection of being.—Lenin.

কাজ করে যা অনুভূতি জাগায় তাই তো বস্তু। বস্তু, প্রকৃতি সত্তা এই সবই তো বাস্তব ও মৌলিক, আর আত্মা, চেতন, অনুভূতি প্রভৃতি মানসিক কাজ—এসব হলো গৌণ।

> Matter is that, which acting upon our sense organs, produces sensation. Matter, nature, being the physical is primary, and spirit, consciousness, sensation—the psychological is secondary.

সুতরাং এটা পরিষ্কার যে মার্ক্সবাদী বস্তুবাদ অনুসারে বস্তুই মৌলিক। চিন্তা অনুভূতিসহ আর সব কিছু বস্তুর বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। পাঁচ-ইন্দ্রিয় দ্বারা যা অনুভব করা যায় তাই বস্তু, আর তাই আসল সত্তা। চিন্তাশক্তি বস্তুরই একটা গুণ মাত্র। চিন্তাশক্তি ও চেতনাশক্তির উপর বস্তু নির্ভরশীল নয়।

এই বস্তুবাদ দিয়ে সমাজের কাজ-বিকাজ (ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া) ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মার্ক্স বলেছিলেন ঃ চেতনাশক্তি মানুষের সমাজ-সত্তা নির্ধারণ করে না, বরং সামাজিক সত্তাই মানুষের চেতনশক্তি নিধারণ করে।

> It is not the consciousness of men that determines their social being—but on the contrary their social being that determines their consciousness.

তিনি আর এক জায়গায় বলেছিলেন ঃ সামাজিক উৎপাদন থেকে মানুষ এমন সম্পর্কে সম্পর্কিত হয় যা তাদের ইচ্ছাশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়।

> In the social production of their life men enter into definite relations that are indispensible and independent of their will.

যেহেতু বস্তুবাদ অনুযায়ী মন বস্তুর একটা বিকাশ মাত্র—এজন্য এ মতে চেতনাশক্তি বা মন যে ঘটনার নিয়ামক হতে পারে না—তা অনেকটা স্বতঃসিদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়।

পরবর্তীকালে কোন কোন মার্ক্সবাদীর দ্বারা কোন কোন ক্ষেত্রে মনের বা ভাবের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে বটে কিন্তু তা বস্তুবাদের অনুসরণ নয় বরং তার বিকৃতি বলা চলে।

কিন্তু মনের তৈরী তত্ত্ব—সজাগ মানুষের সংগঠন যে সমাজের এমন কি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রেও বিরাট প্রভাব বিস্তার করে, এমন কি এই

চেতন শক্তি ইতিহাসেরও মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে তার গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। স্বয়ং স্ট্যালিনও তাঁর 'দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদে' এটা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। রাশিয়ার সমাজ গঠনে লেনিন ও স্ট্যালিনের প্রতিভাময় চেতনা শক্তির দান ও চীনের সমাজ বিপ্লবে মাও-সে-তুঙের অনেকটা একক প্রভাব বাস্তব সমাজের উপর চেতন শক্তির বিজয়ই প্রমাণ করে। এই তিন চেতন-প্রতিভার অভাবে বর্তমান রাশিয়া বা চীন বা কম্যুনিজম আমরা ইতিহাসে খুঁজে পেতাম কিনা তাও বা কে বলতে পারে? আরব মরুভূমিতে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর আবির্ভাব না হলে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার ইতিহাস কিভাবে লিখিত হত তাও তো বিরাট কল্পনার ব্যাপার। অথচ প্রায় একই রকম অনুকূল বস্তুগত পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও দুনিয়ার অন্য কোন দেশে ইসলামী বা কম্যুনিস্ট বিপ্লবের মত ঘটনা ঘটেনি।

বিজ্ঞান ও বস্তুবাদ

অতীত

সতর, আঠার বা উনিশ শতকের বস্তুবাদকে ঘেটে দেখলে খোলাসা হবে যে, বস্তুবাদীরা নিজ নিজ বিজ্ঞানকে তাঁদের যুক্তির পক্ষে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন। এই ব্যবহারের পক্ষে সুবিধা ছিল ২টি :

ক. বিজ্ঞানের বাল্যাবস্থায় ইউরোপ ছিল এর খেলাঘর। অথচ এই ইউরোপেই তখন চলছিল খ্রীস্ট ধর্মের বিকৃতি পুরাদমে। খ্রীস্ট ধর্ম ও ঈশ্বরের নামে তখন তীব্রভাবে আক্রমণ করা হচ্ছিল বিজ্ঞানকে এবং বিজ্ঞানীকেও। এমন কি কোন কোন নামকরা বিজ্ঞানীকে ধর্মের দোহাই দিয়ে অমানুষিকভাবে হত্যা করতেও এই ধর্মনেতাদের কুন্ঠা হয়নি।

কাজে কাজেই ধর্মবিরোধী নাস্তিকতা প্রচারে বিজ্ঞানকে যে ব্যবহার করা হয়েছিল তা ছিল নেহায়েত ও স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার ব্যাপার।

খ. এই যুগের বিজ্ঞান নেহায়েত তার অপূর্ণতার সময়ে ছিল কমবেশী যান্ত্রিকতাবাদী বা স্থূল। বস্তুবাদী সূক্ষ্ম ও বস্তুর অতীত বিজ্ঞানের কোন কিছু তখন বিকাশ লাভ করেনি। ফলে বিজ্ঞানীদের এক অংশ সন্দেহবাদী (agnostic) কিংবা নাস্তিক হয়ে পড়েন।

বর্তমান

বিশ শতকের বিজ্ঞান অভাবিতরূপে তার স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। পদার্থ, রসায়ন, অঙ্ক ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিজ্ঞান যেভাবে এগিয়ে গেছে তা ভাবতেও অবাক লাগে। গত ৮০-৯০ বছরে বিজ্ঞান যা আয়ত্ত করেছে—তার সাথে তুলনা করলে আগের সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও জ্ঞান নেহায়েত অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হবে।

বিজ্ঞানের বর্তমান অগ্রগতি মানুষের জীবন ধারণের উপর যেমন বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছে—তেমনি প্রলয়ঙ্করী বিপ্লবের সূচনা করেছে তার চিন্তাধারায়ও। ফলে নানা ত্রুটি ও অপূর্ণতা দেখা দিয়েছে অতীতের চিন্তাধারায়। বিজ্ঞানী ও দার্শনিক তাই আবার নতুন রূপে সব কিছুর মূল্যায়ন করতে শুরু করেছেন।

আধুনিক বিজ্ঞান ও দার্শনিক

এটা আজ কারও অজানা নেই যে আধুনিক শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের অনেকেই আস্তিক্যবাদী। জিনস (Jeans), এডিঙটন (Edington), হোয়াইটহেড (Whitehead) প্রমুখ শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী বিজ্ঞানের সাহায্যে বস্তুবাদকে যে অযৌক্তিক এবং মহান মনন সত্তাকে যে যৌক্তিক বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন তা আজ সকল শিক্ষিত মহলে আলোচিত হয়। বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের মধ্যে যাঁরা বস্তুবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না, তাঁদের মধ্যে মিলিকান (Millikan), মরগান (Morgan), ওয়েনার (Adlof Wagner), লয়েড মরগান, বার্গর্স (Bergson), জোড (Joad) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এদের ভাবধারা সমর্থনে ক্লার্ক (A. H. Clark), মার্শ (Marsh), হাইজেনবার্গ (Heigenberg) প্রমুখ বিজ্ঞানীর লেখা পঠনীয়।[১]

আরও একটি কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। চলতি শতকের আগ পর্যন্ত নিউটন ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। তাঁর আবিস্কৃত তত্ত্বই আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের আগে সব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, আবিষ্কার ও

---

১. মিলিকানঃ বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানীঃ ইলেকট্রন প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁর মৌলিক আবিষ্কার বিজ্ঞানের গৌরবের বস্তু। তার লিখিত বিজ্ঞান ও ধর্ম (Science and Religion) বিজ্ঞানভিত্তিক সুপাঠ্য নামকরা বই।

জিনস্‌ঃ শ্রেষ্ঠ অংকবিদ ও পদার্থবিজ্ঞানীঃ তাঁর নামকরা বই রহস্যময় বিশ্ব (Mysterious Universe), আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি (The Back Grounds of Modern Science) বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

মতবাদকে নিয়ন্ত্রিত করত। বলতে গেলে পদার্থবিজ্ঞান, যান্ত্রিকবিদ্যা, আলোবিজ্ঞান—এমন কি জ্যোতিবিদ্যা পর্যন্ত তাঁর আবিষ্কারে সবল প্রাণ পায়। আরো উল্লেখযোগ্য এই যে তাঁর গতিতত্ত্বের কারণেই মিকানিক্স বা গতিবিজ্ঞানের এত উন্নতি সম্ভব হতে পেরেছে। অথচ তিনি ছিলেন মস্তবড় একজন ধার্মিক লোক। আধুনিক যুগের আর একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইনস্টাইনকেও বলা যায় একজন আস্তিক্যবাদী ধার্মিক ব্যক্তি। ধর্মের বাহ্যিক কাজ কর্ম ও কুসংস্কারকে তিনি অপছন্দ করলেও তিনি ছিলেন ধর্মের মূল সূত্রে পরম বিশ্বাসী। তাঁর লেখা 'আমার শেষ বছরগুলি থেকে' (Out of My Later Years) বইটির বিজ্ঞান ও ধর্ম এই অধ্যায়ে তা সুন্দরভাবে তিনি প্রকাশ করেছেন।

এখানে এ-কথাটা স্মরণ রাখতে হবে: বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছিল গ্রীক ধর্মমন্দিরে- আর তার উচ্ছল ও উজ্জ্বল শৈশব কেটেছিল ৯ম-১০ম শতকে মুসলিম শাসনে। মুসলিম বিজ্ঞানীরা ছিলেন অপূর্ব কুসংস্কারমুক্ত, অথচ তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন আস্তিক। ইউরোপ বিজ্ঞান ও দর্শন-চর্চা আয়ত্ত করেছিল ৯ম ও ১০ম শতাব্দীর মুসলিম বিজ্ঞানীদের অনুসরণ করেই।

বস্তু ও আধুনিক মতবাদ

এ পর্যন্ত যে সমস্ত বস্তুবাদের কথা বলা হয়েছে—তা বর্তমানে যৌক্তিকভাবে টিকে থাকতে পারছে না। বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কার—নতুনতর তত্ত্বের আঘাতে পুরানো বস্তুবাদের আসন টলে উঠেছে। বস্তু সম্বন্ধে আগে যে ধারণা ছিল তার হয়েছে আমূল পরিবর্তন।

এডিঙটন: শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী: তাঁর লেখা বস্তুজগতের প্রকৃতি (**Nature of Physical World**) সুবিখ্যাত বই।

লয়েড মরগান: শ্রেষ্ঠ জীব-বিজ্ঞানী: তাঁর নামকরা বই হল—বিকাশমান বিবর্তন।

বার্গস': জীব-বিজ্ঞানী: বই—নীতি ও ধর্মে দুই মূল (**Two Sources of Morals and Religion**)

মার্শ: জীববিজ্ঞানী: বই—বিবর্তন, সৃষ্টি ও বিজ্ঞান (**Evolution, Creation and Science**)

হোয়াইটহেড: দার্শনিক ও বিজ্ঞানী: বই—বিজ্ঞান ও আধুনিক জগৎ (**Science and Modern World**)

জোড: নামকরা দার্শনিক: অন্যতম বই—আধুনিক চিন্তাধারার গাইড।

হাইজেনবার্গ: বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী: অনিশ্চয়তা তত্ত্বের (**Uncertainty Principle**) আবিষ্কারক।

পদার্থবিদ্যা বস্তুর সত্তা নির্ধারণ করে। সেই পদার্থ বিজ্ঞানের প্রভাবে এমন একটি ধারণা সৃষ্টি হতে চলেছে—যাতে বস্তুর বস্তুত্বই যেন উবে যেতে চলেছে। ব্রিটিশ দার্শনিক জোড তাঁর 'আধুনিক চিন্তাধারার গাইড' নামক কিতাবে সুন্দরভাবে বস্তুর বর্তমান রূপ বর্ণনা করেছেন :

> উনিশ শতকের বস্তুর ছিল প্রকৃতই বস্তুবাদী রূপ। কিন্তু বস্তু এখন এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, তাকে না ধরা যায় না দেখা যায়। এ যেন পাঁচ ইন্দ্রিয়ের বাইরে চলে যাচ্ছে। আধুনিক বস্তু আকারবিহীন— দুর্বোধ্য— স্থান কালের মাঝে এ এক সূক্ষ্ম সত্তা— বিদ্যুতের কণা বা কোন সম্ভাব্য ঢেউ—যা শূন্যে বিলীয়মান। আজ আর বস্তুকে বস্তু বলে প্রতীয়মান হয় না—এটা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে অনুভবকারীর চেতনার কাল্পনিক ছায়ামাত্র।

বস্তু উবে যাক আর নাই যাক এটা আর অস্বীকার করার উপায় নেই যে বস্তু সম্বন্ধে আগের ধারণা আর নেই। আগে বস্তু সম্বন্ধে ধারণা ছিল :

১. বিভিন্ন বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ হল পরমাণু। প্রতিটি পরমাণুতে বস্তুর গুণ বর্তমান থাকে। বস্তুর প্রতিটি অংশ যান্ত্রিকভাবে যান্ত্রিক নিয়মে বিভিন্ন প্রাকৃতিক আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

২. বস্তুর ভর অপরিবর্তনীয়।

৩. শক্তি (energy) বস্তুতে থাকে বিদ্যমান ; কিন্তু বস্তু ও শক্তি নির্দিষ্ট। (Law of conservation of Mass & Energy)

৪. বস্তুর প্রতিটি অংশ পাঁচ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জানা ও তার স্বরূপ বোঝা সম্ভবপর।

৫. নির্জীব বস্তু থেকে ডারউইনের নিয়মে জীবের উৎপত্তি। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জীবন সৃষ্টি সম্ভবপর।

বর্তমান শতকে বিজ্ঞান এসে দাঁড়িয়েছে নীচের অবস্থায় :

১. বস্তুর শেষ উপাদান পরমাণু নয়। ইলেকট্রন-প্রোটন পার হয়ে বস্তু আরও সূক্ষ্মতর বৈদ্যুতিক সত্তায় বিলীয়মান।

২. বস্তুর প্রতিটি অংশ অন্ধ-যান্ত্রিকভাবে চলে না, ইহার চলাচলের মধ্যে যথেষ্ট অনিশ্চয়তা বর্তমান।

৩. বস্তুকেও শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়।

৪. বস্তুর সবকিছু পাঁচ ইন্দ্রিয় কেন—সর্বাধুনিক সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি দ্বারাও সঠিকভাবে জানা ও মাপা সম্ভব নয়।

৫. রাসায়নিকভাবে জীবন সৃষ্টি আজও সম্ভব হয় নি। জীবনের উৎপত্তি ডারউইনের অন্ধ-নিয়মে হয় নি—হয়েছে উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে। একেই বলা হয় উদ্দেশ্যশীল বিবর্তন (Purposive Evolution)। আর এই উদ্দেশ্য একটা মহামনের তথা সৃষ্টিকর্তার সবল ইংগিত বহন করে।

মন বস্তু হতে সৃষ্ট কিনা এ নিয়ে বর্তমানে বিরাট সন্দেহ রয়েছে। বস্তু হতে সৃষ্টি হোক আর না হোক—একথা আজ স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, বস্তুর সূক্ষ্মতর অবস্থার মাধ্যমে মহামনের মহাপরিকল্পনা অনুসারেই মানব মন ও জীব-সত্তার বিকাশ ঘটে। অন্য কথায় বলা চলে সূক্ষ্মতরভাবে সমস্ত বস্তুসত্তাই মহামনের পরিকল্পিত বিকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। কিংবা এও বলা যায়, সমগ্র বস্তুসত্তাই যেন অদৃষ্ট, অস্পৃশ্য বিশ্বসত্তার বিশ্বরূপে আমাদের সামনে প্রকাশ পাচ্ছে।

৪
কয়েকটি প্রশ্ন

মানুষের শক্তি ও জ্ঞান কি সীমিত

১. আপনি বলেছেন : মানুষের শক্তি ও জ্ঞান অসীম নয় —এটা কি সব সময় সত্য থাকবে বলে আমরা ধরে নিতে পারি ?

জবাব

এক : বিরাট সৃষ্টিতে সুরুজ বা তারকাকেও অতি ছোট এক একটি কণা হিসাবে গণ্য করা চলে। এর তুলনায় দুনিয়াটা ধরতে গেলে কিছুই নয়। আর তার বুকে যে মানুষ—সে যে-স্থান ও কাল (time and space) জুড়ে থাকে তা একেবারে নগণ্য। এই বিরাট বিশ্বের মধ্যে প্রায় অসীম স্থান ও কালের মধ্যকার নগণ্য মানুষের পক্ষে সব কিছুই জানা সম্ভব বলে ভাবার কোন কারণ নেই।

দুই : বস্তুর ভিতরকার অতি ক্ষুদ্র পরমাণু ও তার ভিতরের সূক্ষ্ম-তর কণার অস্তিত্ব সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান সীমিত। তাছাড়া বিজ্ঞান সম্ভাবনা তত্ত্বের (Theory of Probability) দ্বারা প্রমাণ করেছে এই সূক্ষ্ম জগতে অবস্থান ও গতি একই সময়ে জানা সম্ভব নয়। এটাই আধুনিক বিজ্ঞানের অনিশ্চয়তা তত্ত্ব (Uncertainty Principle) নামে পরিচিত।

তিন : মানুষের শক্তি এত সীমিত যে সে প্রকৃতির কোন মৌলিক আইনকেই বদলাতে পারে নি। উদাহরণস্বরূপ : মানুষ কি কখনো মাধ্যাকর্ষণ আইনকে বদলাবার কল্পনা করতে পারে ?

চার : বিজ্ঞানের একটি মৌলিক আবিষ্কার হল : কোন বিজ্ঞানী বস্তু বা শক্তির একটি কণাও সৃষ্টি বা ধ্বংস করতে পারে না। এর নাম বস্তু ও শক্তির নিত্যতা বিধি (Law of Conservation of Mass and Energy)। মানুষ প্রাকৃতিক আইনের বলে বস্তু বা শক্তির রূপ বদল করতে পারে মাত্র। কোন বিজ্ঞানী বস্তু বা শক্তির

কণামাত্রও ধ্বংসের কল্পনা করতে পারে না। কাজেই মানুষের শক্তি ও সামর্থ্য যে সীমিত তা বলাই বাহুল্য।

পাঁচ ঃ যেহেতু মানুষ কোন কিছুরই সৃষ্টিকারক (Creator) বা ধ্বংসকারক (Destroyer) নয়, কাজেই সেও সৃষ্টি-নিয়ন্ত্রিত জীব বিশেষ। আর এই কারণে আমরা একটি তত্ত্ব দিতে পারি। সেটা হল ঃ সৃষ্ট বস্তু বা সৃষ্ট জীব নিজকে তৈরি করতে বা সৃষ্টিকারক সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারে না।

অনুমান

এই তত্ত্ব থেকে আর একটি বিষয় অনুমান করা চলে ঃ

কোন বস্তু বা জীব তার সমান শক্তি ও জ্ঞানসম্পন্ন কোন বস্তু বা জীব তৈরী করতে পারে না।

আমরা অভিজ্ঞতায় কি দেখতে পাই? একটি চেয়ার যতই পূর্ণ ও সুন্দর হোক না কেন একজন মিস্ত্রিকে কিংবা আর একটি চেয়ারকে সৃষ্টি করার বা মিস্ত্রি সম্বন্ধে তার জ্ঞান লাভ করার কল্পনা করা যায় না। কোন পাতিল-কুমার সম্বন্ধে—কিংবা কোন আধুনিক বিজ্ঞানের যন্ত্র ইন্‌জিনিয়ার সম্বন্ধে কি কিছু জানতে পারে? এখানে মিস্ত্রি, কুমার বা ইন্‌জিনিয়ার পরিকল্পক ও তৈয়ারকারী—আর চেয়ার, পাতিল বা যন্ত্র হল পরিকল্পিত তৈরি জিনিস। আধুনিক যে কোন উন্নত যন্ত্র, নিজে-চালু (automatic) মেশিন কিংবা কম্প্যুটার বা রবট সম্বন্ধে একই কথা খাটে। শুধু কি তাই?—গরু-ছাগল, পোকা-মাকড় ইত্যাদি তো মানুষের চাইতে নিম্নতর জীব।—মানুষ এইগুলিও তৈরি করতে পারে না।

এই আলোচনা থেকে বোঝা যায় ঃ যেহেতু মানুষ বিশ্বের পরিকল্পনা-কারী বা সৃষ্টিকারী নয়—কাজেই তার সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে তার জ্ঞান ও শক্তি অতি নগণ্য হতে বাধ্য। কাজেই আল্লাহ্ সম্বন্ধে যদি আমাদের জ্ঞান অতি কম হয় তাতে আশ্চর্যান্বিত হবার কিছুই নেই।

অনুমান বা কল্পনা ছাড়া কি বিজ্ঞান চলে না

২. বলা হয়েছে ঃ অনুমান ছাড়া মানুষের যুক্তি অচল। বিজ্ঞান সম্বন্ধেও কি এ কথা খাটে?

হ্যাঁ, বিজ্ঞান সম্বন্ধেও একথা পুরোপুরি খাটে।

পরমাণুবাদ (Atomic Theory) এভোগাড্রোর কল্পনা (Avogadro's Hypothesis), চল-তত্ত্ব (Kinetic Theory), বিবর্তনবাদ (Theory of Evolution), কণাতত্ত্ব (Corpuscle Theory), ঢেউ তত্ত্ব (Wave Theory), আপেক্ষিক তত্ত্ব (Theory of Relativity), এইরূপ বিজ্ঞানের সবগুলি তত্ত্ব প্রধানত অনুমানের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। অনুমান ছাড়া বিজ্ঞানের পরীক্ষিত সত্যের ব্যাখ্যা তো মিলতই না—বরং বিজ্ঞানও বেশী এগোতে পারত না।

পুরা জ্ঞান কি সম্ভব নয়

৩. মানুষের কোন বিষয়েই কি পুরা জ্ঞান (absolute knowledge) লাভ সম্ভব নয়?

না—কোন বিষয়েই মানুষের পুরা জ্ঞান থাকা সম্ভব নয়। আপনি কি ঘড়ি দিয়ে সময় (time) ও স্কেল দিয়ে লম্বি (length) সঠিকভাবে মাপতে পারেন? পারেন না এইজন্য যে আপনি যাকে ১ গজ ২ ইঞ্চি বলেন—আসলে, তা একেবারে ঠিক ঠিক ১ গজ ২ ইঞ্চি নয়, কিছু কম বা বেশী। তা ছাড়া, আপনার স্কেলটিও পুরোপুরি নির্ভুল নয়। তারপর তো স্থান বা দূরত্ব সম্বন্ধে আপেক্ষিক তত্ত্ব বলে দেয় সব কিছু আপেক্ষিক—সঠিক নয়। সময় সম্পর্কেও একই কথা। আমরা যখন ১ সের বা ১ কিলোগ্রাম ওযন মাপি তাও ঠিক ঠিক ১ সের অথবা ১ কিলোগ্রাম নয়। সামান্য কম বা বেশী। এইগুলি আপেক্ষিক সত্য। সুতরাং বলা যায় অতি পরিচিত দূরত্ব ও সময় সম্বন্ধে যখন আমাদের জ্ঞান সঠিক হয় না তখন মানুষের পূর্ণ জ্ঞান সম্ভব নয়। অনিশ্চয়তা তত্ত্ব এই বিশ্বাসকে আরো মজবুত ভিত্তির উপর স্থাপন করেছে।

আল্লাহ্‌র আগে কি ছিল

৪. আগেই বলা হয়েছে আল্লাহ্‌ই সৃষ্টির আদি কারণ। তা হলে স্বভাবতই প্রশ্ন আসে: আল্লাহ্‌র আগে কি ছিল? অন্য কথায়: আল্লাহ্‌ আসলেন কোথা হতে?

এ প্রশ্ন স্বভাবত সকলের মনে জাগে। কিন্তু এখানেও আমাদের মনে রাখা উচিত মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ—যুক্তিও সীমিত। অসীম সম্বন্ধে সসীমের জ্ঞান যে পুরা হতে পারে না—সে তত্ত্ব আগেই বলা হয়েছে। তবু কোন প্রশ্নকে এড়িয়ে যাওয়া ঠিক নয়। আমরা যাকেই আদি বলে ভাবি না কেন—আল্লাহ্ হোক আর বস্তুবাদীদের বস্তুই হোক—এ প্রশ্ন এসে পড়ে। মানুষের জ্ঞান যে সীমিত এটা তার শক্তিশালী যুক্তি।

হিন্দু শাস্ত্রে স্বয়ম্ভূ বলে একটা কথা আছে। ঈশ্বর স্বয়ম্ভূ— মানে তিনি নিজেই নিজের সৃষ্ট। কথাটা বোঝা কঠিন বটে তবু যুক্তি আমাদের বলে দেয়ঃ সৃষ্টির একটি আদি কারণ থাকবেই। আর তিনি যদি স্বয়ম্ভূ হয়ে থাকেন তবে তা সচেতন ও সৃষ্টিশীল হবেন—নির্জীব ও অচেতন হতে পারেন না। নাস্তিকেরা নির্জীব পদার্থকে সৃষ্টির মূল কারণ বলে মনে করে থাকে। যে বস্তু নিজে নির্জীব ও নির্মন, তার দ্বারা নিজেকে বা অন্য কিছুকে সৃষ্টি করা সম্ভব নয়।

আল্লাহ্‌কে চিরস্থায়ী বললে আমাদের মনে যে খটকা থেকে যায়—তা হল স্থান-কালের প্রশ্ন। প্রত্যেক বস্তু বা ঘটনার আগে একটি বস্তু বা ঘটনা ছিল—আমরা এটা স্বভাবতই ধারণা করে থাকি। ধারণা বললাম এইজন্য যে, আগে-পরের ভাব আমাদের ধারণা বৈ কিছুই নয়। আপেক্ষিক্ষ তত্ত্ব আগে-পরের ধারণাকে এক রকম বদলে দিয়েছে। এই যে আমি রাতের তারা দেখছি, যে আলোর আগমনে আমি তা দেখছি সে আলো হয়ত শত শত বছর আগে এই তারা থেকে বিচ্ছুরিত হয়েছে। অর্থাৎ বিচ্ছুরণের ঘটনা ঘটেছে শত শত বছর আগে—অথচ আমি তা দেখলাম মাত্র এই মুহূর্তে। এইভাবে দর্শনে স্থান কালের কারণে সময়ের ধারণা ওলট-পালট হয়ে যায়। যাকে পরে দেখছি বলে মনে করি তা হয়ত ঘটেছে বহু বহু আগে। অন্যদিকে হয়ত পরের ঘটনাই আমরা আগে দেখে ফেলি।

'আগে-পরের ভাব যে ধারণা বৈ নয়—তা জ্যামিতির সাহায্যে প্রমাণ করা যায়। নীচের ছবির মত একটি গোল বা ডিম আকারের (circular

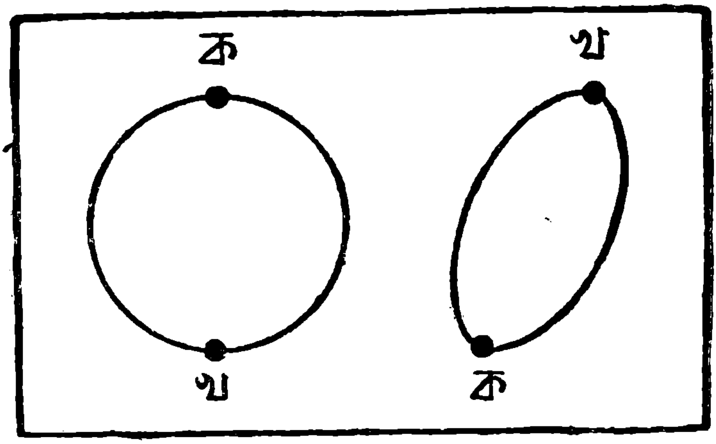

আগে কে ? ক না খ ?

or Elliptical) রাস্তা কল্পনা করি। মনে করি এই রাস্তার ক ও খ যে-কোন দুটি জায়গায় দুজন লোক আগে থেকে আছে বা ঐ পথে চলছে। এখন বলতে পারেন—লোক দুটির মধ্যে কে আগে কে পরে। লোক দুটির গতিপথ যেদিকেই যাক না কেন—কে আগে কে পরে তা বলার যো নেই। এখানে আগে পরের ধারণা অচল।

এ রকম পথ এঁকে তার এক জায়গায় 'আল্লাহ্' শব্দ লেখা যাক। এখন যদি আমরা বলি আল্লাহ্‌র আগে কি ছিল, তাহলে আমাদের জবাব কি হবে? জবাব হবে আল্লাহ্। কারণ আবদ্ধ পথ বলে যেদিক থেকে গতি শুরু করি না কেন আল্লাহ্‌র আগে আল্লাহ্ই হবেন। আল্লাহ্ যে অনাদি এটা থেকে তার কিছুটা হৃদয়ঙ্গম করা চলে। আবার প্রশ্ন উঠতে পারে ঃ আল্লাহ্‌র আগে কি ছিল একথা প্রমাণ করার জন্য আমরা বিশেষ করে বৃত্ত বা উপবৃত্ত বেছে নিলাম কেন?

আমাদের আগে ও পরের ধারণা সরল রেখার উপর অনেকটা নির্ভরশীল। পাশের ছবিতে ক ও খ স্থানের একমুখী দুইজনের কে পরে কে আগে তা সহজে বলা যায়। এতে আবার উল্টামুখি দুজনের বেলায় তা বলা মুশকিল।

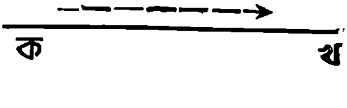

সে যাই হোক, কিনার বিশিষ্ট রেখার জ্ঞান পূর্ণ জ্ঞান নয়—আংশিক জ্ঞান। পৃথিবী বা বিশ্বের কোন কিছুই কিনার বা প্রান্ত বিশিষ্ট রেখায়

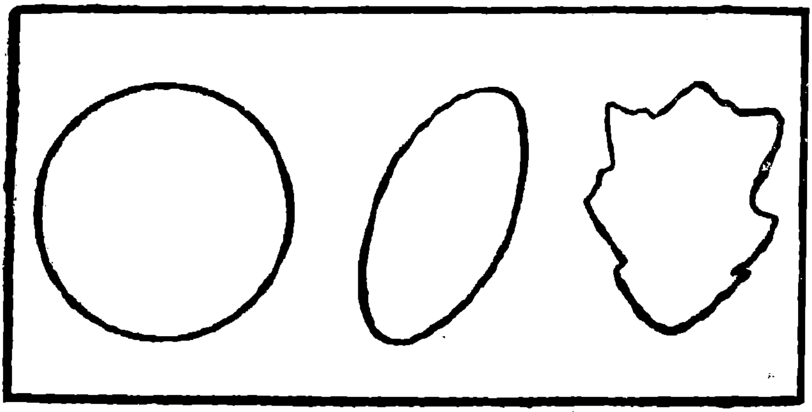

বিশ্বের সব কিছুর মৌলিক আকার ও গতি হল বে-কিনার।

চলে না। চাঁদ, সুরুয, দুনিয়া, তারা, ইলেক্‌ট্রন—সবকিছুই চলে বে-কিনার রেখায় (close curve)। এদের আকারও বে-কিনার। স্বয়ং বিশ্বের আকারও নাকি বে-কিনার সাবদ্ধ-আকৃতি—একথা আইনস্টাইন তাঁর তত্ত্বে বলে গেছেন। আমরা দুনিয়ার একটা ক্ষুদ্র অংশে বিচরণ করি। এতে আমরা সীমিত তল ও রেখায়িত স্থানের জ্ঞান পাই। ফলে এটা হয় খণ্ড জ্ঞান। এই খণ্ড জ্ঞানই আমাদের আগে পরের ধারণা দিয়ে থাকে সুতরাং এই ভুল ধারণার উপর আগে-পরে যে প্রশ্ন জাগে—ওটা অবান্তর। আসলে আগে পরের ধারণা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। আমরা এখানে শুধু স্থানের প্রশ্ন আলোচনা করেছি, কালের প্রশ্ন নয়। স্থান ও কাল মিলিয়ে দেখতে পারলে আগে-পরের সমস্যা আরো সহজভাবে দেখানো যেত।

সৃষ্টিতে বিশৃঙ্খলা কেন

৪-ক. বলা হয়ে থাকে যে, শৃঙ্খলা বা বিন্যাস বা সাজানো অবস্থা সৃষ্টিতে দেখা যায়—তা পরিকল্পনা বা মনন ছাড়া সম্ভব নয়। কিন্তু সৃষ্টিতে অনেক বিশৃঙ্খলা ও অসাজানো জিনিসও তো দেখা যায় যাতে কোন মনন বা পরিকল্পনার দরকার হয় না।

যদি ধরেও নেওয়া হয় যে সৃষ্টির কোন অংশ পরিকল্পিত সাজানো —আর কোন কোন অংশ তা নয়, তা হলেও একটি মনের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। কেননা মন ছাড়া আংশিক পরিকল্পনাও কিভাবে সম্ভব ?

সব চাইতে বড় কথা হল সাজানো অবস্থা সবখানেই আছে। বাহ্যিক-ভাবে আমরা যাকে দেখি এলোমেলো—তার ভিতরেও রয়েছে আশ্চর্য-কর পরিকল্পনা। প্রতিটি দানার (crystal) শৃঙ্খলা অস্বীকার অসম্ভব। কিন্তু দানাহীন বস্তুর প্রতিটি অণু-পরমাণুও যেভাবে গঠিত ও সাজানো, তাতে আমরা চরম শৃঙ্খলা ও পরিকল্পনা দেখে থাকি। সূক্ষ্ম এক্সরে ফটো নিয়ে বিজ্ঞানীরা সব বস্তুতে এই শৃঙ্খলা ও সুবিন্যাস প্রমাণ করেছেন। যারা বাইরের দিকে এলোমেলো দেখেন তারাই মূলে ভুল করে থাকেন।

কেউ কেউ বলেন, দুনিয়ার অসংখ্য অপচয় থেকে আমরা পরিকল্পনা বা মননের ব্যাপারে সন্দিহান না হয়ে পারি না। যেমন, মানুষের অসংখ্য শুক্রকীটের মধ্যে মাত্র দু-একটি জীবিত থাকে—বাকিগুলির হয় অপচয়।

কিন্তু কথা হল, এই কীট এবং দুনিয়ার আরো হাজার রকমের কীট-পতঙ্গের জীবনেরও সার্থকতা আছে; বহু কোটি কোটি রকমের বেকটে-রিয়ার মত এইগুলিও খুব কম সময়ে নির্দিষ্ট কাজ করে থাকে। আর এগুলির শুধু জীবনে ও তরিকায় নয়—এদের গঠন ব্যাপারেও সুবিন্যস্ত নিয়ম ও সাজান ব্যবস্থা রয়েছে। এইগুলিকে অপচয় বলা চলে না, যদিও বাইরে থেকে আমাদের সীমিত জ্ঞানে তা মনে হয়।

পরলোক-তত্ত্ব

৫. পরলোক-তত্ত্বের পেছনে কি যুক্তি আছে ?

আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের সাথে পরকাল-তত্ত্বও এসে পড়ে। তাছাড়া নীচের প্রমাণগুলি বিবেচ্য।

ক. বিজ্ঞানের একটি আইন হল প্রতিটা কাজের বিকাজ বা প্রতিফল আছে। একে বলা হয় নিউটনের তৃতীয় সূত্র। দুনিয়ার এই প্রতিফল অনেক বিষয়ে লক্ষ্য করা যায়। যে ভাল কাজ করে সে ভাল ফল পায়, আর যে খারাপ কাজ করে সে পায় খারাপ ফল। কিন্তু এমনও দেখা যায় যে, একজন অত্যাচারী রাজা বা জমিদার বা ডিক্টেটর সারাজীবন অধীন অসহায় লোকের উপর অত্যাচার ও অবিচার করে যাচ্ছে, তার দুঃখময়

ফল ভোগ করছে এইসব হতভাগ্য লোকেরা। তাদের জীবনে তাদের এই কষ্টের কোন প্রতিদান তারা পাচ্ছে না। অন্যদিকে অত্যাচারী ব্যক্তি প্রকৃতির নিয়মে কিছু প্রতিফল ভোগ করলেও সাংসারিক বহু বিষয়ে সর্দারি উপভোগ করে জীবন কাটিয়ে যাচ্ছে। সে তার জঘন্য অত্যাচার-অবিচার বা শোষণের কোন পুরা প্রতিফল পাচ্ছে না। তাই স্বভাবতই প্রতিফলের একটা জগৎ থাকার তত্ত্ব এসে পড়ে। ইহাই পরকাল নামে পরিচিত। এই পরকাল কল্পনাই বিজ্ঞানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আইনের সঠিকতা প্রমাণ করে।

খ. মানব-মন ও আত্মা এক আশ্চর্যজনক সৃষ্টি। এই মহা ও মহান সৃষ্টি সমৃদ্ধ জীবন—মাত্র এই সীমিত অল্প সময়ের জন্যে এবং অনিত্য—এটা আমাদের মন সায় দিতে চায় না। আমরা তো প্রতিটি জিনিসের এগিয়ে যাওয়ায় ও অগ্রগতিতে বিশ্বাসী। সব থেমে যাবে—এই রক্ষণশীল তত্ত্বে প্রগতিশীল মন মুক্তি ও শান্তি খুঁজে পায় না।

গ. মনোবিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, মনের স্বাস্থ্যের ও স্বস্তির উপর নির্ভর করে মানব-শরীর ও মানব জীবনের সুখ-দুঃখ, স্বাস্থ্য শান্তি সব কিছু। মহত্তর জীবন-বোধ ছাড়া মন ও আত্মার উন্নয়ন সম্ভব নয়। বস্তু-সর্বস্ব সীমিত ক্ষণিক জীবন-বোধ সেই মহত্তর জীবন-বোধ দিতে পারে না; বরং সেই বস্তুবাদী ধারণা মানুষকে করে তোলে উচ্ছৃঙ্খল ও নামিয়ে ফেলে পশুস্তরে। মহত্তর জীবন-বোধ দুনিয়ার বস্তু-সর্বস্ব সীমিত জীবন ধারণায় শিকড় পায় না। স্ফুরণশীল ও প্রগতিশীল অনন্ত জীবন ধারণায় সে বোধ বাসা বাঁধে।

ঘ. দুনিয়ার মহত্তর জীবন-বোধের প্রতিষ্ঠাতা বড় বড় মহাপুরুষেরা যুগে যুগে অশান্তময় দুনিয়ায় শান্তির বাণী প্রচার করেছেন। এইজন্য তারা দুঃখ-কষ্ট ও অত্যাচার-অবিচার সহ্য করে সব মানুষের মঙ্গল ও সত্য প্রতিষ্ঠার উদ্বোধন করেছেন। এদের প্রায় সকলেই আধ্যাত্মিক শক্তি বলে পরকালের ধারণা আয়ত্ত করেছেন। যেহেতু মানব-দরদী এই মহাপুরুষদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মানুষের মুক্তি ও সত্য প্রতিষ্ঠা—তাই এদের প্রায় সকলের প্রচারিত পরকাল তত্ত্বকে অবিশ্বাস করার সবল যুক্তি পাই না আমরা। এই মহাপুরুষদের প্রচারিত ধর্মকে কেন্দ্র করেই দুনিয়ার বড় বড় সভ্যতাগুলি গড়ে উঠেছে।

আল্লাহ্ নেই এটা কি প্রমাণ করা যায়

৬. আল্লাহ্ নেই তার প্রমাণ কি?

আল্লাহ্ নেই—একথা প্রমাণ করা অসম্ভব।

সেদিন আমাদের দেশের একজন উচ্চশিক্ষিত (পদার্থবিদ্যায় ও অঙ্কে ডবল এম. এসসি অধ্যাপক) সন্দেহবাদীর সাথে আলাপ হচ্ছিল। তাকে বললাম ঃ নাস্তিকতা সম্বন্ধে আপনার মত কি? তিনি বললেন আল্লাহ্ বা পরকাল নেই, একথা যারা প্রমাণ করতে চায় তারা বেকুব। না দেখলেই তার অস্তিত্ব অপ্রমাণিত হয় না। সৃষ্টির নগণ্য অংশ মাত্র আমরা দেখি, বাকী সব অদেখা থেকে যায়। অথচ এই অদেখা অনেক কিছুর অস্তিত্বকে মেনে নিতে হয়। বরং আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণ ভবিষ্যতে সম্ভব হতেও পারে, কিন্তু আল্লাহ্ নেই এটা প্রমাণ করা কোনদিনই সম্ভব না।

তকদির ও তদবির

৭. ভাগ্য বা তকদির বলতে আমরা কি বুঝব? মানুষ কি তকদিরে আবদ্ধ? তকদিরের দুটা ভাগ। একটা হল যেটা সে পূর্ব-পুরুষ ও সমাজ থেকে পায়, অন্যটি হল যেটা সে পারিপার্শ্বিক অবস্থার আওতায় নিজের চেষ্টা ও সাধনায় আয়ত্ত করে। প্রথমটাকে বলা যায় আপতিত তকদির—অন্যটি অর্জিত তকদির। পূর্ব-পুরুষ থেকে আমরা পাই মেজাজ, রঙ, দেহের কাঠামো, উত্তরাধিকার ইত্যাদি। এগুলিতে আমার হাত থাকার কথা নয়। সামাজিক অনেক অবস্থা, রীতিনীতি ও আইন আমাকে একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে চলতে বাধ্য করে। আমি যে মেয়ে না হয়ে পুরুষ হয়েছি এবং তাতে মেয়েদের গণ্ডিতে না থেকে বাইরে পুরুষের গণ্ডিতে বিচরণ করছি এটাতেও আমার কোন দায়িত্ব ছিল না। আমি অন্য দেশে বা অন্য সমাজে না জন্মিয়ে বাংলাভাষী মুসলমান ঘরে জন্মেছি এবং এই ঘরে জন্মে মুসলমানী কায়দা-কানুন শিখেছি—এটাতেও আমার হাত ছিল না, এটা আপতিত তকদির। আবার যে নাস্তিক-দেশে জন্মায় সে হয়ত জন্মের পর বড় হতে থাকলে ক্রমশ নাস্তিকতায়-কিংবা এই উপমহাদেশে কোন হিন্দুর ঘরে জন্মিলে ক্রমশ মূর্তিপূজায় অভ্যস্ত হয়। এটা আপতিত তকদিরের প্রভাব। কিন্তু নিজের চিন্তা, তদবির ও কাজের ফলে কেউ মুসলমান

ঘরে জন্ম নিয়েও হতে পারে বিধর্মী। আর কেউ নাস্তিক বা মূর্তি-পূজকের ঘরে জন্ম নিয়েও হতে পারে আস্তিক। এটা অর্জিত তকদির। কৃষক, জমিদার বা মেথরের ঘরে জন্ম নেওয়াটাও আপতিত তকদির বৈ কি। আর অশিক্ষিত গরীব কৃষকের ছেলে হয়েও লেখাপড়া শিখে বড়লোক হওয়ার ক্ষেত্রে অর্জিত তকদিরের বিরাট প্রভাব থাকে।

তবে অর্জিত তকদিরও ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা সামাজিক পরিবেশের উপর অনেকটা যে নির্ভর করে তা বলাই বাহুল্য। মানুষের জীবন এই দুই তকদিরের মিলিত ফল বৈ অন্য কিছুই নয়।

একবার হযরত আলী (রাঃ)-কে কেউ প্রশ্ন করেছিল ঃ তকদির কি ?

তিনি তার উত্তরে বলেছিলেন ঃ তুমি এক পা তুলে খাড়া হও দেখি।

লোকটি এক পা তুলে অন্য পায়ে খাড়া হয়েছিল। তারপর হযরত আলী (রাঃ) আবার বললেন—তুমি দুই পা তুলে খাড়া হও দেখি।

সে বলল ঃ তা তো পারি না হুযুর।

হযরত আলী (রাঃ) তখন বললেন ঃ তুমি যে দুই পা তুলে খাড়া হতে পার না—এটা তোমার তকদির। আর এক পা তুলে যে খাড়া হতে পেরেছ - ওটা তোমার তদবিরের ফল।

এখানে কিন্তু একটা কথা গভীরভাবে বিবেচনা করার আছে।

অনেক গণক বা জ্যোতিষী আছেন যাঁরা হাতের রেখা দেখে বা গণনা করে মানুষের অতীত ও ভবিষ্যতের অনেক কিছু অর্থাৎ তকদির সম্পর্কে বলতে পারেন। এটা কি করে সম্ভব ?

হাতের রেখাও বা কি করে অঙ্কিত হয় ? আর তার সাথে মানুষের অতীত বা ভবিষ্যত জীবনের ইতিহাসও বা কিভাবে লিখিত হয় ?

এ যেন এক অদৃশ্য হিসাবরক্ষক—যে অতীতের হিসাব লিখছে—ভবিষ্যতের গতিরেখা আঁকছে—তদবিরের ফলে সেই রেখাকে আবার নতুন করে টানছে।

এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে একটা অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করতে হয়, যে শক্তি প্রতিটি মানুষের আপতিত তকদির ও অর্জিত তকদিরকে নিয়ন্ত্রিত করে।

এই অলৌকিক শক্তির মূলই কি আল্লাহ্ নয় ?

৫

বিবর্তনবাদ ও আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব

জন্মের পর পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়ে ক্রমশ জীবের অবস্থান উপযোগী হলে প্রথমে অত্যন্ত সরল কোষময় (Simple-celled) জীবের সৃষ্টি হয়। সেই জীব বিভিন্ন পরিবেশে তার জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ক্রমশ জটিল কোষময় (complex) জীবের উৎপত্তি করতে থাকে। এই ভাবে লক্ষ লক্ষ এমন কি কোটি কোটি বছরের পরিবর্তনে জীবজগৎ বর্তমান অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। এই হল বিবর্তনবাদ সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা।

জীব সৃষ্টি হল কিরূপে?

এই প্রশ্নের উত্তরে দুটি মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। একটি হল বিশেষ সৃষ্টিতত্ত্ব (Special Creation Theory) এবং আর একটি হল বিবর্তনতত্ত্ব (Theory of Evolution)। বিবর্তন-তত্ত্বই এত দিন ছিল আধুনিক বস্তুবাদের প্রধান অবলম্বন এবং নাস্তিক্যবাদের প্রধান সহায়ক।

বিবর্তন-তত্ত্ব

ডারউইনের (Darwin) যুগান্তকারী বিবর্তন-তত্ত্ব প্রকাশের পর প্রায় শতাধিক বছর পার হ'তে চলেছে। এর পর অনেক পানি গঙ্গা দিয়ে সাগরে গিয়ে পড়েছে, পুরাতন ডারউইন-তত্ত্বের বহু ত্রুটি ধরা পড়েছে। তারই সাগরেদ বহু বিখ্যাত জীব-বিজ্ঞানী ও ভূতত্ত্ববিদ এর নতুন আকার দান করেছেন।

কিন্তু আমাদের দেশে সাধারণ শিক্ষিত সমাজ ডারউইন-তত্ত্বের এইসব পরিবর্তন সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল নন। আবার আমরা অনেকেই মনে করি বিবর্তন সম্বন্ধে ডারউইন বুঝি শেষ কথা বলে গেছেন। অনেক সময় অনভিজ্ঞ বলে আমরা ভাবি ডারউইন যা বলেছেন তার কিছুই তো বিশ্বাস করা যায় না।

বিবর্তন-তত্ত্ব সম্বন্ধে আর একটি ধারণা হল—সৃষ্টির সব জীব ক্রমশ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষ হয়েছে। এইরূপে বানর না হয় মানুষ হল, কিন্তু গরু বাঘ ইত্যাদি মানুষ হল কিভাবে? সাধারণ মানুষের মনে আরও প্রশ্ন জাগে—মানুষের এত বছরের ইতিহাসে এক জাতের জীব থেকে অন্য জাতের জীব সৃষ্টি হতে দেখা যায় নি—তবে বিবর্তন-তত্ত্ব সত্য হল কি করে?

বিবর্তন তত্ত্ব সম্বন্ধে আর একটি জনপ্রিয় ভুল ধারণা আছে। মনে করা হয় বিবর্তন তত্ত্বের সবদিক পরীক্ষা (Experiment) দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। এইরূপ ব্যক্তিরা মনে করতে পারেন না যে, কোন তত্ত্বই কল্পনা (Hypothesis) ছাড়া সম্ভবপর নয়। তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য হল পরীক্ষা নিরীক্ষা ও কল্পনার মিলনে একটি মতবাদের সৃষ্টি। তত্ত্ব হল একটি সম্ভাবনাময় ধারণা—সম্পূর্ণ পরীক্ষিত সত্য নয়।

উপরে বর্ণিত বিষয়গুলি আরো বোধগম্য হবে যদি আমরা বিবর্তন-বাদের আধুনিক সংজ্ঞা (Definition) জানতে পারি। থিউডোসিয়াস ডব্‌জানস্কি তার 'জেনেটিক্‌স এণ্ড অরিজিন অব স্পেসিস'-এ নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দিয়েছেন।

বিবর্তনবাদের মতে,

১. বর্তমানের বিভিন্ন জীব অতীতের বিভিন্ন জীব থেকে বিবর্তিত হয়ে এসেছে।

২. আমাদের সময়ে বহু জীবের ক্রমবিবর্তনে যে ফাঁক দেখা যায় —তা অতীতের বহু জীব সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞ বলে। যদি অতীতের সব রকমের জীবের প্রমাণ সংগ্রহ করা যেত তা হলে প্রত্যেকটা জীবের বিবর্তনের ক্রমিক বিকাশ দেখানো সম্ভব হত।[১]

এই বিবর্তন সম্বন্ধে ভুল ধারণার সৃষ্টি যেন না হয় এই উদ্দেশ্যে বিবর্তনবাদী বৈজ্ঞানিক এইচ. এইচ নিউম্যান বলেন:

১. বিবর্তন-তত্ত্ব পুরোপুরি যৌক্তিক ভিত্তির উপর নির্ভরশীল।

২. বিবর্তনবাদ বলে না যে, মানুষ সোজাসুজি বানর থেকে জন্ম নিয়েছে; বরং বলে: মানুষ ও বানর অতীতের কোন অজানা সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে জন্ম নিয়েছে।

---

১. Theodosius Dobzhansky—Genetics and The Origin of Species, P.7-8.

৩. বিবর্তনবাদ ডারউইন-তত্ত্ব নয়। কারণ বিবর্তনবাদ সকলের পরীক্ষা ও বুদ্ধিবৃত্তির ফল, ডারউইনের একার নয়।

৪. বিবর্তনবাদ ধর্মবিরোধী নয়—যা অনেকে মনে করে। খ্রীস্টান-ধর্মবিদ অগাস্টিন, থমাস্ একুইনস প্রমুখ বিজ্ঞানী বিবর্তনবাদী ছিলেন।

৫. বিবর্তন তত্ত্ব বলে না যে মানুষই সব বিবর্তন তরিকার শেষ। বরং বলে—মানুষ একটা বিশিষ্ট বিবর্তন প্রক্রিয়ার শেষ। বিবর্তনের শেষ উদ্দেশ্য হল বিশেষ যুগে বিশেষ অবস্থার সঙ্গে পুরোপুরিভাবে খাপ-খাওয়ানো (Adaptation)। অনেক পূর্ণতা পাওয়া জীব বিবর্তনের শেষ সীমায় পৌঁছেছে শুধু ধ্বংস হওয়ার জন্য; কারণ এরা এত পূর্ণ হ'য়েছে যে জগতের তাড়াতাড়ি পরিবর্তনের সাথে নিজকে আর খাপ খাওয়াতে পারে না। অনেক পরিবর্তন তাই শেষ সীমায় এসে পড়েছে; আর বহু জীব তার অপেক্ষায় রয়েছে।

৬. সুতরাং বিবর্তন অতীতের বস্তু নয়, কিন্তু কোন কোন জীব-শ্রেণী (যেমন, মানুষ) বোধ হয় তাদের দৈহিক বিবর্তনের শেষ সীমায় উপনীত হ'য়েছে। কিন্তু এমন বহু সাধারণ জীব-শ্রেণী আছে যারা খাপ-খাওয়াবার সুযোগের অপেক্ষায় আছে।[১]

বলা দরকার যে বিবর্তনবাদীদের মতে যে জীব বিবর্তিত হতে হতে পূর্ণতার শেষ সীমায় আসে সে জীব আর জগতের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে ধ্বংস হয়ে যায়।

লক্ষ্য করার বিষয়—উপরে বর্ণিত আধুনিক বিবর্তনবাদের সংজ্ঞা আমাদের বহু প্রিয় ধারণার বিপরীত।

মনে রাখা অত্যন্ত দরকার যে বিবর্তনবাদ বহু কল্পনার (Assumptions or Hypothesis) উপর নির্ভরশীল। যেমন:

(ক) পৃথিবী যখন প্রথম শীতল হয় তখন জীব-সৃষ্টির কারণ কি? পরিবেশ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে জীব-সৃষ্টি হবে এরও তো কোন নিশ্চয়তাসূচক কারণ নেই। সুতরাং প্রথম জীবের উৎপত্তির ধারণাও কল্পনা মাত্র।

(খ) মানুষ একটি বিশিষ্ট জীবন প্রক্রিয়ার শেষ অবস্থায় এসে থেমেছে;

---

১. H. H. Newman—Evolution Genetics and Eugenics, P. 8-9.

পৃথিবীর অবস্থা ক্রমশ পরিবর্তিত হচ্ছে অথচ এক অবস্থায় থেমে যাওয়ার কারণ কি? পূর্ণতা লাভ করলে ধ্বংস হবে তারও বা কারণ কি? পূর্ণতা লাভ করেছে তারও বা মানে কি? পূর্ণতা কাকে বলে? পূর্ণতা ধ্বংসের কারণ—এটাও তো অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়। পরিপূর্ণ হলে আর খাপ খাওয়াতে পারে না—এও কি একই অযৌক্তিক কল্পনা নয়?

(গ) বিবর্তনের কারণ কি? যে জীবের যা দরকার বা যা হতে চায় তা হয় কেন? আবার তাও এত নিখুঁতভাবে। উদাহরণস্বরূপ মানুষের যে-কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে চিন্তা করা হোক। তা কত সুন্দর ও সুবিন্যস্ত। শুধু পরিবেশেই এরূপ অবস্থা হতে পারে কি?

বিশেষ সৃষ্টিতত্ত্ব

অতীতে ধারণা ছিল প্রত্যেক প্রকারের জীবের সৃষ্টি হয় সৃষ্টিকর্তার দ্বারা। বর্তমানে তার রূপ দাঁড়িয়েছে এমনি:

১. বর্তমানের বিভিন্ন জীব আগে-সৃষ্ট একই জাতীয় জীব থেকে নেমে এসেছে।

২. প্রত্যেকটি জীব-জাতির মধ্যে নানা পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও অন্যান্য কারণে অনেক পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু এই পরিবর্তনে নতুন কোন জীব-জাতির উৎপত্তি হয়নি। মানুষ জাতির মধ্যে স্থান-কাল ও অন্যান্য কারণে পরিবর্তন হয় বটে, কিন্তু পরিবর্তনের পরও মানুষই থাকে, সে নিগ্রো হোক বা জার্মানই হোক। একইভাবে বিড়াল বা অন্যান্য জাতি সম্বন্ধেও একথা খাটে।

৩. একই জাতীয় জীবের মধ্যে যে পরিবর্তন-বিবর্তন আসে তা পরীক্ষার দ্বারা নিরূপণ করা যায়।

ইউরোপ ও আমেরিকায় এখন বহু সংখ্যক নামকরা জীব-বিজ্ঞানী এই বিশেষ সৃষ্টিতত্ত্বের সমর্থক।

বর্ণিত প্রত্যেক জীব তার জাতীয় ভিত্তিতে (after its kinds) সৃষ্টি হয়েছে এ কথা আধুনিক 'বিশেষ সৃষ্টিতত্ত্বে'র সমর্থন করে।

বিবর্তন-তত্ত্বের মূলে

সিনট ও ডান (Sinnot and Dunn, Principle of Genetics 3rd. ed. P, 21-34) সব ধরনের পরিবর্তনের কারণকে দুভাগে ভাগ করেছেন।

পারিপার্শ্বিক কারণ ও ভিতরিক (Autogenous) কারণ। প্রথমটা হয়— জায়গা, আবহাওয়া, খাদ্যের বেশকম ও অন্যান্য কারণে এবং দ্বিতীয়টি হয় উত্তরাধিকার হিসাবে পাওয়া বস্তু (hereditary substance) থেকে।

আলোচনা

বিবর্তন-তত্ত্ব নিম্নলিখিত কয়েকটি পরীক্ষিত সত্য ও ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ঃ

১. সংকর উৎপত্তি (Hybridization or Cross-breading)। বিভিন্ন জীব ও উদ্ভিদের মধ্যে মিলনে যে নতুন ধরনের জীব ও উদ্ভিদের সৃষ্টি তাকেই বলে সংকর।
২. শ্রেণীকরণ (Classification) ইত্যাদি।
৩. আকার-বিজ্ঞান (Morphology)
৪. ভ্রূণ বিজ্ঞান (Embryology)
৫. পুরাতত্ত্ব (Paleontology)
৬. ভৌগোলিক বিন্যাস (Geographical Distribution) ইত্যাদি।

পরিবর্তন সম্বন্ধেও পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। বিবর্তনবাদীদের মতে পরিবর্তন হয় তিন প্রকারের ঃ

(ক) মিলন (Recombination)
(খ) জিন পরিবর্তন (Gene-mutation)[1]
(গ) ক্রমোজোম পরিবর্তন (Cromosom Changes)

(ক) মিলন ঃ পৃথক গুণবিশিষ্ট একই জাতীয় জীবের মধ্যে যদি মিলন হয় তবে সম্পূর্ণ আলাদা গুণের সন্তান উৎপন্ন হতে পারে। অর্থাৎ সন্তান পিতা বা মাতার সেই বিশিষ্ট গুণটি পায় না। যেমন— কাল ও হলদে ইঁদুরের মিলনে ধূসর রঙের ইঁদুরের জন্ম হয়।

---

১. জিন—Gene। যে-কোন জীব সাধারণত তার পূর্বপুরুষের গুণাগুণ বহন করে। প্রত্যেক গুণাগুণের ভিত্তি হিসাবে এক একটি জৈব-পরমাণু কল্পনা করা হয়েছে। এই জৈব পরমাণুকেই বলা হয় জিন। জিন থাকে ক্রমোজোমের মধ্যে। প্রত্যেক জীবকোষে নিউক্লিয়াসের মধ্যে সুতার ন্যায় এক রকম পদার্থ দেখা যায়, তাকেই ক্রমোজোম বলে। ক্রমোজোম রাইবোনিউক্লিক এসিড দ্বারা গঠিত। বিভিন্ন জীবের ক্রমোজোমের সংখ্যা বিভিন্ন। যেমন, মানুষের ২৩ জোড়া আর ড্রসবিলা মাছির ২ জোড়া ক্রমোজোম বিদ্যমান। জীব-বিজ্ঞানীদের মতে জিন ক্রমোজোমের মধ্যে সারির আকারে থাকে।

(খ) জিন পরিবর্তন: পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার পরিবর্তনের সাথে জীবদেহে কোন কোন জীন তাদের গুণাগুণ হারিয়ে ফেলে। ফলে নতুন জীবাঙ্গের উৎপত্তি হয় অথবা সে জাতীয় জীবের কোন অঙ্গের আবির্ভাব হয় না। জীবের এরূপ পরিবর্তনের মূলে থাকে গুণাগুণ বহনকারী জিনের পরিবর্তন। যথা, পা খাটো ভেড়া, শিং ছাড়া গরু, দুইকানি (Double eared) গরু, বহু আঙুলা বিড়াল. গাধাখুরা শূকর এবং নানা নতুন প্রজাতির (Species)[১] উদ্ভিদ।

(গ) ক্রমোজোম পরিবর্তন: জনন-কোষ উৎপন্ন হওয়ার সময় প্রত্যেক কোষের ক্রমোজোম সংখ্যা আধা (Haploid) হয়ে যায়। এভাবে দুভাগ হওয়ার সময় ক্রমোজোমের কোন কোন অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্য আর একটি ক্রমোজোমের সাথে মিলিত হয়। ফলে জিনগুলিরও স্থান পরিবর্তন হয়ে যায়। সুতরাং কোন ক্রমোজোমের দৈর্ঘ্য বাড়ে আর কোনটি খাটো হয়। এই ভাবেই ক্রমোজোম পরিবর্তিত হয়। ক্রমোজোম পরিবর্তনের ফলেই নতুন ধরনের প্রজাতির সৃষ্টি হতে পারে।

সংকর সৃষ্টি

সংকরীকরণের দ্বারা নতুন নতুন রকমের (Species) জীবের যে সৃষ্টি হয় তা জীববিজ্ঞান নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছে। গাধা-ঘোড়ার মিলনে যে খচ্চর হয়, তা বহু পুরনো কাল থেকে জানা কথা। শালগম. মূলা, গোলাপ, ইঁদুর, খরগোস প্রভৃতির বিভিন্ন প্রকারের মিলনে ও বাহ্যিক প্রভাবে নতুন রং, আকার ও প্রকারের উদ্ভিদ এবং জীব সৃষ্টি হয়। পরীক্ষণ দ্বারা তা বিভিন্ন দেশে সম্ভবপর হয়েছে। কিন্তু একটি কথা এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই যে দুয়ের মিলনে তৃতীয় ধরনের আর একটি জীবনের সৃষ্টি হয়, এ শুধু সম্ভবপর দুটি একই জাতীয় (Kind) জীবনের মধ্যে। ইউরোপীয়ান ও নিগ্রো এই দুই প্রকারের মানুষের মধ্যে যদি মিলন হয় তা হলে নতুন ধরনের মেজাজ, রূপ ও বর্ণের সন্তান উৎপন্ন হবে সত্য—কিন্তু এটা সম্ভবপর হয়েছে মানুষে মানুষে (নিগ্রো ও ইউরোপীয়) মিলনে। আর তাদের মিলনে যার উদ্ভব হয়েছে সেও মানুষ। মানুষের সঙ্গে অন্য কোন জীবের মিলনে এ পর্যন্ত অন্য কোন জীবের সৃষ্টি হয়নি। একথা অন্যান্য জীব জগতেও

১. Species—রকম: যেমন নিগ্রো, আর্য, মুগল ইত্যাদি।

খাটে। বাঁশ জাতীয় গাছের (বিভিন্ন প্রকারের বাঁশ, ইক্ষু ইত্যাদি) মধ্যে সংকরীকরণের ফলে নতুন ধরনের উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়, কিন্তু তাও থাকে বাঁশ জাতীয় উদ্ভিদ। আগে যে গাধা-ঘোড়া-খচ্চরের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে তাতেও তিনটি প্রাণীই একই জাতীয় (kind)[১] —যদিও তা ভিন্ন প্রকারের (Species) জীব।[২]

অবশ্য গত ষাট বছর ধরে বিভিন্ন জাতীয় জীবের মধ্যে মিলনে নতুন ধরনের জীবের জন্ম হয়েছে বলে কয়েকটি পত্রিকায় বিবরণী প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু পরে তদন্ত করে দেখা গেছে যে তা মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। ১৯৪৩ সনের ১৫ই এপ্রিল সংখ্যায় সাপ্তাহিক Time-এ লিখিত একটি চিঠিতে নিম্নলিখিত তথ্য প্রকাশ পায়ঃ

"ইণ্ডিয়ানায় পশম-মোরগ নামক একটি নতুন ধরনের প্রাণীর জন্ম দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এর উৎপত্তি হয়েছে নিউজিল্যাণ্ডের লাল জাতীয় খরগোস ও বাক অপিংটন মোরগের সম-মিলনে। উৎপন্ন প্রাণীটি ডিম্ব থেকে জন্ম নিয়েছে এবং তার মাথা খরগোসের মত এবং শরীরটা মোরগের মত.........।"

এরূপ আর একটি নামকরা দৃষ্টান্ত হল ইসকেভেডর (Skvader) নামক উত্তর সুইডেনের একটি প্রাণীর উৎপত্তি নিয়ে।

কিন্তু তদন্ত করে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে এ দুটোই মিথ্যা, দেখুনঃ (Evolution Creation and Science P. 141—145)

শ্রেণীকরণ ও আকার বিজ্ঞান
(Classification and Morphology)

মানুষ ও অন্যান্য জীবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিশেষভাবে পরীক্ষা করার পর এটা প্রমাণিত হয়েছে যে অনেক জীবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অদ্ভুত মিল রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মানুষ এবং গরিলা-শিম্পাঞ্জী প্রভৃতি প্রাণীর মধ্যে অদ্ভুত মিলের কথা উল্লেখযোগ্য। মানুষ এবং এদের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ

---

১. Kind—জাতিঃ যেমন মানব জাতি, বিড়াল জাতি ইত্যাদি।

২. এই প্রকারের বিভিন্ন প্রকারের জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বইগুলি পঠনীয়ঃ Journal of Heredity and Mechanism of Creative Evolution by C. C. Hurst. Man & the Living World by B. Stanford.

কেটে দেখা যাবে, এদের মূল অঙ্গসংস্থানে মিল রয়েছে ; শুধু তাই নয়, এদের ব্যবহারের মধ্যেও কোন কোন বিষয়ে সামঞ্জস্য দেখা যায়। এই সামঞ্জস্যের উপর নির্ভর করে পাহাড়ে জঙ্গলে পাওয়া অতীতের প্রাণীগুলির ফসিল (fossil)-কে এই ভাবে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ (Classification) করা এবং অনুমান করা হয়—বিবর্তনের দ্বারাই এক একটি জীব বর্তমান অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে।

অন্যদিকে বিশেষ সৃষ্টিবাদীরা বলেন যে, শিম্পাঞ্জীর সংগে মানুষের অনেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মিল আছে বলে শিম্পাঞ্জী বা গরিলাকে মানুষের পূর্বপুরুষ ভাবা অনুমান মাত্র। অন্যপক্ষে সহজেই বলা যায় সাধারণ পরিকল্পনা দ্বারা এই সব জীব প্রথম সৃষ্টি করা হয় এবং সেই পরিকল্পনাই এইরকম মিলের জন্য দায়ী। বিবর্তনবাদী হয়েও বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী এ. এইচ. ক্লার্ক (A. H. Clark) বলেন :

মানুষ দুগ্ধপায়ী। আর এও নিঃসন্দেহ যে মানুষের সংগে বিশেষ আকারের বানরের (Anthiopoid apes) বিশেষ আঙ্গিক মিল আছে। এটা পরীক্ষার দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু মানুষের শুধুমাত্র দৈহিক গঠনের মিল দেখে অন্যান্য জীবের সংগে এর প্রকৃত সম্পর্ক নির্ধারণ বা বর্তমান জগতে তার সঠিক স্থান নিরূপণ করা যায় না। দুর্ভাগ্যবশত পৃথিবীতে মানুষের সঠিক রূপ নির্ধারণে বহু জীববিজ্ঞানী উদারতর দৃষ্টিভঙ্গী ত্যাগ করে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে অত্যন্ত সংকীর্ণ পন্থা অবলম্বন করেছেন। শুধু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সর্বস্ব জীবকে মানুষ বলা বাতুলতা

প্রত্যেক প্রাণীর শারীরিক গঠন-কাজ তার মানসিক গঠনের দ্বারা চালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। আর এই মানসিক গঠন সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত পদার্থিকা বা রসায়নের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার মত জ্ঞান আমরা পাই নি। প্রত্যেক রকমের ও জাতির জীবে বিশেষ ধরনের জটিল মনোগঠন দেখা যায় যা ঐ প্রকার জীবের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট। প্রত্যেক প্রকার জীবে এই যে মনোগঠন তা তার দৈহিক গঠনের মতই গুরুত্বপূর্ণ। ক্লার্ক বলেছেন :

Man is a mammal and it is indubitable that in his structure and anatomy man is very close to the manlike or

anthropoid apes. This is easily demonstrable fact which is quite beyond dispute. But a knowledge of the structure of anatomy of man is not sufficient in itself alone to enable us to judge of his true relations to the other forms of life and correctly to appraise his status in the world today. Unfortunately at the present time the broader view point of man's relation to the world at large has among biologists been almost completely superseded by the very narrow view-point that the position of man is to be explained entirely on the basis of his dissected body.

The bodily mechanism of every animal in life is operated and controlled by a mental mechanism which as yet we are unable to explain in terms of physics and chemistry. In each sort and kind of animal his mental mechanism takes the form of a definite complex peculiar to the species. These mental complexes are as much a part of the individuality of species as are the tangible structures of the body. (The New Evolution, by A. H. Clark.—P. 2—3.)

সত্য বলতে কি মানুষের মনের গঠনকে ত্যাগ করে শুধু শারীরিক গঠনের দ্বারা সৃষ্টি-সম্পর্ক স্থাপন অযৌক্তিক বৈ কি। তিনি আরো বলেন ঃ এইভাবে চিন্তা করা মানে জীববিজ্ঞান একটা সংকীর্ণ গোঁড়া মতবাদে পরিণত হয়েছে—এ যেন একটি নিষ্প্রাণ ধ্বংসাবশেষের বিজ্ঞানে পর্যবসিত হয়েছে—যা ভূ-বিজ্ঞান, পদার্থ ও রসায়নের মিলন ক্ষেত্র মাত্র—যেন মানুষের উন্নত ও মহত্তর গুণের গভীরতর দিকে এর কোন সম্পর্ক নেই।

To do this is to admit that the science of biology is the science that deals with living things, has crystalised into a narrow orthodoxy—a science of dead remains, a short of common meeting of geology, chemistry and physics—a science with no bearing upon those deeper problems which concern cosmic qualities and values. (do, P.4.)

এই প্রসংগে উল্লেখ করা যায় যে—জি-আই-রমনেস তার 'ডারউইন ও ডারউইন পরবর্তী' (Darwin & After Darwin, Vol. I.P.55-57) কিতাবে বিশেষ সৃষ্টিতত্ত্বেরই সমর্থন জানিয়েছেন।

অকেজো অঙ্গ

অনেক জীবের এমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখা যায় যা কাজে লাগে না অথচ ঐ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্যজীবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংগে মিল আছে। এটা হতে বিবর্তনবাদীরা অনুমান করেন—আগে অকেজো প্রত্যঙ্গ কাজে লাগত কিন্তু ক্রমশ বিবর্তনের ফলে এগুলো অকেজো হয়ে পড়েছে।

অকেজো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অনেক অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়।

ঘোড়ার পায়ের ইসপ্লিন্ট (splint) হাড়, পাখীর পাখার সূচী (index) আঙুল, ভ্রূণ-ভেড়ার কাঁধের হাড় (collarbone of embryo-sheep), মানুষের ভ্রূণ লেজ (the embryonic tail of man), মানুষের জ্ঞান-দাঁত (the wisdom teeth) ইত্যাদি অকেজো অঙ্গ। বিশেষ সৃষ্টিবাদীরা বলেন—প্রথমতঃ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অনেকগুলো—যাকে আমরা অকেজো মনে করি—তারা অকেজো নয়। বয়সের বিভিন্ন স্তরে এদের জরুরী কাজ রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, যে কয়টি অকেজো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখা যায় তার দ্বারা বিবর্তন-বাদ প্রমাণিত হয় না। একই জাতীয় জীবের মধ্যে পরিবর্তন বিশেষ সৃষ্টিবাদীরা স্বীকার করেন। সুতরাং একই জাতীয় জীবের কোন কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিবর্তন হওয়া অস্বাভাবিক নয়। সামান্য দাঁত বা লেজ অকেজো হ'য়ে যাওয়ায় ভিন্ন জাতীয় জীবের উৎপত্তি বুঝায় না।

ভ্রূণ বিজ্ঞান ও শারীর বিজ্ঞান

ফ্রিটজ মুলার (Fritz Muller ১৮২১-১৮৯৭) এবং অনেকে পুনরাবর্তন তত্ত্ব (Recapitulation Theory) দিয়ে ভ্রূণের পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন। বহু বছর ধরে এই তত্ত্ব প্রায় সকলের কাছে গৃহীত হয়ে চলেছিল। এই তত্ত্ব অনুযায়ী—ভ্রূণ-অবস্থায় যে জীব আগে যে যে পূর্বপুরুষ থেকে ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থায় এসেছে—তার স্তরগুলো অতিক্রম করে। সহজ দৃষ্টান্ত দিলে বলতে হয়—মানুষ যে গরিলা এবং তারও আগের যে সব জীব থেকে বিবর্তিত হ'য়ে বর্তমান রূপ পেয়েছে ভ্রূণ থাকাকালীন সময়ে সেসব অবস্থার রূপ গ্রহণ করে।

ব্যাঙও যে ব্যাঙাচি অবস্থায় লেজযুক্ত মাছের মত থাকে—তার কারণ হল ব্যাঙের পূর্বপুরুষ ছিল মাছ। তাই বেঙাচি অবস্থায় সে সেই আগের অবস্থায় পুনরাবর্তন করে। এটা যেন পূর্বাবস্থা স্মরণ করার মত ব্যাপার (Reminiscenes)

ভ্রূণাবস্থায় প্রতিটি জীব বিভিন্ন আকার ধারণ করে সত্য, কিন্তু এটা যে বিবর্তিত পূর্বাবস্থার পুনরাবর্তন—এটা বলা ঠিক নয় বলে বর্তমানে অনেক জীববিজ্ঞানী মনে করেন। হুয়েটনার (A. F. Huettner তাঁর Fundamentals of Comparative Embryology of the Vertebrates P. 48) বলেন ঃ বিধি হিসাবে এই তত্ত্বকে সন্দেহ করা হয়েছে। এই তত্ত্বকে ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখা গেছে ঃ এই তত্ত্বে বহু ভুল ধরা পড়েছে। এর ব্যতিক্রম আছে অনেক অনেক। (As a law the principle has been questioned. It has been subjected to careful scrutiny and has been found wanting. There are too many exceptions to it.)

আসলে এটা একটা অনুমানের উপর নির্ভর করা কল্পনা মাত্র। বৈজ্ঞানিকেরা পুনরাবর্তন তত্ত্বের বিরুদ্ধে বহু বিষয় উত্থাপন করেছেন। তার মধ্যে নিম্নলিখিত দুটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা হল ঃ

ক. একটি সর্বজনগৃহীত প্রাকৃতিক নীতি হল—প্রকৃতি তার সব কিছুর পরিবর্তনে সব চাইতে কম শক্তি নিয়োগ করে। অর্থাৎ প্রকৃতি সব সময় সহজতম পথেই চলে। আলো বিজ্ঞানে এ নীতি পরীক্ষিত সত্যরূপে গৃহীত হয়েছে। অথচ পুনরাবর্তন তত্ত্ব বলে ঃ জীব ভ্রূণাবস্থায় পূর্বতন বহু জীবের আকার পরিবর্তন করতে করতে তার পরিপূর্ণ রূপ নেয়। যদি পূর্বে বর্ণিত প্রাকৃতিক আইনকে মানতে হয়—তো এই তত্ত্ব টিকে না।

খ. জীবের বেলায় এই পুনরাবর্তন আছে বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়, কিন্তু উদ্ভিদের বেলায়? সত্যই উদ্ভিদের বেলায় এরকম কোন ঘটনা ঘটে না। পুনরাবর্তন যদি হয় তো—জীব এবং উদ্ভিদ সবটিতেই তা হওয়া উচিত। বিবর্তনবাদীরা এখানে নিরুত্তর।

অন্যান্য আলোচনার জন্য C. B. Couvill-এর The Casual Significance of Parallelism : An Inquary into Certain Fundamental Principles of Embryonic Development পঠনীয়।

সৃষ্টিবাদীদের মতে ভ্রূণাবস্থায় জীবন রক্ষার খাতিরেই তার সাময়িক বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও রূপ প্রকাশ পায়। এটা কোন মতেই পূর্বতন অবস্থা-গুলোর পুনরাবৃত্তি নয়।

শারীর বিজ্ঞান (Physiology) থেকে আর একটি ঘটনা নিয়ে বিবর্তন-বাদের পথে যুক্তি খাড়া করা হয়। বিখ্যাত প্রেসিপিটিন-পরীক্ষা (Precipitin Test) দিয়ে—রক্তের শ্রেণী ভাগ করা হয় এবং এটা দিয়ে বিভিন্ন জীবের মধ্যে রক্তের সম্বন্ধ নির্ণয় করা হয়। বিভিন্ন জীবের মধ্যে একই রকম রক্ত পাওয়া গেলে সে দুটি জীবন অতীতে একই অবস্থা হতে বিবর্তিত হয়েছে বলে অনুমান করা হয় এবং একেই বিবর্তনের একটি প্রধান প্রমাণ হিসাবে চিন্তা করা হয়।

এর যারা বিরুদ্ধে তাঁরা বলেন : রক্ত একই রকম হলে—একই জীব থেকে উৎপত্তি হবে এর কোন মানে নেই। তাদের মতে রক্ত হল একটি বিশেষ রাসায়নিক বস্তু মাত্র—heriditary বস্তু নয়। পাখী এবং মানুষের নখ একই রাসায়নিক বস্তু দিয়ে তৈরি বলে তারা একই জাতের—এটা বলা অবান্তর বৈ কি।

এরা আরো বলেন : মানুষের মধ্যে ৪টি রক্তশ্রেণী (Blood Group) আছে—O, A, B আর AB। A রক্তের মা B রক্তের ছেলের জন্ম দিতে পারে ; অধিকন্তু ভিন্ন শ্রেণীর রক্ত বলে দরকার হলে এদের একজনের রক্ত আর একজনকেও দেওয়া যাবে না। কাজেই এর অর্থ এই নয় যে, মা ও ছেলের মধ্যে সম্বন্ধ ছিল না।

পুরাতন জীবনের ইতিহাস (Paleontology)

ইহা প্রধানত ফসিলের ইতিহাস। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন স্তরে অতীত জীবনের যেসব চিহ্ন (যেমন: হাড়, খুলি, জীবের শরীরাংশের দাগ প্রভৃতি) পাওয়া যায়, তা-ই ফসিল বলে পরিচিত। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় পলিপড়া মাটির স্তর আছে—এই স্তর কোন স্থানে শূন্য আর কোন স্থানে প্রায় ২/৩ মাইল গভীর। এই সব স্তরে অতীতের নানা রকম জীবনের চিহ্ন (ফসিল) পাওয়া যায়। এই ফসিল দেখে মাটির বিভিন্ন স্তরের বয়সও নির্ণয় করা যায় বলে সবার আগে ভূ-তত্ত্ববিদ উইলিয়ম স্মীথ (১৭৬৯—১৮৩৯) মত প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে একে ভিত্তি করেই ঠিক করা হয় যে অতীতে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রকমের জীব পৃথিবীতে

বিচরণ করত। প্রথম ছিল—হাড়হীন সহজ-সরল জীবন—আরকিওজয়িক যুগে (Archeozonic Age)। এরপর থেকে পেলিওজোয়িক (Paleozoic) যুগের প্রথমভাগ পর্যন্ত কোন স্থল-উদ্ভিদ ছিল না। পানিতে ছিল নিম্নস্তরের কাঁটাবিহীন প্রাণী। এই যুগের মধ্যভাগে—বীজহীন উদ্ভিদ, নিম্নস্তরের বীজ-উদ্ভিদ এবং পরে কোন কোন গাছের উৎপত্তি হয়। এই সময়ে সহজ ধরনের দাঁড়াযুক্ত মাছেরও উৎপত্তি হয়। পেলিওজোয়িক যুগের শেষের দিকে মাছ থেকে বিভিন্ন রকমের সরীসৃপ (যেমন সাপ) জন্ম লাভ করে। এর পরে আসে মেসোজোয়িক (Mesozoic) যুগ। এই সময়ে সরীসৃপের 'রাজত্ব' চলে এবং ক্রমশ সরীসৃপ থেকে পাখী ও দুগ্ধপায়ী জীবের উদ্ভব হয়।[১]

এখানে অবশ্য কয়েকটি কল্পনার (assumptions) সাহায্য নেওয়া হয়েছে। ধরে নেওয়া হয়েছে যে, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রকমের জীবের উৎপত্তি হয় এবং যে সব মাটির স্তরে একই রকম জীবের ফসিল পাওয়া যায় সে সব স্তর একই কালে সৃষ্টি হ'য়েছে। এই ধরে নেওয়ার ফলে বিবর্তনকেও স্বীকার করে নেওয়া সম্ভব হয়েছে।

কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে—বিভিন্ন যুগে সৃষ্ট বলে কথিত নানা রকম ঘোড়ার ফসিল একই যুগের মাটির স্তর থেকে পাওয়া গিয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে সব রকম ঘোড়া একই কালে অবস্থান করত—একটার পর একটার জন্ম হয়নি।

সত্য কথা বলতে কি বিবর্তনের জন্য ফসিলকেই সব চাইতে বিশ্বস্ত প্রমাণ হিসাবে স্বীকার করা হয়ে থাকে। সরল জীবন থেকে ক্রমশ জটিল জীবনের দিকে যে বিবর্তন তা শুধু ফসিলের ইতিহাস হতেই জানা যেতে পারে। ডানবর (Dunbar) বলেন জীবিত প্রাণী ও উদ্ভিদ-এর তুলনামূলক বিচার থেকে ভাল পারিপার্শ্বিক প্রমাণ পাওয়া সম্ভব হলেও ফসিলই আমাদের একমাত্র ঐতিহাসিক দলিল-নির্ভর প্রমাণ দেয় যে—জীবন ক্রমশঃ সরল অবস্থা থেকে জটিল রূপ ধারণ করেছে।

While the comparative study of living animals and plants may give very convincing circumstantial evidence, fossils provide

---

১. See W. J, Miller: An Introduction to Historical Geology 4th ed, and Also George M. Price: The New Geology.

the only historical, documentary evidence that life has evolved from simple to more and more complex forms.

অথচ একটির উপর আর একটি মাটির স্তরে এই বিবর্তনীর ক্রম দেখা যায় না। এই যে ক্রমিকভাবে মাটির স্তর পাওয়া যায় না—তা ডারউইন, টি. এইচ. হাক্সলি, লা কোতে (Le Coute) প্রমুখ বৈজ্ঞানিক স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন।[১]

বিখ্যাত বিজ্ঞানী ক্লার্ক (A. H. Clark) তাঁর The New Evolution-এর ১০০-১০৫ পাতায় বলেন ঃ ফসিল দেখে বিবর্তন প্রমাণ করা কঠিন। তিনি বলেন– যখন আমরা যে কোন যুগে অনেকগুলি ফসিল দেখি ঃ আমরা তার একটি বেছে নিয়ে বিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি ঃ

> এটা কাঁকড়া জাতীয় (Crustacean) কিংবা স্টারফিশ (Starfish) কিংবা ব্রেকিওপদ (Brachiopod) কিংবা এনেলিদ (annelid) কিংবা অন্য জাতের প্রাণী।
>
> যেহেতু বর্তমানে জীবিত প্রাণীর আকৃতির সংজ্ঞা (definition) থেকে আমরা এই সমস্ত ফসিলকে যে কোন একটি জাতের সদস্য হিসেবে পরিগণিত করতে পারি এবং যেহেতু বিভিন্ন স্তরে পাওয়া ফসিলকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বড় বড় গ্রুপের কোন প্রাণীর সংজ্ঞা বদলাবার বা প্রসার করবার কোন আবশ্যকতা হয় না, এজন্য এটা স্বভাবত প্রমাণিত হয় যে, ফসিল রেকর্ডের গোটা ইতিহাসে এই সমস্ত বড় যুগের কোন পরিবর্তন ঘটে নি। অন্য কথায় এই সমস্ত বড় গ্রুপের মধ্যে পরস্পর সম্পর্কও অপরিবর্তিত রয়েছে।
>
> প্রত্যেক জাতের প্রাণীর সম্পর্ককে জীবন-সৃষ্টির শুরু থেকে সমান্তরালভাবে (parallel) এ পর্যন্ত এসেছে ধরে নেওয়া যত যুক্তিসংগত—একটি কাল্পনিক সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে সমস্তই উৎপন্ন হ'য়ে দূর অতীতের কোন সময়ে পরিবর্তিত হয়েছে বলা তত যুক্তিযুক্ত নয়। .... বিজ্ঞান কতকগুলো স্থিরকরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যেভাবে আমরা এই সত্য পাই—সেভাবে আমরা গ্রহণ করি এবং এগুলোকে সাধারণভাবে শ্রেণীবদ্ধ করি। বর্তমানে প্রচলিত সমস্ত বড় গ্রুপে সব ফসিল যে পড়ে, এমন কি প্রথম যুগের ফসিলও, এই সত্য সন্দেহাতীত।

---

১. Origin of Species by Charles Darwin—Para 2, P. 52.

"When we examine a series of fossils of any age we may pick out one and say with confidence— this is a crustacean or starfish or a brachiopod or an annelid or any other type of creature as the case may be.

Since all these fossils are determinable as members of their respective groups by the application of definition of these groups drawn up from and based entirely on living types, and since none of these definitions of the phyla or major groups of animals need be in any way altered or expanded to include the fossils, it naturaly follows that throughout the fossil record these major groups have remained essentialy unchanged. This means that ineter-relationships between them like-wise have remained unchanged.

.......................it is much more logical to assume a continuation of the parallel inter-relationships further back into the indefinite past, to the time of the first beginnings of life, then to assume somewhere in early pre-cambrian times a change in these inter-relationships and a convergence towards a hypothetical common ancestral type from which all were derived.

....................................science is based on ascertained facts. We take the facts as we find them and co-ordinate them into broad generalizations. The facts are that all of the fossils, even the very earliest of them, fall into existing major groups ; this is indisputable.

আবার সিমসন (G.G. Simpson) ১৯৪৪ সনে বলেন ঃ বিভিন্ন প্রকারের জীবের মধ্যে ক্রম-সম্পর্কহীনতা (discontinuity) এত বেশী এবং উচ্চস্তরের জীবের মধ্যে এত প্রবল যে-এক সময়ে ক্রম-সম্পর্ক পাওয়াই যায় না। (See Tempo & Mode in Evolution P. 99) । এই যে বিভিন্ন জীবের মধ্যে অমিল এটাই বিবর্তন তত্ত্বের পক্ষে একটি বিরাট বাধাস্বরূপ।

এক রকম পাখি আছে যার লেজ সরীসৃপের লেজের মত (Archaeopteryx) । এর থেকে ধরে নেওয়া হয় যে, সরীসৃপ থেকেই পাখি সৃষ্টি

হয়েছে। এটা অনুমান মাত্র। ডাকবিল (duck bill) দুগ্ধপায়ী জীব ও সরীসৃপের মত। তাই বলে কি এটা একটা সরীসৃপ থেকে উদ্ভব হয়েছে বলে ভাবতে হবে?

ডব্লিউ. জে. টিংকল বলেন:

আমরা দেখেছি: কিভাবে অবস্থান বিবেচনার চাইতে স্তর মধ্যকার ফসিল দেখে মাটি স্তরের বয়স নির্ণয় করা হয়। আমাদের দুর্ভাগ্য যে এই কারণে বর্তমান গবেষণার জন্য এই ভূতাত্ত্বিক রেকর্ডের মূল্য নেহায়েত কম। কেননা যদি মাটি-স্তরের বয়স নির্ণয়ের জন্য ফসিল ব্যবহার করা হয় তবে আমরা অমনি উল্টা ঘুরে বলতে পারি না যে মাটির স্তর দেখে ফসিলের বয়স নির্ধারণ করা যাবে। বিবর্তনবাদী ভূতাত্ত্বিক বিবর্তন-তত্ত্বকে সত্য বলে ধরে নিয়েই তার উপর সমস্ত পরীক্ষা নির্ভর করান। এই কারণে এ রকম বিবর্তনবাদীর পাওয়া তথ্য দিয়ে প্রমাণ করা যায় না যে সরল আকার থেকে প্রাণী জগতের উদ্ভব হয়েছে।

Already we have seen how the age of rock strata is estimated by the included fossils much more often than by its position. Unfortunately for us this makes the geologic record of very little value for the present study for if the fossils are used to tell the age of the rocks, we cannot turn around and use the rocks to tell the age of the fossils. The evolutionary geologist assumes the truth of the Theory of Evolution and bases his study upon it. Consequently his findings, cannot be used to prove that animals have developed from simple forms.—(Fundamentals of Zoology, P. 438)

জৈবিক অভিযোজন (adaptation) দ্বারা জীবের বিভিন্ন অংশের উৎপত্তি হয়—একথা বহুদিন ধরে জীববিজ্ঞানে প্রচলিত ছিল। —কিন্তু মানুষের চোখ বা মস্তিষ্কের মত এমন জটিল (complex) ও কার্যকরী অংগের উদ্ভব অভিযোজন দ্বারা হয়েছে বলা অযৌক্তিক বৈ কি? বিবর্তনবাদী দবজানস্কিও (Dobzhanski) কি করে প্রাণের উদ্ভব হল তার উত্তর দানের অসুবিধা সম্বন্ধে বলেন:

উপরের সমস্যাগুলো ব্যাখ্যা করার জন্যে নীচে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের কতকগুলো দৃষ্টান্ত দেওয়া হ'ল।

> কল্পনা করুন যে একটি বাক্সের মধ্যে ছাপার টাইপ নিয়ে একটি বানর ঝাঁকি দিচ্ছে। ঘটনাক্রমেও কি টাইপগুলি দান্তের 'ডিভাইন কমেডি' নামক পুস্তকটি রচনা করতে পারে? প্রথম দৃষ্টিতেই এই অসুবিধা-যা স্বয়ং ডারউইনকেও হতভম্ব করেছিল—জীববিজ্ঞানের ভিতরের ও বাইরের বহু চিন্তাবিদের কাছে তা গৃহীত হয়নি। ভান ক'রে লাভ নেই যে (বানরের উদাহরণ দিয়ে) সেই অসুবিধা সন্তোষজনকভাবে সমাধান করা হয়েছে।
>
> The following analogy or its variants, have been suggested to illustrate the above difficulty. Imagine monkey Shaking boxes containing printer's type. Could the letters even arrange themselves by chance to produce Dante's Divine Comedy? At first sight this difficulty —which had already perplexed Darwin, appears well nigh insuperable, so much so that it has made all forms of Darwinism unacceptable to many thinkers in & out of biology. There is no use pretending that this difficulty has been satisfactorily solved.

অন্য কথায় বলা যায়ঃ যাঁরা হঠাৎ (by chance) জীবন সৃষ্টি হয়েছে বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করার চেষ্টা করে—তাদের বোঝা উচিত—হাজার হাজার বছর ধরে বানরের টাইপ নিয়ে খেলা করার দ্বারা কবি দান্তের 'ডিভাইন কমেডী' সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। অথচ বিশেষ সৃষ্টিতত্ত্ব মেনে নিলে এ সমস্যা (difficulty) সহজেই দূরীভূত হয়।

উপরে যা বলা হল তাতে দেখা যাবে, বিশেষ সৃষ্টিতত্ত্বকে নস্যাৎ করবার শক্তি এখনও বিবর্তনতত্ত্ব পায় নি। বিশেষ সৃষ্টিতত্ত্বের সমর্থকেরা বলেনঃ বিবর্তন যে হয় তা সত্য, কিন্তু এটা হয় এক একটি প্রজাতির (kind) মধ্যে সীমাবদ্ধভাবে। ইহা স্বীকার করে নিলে বিশেষ সৃষ্টিতত্ত্ব তথা আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া গতি থাকে না। বিবর্তনতত্ত্বে যে বহুকল্পনা অলৌকিকতার (miracles) অস্তিত্ব রয়েছে তাও আজ বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে। বৃটিশ জীববিজ্ঞানী

ডগলাস ডিওয়ার বলেন, বিবর্তনতত্ত্ব অলৌকিকতার অবসান কামনা করেছিল সত্য—কিন্তু তার দ্বারা তা সম্ভব হয় নি। এটা বিশেষ সৃষ্টিতত্ত্বের অলৌকিকতাকে নতুনভাবে পরিবেশন করেছে মাত্র।[১]

অর্জিত গুণের বংশানুক্রমিক বিস্তার ও মেণ্ডেলের প্রজনন শাস্ত্র (genetics)

চার্লস ডারউইন তাঁর তত্ত্বে বলেছিলেন, প্রাকৃতিক নির্বাচন ও অন্যান্য কারণে জীবন সংগ্রামে জীবগুলো যে সমস্ত গুণ আহরণ করে তা বংশগতভাবে সংক্রমিত হয়। এই তথ্য যে ভুল তা বিজ্ঞানীরা অনেকে উনিশ শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। জার্মান বিজ্ঞানী অগাস্ট ওয়াইজম্যান (August Weismann) লেজবিহীন ইঁদুর উৎপাদন করতে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন। ইঁদুর জোড়ার যৌন মিলনের পূর্বে তিনি লেজগুলো কেটে দেন। বিশ জেনারেশন পর্যন্ত চেষ্টা করেও দেখা গেল, শেষ জেনারেশনের ইঁদুর বাচ্চাগুলোর লেজ তাদের পূর্ব পুরুষের মতই লম্বা। এতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল: অপ্রাকৃতিক ভাবে সংঘটিত লেজহীনতা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করা সম্ভব নয়। ১৯৬৬ সনে (Review Text in Biology) বইতে এই পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়।

প্রজনন বিদ্যা পারদর্শী এইচ. জে. মুলার নোবেল প্রাইজ লাভ করেছিলেন। তাঁর ভাষায় পারিপার্শ্বিকতার বলবান প্রভাবে শরীর মোটামুটিভাবে প্রভাবিত হলেও সেলে (কোষে) জিনের পরিবর্তন হয় না। ফলে প্রভাবিত বাচ্চার কোন অর্জিত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় না।

লাইচেনকো ছিলেন রাশিয়ার উদ্ভিদবিদ্যাবিদ। তিনি বিভিন্ন শস্য গাছে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে উন্নতমানের নতুন শস্য উৎপাদনে সক্ষম বলে প্রকাশ করেছিলেন। এই সম্বন্ধে টাইম মেগাজিন ১৯৬৫ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে লেখেন, তার এই মতাদর্শ এমন কি কম্যুনিস্টদের দ্বারাও প্রত্যাখ্যাত ও বাতিল বলে গণ্য হয়। টাইম মেগাজিন আরো বলে—জন্ম সংক্রান্ত সেলে (cell) অবস্থিত জিন দ্বারা উত্তরাধিকার নিয়ন্ত্রিত হয় এবং তা জীবনভর অপরিবর্তিত থাকে।

---

১. The Man for Monkey Myth—the Nineteenth Century & After, April, 1944.

জীবন সংগ্রাম বা পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে অর্জিত গুণ উত্তরাধিকার ধারায় সংক্রমিত হয় বলে লামার্ক (Lamark) যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তাও ভুল বলে প্রত্যাখ্যাত হয়। (see CL.Review Text in Biclogy ; edited by Hall and Lenser—Page 363)।

গ্রেসর মেণ্ডলের নাম জীববিজ্ঞান জগতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রতিষ্ঠিত নাম। তিনি ছিলেন একজন পাদ্রী এবং বৈজ্ঞানিক। প্রজনন বিজ্ঞানে তাঁর গবেষণা ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে পূর্ব প্রতিষ্ঠিত ধারণার অসারতা প্রদর্শন করে।

ডারউইনের সমসাময়িক অস্ট্রেলিয়ার এই বিজ্ঞানী একটি অখ্যাত বিজ্ঞান পত্রিকায় তাঁর এই গবেষণার ফল প্রথম প্রকাশ করেছিলেন। এই গবেষণা দীর্ঘকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে লুক্কায়িত থেকে যায়। এই সুযোগে ডারউইনের বহু কল্পনা-সমৃদ্ধ বিবর্তনবাদ পৃথিবীর সর্বত্র জেঁকে বসতে সমর্থ হয়। ইহা স্বয়ংসিদ্ধ যে মেণ্ডেলের গবেষণা যথাযথ প্রকাশিত ও বিবেচিত হলে ডারউইন তত্ত্বের দাঁড় পানি খুঁজে পেত না। তাহলে জীববিজ্ঞানী থমাস হাক্সলিও আর ডারউইনের ক্রমবিবর্তনবাদকে অযৌক্তিক উচ্চ প্রশংসার মোড়কে সাজিয়ে তাকে এত জনপ্রিয় করে তুলতে পারতেন না।

হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমেস্ট্রির অধ্যাপক উইলিয়ম এস বেক "আধুনিক বিজ্ঞান ও জীবনের প্রকৃতি" শীর্ষক গ্রন্থে কয়েক বছর আগে বলেছেন ঃ ডারউইনের বই মানুষকে খুবই প্রভাবিত করার কারণে মেণ্ডেলকে বুঝার জন্য কেউ সঠিক চেষ্টা করেন নি। মুলারের মতে মেণ্ডেল এই সময়কার প্রচলিত বিশ্বাস ও ভাবনা থেকে অনেক এগিয়ে ছিলেন বলে অনেকে তাঁর আবিষ্কারের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন নি। মেণ্ডেল বংশানুক্রমিতার কার্যধারা এবং তার গবেষণার সঠিক পদ্ধতি সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণার অধিকারী হয়েছিলেন। মুলারের ধারণা মেণ্ডেল তার যুগের বহু আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

কিন্তু এ কথা বলা তো ইতিহাসেরই অপব্যাখ্যা করা। এমনও ঘটেছিল যে ১৯৫০ সনে আমেরিকার জেনেটিক সোসাইটি মেণ্ডেলের আবিষ্কারের পঁচাশিতম জন্মবার্ষিকী পালন না করে ৫০তম জন্মবার্ষিকী পালন করেছিল। ইতিহাসের প্রতি ইহা ছিল চরম অবিচার, কারণ মেণ্ডেলের

গবেষণা প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত বংশগত উত্তরাধিকার বিদ্যা সঠিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নাই। মেণ্ডেলের আবিষ্কার ছিল বংশগত উত্তরাধিকার কার্যধারার সঠিক যান্ত্রিক ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। (Modern Science and Nature of Life, P. 221)

আমরা আগেই বলেছি : জীবকোষে ক্রমোজোম নামক সূক্ষ্ম জীবাণু থাকে। প্রত্যেক প্রজাতির মধ্যে ইহার সংখ্যা হয় বিভিন্ন ও নির্দিষ্ট। মানব দেহে ইহা থাকে ২৩ জোড়া। পুরুষ ও নারীর মিলনে যখন গর্ভের সঞ্চার হয় তখন পুরুষের শুক্রকীট ২৩টি, স্ত্রীর ডিম্বকোষের ২৩টি ক্রমোজোম নিয়ে এসে দুটা মিলে ২৩ জোড়া ক্রমোজোমের যোগে নবতর সংগঠনে ভ্রূণের উদ্ভব ঘটায়। এইজন্যই এ ভ্রূণ মা ও বাপের দুজনের বৈশিষ্ট্যময় হয়ে থাকে।

ক্রমোজোম হল বহুসংখ্যক জিনের সমষ্টি। প্রতিটা জিনই এক একটা বিশেষত্বের ধারক ও বাহক। এই জিনের সাহায্যেই প্রজাতির বিশেষত্বটি উত্তরাধিকারসূত্রে সংক্রমিত হয়।

ক্রমোজোম ও জিন স্বাভাবিকভাবেই স্থিতিশীল, কিন্তু কোন কারণে যদি একটি ক্রমোজোমও গুরুতররূপে আহত হয় তবে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সন্তানের বংশধারা সামনে আগাতে পারে না। ফল হয় জীবনধারার ইতি—বন্ধ্যাত্ব। আর যদি গুটিকয়েক জিনও আহত হয় তবে সন্তানের মধ্যে দেখা দেয় পংগুত্ব।

এই তত্ত্বের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে অর্জনমূলক কার্যধারার কারণে সন্তানের কোন পরিবর্তন সূচিত হয় না অর্থাৎ ডারউইনের অর্জন-ভিত্তিক বিবর্তনবাদ অনুসারে পরিবেশের চাপে কিংবা চেষ্টা প্রসূত কারণে বংশানুক্রমিক কোন পরিবর্তন হয় না।

উল্লেখ্য যে-এটম বোমা জাতীয় কোন মারাত্মক রেডিয়েশনের কারণে যদি জিনের কোন পরিবর্তন হয়, তা বংশধারায় সংক্রমিত হয় বটে, তা সন্তানের জন্য কোন কল্যাণকর হয় না। হয় বন্ধ্যাত্বে ও মারাত্মক ত্রুটিপূর্ণ সন্তানের বংশধারায় পর্যবসিত। ফলে এতে উন্নীত ক্রমবিকাশ সম্ভবপর হয় না। উইলিয়ম বেকের কথায়—মেণ্ডেলের গবেষণা প্রত্যেক প্রজাতি ও তার জিনকে পরিবর্তন-অযোগ্য ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা হিসাবে ঘোষণা করে। অন্য কথায় স্ত্রীপুরুষের মিলন ব্যতীত ক্রমোজোম

বা জিনের সংযোগ হয় না বলে এবং জীবন সংগ্রামে বা পরিবেশের প্রভাবে এই জনন বস্তুর পরিবর্তন ঘটে না বলে ডারউইনীয় ক্রমবিবর্তন স্বপ্নিল কল্পনায় পর্যবসিত হয়।

বিবর্তন সম্বন্ধে আধুনিক দর্শন

জীবদেহের কার্য-প্রকৃতি মূলত যন্ত্রের কার্যপ্রকৃতি থেকে পৃথক। জীব-প্রকৃতি মেশিনের স্বরূপ দ্বারা ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। মনে হয়, জীবন একটি মৌলিক সত্তা। অধিকন্তু ইহা সৃষ্টিশীল। ইহা জীবদেহের স্বরূপগুলোকে এমনভাবে তৈরী ও ব্যবহার করে যাতে তার উদ্দেশ্য ও স্বার্থ সিদ্ধ হয়। এই কারণে সৃষ্টিধর্মী বিবর্তনবাদের উদ্ভব হয়েছে। এই তত্ত্ব এমন একটি উদ্দেশ্যশীল শক্তি বা নীতির প্রমাণ দেয়, যা জীবদেহে থেকে একটি আপাত দুর্জ্ঞেয় উদ্দেশ্যের দিকে পরিচালিত করার তাগিদে ক্রমশঃ উন্নততর জীবনের বিকাশ সাধন করছে।

অতীতে জীববিজ্ঞান ডারউইন তত্ত্বকে অবলম্বন করে নাস্তিক্যবাদী ভাবের বিস্তার করেছিল। আধুনিক জীববিজ্ঞান আজ নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছে জীবন বস্তুধর্মী যন্ত্র নয়, জীবন একটি মৌলিক ব্যাপার। অধিকন্তু এটা সৃষ্টিশীল ও উদ্দেশ্যশীল। এখন বলা হয়:

> The mode of behaviour of a living organism is fundamentally different from that of a Machine and can never be explained in terms of it. Life, it seems, is fundamental; moreover it is creative, and uses and moulds forms of living organism as instruments to further its purposes and serve its ends. Hence arise theories of Creative Evolution as the expression of a purposive force or principle which manifesting itself in living organism, seems to achieve ever higher qualities of life in the effort to realise some objective at which we can at present only deemly guess.

এর অর্থ এই যে, আধুনিক দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরা ভাবছেন: বিবর্তন সত্য হলেও সেটা অন্ধভাবে ঘটছে না। এমন সুন্দর ও সুসমঞ্জস সৃষ্টি বিনা চিন্তায়—বিনা পরিকল্পনায় সম্ভব নয়। প্রত্যেকটি বিবর্তনধারার মধ্যে একটা মহামন কাজ করছে। এই মহামনই প্রত্যেকটা বিবর্তনের ধারার মধ্য দিয়ে একটা উদ্দেশ্যের দিকে সৃষ্টিকে পরিচালিত করছে।

সুতরাং জীববিজ্ঞান আজ একটি মহামনের দিকে—একটি উদ্দেশ্যশীল সত্তার দিকে আমাদের নিয়ে যাচ্ছে।

অন্য কথায় যে বিবর্তনবাদ নাস্তিকতার পোষক হিসেবে দেখা দিয়েছিল তারই আধুনিক রূপ আজ তাকে আস্তিকতার মাহাত্ম্যে উন্নত করে তুলে ধরছে।

বস্তুবাদ ও বস্তু

ডারউইনবাদের সৃষ্টি হয়েছিল তখন—যখন বিজ্ঞান বস্তুবাদের গুণগানে ভরপুর ছিল। বিজ্ঞানে এখন স্বয়ং বস্তুবাদের বস্তুই বস্তুত্ব হারিয়ে মহিমান্বিত হয়ে উঠছে। পদার্থবিজ্ঞান অণু-পরমাণুকে ভেঙে বস্তুকে এমন পর্যায়ে এনেছে—যাতে তাকে আর মৌলিকভাবে বস্তু বলে চিনবার উপায় নেই। বস্তুর বস্তুত্বই যেন আজ উবে গেছে।

উনিশ শতকের পদার্থবিজ্ঞান ছিল প্রকৃতই বস্তুবাদী, কিন্তু বস্তু এমন অবস্থায় আছে যাকে না যায় ধরা—না যায় দেখা। আগে বস্তু সম্বন্ধে ধারণা ছিল—এটা হবে স্থায়ী, দৃশ্যমান; এবং জগতের প্রাকৃতিক আইনের দ্বারা হবে চালিত ও নিয়ন্ত্রিত। অর্থাৎ বস্তু কম-বেশী মেশিনের মত কাজ করবে। কিন্তু বিশ শতকের বিজ্ঞান বস্তু সম্বন্ধে এই ধারণা দূর করে দিয়েছে। আধুনিক বস্তু আকারহীন দুর্বোধ্য—স্থান-কালের মাঝে এটা এক সূক্ষ্ম সত্তা, বিদ্যুতকণা কিংবা কোন সম্ভাব্য ঢেউ যা শূন্যে বিলীয়মান। প্রায়ই বস্তু আর বস্তু থাকে না, সে দর্শক বা অনুভবকারীর কাল্পনিক ছায়া হয়ে দেখা দেয়। আধুনিক বস্তু এত রহস্যাবৃত হয়েছে যে আধুনিক কালে অন্য কিছুর চাইতে মনের দ্বারা যে-কোন ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা সহজ বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

Nineteenth century physics was essentially materialistic. Now matter was something which one would not see and touch. Parallel with this belief that the real must be a substance tangible and visible, was the belief observed that it must be subject to the laws which were to operate in the physical world—that it must work, in short, like a machine. Today the foundation for this whole way of thinking–the hard obvious simple lumps of matter has

disappeared. Modern matter is something infinitely attenuated and is elusive, It is a hump in space, a mush of electricity, a wave of probability undulating in nothingness. Frequently it turns out not to be a matter at all, but a projection of the consciousness of its perceiver. So mysterious indeed has it become that the modern tendency to explain things in terms of mind is little more than a preference for explanation in terms of the unknown rather than of the more.

অধিকন্তু পদার্থবিজ্ঞানের কয়েকটি বিপ্লবাত্মক আবিষ্কার সব কিছুকে ওলট-পালট করে উনিশ শতাব্দীর অনেক বৈজ্ঞানিক ভাবধারার কবর তৈরি করেছে। আইনস্টাইনের আপেক্ষিক (Theory of Relativity), হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তাবাদ (uncertainty Principle) বা শক্তি-কণাবাদ (Quantum Theory) আজ বৈজ্ঞানিক মনকে বস্তুবাদ থেকে ঝেটিয়ে স্রষ্টার অস্তিত্বের স্বীকারের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি ও মূলনীতি নির্ধারক উপাদান হল পদার্থ-বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান। বস্তু ও জীবন নিয়েই বিজ্ঞানের কারবার, আর এই দুটি শাখা আজ স্রষ্টার অস্তিত্বের পরিপোষক।

কুরআনের একটি কথা আজ বারবার মনে পড়েঃ জগতের ও আকাশের প্রতিটি বস্তুতে ও গতিতে সত্যান্বেষীদের জন্য চিহ্ন রয়েছে। সত্যই আজ বিজ্ঞান সেই চিহ্ন আমাদের জ্ঞান চোখে ধরিয়ে দিয়ে আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাসকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে সাহায্য করছে।

কুরআন ও বিবর্তনবাদ

বিবর্তনবাদ তত্ত্বের মধ্যে এখনো যে বহু অনিশ্চয়তা ও সংশয় রয়েছে তার সব কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা দূর করা এখনো সম্ভব হয়নি। ফলে বিবর্তনতত্ত্ব যে ভাবে এখন বিরাজ করছে তা টিকবে কি না তাও ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত আছে।

কাজেই বলা যায়ঃ বিবর্তন সম্বন্ধে শেষ কথা বলার সময় এখনো আসেনি। আমরা আগেই দেখিয়েছিঃ ডারউইনের সময় যে ধারণা ছিল বর্তমানে তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার

ফলে ভবিষ্যতেও যে এ ব্যাপারে আমাদের চিন্তাধারার পরিবর্তন করতে হবে তা বলাই বাহুল্য। এখনো বহু সংখ্যক অনুমানের ওপর নির্ভর করে এই তত্ত্বকে প্রকাশ করা হচ্ছে।

আমরা আরো দেখিয়েছি ঃ বিবর্তন কোন একটা শ্রেণীতে সীমাবদ্ধভাবে সংগঠিত হলেও সবক্ষেত্রে সীমাহীনভাবে ঘটে বলে পরীক্ষিত প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধভাবে ঘটুক আর বিস্তৃতভাবে ঘটুক একটা কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে ঃ অণু-পরমাণু থেকে শুরু করে গ্রহ-উপগ্রহ সূর্য-তারকা পর্যন্ত সব কিছুতেই যে অদ্ভুত নিয়ম ও শৃঙ্খলা বিরাজমান— অতি ক্ষুদ্র সরলতম কীট থেকে শুরু করে মানুষ পর্যন্ত জটিল জীবের গঠনে ও ক্রিয়াকলাপে যে মানবাতীত কারিগরি, সামঞ্জস্য ও নিয়ম বর্তমান, তাতে এই সিদ্ধান্ত না করে উপায় নেই যে, পুরা বিবর্তনক্রিয়ার মাধ্যমেই হোক আর শ্রেণীর সৃষ্টির মাধ্যমেই হোক একটা মহান উদ্দেশ্য এই জীবন সংগঠনের মাধ্যমে কাজ করছে। নিশ্চয়ই একটা মহামন হলো এর হোতা।

কুরআনে বিবর্তন ও সৃষ্টি সম্বন্ধে বহু আয়াত আছে। এই সমস্ত আয়াত আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম ও বিবর্তনবাদ তৈরী হওয়ার আগে স্পষ্ট-ভাবে বোঝা যেত না। বিবর্তন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক বহু আলোচনার দ্বারা এদের অনেকগুলো এখন স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে। ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের আলোচনার সংগে সংগে বাকী আয়াতগুলোও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

নীচে আমরা কয়েকটি আয়াত তুলে ধরছি। বিজ্ঞানমনা পাঠক বুঝতে পারবেন এই আয়াতগুলোতে কি অমূল্য জ্ঞানাংকুর নিহিত আছে।

১. পৃথিবী দুবারের সৃষ্টি—উঁচু পাহাড় সৃষ্টি, বৃষ্টি তৈরি, ইত্যাদি। [৫১-১০৯, ১০, ১১]

২, সব কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে ঠিক পরিমাণে ও অনুপাতে। [৫৪—৪৯]

৩. আল্লাহ্ সূর্য সৃষ্টি করেছেন—সৃষ্টি করেছেন চাঁদ ও তারা। আর এ সবই আইনের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। [৭—৫৪]

৪. তিনি তোমাদের এক জীব-জন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং সম প্রকৃতির সঙ্গিনী দিয়েছেন যেন একসাঙ্গে তারা বসবাস করতে পারে। [৭—১৮৯, ৩৯—৬]

৫ আল্লাহ্‌ই সৃষ্টির ধারা শুরু করেন আর পুনরাবৃত্তি করেন। [১০—৪]

৬. মানুষ ছিল এক জাতি—পরে তাদের মধ্যে ভিন্নতা দেখা দেয়। [১০ - ১৯]

৭. মানুষকে উঠানো হয়েছে মাটি হতে, এবং মাটিতে তার বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। [১১ – ৬১]

৮. তিনি মানুষকে (রাসায়নিক) ক্রিয়াশীল কাদা (জাতীয় জিনিস) হতে সৃষ্টি করে আকার দান করেছেন। আর জিনকে[১] সৃষ্টি করেছেন আগুন জাতীয় জিনিস হতে। [১৫—২৬]

৯. একটি শুক্র ফোটা হতে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। [১৬—৪]

১০. আল্লাহ্‌ই প্রত্যেক জিনিসকে এর আকার ও প্রকৃতি দান করেছেন। [২০— ৫০]

১১. অবিশ্বাসীরা কি দেখে না যে, আলাদা করার আগে আকাশ (আকাশের জোতিষ্ক) ও পৃথিবী একত্র ছিল ?[২]

১২. আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি প্রথম কাদাবস্তু হতে পরে শুক্রবস্তু হতে - পরে জোকাল (জোঁকের মত) ব্যাকটেরিয়া হতে, 'পরে মাংসপিণ্ড হতে যার কিছুটা আকার পায় আর কিছুটা পায় না। [২২--৫]

১৩. মানুষকে আমরা সারভাগ হতে সৃষ্টি করে তাকে শুক্র হিসাবে বিশ্রামাগারে স্থির রাখলাম। [২৩—১৩, ১৪]

১৪. সব জীবকে আল্লাহ্ পানি হতে সৃষ্টি করেছেন ঃ এদের কোনটি হামাগুড়ি দিয়ে চলে—কোনটি চলে দুপায়ে আর কোনটি চলে চার পায়ে।[৩] [২৪—৪৫]

১৫. আল্লাহ মানুষকে পানি হতে সৃষ্টি করেন—পরে তিনি বংশগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। [২৫—৫৪]

---

১. এই জিন মানে gene নয়, জিন জাতি।

২. বিবর্তনবাদের মতে পৃথিবীর সৃষ্টি হবার আগে উহা সূর্যের অংশ ছিল। পরে নৈসর্গিক আকর্ষণে বিচ্ছিন্ন হয়ে গ্রহরূপে আলাদা হয়ে যায়।

৩. বিবর্তনবাদ অনুসারে সৃষ্টির আদিতে সমুদ্রে সরলতম (এককোষী) জীবের সৃষ্টি হয়, সেখান থেকে ক্রমশ বহুকোষী জীবের সৃষ্টি হতে থাকে; আরো পরে বিভিন্ন মাছ এবং সরীসৃপ (যারা হামাগুড়ি দিয়ে চলে)—এবং পরে অন্যান্য চৌপদী ও দ্বিপদী জীবের উদ্ভব হয়।

১৬. আল্লাহ্ সৃষ্টি শুরু করেন ও পরে পুনরাবর্তন (repeats) করেন। আল্লাহ্‌র পক্ষে এটা সহজ।

১৭. দুনিয়া ঘুরে দেখ—আল্লাহ্ কিভাবে সৃষ্টি আরম্ভ করেন।[১] একই-ভাবে তিনি পরবর্তী সৃষ্টি করবেন, কারণ সব কিছুর উপর আল্লাহ্‌র শক্তি আছে। [২৯—১৯ ও ২০]

১৮. আল্লাহ্ সৃষ্টির ধারা প্রবর্তন করেন—তারপর পুনরাবৃত্তি করেন। [৩০—২৭]

১৯. আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছেমত সৃষ্টিতে যোগ করেন। [৩৫—১]

২০. আসমান জমিনের সৃষ্টির উদ্দেশ্য আছে। [৩৮—২৭, ৪৫—২২]

২১. যা-তা খেলার জন্য নয়—একটা মহৎ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। [৪৪—৩৮, ৩৯]

---

১. ডারউইন ও অন্যান্য জীববিজ্ঞানী বহু দেশ ভ্রমণ করে বিভিন্ন জীব সম্পর্কে জ্ঞান ও ধারণা অর্জন করেন।

সমাজ ও ধর্ম

উপসূচী

১. একমাত্র পথ ১৪৯

২. আধুনিকতা ও ঐতিহ্যবোধ ১৮৮

৩. বিশ্ব-অশান্তি ও ধর্ম ১৯৩

৪. কুরআনের আলোকে সার্বজনীন ও চিরন্তন আদর্শ ১৯৯

৫. অমরত্বের সাধনা ২০৩

১
একমাত্র পথ

[লেখা-পরিচিতি ঃ একমাত্র পথ-এর মূল লেখক ছিলাম আমি। সাপ্তাহিক সৈনিকের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মোকাদ্দমার কাজ ও তমদ্দুন মজলিসের বাগেরহাট শাখার কাজ সেরে ঢাকা আসার পথে স্টিমারে উহা লিখে শাহেদ আলী সাহেবকে সম্পাদনা করতে দেই। সম্পাদিত লেখাটি আমি দুজনের নামে একটি ছোট পুস্তিকাকারে পাকিস্তান আমলের ১ম ভাগে তমদ্দুন মজলিস থেকে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করি। ১৯৬৭ সনে আমার লেখা আর পাঁচটি পুস্তিকা (মুক্তি কোন্ পথে, ঘোষণা, বিবর্তনবাদ, সৃষ্টিতত্ত্ব ও আল্লাহর অস্তিত্ব, ইসলাম কি দিয়েছে ও কি দিতে পারে এবং হাত কাটা কি এ যুগে চলে) আর উক্ত পুস্তিকাকে সংশোধিত ও পরিবর্ধিত আকারে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আমার ব্যস্ততার কারণে সংস্কার ও পরিবর্ধনের কাজটি সম্পন্ন করার জন্য আমি শাহেদ আলী সাহেবকে অনুরোধ করি। এজন্য বহু বিলম্ব করা সত্ত্বেও শাহেদ আলী সাহেব (সম্ভবত তাঁর ব্যস্ততার কারণে) তা করতে অপারগ হন। ফলে পুস্তিকাটি বিপুলভাবে সংশোধিত ও পরিবর্ধিত করে প্রায় ৩৫ পৃষ্ঠার এই রচনাটি তাতে সংযোগ করি। ১৯৬৭ সনের মে মাসে 'একমাত্র পথ' নামে সংযুক্ত বইটি প্রকাশ করি। তাকে আমি আরো সংশোধন ও সম্পাদন করে সম্মিলিত বইটির বাংলাদেশ সংস্করণ বের করার ব্যবস্থা করি ১৯৭৩ সনে। 'বিজ্ঞান-সমাজ-ধর্ম' বইতে তা সংযোগ করার জন্য ওটাকে আরো সংশোধন ও পরিবর্ধনের আবশ্যকতা দেখা দেয়। শাহেদ আলী সাহেবকে এবারও তা সম্পন্ন করতে বলি। এবারও তিনি পারেন নি। ফলে এবারও আমাকে তার বিস্তৃত সংশোধন ও পরিবর্ধনের কাজ সেরে নিয়ে এই বইতে সংযোজন করতে হয়।]

সৃষ্টির আদি থেকে মানুষ আদর্শের জন্য সংগ্রাম করে আসছে। এককভাবে বা সামাজিকভাবে সে যুগে যুগে আদর্শের জন্য জিহাদ করেছে। মানবসমাজকে উন্নত স্তরে পৌঁছাবার চেষ্টা করেছে। আদর্শের জন্য মানুষের স্বার্থত্যাগ ও আত্মত্যাগের অমর কাহিনীতে ইতিহাস ধন্য হয়ে আছে।

আত্মিক বিশৃঙ্খলার দরুন, আর মানব জীবনের বিকৃতির দরুন ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। সমাজের বাইরের রূপ তার মনেরই প্রতিফলন বললে বেশী বলা হয় না। বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশ মানুষের মন-জীবনের উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করে সন্দেহ নেই, কিন্তু মন-জীবনের বিকৃতি হলে তার খারাপ ফল সমাজে নিশ্চিতভাবে দেখা দেয়। একমাত্র মহত্তর আদর্শই মন বিকৃতির ঔষধ। মানুষ যখন দুঃখ-কষ্ট ও দুর্গতির শেষ সীমায় গিয়ে পেঁাছে, তখনি দরকার হয় আদর্শের। সেই আদর্শ একদিকে তার আত্মিক স্থিরতা তথা ভারসাম্য আনে অন্যদিকে সমাজে ও রাষ্ট্রে শৃঙ্খলা কায়েম করে। ফলে, মানুষ আবার পরিবেশের সংগে তার একাত্মতা ও সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার নিবিড় বাঁধন অনুভব করে। পথভ্রষ্টদের পথ ছেড়ে আবার সে কল্যাণের পথে—মানবতার পথে এগিয়ে যায়।

আদর্শকে অনুসরণ করতে গিয়ে মানুষ তার আত্মবিশ্বাস ফিরে পায়, সংসারের সকল রকম বাধা-বিপত্তিকে তুচ্ছ করে অবিরাম জিহাদ চালিয়ে যাবার সাহস পায়; কারণ, সে জানে, আদর্শ একটা খেয়ালী কল্পনার হাতছানি নয়, এর পেছনে আছে সদা-জাগ্রত বিশ্ব মনের সমর্থন। তাই, আদর্শকে কেন্দ্র করে পৃথিবীতে একেকটি ধর্ম বা মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। আর সেই ধর্ম বা মতবাদকে কেন্দ্র করেই বিভিন্ন জাতি সভ্যতার উচ্চতম চূড়ায় পেঁাছেছে।

যাজক-তন্ত্রের উৎপীড়ন ও গোঁড়ামীর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ মধ্যযুগে ইউরোপ রাষ্ট্র ও শিক্ষাজীবন হতে ধর্মকে নির্বাসন দেয়; ফলে ধর্মের মহৎ দিকগুলিও ইউরোপীয় সমাজ ও শিক্ষাজীবন থেকে অনেকটাই নির্বাসিত হয়; সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক নীতি ও পুঁজিবাদ তাদের আদর্শ হয়ে দাঁড়ায়। এই ঔপনিবেশিকতা ও পুঁজিবাদ মানব সমাজকে সামগ্রিকভাবে এতই নিচে ঠেলে দেয় যে, সমাজের অধিকাংশ লোক মানুষের মত বেঁচে থাকবার সুযোগ ও অধিকার থেকেও বঞ্চিত হয়। ফলে নৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকট তীব্রভাবে দেখা দেয়। মানুষের রাষ্ট্রীয় জীবনে নৈতিক প্রশ্নটা চিরন্তন এবং এর গুরুত্বও সব চাইতে বেশী। কিন্তু সেটা অর্থনৈতিক কিংবা সামাজিক সংকটের মত অনুভবযোগ্য নয় বলে সাধারণত সেদিকে কেউ নজর দেন না। আমাদের মতে আজ এ দিকটা সম্বন্ধে গভীরভাবে তলিয়ে দেখবার সময় এসেছে।

যেকোন দিকে তাকালেই আমরা দেখতে পাই, অতীতের ঘুণে-ধরা সমাজব্যবস্থাকে ভেঙে-চুরে সম্পূর্ণ নতুন বুনিয়াদের উপর এক নতুন সমাজের ইমারত গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা আজকের সামাজিক কর্মী, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ ও দার্শনিকদেরে অস্থির করে তুলেছে। তাঁরা নতুন কিছু চান। এমন কিছু চান—যা মানুষের সামগ্রিক বিকাশের সহায়তা করবে, তার ব্যক্তিত্ব গঠনে—তার মনুষ্যত্বের স্ফুরণে সাহায্য করবে।

আপাতদৃষ্টিতে, অর্থনৈতিক সংকটই আজ সবচাইতে বড় সমস্যা। কারণ ভাত-কাপড়ের প্রয়োজনীয়তাটা বোঝবার জন্য দার্শনিকতা করার প্রয়োজন হয় না। ফলে, মার্ক্স প্রবর্তিত কম্যুনিজম বা অর্থনীতিবাদ চাঞ্চল্যকর মতবাদ হিসাবে অনেকের কাছে খুবই আকর্ষণীয়। যার খিধে আছে, কাপড়ের অভাব আছে, সে সহজেই এমনি ধরনের দর্শনের দিকে ঝুঁকে পড়তে পারে।

কিন্তু নিকৃষ্ট জীবগুলির মত মানুষের শুধু খাদ্য-সমস্যা তথা অর্থাভাবই একমাত্র সমস্যা নয়।[১] অবশ্য, মানুষের দৈহিক-জীবনধারণ অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল এবং আর সব সমস্যা জীবনের উপর নির্ভরশীল; কাজেই অর্থনৈতিক সমস্যা মানব-সমাজের সংগে যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাতে সন্দেহ করার কিছুই নেই। কিন্তু এ ছাড়াও তামদ্দুনিক, আধ্যাত্মিক, ধর্মীয়, নৈতিক, যৌন ও আদর্শিক—ইত্যাদি অসংখ্য সমস্যা রয়েছে মানুষের। এসব সমস্যা অতীতের বিভিন্ন সময়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে; এবং তা নিয়ে যুদ্ধ হয়েছে, বিবর্তন এসেছে, বিপ্লব ঘটেছে; তারই ফলস্বরূপ জাতির উত্থান-পতন হয়েছে।

একথা সত্য যে সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রের যুগে কম্যুনিজম আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তির আশ্বাস দিতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু মনে রাখতে হবে, পুঁজিবাদ পৃথিবীর সম্পদ গুটিকতক পুঁজিপতির হাতে সঞ্চিত রাখতে চায়, আর কম্যুনিজম সেই সম্পদকেই সর্বহারাদের মধ্যে ভাগ করে দিতে চায়—দু'য়েরই চরম ও পরম উদ্দেশ্য হচ্ছে ধনোপার্জন,

১. পশু-পক্ষীরও খাদ্যাভাব ছাড়া যৌন-সমস্যাও রয়েছে। একথা বিনা দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, বর্তমানের আর্থিক অসাম্য কিছুটা দূর হলে মানব জীবনের অন্যান্য সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে।

অন্তহীন অর্থনৈতিক প্রাচুর্যের আকাঙ্ক্ষা। এর বাইরে কোন মহৎ উদ্দেশ্য কারও নেই। কিন্তু প্রচুর খেতে-পরতে পেলেই যে মানুষ সুখী হয়, তার সকল দুঃখের অবসান হয়, সে চরম স্বাধীনতা ভোগ করে, মানুষ সত্যিকার মানুষ হয়—একথা স্বীকার করলে মানুষের মনুষ্যত্বকেই অস্বীকার করতে হয়।

কাজেই কম্যুনিজমের বিপ্লবী অর্থনীতি সত্ত্বেও, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তার অসম্পূর্ণতা ধরা পড়েছে। শুধু তাই নয়, কম্যুনিজমের যারা ধারক ও বাহক—তারা কম্যুনিজমকে এমন এক স্তরে নিয়ে এসেছেন, যেখানে ব্যক্তি-মানুষের স্বকীয় সত্তা বিলুপ্ত হয়েছে,—তাকে পরমাণুকৃত করা হয়েছে।[১] সমাজ নামক এক অশরীরী জীবের খেলার পুতুল হিসাবে সে তার ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে হারাতে বসেছে। ব্যক্তির অনন্যসাধারণতা অস্বীকৃত হয়েছে বলে—তার চিন্তা ও বিচারের স্বাধীনতা, বাক্যের স্বাধীনতা, ভিন্নমত পোষণের স্বাধীনতা[২], প্রচারের স্বাধীনতা, সংগঠন বা সভা-সমিতি করার স্বাধীনতা আজ বিলুপ্ত হয়েছে। মানুষ সমাজ বা রাষ্ট্রনিরপেক্ষ নয় তা সত্য—কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, জীবনের একমাত্র বাহন হচ্ছে ব্যক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্র নয়। এক-নায়কত্ব আর নীতিহীন এক-দলীয় শাসনের যাঁতাকলে সেই ব্যক্তির জীবন ও তার বহুমুখী ভাবধারা আজ নিষ্পিষ্ট। তবু এতো করেও সমাজের আর্থিক অসাম্য দূর করা সম্ভব হয়নি। বরং মার্ক্সিজমের নির্ধারিত আদর্শ-কম্যুনিস্ট সমাজ-ব্যবস্থা থেকে রাশিয়া ও অন্যান্য কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রগুলি অনেক দূরে সরে গেছে। বাস্তব ক্ষেত্রে ধাক্কা খাওয়ার ফলে কম্যুনিস্ট আন্দোলন শুধু যে রাশিয়া ও চীনপন্থী এই দুটি যুদ্ধশীল শিবিরে বিভক্ত হয়েছে তা নয়—এটা শত শত শিবিরে ভাগ হয়ে গেছে। শুধু কি তাই, অর্থনৈতিক সাফল্য আশানুরূপ না হওয়ায় রাশিয়া সহ বহু কম্যুনিস্ট দেশে পুঁজিবাদী দেশগুলির অনুকরণে ব্যক্তি নির্ভর অর্থনীতির প্রচলন হচ্ছে বিপুলভাবে।

---

১. এম. এন. রায়।

২. বিশ্বজনীনতার অপরাধে অভিযুক্ত বিখ্যাত সাহিত্যিক 'দস্তয়ভস্কির বা পেস্টারনাকের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবুন। লেনিনকে সমালোচনা করার এবং শিল্পীদের স্বাধীনতা দাবী করায় হাঙ্গেরীর জগদ্বিখ্যাত কম্যুনিস্ট-চিন্তানায়ক অধ্যাপক লুকাক্সকে কম্যুনিজম ও সোভিয়েতের শত্রু বলে প্রচার করা হয়েছে। (স্টেটসম্যান, ২১শে জুলাই, ১৯৫৯)।

অপরদিকে নাস্তিকতাকে কেন্দ্র করে যে মার্ক্সবাদ তথা কম্যুনিজমের দর্শন প্রসার লাভ করেছে তাও বাস্তব ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করতে পারে নি। মার্ক্সবাদের জন্ম মার্ক্সের বিক্ষুব্ধ মস্তিষ্কে; তাঁরই কঠোর একচোখা চিন্তার ফল হচ্ছে এই মতবাদ—এজন্য মানব-হৃদয়ে এর পবিত্র আবেদন নেই, এ শুধু মানুষের মনকেই বিক্ষুব্ধ করে। বিশুদ্ধ মার্ক্সবাদ গুটিকতক ব্যক্তির মানসিক পরিবর্তন আনতে পারে, কিন্তু বিশাল জনতার মানসিক পরিবর্তন ঘটাতে সে অক্ষম। মানুষের বুদ্ধিজাত সকল মতবাদ সম্বন্ধেই একথা খাটে। এ জন্যই রাশিয়া থেকে ধর্ম বিতাড়ন করা তো সম্ভবই হয়নি, বরং রাশিয়া পারিপার্শ্বিকতার চাপে পড়ে ধর্মকে অস্বীকার করতে পারছে না।[১]

অনেক মনীষীর ধারণা, কম্যুনিজমও একটি তথাকথিত ধর্মে পরিণতি লাভ করেছে। "আমার ধর্মের অনুসারী ছাড়া আর সবাই কাফির বা ভ্রান্ত"—এই কুসংস্কারও কম্যুনিস্টদের মধ্যে প্রসার লাভ করেছে। কম্যুনিস্টরা যা করে তা-ই ভাল, শ্রমিকরা যা করে তা নীতিসঙ্গত (moral), মার্ক্স বা স্টালিন যা বলেছেন—তাই অকাট্য এবং অভ্রান্ত সত্য, কম্যুনিস্ট ছাড়া আর সবাই দালাল—এ সবের সংগে তথাকথিত ধর্মীয় গোঁড়ামী ও ধর্মান্ধতার হুবহু মিল আছে। কার্যত, রাশিয়ার কম্যুনিস্ট দল কোন অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত বা কাজ করলেও অন্যান্য দেশের কম্যুনিস্টরা যে তাকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়—তার অনেক দৃষ্টান্ত আছে।[২]

১. দেখুন, মস্কো থেকে প্রকাশিত The Call of Russian Church। ১৯৪৮ সালে রাশিয়া কর্তৃক মক্কায় হাজীদের পাঠানো ও ১৯৪৯ সালে সোভিয়েতের তাসখন্দে অনুষ্ঠিত মুসলিম সম্মেলনও এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য। রাশিয়া তার মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে ধর্মের স্বীকৃতি না দিয়ে পারেনি। বর্তমানে চীনে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের উপাসনাগারের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে যা মাওয়ের নেতৃত্বে পরিচালিত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল।

২. দেখুন, 'সাম্রাজ্যবাদ ও রাশিয়া'—শাহেদ আলী। Independent India-তে ভি. আর. কার্নিক লিখছেন:

"With Communist, good and evil, virtue and vice are always sharply defined and they are not in doubt as to where it lies. It lies in—"whatever Soviet Russia does or thinks, and that should be done."

১৯৮৩ সনে ইরানে কম্যুনিস্ট পন্থী তুদেহ পার্টির প্রধানদের রাষ্ট্রদ্রোহিতার জন্য যে বিচার হয় তাতে উক্ত পার্টির প্রধান নূরুদ্দিন সহ নেতৃস্থানীয় সকলে কোর্টে স্বীকার করেন: তারা সবাই রাশিয়ার নির্দেশে স্বদেশের বিরুদ্ধে ক্ষতিকর কাজ করেছেন, আন্দোলন করেছেন ও গুপ্তচর বৃত্তি করেছেন। তাদের গুপ্তচর বৃত্তির কাজের বিবরণও কোর্টে পেশ করেছিলেন। এজন্য তারা কোর্টে প্রকাশ্যে দুঃখও প্রকাশ করেছিলেন।

ধর্মে নবুয়তের (Prophethood) প্রতি যে অন্ধভক্তি দেখা যায়, কম্যুনিজমের নেতাদের প্রতিও কম্যুনিস্টরা তেমনি সীমাহীন অন্ধভক্তি দেখিয়ে থাকেন। স্ট্যালিনের প্রতি এই ভক্তি কতদূর গড়িয়েছিল তা আজ ভুলবার নয়।

সুতরাং কম্যুনিজম—নিপীড়িত জনগণের যতই আশার সঞ্চার করতে সমর্থ হোক, পুঁজিবাদ, ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদের দুষ্ট প্রভাব থেকে মানব-সমাজকে রক্ষা করবার যতই সে শক্তি রাখুক না কেন, আদর্শ হিসাবে এ নিখুঁত নয়।

ফলে এই অসম্পূর্ণ আদর্শ দ্বারা মানব-সমাজের সমস্যার সমাধান বা সর্বাঙ্গীন উন্নতিও সম্ভব নয়। এক সময় কম্যুনিজমের প্রতি পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র একটা অদম্য আকর্ষণ গড়ে উঠেছিল। প্রায় প্রতিটি অনুন্নত দেশে এর অপ্রতিরোধ্য প্রভাব বিস্তার লাভ করেছিল। কিন্তু আজ সে অবস্থা আর নেই। এর বিভিন্ন দোষ ধরা পড়েছে বলেই আজকের দুনিয়ায় এর প্রতি আকর্ষণ বহু পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। রাশিয়া তার আদর্শের শক্তির উপর আর নির্ভর করতে পারছে না এবং তার প্রতি বিশ্বের জনমতও বহু ক্ষেত্রে বিরূপ প্রমাণিত হওয়ায় সে অস্ত্রবলের দ্বারা অনেক দুর্বল জাতিকে কবজা করে রেখেছে। এইভাবে পূর্ব ইউরোপের কম্যুনিস্ট পন্থী হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোলাণ্ড, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশে সাম্রাজ্যবাদী পন্থায় পাশবিক শক্তিবলে অভিযান চালিয়ে অনেকগুলি দেশকে দখল করে রেখেছে।

অন্যদিকে, এটা বলাই বাহুল্য যে, পশ্চিমের তথাকথিত গণতন্ত্র তার সংকীর্ণ পরিধিকেও পশ্চিমেই সীমাবদ্ধ রেখেছে। সেই গণতন্ত্রে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ খুব কমই আছে। পশ্চিমা গণতন্ত্র কর্তৃক মানব-সমাজের জন্য শান্তি ও সুখ আনয়ন করা তো দূরের কথা, বরং এর আওতায় ঘৃণ্য সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদ অধিকতর অনুন্নত দেশ ও অনুন্নত সম্প্রদায়গুলিকে শোষণে-শাসনে সর্বস্বান্ত করেছে।

কাজেই, সত্য কথা বলতে কি, মানব-সমাজের সামনে আজ নিখুঁত 'আদর্শের দুর্ভিক্ষ' দেখা দিয়েছে। ফলে, চিন্তাশীল ব্যক্তিরা কি করবেন, ঠিক করতে পারছেন না। পৃথিবী যেন একটা তরল অবস্থার মধ্যে এসে পড়েছে।

কিন্তু, মানব-সমাজের সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও প্রগতি কোন পূর্ণাঙ্গ আদর্শ ছাড়া সম্ভব নয়। সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ, হতভম্ব বা কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে অনিশ্চয়তার অন্ধকারে রাত-যাপন করতে পারে না,— নিখুঁত আদর্শ তাকে খুঁজে নিতেই হবে, সে যে আল্লাহ্‌র খলীফার উপযুক্ত—সেটা তাকে প্রমাণ করতেই হবে।

আদর্শ অনুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক তরিকা

আমাদের আদর্শকে খুঁজে বার করতে হলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পরীক্ষার আশ্রয় নিতে হবে। এ ব্যাপারে, অতীতের কোন্ আদর্শ মানব সমাজের কতটুকু উপকার বা অপকার করেছে, কোন ঐতিহাসিক ও সামাজিক অবস্থায় সেই আদর্শ কিরূপ কাজ করেছে, বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় তা কার্যকরী করা যাবে কিনা, গেলেই বা কতটুকু সম্ভব, অতীতের কোনো আদর্শকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে বর্তমানে যুগোপযোগী করে নেওয়ার সম্ভাবনা কতদূর, ভবিষ্যতেই বা তা কতদূর কার্যকরী ও ফলপ্রসূ হবে—ইত্যাদি বারবার পরীক্ষার দ্বারাই বৈজ্ঞানিক নিয়মে আদর্শের আবিষ্কার সম্ভব।

মানব-জাতির কয়েক হাজার বছরের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আদর্শ কাজ করছে। আর সেই আদর্শকে কেন্দ্র করে, একেকটি সভ্যতা মানব জাতিকে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে সুখ-শান্তি সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে সাহায্য করেছে। প্রাচীন চৈনিক সভ্যতা, মিশরীয় সভ্যতা, ব্যাবিলনীয় সভ্যতা, ভারতীয় সভ্যতা, রোমান ও গ্রীক সভ্যতা আর সর্বশেষে আরব সভ্যতা, সামন্ত-পূর্ব ও সামন্ত পরবর্তী সভ্যতা, সংগঠন, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সৃষ্টি কল্পনায় মানব-সমাজকে উন্নত করেছে। বর্তমান সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার যুগে বিচার করলে সেই সময়কার রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও সমাজনীতির মূলে অনেক গলদ ধরা পড়ে; কিন্তু এ-ও মনে রাখতে হবে যে, তখনকার সময়ে সমাজের আর্থিক বিন্যাস, জ্ঞানের পরিসর ও মানুষের মনোভাব যে স্তরে ছিল তাতে তখন সে সমাজ-ব্যবস্থাই ছিল উত্তম। কার্ল মার্ক্স নিজেও একথা স্বীকার করেছেন। মানব-সভ্যতার এই ইতিহাস পাঠে জানা যায়, এ-ইতিহাসের নিরানব্বই ভাগই প্রধানত এবং বিশেষত ধর্মকেন্দ্রিক ও ধর্ম-নির্ভর।

মিশর ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতায় ইহুদী-ধর্মের প্রভাব, গ্রীক-রোমান সভ্যতায় খ্রীস্ট ধর্মের প্রভাব, ভারতীয় সভ্যতায় হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম ও জৈন ধর্মের প্রভাব, চৈনিক সভ্যতায় কনফুসিয়াস ও লাও-এর প্রভাব, পারস্যে জোরাস্তারের প্রভাব এবং আরব সভ্যতায় ইসলাম ধর্মের দান অস্বীকার করা মানে ইতিহাসকে অস্বীকার করা।

অবশ্য, একথা সত্য যে এই ধর্মগুরুর অনুসরণকারীরা পরকালে ধর্মকে হয়তো বিকৃত করে আত্মস্বার্থে নিয়োজিত করেছে, নয়ত সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তনের সংগে খাপ খাওয়াবার চেষ্টা না করে গোঁড়ামীর আশ্রয় নিয়ে ধর্মের গতিশীলতাকে অস্বীকার করে মানব জাতির অনেক অকল্যাণ করেছে। তবু একথা অনস্বীকার্য যে মানব সভ্যতার যে ইতিহাস আমরা পাই তার অধিকাংশই ধর্মকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে।

কুসংস্কার, গোঁড়ামী এবং স্থিতিশীল অনুষ্ঠান সর্বস্বতার দরুনই ধর্মগুলি জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে তার নিজস্ব মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে।[১] প্রায়ই দেখা যায়, সূচনাতে এই ধর্মগুলি কুসংস্কার ও গোঁড়ামীর উর্ধ্বে থেকে, তখনকার সমস্ত অন্যায়, অনাচার, সংকীর্ণতা ও প্রথা সর্বস্বতার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছে এবং মানব সমাজকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে। বর্তমানে কম্যুনিজমের যেমন গোঁড়ামী আত্মপ্রকাশ করছে— তেমনি ধর্মগুলিও পরবর্তীকালে, বিকৃত অন্ধভক্তির দরুন ঐসব দোষে দুষ্ট হয়ে ওঠে।

ধর্মের সমন্বয়

বর্তমানে সমাজতন্ত্রবাদ (Socialism) ও কম্যুনিজমের একই উদ্দেশ্য আর্থিক সাম্য হলেও তাদের মধ্যে গুরুতর বিরোধ আছে। শুধু তাই নয়, একই কম্যুনিজমের মধ্যেও শত শত বিভিন্ন বিপরীতমুখী মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। তেমনি প্রতিটি ধর্মের মূল উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা মানব সমাজকে শান্তি, সমৃদ্ধি ও প্রগতির পথে এগিয়ে নিলেও তাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধিতাও উৎকটভাবে দেখা দিয়েছে। কিন্তু তবু তাদের

---

১. খবরদার! ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না এবং গোঁড়ামীর পরিচয় দিও না—গোঁড়ামী ও বাড়াবাড়ির জন্য অতীতে অনেক জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে—হাদীস। ধর্মে জোর-জবরদস্তি অচল। [কুরআনঃ ২—২৫৬] ধর্মে বাড়াবাড়ি করো না। [কুরআনঃ ৪—১৭১]

মৌলিক উদ্দেশ্য এক, তাতে সন্দেহ নেই—একভাবে না হয় অন্যভাবে জগতে শান্তি ও সমৃদ্ধি আনয়ন এবং অন্যায় অবিচারের চির অবসানের জন্য ধর্মগুলি সংগ্রাম করেছে।

ভারতের ইতিহাসে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ থেকে শুরু করে রামকৃষ্ণ, মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত সকলেই বিভিন্ন রকম কাজের ধারা গ্রহণ করেছেন, তাঁদের প্রচলিত ধর্মীয় মতবাদ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ নিয়েছে—তবু তাঁদের উদ্দেশ্য ও প্রেরণা ছিল এক এবং প্রত্যেকটি মতবাদই যে একই বৈদিক ধর্মের বিভিন্ন রূপ, তা এখন স্বীকৃত হয়েছে। এ থেকে আরো একটি সত্য আমরা পাই—সময়, সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন এবং জ্ঞানের পরিসর বাড়ার সংগে সংগে ধর্মের বাইরের বা আনুষ্ঠানিক রূপও বদলায়। অর্থাৎ ধর্মের উদ্দেশ্য এক হতে পারে, তার মূল নীতিও পরিবর্তনীয় নয়, কিন্তু তার প্রয়োগধারা তথা কাজের ধারা যুগে যুগে পরিবর্তনশীল, স্থির (Static) নয়–গতিশীল (Dynamic)।[১]

এই সত্যটি অন্য উপায়ে আরো স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। খ্রীস্ট ধর্ম ও তার প্রবর্তক ঈসা (Jesus) তাঁর আগের ধর্ম ও ধর্মপ্রবর্তককে [যেমন মুসা, Moses] খ্রীস্টানদেরও পয়গম্বর বলে মেনে নিয়েছেন। শুধু পার্থক্য এইটুকু যে, খ্রীস্টানদের ধর্মমতে-খ্রীস্ট ধর্ম প্রবর্তনের সময়ে ইহুদী ধর্ম কুসংস্কার, গোঁড়ামী আচার-সর্বস্বতার কাদা থেকে মুসা প্রবর্তিত ধর্মকে উদ্ধার ও সময়োপযোগী করে তোলবার জন্য হযরত ঈসার আবির্ভাব হয়।

ইহুদী এবং ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। মুসলমানেরা জানেন—হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর আবির্ভাবকাল থেকেই ইসলাম ধর্ম শুরু হয়নি। শুরু হয়েছে সৃষ্টির আদি থেকে। সৃষ্টির সূচনা থেকে আদম, দাউদ, সুলায়মান, ঈসা, মূসা (আঃ) সহ বিভিন্ন জামানায়, বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন নামের ধর্মমত নিয়ে যে-সব মহাপুরুষ জন্ম নিয়েছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকে ইসলামেরই এক একজন নবী বা পয়গম্বর—এঁদেরকে নিজের পয়গম্বর বলে স্বীকার না করে, কিংবা তাঁদের মধ্যে কোনো রকম ভেদরেখা

১. এই গতি প্রবাহেই "—এই পৃথিবী একটা ভিন্ন পৃথিবীতে এই আকাশ একটা ভিন্ন আকারে রূপান্তরিত হবে।" —কুরআন

টেনে কেউ প্রকৃত মুসলমান হতে পারে না।[১] কুরআনের ভাষায়ঃ এমন কোন দেশ বা কওম ছিল না যেখানে ইসলামের পয়গম্বর আসেন নি। এমন কথা বলা হয়নি, যা আগের পয়গম্বরদের বলা হয়নি। এই হিসাবে ভারত, চীন বা অন্য যে কোনো দেশের খাঁটি ধর্মপ্রবর্তকদের ইসলামের পয়গম্বর বলে ধরে নিতে প্রত্যেক মুসলমান ধর্মত বাধ্য।

কুরআনে ইসলামের ঐতিহাসিক বিবর্তন ও বিপ্লবের যে ধারাবাহিক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তাতে প্রমাণিত হয়ঃ

> যদিও শুরু থেকে ইসলামের মূল সূত্রগুলি একই ছিল—তবু, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারের সাথে সাথে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন জামানায়, তার বাইরের রূপ ও আচার তরিকায় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে।
>
> বাইরের এই পরিবর্তনশীলতাকে কেন্দ্র করেই একই ধর্ম বা মতবাদ বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন নামে (যেমন ইহুদী ধর্ম, খ্রীস্ট ধর্ম, বৌদ্ধ-ধর্ম, হিন্দুধর্ম, ইসলাম ইত্যাদি) বিভিন্ন রূপ নিয়েছে।

সময়ের পরিবর্তনের সংগে সংগে এক যুগে প্রচলিত ধর্ম অন্য যুগে প্রধানত ৩টি কারণে অকেজো হয়ে পড়েঃ

১. মূলনীতিকে বাদ দিয়ে, আচার-নিয়মকেই ধর্ম বলে গ্রহণ করলে এবং আচার-ব্যবহারকেই বা প্রয়োগ তরিকাকে যুগোপযোগী করে পরিবর্তন পরিবর্ধন না করে অন্ধ গোঁড়ামীর আশ্রয় নিলে।

২. ধর্মের প্রবর্তকদের প্রতি অতিরিক্ত ও অতিশয়োক্তির দরুন সংকীর্ণতা ও কুসংস্কার এসে ধর্মকে বিকৃত করে দিলে।

৩. ধর্মের যারা ধারক ও বাহক সেই মোল্লা-পুরোহিত এবং রাজা-সম্রাটরা ধর্মের নির্দেশ পালন না করে ধর্মকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করলে।

এই তিনটি ত্রুটি দূর করবার জন্যই, ইসলাম কোনো কোনো সময় বিবর্তনের আকারে আবার কোনো কোনো সময় বিপ্লবের আকারে বিভিন্ন নামে আত্মপ্রকাশ করেছে।[২]

---

১. কুরআন (২ঃ ২৮৫ ও অন্যান্য আয়াত)।

২. সেই বিপ্লবের লক্ষণ কী? "......আল্লাহ্, তোমাদেরকে অপসারিত করে এক নতুনতর সৃষ্টিকে আনয়ন করবেন।" (১৪ঃ ১৯)

সুতরাং পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্মমতগুলি আলোচনা করলে আমরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে পৌঁছি।

১. প্রকৃত ধর্মগুলির মূলনীতি এক এবং অভিন্ন। বিভিন্ন কাজের ধারা ও বিশ্বাসের দ্বারা পৃথিবী হতে অন্যায়-অবিচারের মূলোৎপাটন, সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের প্রতিষ্ঠা, মানব সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন এবং একই সৃষ্টিকর্তার মহান সম্পর্কের মাধ্যমে পৃথিবীতে সত্যিকার শান্তি আনয়ন—এসবই এদের কাম্য।

২. সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োগ-পদ্ধতির পরিবর্তনশীলতা ও পরিবর্ধনশীলতা ধর্মের লক্ষ্য।

এই ধর্মগুলি মূলত যখন এক,—আলোচনার সুবিধার জন্য সবগুলি ধর্মকে একটি নামে প্রকাশ করতে পারলে ভাল হয়। শুধু একটি মাত্র নাম ব্যবহার করবার আরো একটি কারণ আছে ঃ ধর্মগুলির মৌলিক ঐক্যজ্ঞানের অভাবের দরুন এতদিন ধর্মে ধর্মে যে হানাহানি চলেছে একই নাম ব্যবহার করলে ভবিষ্যতে সেই হানাহানি লাঘব করার পক্ষে কিছুটা সহায়কও হতে পারে।

(ক) সব ধর্মকে বোঝাবার জন্য আমরা ইহুদী ধর্ম, খ্রীস্ট ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, হিন্দু ধর্ম ও ইসলাম ধর্ম ইত্যাদি প্রচলিত যে কোনো একটা প্রকৃত ধর্মের নাম ব্যবহার করতে পারি।

(খ) অথবা একটি নতুন নামও তৈরি করা যেতে পারে।

নতুন নাম তৈরি করার ব্যবহারিক অসুবিধা আছে। কেউ কেউ একে আরেকটা নতুন ধর্ম বলে ভুল করতে পারেন; অথচ এটা কোনো মতেই কাম্য নয়। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে—সুবিধা সহকারে ধর্মের বিশ্লেষণ করে সত্যে উপনীত হওয়া। পুরানো নামগুলির একটি ব্যবহারেও যে অসুবিধা আছে সে সম্বন্ধে আমরা সচেতন। তবু নিম্নলিখিত নীতিতে বিচার করে আমরা একটি নাম গ্রহণ করতে চাই।

১. নামটি প্রধান ধর্মগুলির মৌলিক নীতি-বোধক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

২. নামটি ব্যক্তি, দেশ বা জাতিগত স্বভাব থেকে মুক্ত হওয়া চাই।

৩. এই নামীয় ধর্মটির অন্য সব ধর্মকে আপন বলে গ্রহণ করবার অভ্যন্তরীণ ক্ষমতা থাকা দরকার।

এই হিসাবে দেখতে গেলে মুহাম্মদী ধর্ম, ইহুদী ধর্ম, বৌদ্ধ, খৃীস্ট বা হিন্দুধর্ম— এর কোনোটাই সব ধর্মের মৌলিক নীতি-বোধক নহে। এদের প্রত্যেকটিই একেকটি বিশেষ ধর্মপ্রবর্তক, বিশেষ দেশ বা বিশেষ সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য-বোধক। এদের কোনোটারই স্বভাব বা প্রকৃতি বিশ্বজনীন নয় অর্থাৎ এদের প্রত্যেকটাই সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক (Sectional) অর্থবোধক।

কিন্তু আরবী ভাষায় এমন একটি শব্দ আছে যাকে আমরা এসব ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত বলে ধরে নিতে পারি। সে শব্দটি হচ্ছে— ইসলাম। ইসলাম অর্থ শান্তি। স্রষ্টার ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ আর শান্তিই মানব সমাজের প্রধান কাম্য, মানুষে-মানুষে, জাতিতে জাতিতে, স্রষ্টার সৃষ্টিতে শান্তি প্রতিষ্ঠাই সমস্ত ধর্মের মৌলিক উদ্দেশ্য; সুতরাং ইসলাম শব্দটি সমস্ত ধর্মেরই মৌলিক নীতি-নির্দেশক। শুধু তাই নয়- ইসলামের অনুসারীরা পরমতসহিষ্ণু হতে বাধ্য।[১]

দ্বিতীয়ত, কুরআনিক পরিভাষায় ইসলামের আবির্ভাব হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সময়ে হয়নি, সৃষ্টির আদি থেকেই এর শুরু এবং এটা আদি মানবেরও ধর্ম। সকল দেশের সকল জামানার প্রকৃত ধর্মগুলি ইসলামেরই বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র; যে দেশ এবং যে জামানাতেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, প্রকৃত ধর্মের প্রবর্তক মাত্রই ইসলামের পয়গম্বর।[২] অনেকে মুহাম্মদী ধর্ম ও 'ইসলামকে' একই অর্থে ব্যবহার করে অসুবিধায় পড়তে পারেন; কিন্তু প্রচলিত অর্থ হিসাবে মুহাম্মদী ধর্ম বলতে আমরা শুধু হযরত মুহাম্মদ (সঃ) প্রবর্তিত ধর্মকে বুঝি এবং

১. মুসলমান, ইহুদী, খৃীস্টান, সূর্য-উপাসক যেই হোক না কেন—যদি সে আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম করে তার কোন ভয় নেই; সে পুরস্কৃত হবে। কুরআন (২ : ৬২ ও ৩ : ১১৩—১১৫)।

২. কুরআন (২ : ১৩০—১৪১) আমরা ধর্ম-প্রবর্তকদের মধ্যে কোন ভেদ-রেখা টানি না। কুরআন (২:২৮৫)।

ইসলাম বলতে বুঝি আদি মানব আদম হতে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) পর্যন্ত অসংখ্য ধর্ম-প্রবর্তক দ্বারা প্রচারিত ধর্মকে।[১]

ইসলামের পরিচয়

ইসলাম বলতে আমরা কোন বিশেষ কালে বিশেষ দেশে প্রচলিত ধর্মকে বুঝি না। এ একটি বিবর্তনশীল ও বিকাশশীল ধারা। নিজেকে মার্জিত করে বিকশিত করে এই অস্থির প্রবাহ নিরবচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে এসেছে স্রষ্টার উদ্দেশ্যকে পূর্ণ রূপ দেওয়ার জন্যে। কাজেই আমরা বলব ঃ

১. বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে প্রচলিত বিভিন্ন সত্য ধর্মের বাহ্য-আচার নিরপেক্ষ মৌলিক ঐক্যসূত্রই ইসলাম। মৌলিক বস্তুর কোন পরিবর্তন নেই।

২. এর বাহ্যিক রূপ ও প্রয়োগ-ধারা যুগে-যুগে ও দেশে-দেশে পরিবর্তনশীল এবং পরিবর্ধনশীল। অসাম্য, অন্যায়, অত্যাচার ও কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করে, সত্যিকার মানুষ সৃষ্টি করে, মানব সমাজে ইহ ও পরকালে প্রকৃত শান্তি আনাই এর লক্ষ্য।

৩. অতএব অসাম্য, অন্যায়, অত্যাচার, হিংসা, বিদ্বেষ ও কুসংস্কারের মূল উপড়ে তুলে খাঁটি মানুষ সৃষ্টির ভেতর দিয়ে মানব-সমাজে প্রকৃত শান্তি আনয়নের জন্য যে ধর্ম বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়ে—প্রয়োগধারায় পরিবর্তিত ও বাস্তব রূপ নিয়ে পূর্ণতা লাভ করছে তা-ই ইসলাম।

অন্য কথায়, যে মানব-ধর্ম আদি পুরুষ আদম হতে শুরু করে অবিরত মানব সমাজের আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক অর্থাৎ মানুষের সামগ্রিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান দিয়ে মানব-সভ্যতাকে সর্বাঙ্গীন পূর্ণতা ও পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে তা-ই ইসলাম।

---

১. আদি মানব আদম (আঃ) একজন পয়গম্বর ও মুসলমান।—আল্লাহ্‌র প্রেরিত ধর্ম তাঁর সময় থেকে শুরু হয়েছে এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বরফগলা নদীর মতো তার প্রবাহ বয়ে চলেছে, এই গতিপথে তার চেহারা বদলেছে কিন্তু প্রাণের আদি লক্ষণটি বজায় আছে।

ইসলাম মৌলিকতায় ও দলীলগতভাবে পূর্ণ রূপ পেয়েছে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর সময়ে। এই মূলকে ভিত্তি করে বহু অমৌলিক বিষয়ের সমাধান ইজতিহাদের মাধ্যমে যুগে যুগে মানুষ খুঁজে নেবে। এইভাবে ইসলামের গতিশীলতা অনন্তকাল ধরে চলতে থাকবে।

আমাদের সমস্যা

মানব সমাজে বর্তমান বড় সমস্যা—মানব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারসাম্যের[১] একান্ত অভাব। ফলে যুদ্ধ, বিপ্লব, হানাহানি ও অশান্তি লেগেই আছে। অনেক চিন্তাশীল মনীষীর মতে মানব জাতি বর্তমানে যেরূপ সামগ্রিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছে, অতীতে কখনো এরূপ হয়নি। কেন এরকম হল? বিজ্ঞানের এত দান গ্রহণ করেও মানব জাতির মধ্যে কেন এভাবে ভারসাম্যের অভাব দেখা দিল, আর কেনই বা মানব সমাজ অধিকতর অশান্তির দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে—তা আজ গভীরভাবে ভেবে দেখবার সময় এসেছে।

ধর্মের বিকৃতি এবং ধর্মের নামে গোঁড়ামী ও কুসংস্কার প্রশ্রয় পাওয়ায় মধ্যযুগে ইউরোপে ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়; ফলে শিক্ষা, সমাজ ও রাজনীতি হতে ধর্মকে নির্বাসন দেওয়া হয় এবং আবর্জনা সরাতে গিয়ে ধর্মের মহৎ দিকটাকেও বিদায় দেওয়া হয়। এরই পরিণতিস্বরূপ মানুষের মনে নৈরাজ্য উপস্থিত হয়—মানসিক বৃত্তিগুলির সঠিক ব্যবহার মানুষ ভুলে যায়। এরপর, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে যে নতুন অধ্যায় মানুষের ইতিহাসে খোলা হল, তা সত্যি এক বিস্ময়কর ব্যাপার। প্রত্যেকটি বিচিত্র আবিষ্কারের সংগে সংগে সে ভাবতে শুরু করল—সে-ই সর্বেসর্বা, তার ক্ষমতার কোনো পারাপার নেই; কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, সে তার নিজের সৃষ্টির হাতেই পুতুল হয়ে দাঁড়িয়েছে। জড়-প্রগতিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আত্মিক প্রগতির দিকেও নজর না দেওয়াতে মানুষের মনোজীবনে ভারসাম্যের অভাব দেখা দেয়,—আত্মাকে অবহেলা করে দেহের প্রগতিকে ও মানব জীবনের একাংশের বিকাশকে মানুষ তার চরম ও পরম ভাবতে শুরু করে, জীবনের আদর্শ দৈহিক-মূল্য সর্বস্ব হয়ে ওঠে। এই যে মানুষের দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যে পরস্পরবিরোধিতা ও ভারসাম্যের অভাব

১. Equilibrium.

দেখা দিল, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আজকের দুনিয়ার সমস্ত বিশৃঙ্খলা, বিপর্যয় ও অশান্তির উৎস সেখানেই।

সমাজে ও রাষ্ট্রে আজ যে ভারসাম্যের অভাব দেখা যায়—তাকে নীচের কয়েকটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

ক. জাতিতে জাতিতে ভারসাম্যের অভাব (আন্তর্জাতিক সমস্যা)।
খ. বর্ণে বর্ণে ভারসাম্যের অভাব (সামাজিক সমস্যা)।
গ. ধর্মে ধর্মে ভারসাম্যের অভাব (সাম্প্রদায়িক সমস্যা)।
ঘ. শ্রেণীতে শ্রেণীতে ভারসাম্যের অভাব (অর্থনৈতিক সমস্যা)।
ঙ. আদর্শে আদর্শে ভারসাম্যের অভাব (আদর্শিক সমস্যা)।
চ. অন্যান্য ব্যাপারে ভারসাম্যের অভাব।

জাতিতে জাতিতে ভারসাম্যের অভাব

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রসার ও শিল্প-বিপ্লবের সংগে সংগে একদিকে পুঁজিবাদের সৃষ্টি হল—অন্যদিকে ঔপনিবেশিকতার আওতায় সাম্রাজ্য-বাদের খুঁটি বিভিন্ন দেশে শক্ত করে গাড়া হল। নৌশক্তি তথা সামরিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ইউরোপীয় দেশগুলি ১৫শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে উপনিবেশ স্থাপন তথা সাম্রাজ্য পত্তন করেছে। সেইসব দেশের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও তথায় উদ্‌গত শিল্প-বিপ্লব মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত না হয়ে সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও ঔপনিবেশিকতাকে আরো শক্তিশালী করেছে, পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ ও কাঁচামাল হরণের নেশায় তাদের পাগল করে তুলেছে। ফলে এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার শিল্পে ও সামরিক শক্তিতে অনগ্রসর দেশগুলি সাম্রাজ্যবাদী ইংলণ্ড, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, ইতালী, জার্মানী, স্পেন প্রভৃতি দেশের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। এরই ফল আমরা দেখেছি ভারত, ফিলিপাইন, বার্মা, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, আল্‌-জিরিয়া, তিউনিসিয়া, সোমালিল্যাণ্ড, মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকায়। এমন কি স্বাধীনতা লাভের আগে পর্যন্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ আমেরিকায় যে অমানুষিক বর্বরতা ও অকথ্য জুলুমের বীভৎসতা ঘটি-য়েছে, সে-ও এই সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিকতারই কাজ। আজো এর শেষ হয়নি। বহু কষ্ট স্বীকার ও সংগ্রামের পর যে-সব দেশ রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের আওতা থেকে মুক্তি লাভ করতে পেরেছে, নতুন অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা শোষিত হতে হতে তাদেরও নাভিশ্বাস উঠেছে।

পুরানা সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতাবাদ ক্রমশ ঐতিহাসিক ধারায় বর্তমানে বিলোপ হতে যাচ্ছে—কিন্তু তার জায়গায় বিভিন্ন অনুন্নত দেশকে আমেরিকাসহ উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির অর্থনৈতিক শোষণ নতুন আকারে অধীনতা ও জুলুমের বিকাশ ঘটাচ্ছে। দুই সুপার পাওয়ারের অন্যতম রাশিয়াও সম্প্রসারণবাদের আওতায় ভিন্নতর শোষণ ও জুলুম চালাচ্ছে বিভিন্ন দুর্বল দেশের উপর।

সুতরাং ইসলাম মানবজাতির জন্য যে ভারসাম্য ও শান্তি চায়, ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদ তার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ইসলাম সমস্ত মানব সমাজকে এক জাতি হিসাবে দেখে থাকে।[১] এক দেশের উপর অন্য দেশের প্রভুত্বকে সে স্বীকার করে না।[২] এক দেশের দ্বারা অন্য-দেশ শোষণকে জঘন্য হারাম বলে রায় দেয়। সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপ-নিবেশিকতা—মানুষে মানুষে বিরোধ সৃষ্টিকারী জাতিগত অহমিকা, লোভ ও শোষণের উপরই প্রতিষ্ঠিত। কাজেই, এই অনৈসলামিক নীতিকে ধ্বংস করতে না পারলে ইসলাম বা শান্তি ও ভারসাম্য অসম্ভব। সুতরাং ইসলামী আদর্শকে অনুসরণ করতে হলে আমাদের এই সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে।[৩]

বহু যুগ সঞ্চিত শোষণ ও জুলুমের বিরুদ্ধে অত্যাচারিত দেশগুলি আজ জেগে উঠেছে। তাদের এই সংগ্রাম আমাদের সংগ্রাম। এই সংগ্রামকে সুষ্ঠু উপায়ে সংঘবদ্ধ করাই হবে প্রকৃত ইসলাম-পন্থীদের কাজ। যে ঘৃণ্য জাতীয় সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয় শোষণ সংকীর্ণ জাতীয়তা-বাদের পরিপোষক এবং যুদ্ধ, শোষণ ও অত্যাচারের মূল উৎস—তাকে নির্মূল করে, মানুষের জীবনের মর্যাদা ও পবিত্রতায় বিশ্বাসী, মহৎ কাজে সামাজিকভাবে পরস্পরে সাহায্যকারী আর ব্যক্তিগতভাবে প্রতিযোগিতা-শীল, সহনশীল ও পরস্পরের ভ্রাতৃপ্রতিম-সম্পন্ন—এই রূপ বিশ্বজোড়া এক মহত্তর জাতি গঠন করাই হবে আমাদের অবশ্যকর্তব্য।

যতদিন পর্যন্ত মানুষের জীবন ও মনে সেই বিপ্লব সংঘটিত না হয়েছে, এবং জাতীয় ভারসাম্য কায়েম না হয়েছে ততদিন ইউ-এন-ও বা অন্য

---

১. "সব মানুষ মিলে এক জাতি" কুরআন (২, ২১৩)।
২. বিদায় হজের সময় হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর ঘোষণা।
৩. কারণ Who-ever goes with the tyrant to assist him to be tyrant, then verily he has gone out of Islam (Quran).

কোনো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানই সফল হতে পারে না। সাম্রাজ্যবাদ, জাতীয় শোষণ এবং অসহিষ্ণু জাতীয়তাবাদের ধ্বংসের উপরই 'মানব গোষ্ঠী একজাতি' —এই মহান আদর্শের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হবে।[১] সঙ্গে সঙ্গে নতুন ধরনের এক আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও আমাদের সজাগ থাকতে হবে। এটি হল কম্যুনিস্ট সাম্রাজ্যবাদ। এশিয়ায় ও পূর্ব-ইউরোপে এই সাম্রাজ্যবাদ বহু ক্ষুদ্র দেশ ও জাতিকে শুধু যে কুক্ষিগত করে রেখে তাদের সর্বপ্রকার স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার খর্ব করে রেখেছে তা নয়—এদের অনেকগুলিকে অর্থনৈতিকভাবেও শোষণ করেছে।

বর্ণে বর্ণে ভারসাম্যের অভাব

জন্ম, পেশা, রঙ ও রক্তকে কেন্দ্র করে মানুষের মনে যে Superiority Complex বা শ্রেষ্ঠত্ববোধ বাসা বাঁধে, তাই বর্ণ সমস্যার জন্ম দেয়। মানুষ হিসাবে মানুষের মর্যাদা, তার জীবনের পবিত্রতাকে স্বীকৃতি না দেওয়ার দরুনই মানুষের মনে অর্থহীন শ্রেষ্ঠত্ব-বোধ শিকড় গেড়ে বসে। এইভাবে বর্ণ-সমস্যা অতীতকালে সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু আজো—এই বিংশ শতাব্দীতেও বর্ণ-সমস্যা যেভাবে চালু রয়েছে এবং বর্ণের অহমিকায় মানব-সমাজের একটা বড় অংশের উপর যে অমানুষিক জুলুম চলেছে তা ভাবলে অবাক হতে হয়। এজন্য বর্তমানে দায়ী—

১. তথাকথিত বর্তমান সভ্যতার ধ্বজাধারী ইউরোপ ও আমেরিকার সাদা জাতগুলি।

২. বিভিন্ন দেশের বা ধর্মের তথাকথিত অগ্রসর উচ্চবংশের লোকগুলি।

গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, মানুষ জ্ঞানে-বিজ্ঞানে খুব এগিয়ে গেলেও প্রকৃত সভ্য ও উঁচু মানুষ হতে পারে না। আমেরিকার নিগ্রোদের প্রতি ইউরোপ হতে আগত সাদা জাতগুলির ব্যবহার মানুষের ইতিহাসের এক কলংকজনক অধ্যায়। ভারতে শূদ্রদের প্রতি শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রসর, কৌলিন্য-গর্বে অন্ধ ব্রাহ্মণদের ব্যবহার একই জঘন্যতার পর্যায়ে পড়ে। এ ছাড়া বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালী, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের অধিবাসীরা ভারত, আফ্রিকা, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে

---

১. সমস্ত মানুষ মিলে একটি জাতি বৈ কিছু নয়, কিন্তু তাদের মধ্যে বিভিন্নতা এসেছে। (কুরআন ১০ : ১৯)

বর্ণ-বিদ্বেষের যে জঘন্য নযীর স্থাপন করেছে তা ভুলবার নয়। বহুদিন ধরে দক্ষিণ আফ্রিকায় সাদা আদমীরা কালা আদমীদের উপর অকথ্য জুলুম চালিয়েছে এবং সেটা একটা আন্তর্জাতিক সমস্যার রূপ নিয়েছে। এমনও দেখা গেছে আমেরিকায় কোনো নিগ্রো সাদা জাতের কাউকে বিয়ে করলে গণতন্ত্রী আমেরিকার আইন তাকে জেলে পাঠাত। একই হোটেলে তার আহার গ্রহণের অধিকার তো দূরের কথা, সাদা জাতের ছেলেমেয়ের সাথে একই স্কুলে পড়তে গেলে তার ইয্যত ও প্রাণ দুই-ই হারাবার সম্ভাবনা থাকত। আশ্চর্যের কথা এই যে গণতন্ত্রী আমেরিকায় নিগ্রোদের ভোটাধিকার পর্যন্ত অস্বীকৃত হত। আমেরিকার স্বাধীনতা, তার উন্নতি ও প্রগতির জন্য যে সব বীর সন্তান জীবনপাত করে এসেছে, শুধুমাত্র কালো রঙ ও পুরু ঠোঁটের জন্য তাদের প্রাথমিক মানবীয় অধিকার হতে বঞ্চিত করতেও গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী মহান আমেরিকার একদল সাদা আদমীর লজ্জা হয় না। ভারতে বর্ণাশ্রমের কুফল সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা না করাই ভাল। মহান হিন্দু ধর্মকে এই প্রথা যেভাবে বিকৃত ও কলঙ্কিত করেছে আর কিছুই তা করতে পারে নাই। মহাত্মা গান্ধী বর্ণবিদ্বেষবিরোধী যে আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন তাঁর ভক্তেরা যদি তা আন্তরিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতেন বর্ণাশ্রম কালে বিলোপ পেয়ে যেত।

তা না হওয়ায় আজো ভারতের বহু অস্পৃশ্য প্রতি বছর পশুর মত উচ্চ বর্ণের দজ্জালদের হাতে নির্বিচারে প্রকাশ্যে প্রাণ হারাচ্ছে। ভারতের বিহার প্রদেশে আজো হাজার হাজার ভূমিদাস পশুর চাইতেও হীনতর জীবন-যাপন করছে, যার রিপোর্ট সম্প্রতি বিশ্বের সর্বত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে, এই বর্ণবিদ্বেষের মত অমানুষিক পাপের বন্যা যারা বইয়ে চলেছে, তারা হচ্ছে ইউরোপ আমেরিকার সভ্য জাতগুলি আর ভারত ও অন্যান্য দেশের সভ্য সম্প্রদায়গুলি। সুতরাং মানবীয় মূল্যবোধ ও নীতি-ধর্মের দ্বারা বিচারে আমরা দেখতে পাই—এই ধরনের তথাকথিত শিক্ষিত অগ্রসর সভ্যরাই অসভ্য নামের যোগ্য। মনুষ্য-ধর্ম বিবর্জিত বলে এদের সভ্যতা সভ্যতা নয়, বর্বর অসভ্যতারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। যীশু, মুসা, বুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ, কনফুসিয়াস প্রমুখ মহামানব বিভিন্ন দেশে সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের বাণী নিয়ে মানুষের মহৎ উত্তরাধিকারের

অঙ্গীকার নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন ; শিক্ষা, সভ্যতা ও ক্ষমতাগর্বী অনুসারীরা ধর্মগুলির প্রকৃত শিক্ষাকে ভুলে গিয়ে আজ মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করেছে—জবরদস্তিমূলক অত্যাচারে মানুষের জীবনকে বিষিয়ে তুলছে।

এই ভুল ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে না দাঁড়ালে দুনিয়াতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। ইসলাম বর্ণ-বিদ্বেষের দুশমন।[১]—"সব দেশের মানুষ সম-মর্যাদাসম্পন্ন"[২]। "ইসলামের অনুসারীরা ভাই ভাই।" "হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বেহেশতে নিগ্রো বিলালের পদধ্বনি শুনতে পান তাঁর আগে।"[৩] "নিখুঁত চরিত্র, সৎ কর্মশীলতা ও আত্মিক উন্নতি ছাড়া মানুষের আর কোনো রকম শ্রেষ্ঠত্ব ইসলাম স্বীকার করে না।"[৪] আজ যে ভুল ধারণার উপরে বর্ণ-বিদ্বেষ স্থায়ী আসন গেড়ে বসেছে এবং বর্ণ-বিদ্বেষের জন্য মানুষে-মানুষে জাতিতে-জাতিতে যে হানাহানি ও জোর-জুলুম চলেছে-তার বিরুদ্ধে অবিরাম জিহাদ চালিয়ে যাবার শিক্ষা ইসলামই আমাদের দিয়েছে। একমাত্র ইসলামের প্রকৃত অনুসারীদের মধ্যেই বর্ণ বিভেদ বলে কিছু নেই। ইসলামের এই মহান শিক্ষা সেই ১৪ শ বছর আগেই ইসলামী সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। জ্ঞান ও বিজ্ঞান গর্বিত পশ্চিমা দেশগুলি নানা আইন ও সৈন্যবাহিনীর আশ্রয় নিয়েও সেই পাপ হতে মুক্তি পাচ্ছে না। বর্ণ-বিদ্বেষ সমূলে উপড়ে ফেলে, মানুষের সঙ্গে মানুষের একাত্মতা, জীবনে-মরণে সমভাগ্যের শরীকানা কায়েম করার মহান ব্রত আমাদের নিতে হবে।

ধর্মে ধর্মে ভারসাম্যের অভাব

আমরা আগেই দেখিয়েছি—ইসলাম ধর্মই সকল সত্য ধর্মের যোগ বা নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ। সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে খাঁটি ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে কোনো বিরোধ থাকার কথা নয়। কিন্তু, প্রধানত তিনটি কারণে এই বিরোধ গজিয়ে ওঠে। ফলে এক ধর্ম-সম্প্রদায়ের সংগে অন্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের বিরোধ, হানাহানি, অসহিষ্ণুতা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা লেগেই থাকে। বহু দেশে এইরূপ সাম্প্রদায়িক হানাহানির-কুৎসিত ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। বিরোধের এই তিনটি কারণ হলো ঃ

১. "জাত্যাভিমানের স্থান ইসলামে নাই।" হাদীস

২. বিদায় হজের সময় হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর ঘোষণা।

৩. হাদীস।

৪. কুরআন ও হাদীস।

১. ধর্মগুলি বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন যামানায় প্রবর্তিত হওয়ায় এবং আচার ও আনুষ্ঠানিকতার আতিশয্যে ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে কুসংস্কারের বিকৃতি প্রবেশ করায় বাহ্যিকভাবে প্রায় সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী রূপ ধারণ করেছে।

২. হযরত (সঃ)-এর আগ পর্যন্ত ধর্মীয় মোল্লা পুরোহিতেরা ইসলামের প্রয়োগতরীকায় গতিশীল পরিবর্তনশীলতাকে হৃদয়ংগম করতে না পারায় এবং অন্ধ গোঁড়ামীর আশ্রয় গ্রহণ করায় পরবর্তীকালে ইসলামের মার্জিত ও সংস্কৃত রূপ হিসাবে যে সব ধর্ম প্রচলিত হয়েছে তাদেরকে অধর্ম জ্ঞান করা হয়েছে।

৩. ইসলামের মৌলিক নীতির উপর জোর না দিয়ে বাহ্যিক ক্রিয়াকাণ্ডকে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়ার ফলে ঐক্য-বোধ তথা সহনশীলতার একান্ত অভাব ঘটেছে।

বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানকে অতি গুরুত্ব দেওয়ার ফলে গরু জবেহ বা বাদ্য-বাজনা নিয়েও যে কি অঘটন ঘটে যায়—তা এদেশের সকলেই জানেন। অথচ প্রত্যেক ধর্মপ্রবর্তকই এই অসহনশীলতার বিরুদ্ধে কঠোর নির্দেশ জারি করে গেছেন। মহাত্মা গান্ধী হিন্দু ছিলেন; তবু তাঁর প্রার্থনা সভায় তিনি গীতার সংগে কুরআন ও বাইবেল পাঠ করতেন। সর্বোপরি, তাঁর অমূল্য জীবন তিনি দান করেছেন হিন্দু-মুসলিম মিলনের জন্যে। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর জীবনী ও তাঁর বাণী এই শিক্ষাই দেয় যে, বিভিন্ন দেশের খাঁটি ধর্মগুলি ইসলামেরই পূর্বতন রূপ ও প্রকাশ—এই সব ধর্মের নবী ও রসূলেরা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর উম্মতদেরও নবী-রসূল—তাঁদের সমভাবে সম্মান করা এবং তাঁদের মধ্যে কোনো পার্থক্য না আনা খাঁটি মুসলমান হওয়ার অন্যতম মৌলিক নির্দেশ।[১] ধর্ম বিষয়ে কোনো জোর জবরদস্তির স্থান নেই।[২] প্রত্যেক ধর্মের লোকের প্রতি ন্যায়বিচার করতে ইসলামের অনুসারীরা ধর্মত বাধ্য। —"অন্য ধর্মের লোক কুসংস্কার হেতু অন্য কিছু পূজা করলেও সেই জিনিসকে কোন কটূক্তি করা যাবে না। মক্কার কাবা ঘর ভাঙ্গার চাইতে একজন মানুষের মন ভাঙ্গা অধিকতর অন্যায়। কারণ কাবা মানুষের সৃষ্টি-আর মানুষ আল্লাহ্‌র সৃষ্টি।"

১. কুরআন (২ঃ ১৩৬-১৪১)।
২. কুরআন (২ঃ ২৫৬)।

সুতরাং, ধর্মীয় বিরোধ দড়িকে সাপ বলে ভুল করা বৈ আর কিছুই নয়। মুহাম্মদ (সঃ) মানুষের চিরন্তন ধর্মকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর ধর্মের শিক্ষা অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের মধ্যেও বর্তমান আছে।[১] সমস্ত সৃষ্টিকে যা রক্ষা করছে, চালিত করছে, সেই মহাজাগতিক বিধানের (Cosmic principle) প্রকাশই তো হচ্ছে ইসলাম। "প্রত্যেক মানব-শিশু তো স্বভাব-ধর্ম ইসলামেই জন্মগ্রহণ করে।"[২] সুতরাং ধর্মীয় বিরোধ আল্লাহ্‌র অনভিপ্রেত—শান্তি ও ইসলামের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এই বিরোধ দূর করা যেতে পারে—

১. ইসলাম যে মানুষের স্বভাবধর্ম এবং সে জন্য—এ যে সকল মানুষেরই ধর্ম, বিভিন্ন ধর্মের অনুসরণকারীদের মধ্যে সেই বোধ জাগায়ে।

২. সমস্ত ধর্মের অনুসারীকে সকল প্রকার সংকীর্ণ এবং অযৌক্তিক মনোভাব ও কুসংস্কার হতে মুক্ত করে মানুষের সাধারণ উত্তরাধিকারিত্বে বিশ্বাসী করায়ে।

৩. মূলনীতিকে ঠিক রেখে প্রয়োগ পদ্ধতির পরিবর্তনশীলতা ও পরিবর্ধনশীলতা যে ইসলামের বৈশিষ্ট্য, সকলের মনে সেই উপলব্ধি এনে দিয়ে।

শ্রেণীতে শ্রেণীতে ভারসাম্যের অভাব

আগেই বলা হয়েছে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে ভারসাম্যের অভাব তথা অর্থনৈতিক সমস্যা এ যুগের সব চাইতে পীড়াদায়ক সমস্যা। শিল্প-বিপ্লব হতে শুরু করে বৈজ্ঞানিক উপায়ে উৎপাদন শক্তি ও যানবাহনের উন্নতির দরুন, শিল্প ও ব্যবসায়ের মধ্য দিয়ে, নানা প্রকার একতরফা নীতি ও দুর্নীতির মাধ্যমে দেশের সমস্ত সম্পদ গুটিকতক লোকের হাতে গিয়ে জমা হয়েছে। মানুষের জীবনাদর্শ দৈহিক মূল্যসর্বস্ব হয়ে উঠায় অর্থদেবতা—ম্যামন পূজাই এ যুগের একমাত্র ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষের আত্মা অস্বীকৃত হওয়াতে আর তাঁর জীবনের মর্যাদা ও পবিত্রতায় বিশ্বাস না থাকায়, সীমাহীন লোভ তাকে উন্মাদ করে তোলে; ফলে শ্রমিক মজুরকে সে

---

১. কুরআন।
২. হাদীস।

প্রাণহীন উৎপাদন-যন্ত্রের লোহা-লক্কড়ের একটা ক্ষুদ্র বা ছোট টুকরার চাইতে বেশী দাম দিতে রাজী নয়। মানুষ যে একটা দিব্য সত্তা— উৎপাদনের উপায় মাত্র নয়, এই মৌলিক সত্যকে অস্বীকার করায় শ্রমের মূল্য হ্রাস, বেকার সমস্যা প্রভৃতি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ফলে, দেশের বড় একটা অংশ আজ সকল দিক দিয়েই 'সর্বহারা' হতে চলেছে। তাই, বহির্জীবনে বা সমাজ-জীবনে আজ অর্থনৈতিক ভারসাম্যের অভাব এক ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটের সৃষ্টি করেছে। এ যে আত্মিক মূল্য-বিবর্জিত বল্গাহারা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফল— একথা বললে বেশী বলা হয় না। একথা সত্য যে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে মানব-সমাজের সম্পদ বিপুল পরিমাণে বেড়ে গেছে ও যাচ্ছে, কিন্তু এই বাড়তি সম্পদ অনেক দেশে শতকরা ৯৫ জনের কোনো কাজেই লাগছে না। বরং, তাদের সর্বস্বান্ত করে দৈহিক ও নৈতিক দুর্গতির শেষ সীমায় নিয়ে এসেছে। ফলে, 'বিত্তবান' ও 'বিত্তহীন' এই দুই দলের মধ্যে দারুণ বিরোধ উপস্থিত হয়েছে। মানব-সমাজের শান্তিকে বিপন্ন করতে এটা দুই উপায়ে কাজ করছে ঃ

১. বেকার সমস্যা, অভাব-অনটন, অনশন, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি সৃষ্টি করে,

২. আর এর ফলস্বরূপ শ্রেণীতে শ্রেণীতে একে অন্যের বিরুদ্ধে ধ্বংস-কারী সংঘর্ষের সূচনা করে।

এই অর্থনৈতিক সমস্যা আবার আন্তর্জাতিক সমস্যারও সৃষ্টি করছে। যে সমস্ত গভর্নমেণ্ট পুঁজিবাদকে কমবেশী সমর্থন করে এবং যারা পুঁজিবাদের উচ্ছেদ চায়—এই দুই বিরোধী ব্লকের উৎপত্তি হওয়ায় আন্তর্জাতিক শান্তি আজ একেবারেই বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

এখানে একটা কথা উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমান অর্থনৈতিক শ্রেণী-বিরোধের মতো উগ্র শ্রেণী-বিরোধ অতীতের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। ইতিহাস পাঠে দেখা যায়, কোন কোন সময় কোন কোন জায়গায় হয়তো কৃষক-বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে, এমন কি কোন কোন জালিম রাজা বা জমিদারের বিরুদ্ধে তারা হয়ত আন্দোলনও করেছে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই রাজা বা জমিদার পরিবর্তনেই সে আন্দোলন পর্যবসিত হয়েছে। নতুন ও অপেক্ষাকৃত ভাল রাজা বা শাসনকর্তা পেয়েই আন্দো-লনকারীরা সন্তুষ্ট হয়েছে। অতীত কালে যেসব যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সংঘর্ষ

হয়ে গেছে, তার অধিকাংশেরই কারণ ছিল রাজনৈতিক (শক্তির মোহ), ধর্মীয়, যৌন, জাতিগত ইত্যাদি। ভারতের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে, রাম-রাবণ ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ থেকে শুরু করে সবশেষে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত যত লড়াই হয়ে গেছে–তার কোনটাই খাঁটি শ্রেণী-সংগ্রাম ছিল না। মারাঠা বিদ্রোহ, ভুক্তা বিদ্রোহ, ওয়াহাবী আন্দোলন, সিপাহী-বিদ্রোহ, শিখ-বিদ্রোহ এমন কি কংগ্রেস ও লীগ চালিত আন্দোলন-সমূহের কোনোটাই খাঁটি শ্রেণীসংগ্রাম ছিল না। হয় রাজনৈতিক ও জাতিগত কারণে, না হয় ধর্মীয় কারণে এই সংগ্রাম ও আন্দোলনগুলি পরিচালিত হয়েছে। এসবের যারা নেতৃত্ব করেছে ও অংশ নিয়েছে, তারা শ্রেণীগত কারণে নয়, বরং শ্রেণী-নির্বিশেষে ধনী-দরিদ্র সবাই ধর্মীয় ও জাতীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করেছে। ভারতের ইতিহাসের বেলায় যা সত্য, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ইতিহাসের বেলায়ও তা সত্য। এমন কি, অতীতে রাজ্য-শাসন ব্যাপারে রাজাই যখন সর্বেসর্বা ছিলেন তখন কোনো নারীঘটিত ব্যাপারে, ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশী এবং রাজায় রাজায় ব্যক্তিগত শত্রুতার দরুনও রক্তক্ষয়ী লড়াই হয়ে গেছে, ইতিহাসে এরূপ নজীরের অভাব নেই।

সুতরাং, শ্রেণী-সংগ্রাম বলতে আজ যা বোঝায় অতীতে ঠিক সেরকম কিছু ছিল না। কোন কোন সময় কোন অত্যাচারী রাজা বা জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজারা আন্দোলন করেছে সত্য, কিন্তু তা খাঁটি শ্রেণীসংগ্রাম ছিল না। কারণ—

১. অত্যাচারী রাজা বা জমিদারকে সরিয়ে নতুন রাজাকে গদিতে বসানোই ছিল এই সব আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য।

২. প্রায়ই দেখা যায় অত্যাচারী রাজা-জমিদারের ভাই, নিকটবর্তী আত্মীয় বা কোনো উচ্চপদস্থ ব্যক্তি এই সব আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছে। ফলে 'বিদ্রোহের নেতাকে' অত্যাচারী রাজা বা জমিদারের গদিতে বসানোতেই অধিকাংশ আন্দোলন পর্যবসিত হয়েছে।

বর্তমান আর্থিক ভারসাম্যের অভাবের দরুন সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে যে বিরোধ এবং তার ফলে দুঃখ-দুর্দশা দেখা দিয়েছে, তাকে ধ্বংস করতে না পারলে শান্তি প্রতিষ্ঠার চিন্তা করাই অসম্ভব। বর্তমান উৎপাদনব্যবস্থা,

যাতায়াতের উৎকর্ষতা এবং বাজারের বিস্তৃতির দরুন প্রধানত তিনটি উপায়ে এই ভারসাম্য নষ্ট হয়ঃ

১. শিল্প-প্রসারের দ্বারাঃ এতে খুব অল্প সময়ের মধ্যে খুব অল্প লোক দ্বারা শিল্পপতিরা একদিকে যেমন অর্থের কেন্দ্রীকরণ করে, অন্যদিকে দেশের কুটিরশিল্প ইত্যাদি ধ্বংস করে অসংখ্য লোককে বেকার সমস্যা তথা অভাব-অনটন ও উপবাসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। পশ্চিম জার্মানী, বৃটেন ও আমেরিকার মত কয়েকটি দেশ জনকল্যাণমূলক নীতি গ্রহণ করে এই কুফল থেকে কিছুটা রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ উন্নয়নকামী দেশে এই কুফল ব্যাপকভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

২. ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির দ্বারাঃ যাতায়াতের উন্নতি, বাজারের বিস্তৃতি ও অন্যান্য কারণে, যে বা যারা অধিক পুঁজি খাটাতে পারে সাধারণত তারাই ব্যবসায়ে 'মনোপলি' বা একচেটে-কর্তৃত্ব' প্রচলন করতে পারে; ফলস্বরূপ, একদিকে যেমন অধিকতরো গরীব ব্যবসায়ীরা প্রতিযোগিতায় হেরে ক্রমশ সর্বহারা শ্রেণীতে পরিণত হয়, অন্যদিকে তেমনি বড়ো বড়ো ব্যবসায়ীরা 'মনোপলির' প্রভাবে যথেচ্ছা দাম আদায় করে আরো শক্তিশালী, আরো লোভী হয়ে ওঠে। ফলে, চোরাকারবারী ইত্যাদি দুর্নীতি দেখা দেয় এবং দেশের গরীব কিষাণ, মজুর ও শ্রমিকেরা অধিক মূল্যের চাপে, আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের সামঞ্জস্য করতে না পেরে সর্বস্বান্ত হয়ে যায়।

প্রথম কারণে যে অনর্থের সৃষ্টি হয় তা তিন উপায়ে রোধ করা যায়ঃ

ক. De-industrialization বা বি-শিল্পীকরণ করে কুটিরশিল্পের প্রসার। মহাত্মা গান্ধী এই নীতির সমর্থক ছিলেন। কিন্তু এই পদ্ধতির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল নয়; বর্তমান উৎপাদন প্রতিযোগিতায় কুটিরশিল্প কারখানার কাছে হেরে যেতে বাধ্য। সকল ব্যাপারে আত্মনির্ভরশীল ও স্বয়ংপ্রচুর না

হয়ে কোনো রাষ্ট্রই বি-শিল্পীকরণের নীতি গ্রহণ করে সফল হতে পারে না। কিন্তু আজকের জামানার সকল ব্যাপারে আত্মনির্ভরশীল রাষ্ট্র কল্পনা করা অসম্ভব। সুতরাং কোন দেশ বাধ্যতামূলক বি-শিল্পীকরণের নীতি গ্রহণ করলেও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবে না।

খ. শিল্পকে রাষ্ট্রের হাতে এনে লভ্যাংশ সকলের মধ্যে বণ্টন করবার বন্দোবস্ত করা।[১] বর্তমান পুঁজিবাদের যুগে শিল্প ও জমি রাষ্ট্রীয়করণ খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু রাশিয়া ও অন্যান্য কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে এই নীতির মারাত্মক কুফল দেখা দিয়েছে। ফলে চীনসহ এইসব দেশ ব্যক্তি বা গ্রুপের হাতে শিল্প ও কৃষি ছেড়ে দেবার চিন্তা করছে।

গ. এই সমস্যার আর একটি সমাধান হল ঃ শিল্পের মানবীয়করণ বা ইসলামীকরণ (Humanization or Islamization of Industry)। এই সমাধানটি 'শিল্পের আদর্শ ব্যবস্থাপনা' নামক প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা যে অনর্থের সৃষ্টি হয় তা-ও দুই উপায়ে সমাধান করা সম্ভব ঃ

ক. কার্যকরীভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর প্রভাব খাটিয়ে,

খ. রাষ্ট্রের হাতে ব্যবসা-বাণিজ্যের ভার দিয়ে।

রাষ্ট্র যদি জনগণের হয় ও তার ভিত্তি মজবুত থাকে, তা হলে অত্যধিক মুনাফাকে বে-আইনী করে, সর্বোচ্চ সংখ্যক লোকের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য ভাগ করে দিয়ে, জিনিসপত্রের দর বেঁধে, চোরাকারবারী ও অধিক মূল্য আদায়কারীদের শায়েস্তা করার জন্য কঠোর ও নির্মম আইন প্রণয়ন

---

১. "শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর আগেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দিতে হবে।" —হাদীস। 'শ্রমিকের কাছ থেকে কাজ আদায় করে যে ব্যক্তি তার পুরোপুরি মূল্য পরিশোধ করবে না, আমি তার বিরুদ্ধে শ্রমিকের হয়ে কিয়ামতের দিন অভিযোগ তুলব।"—হাদীস।

করে কিংবা নিয়ন্ত্রিত যৌথ ব্যবসায় তরিকার প্রচলন করে একে রোধ করা যায়।[১] কিন্তু, এর দ্বারা বিভিন্ন দেশের গভর্নমেণ্ট এই অনর্থকে দূর করতে অক্ষম হয়েছে। তার কারণও দুটা ঃ যে সব মন্ত্রী বা কর্মচারী গভর্নমেণ্ট চালনা করেন, তাঁরা নিজেরাই দুর্নীতিমুক্ত নন—আর জনসাধারণ দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবিরাম জিহাদ করে যাবার জন্য সেরূপ সংঘবদ্ধ নয়; কিংবা এ-ও বলা যায় যে তারাও কম-বেশী দুর্নীতি-পরায়ণ। শুধু এ জন্যই, যেসব রাষ্ট্র এ-সব ব্যাপারে ব্যবসা চালাচ্ছে তারাও বিফল হচ্ছে। যে সর্ষে দিয়ে ভূত তাড়াতে হবে সেই সর্ষের মধ্যেই যদি ভূত থাকে—তো ভূতের উৎপাত আরো বেড়েই যাবে। দুর্নীতিপরায়ণ গভর্নমেণ্ট ও কর্মচারীদের দ্বারা ব্যবসা চালালে কী যে দুর্ভোগ ভুগতে হয়, তা আমাদের দেশের কয়েকটি ব্যবস্থার দিকে নজর দিলেই হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যাবে।

সুতরাং মহৎ আদর্শ থাকলে কী হবে, যারা তাকে বাস্তবে রূপায়িত করবে, তারা যদি উপযুক্ত না হয়, তারা যদি মানব-জীবনের প্রতি গভীর মমতা ও মহৎ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত না হয়, সব কিছুই ব্যর্থ হতে বাধ্য। রাষ্ট্রীয়করণের নামে এমন লোকের হাতে কিছুতেই ক্ষমতা তুলে দেওয়া যেতে পারে না। মহৎ কাজের জন্ম হচ্ছে মহৎ চিন্তায়—সুগভীর উপলব্ধিতে।

এইজন্যই মানুষের সুষ্ঠু ও সবল বুদ্ধির বিকাশের সংগে সংগে সমগ্রভাবে তার মানসিক ও আত্মিক বিপ্লব ঘটাতে হবে। উচ্চতর আদর্শ ও প্রকৃত ধর্মবোধ দ্বারাই সে বিপ্লব আনা সম্ভব। সে বিপ্লব দ্বারাই মানুষের মন হতে দুর্নীতির উৎসকে দূর করে সত্যিকার মনুষ্যত্ববান মানুষ কর্তৃক জনগণের রাষ্ট্র গঠনের দ্বারাই এ কাল ব্যাধি হতে মুক্ত হওয়া সম্ভব। আর এইরূপ

---

১. যে সব বণিক অবৈধ কাজ থেকে বিরত থাকে এবং মিথ্যা শপথ না করে তাদের জিনিসের সত্যিকার দাম প্রকাশ করে—তারা ছাড়া, অন্যান্য সব বণিককে হাশরের দিনে মিথ্যাবাদীদের স্তরে দাঁড় করানো হবে। —হাদীস

"শহরে খাদ্যশস্য এনে যারা কম দামে বিক্রি করে, তারা এতে করে পরম লাভবান হয়। কিন্তু বেশী দাম আদায় করবার আশায় যারা খাদ্যশস্য মওজুদ করে রাখে তারা অভিশপ্ত।" —হাদীস

আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবসায়-বাণিজ্যে জনগণকে আবশ্যকীয় স্বাধীনতা দিলেও কোন প্রকার ভারসাম্য, অব্যবস্থা বা দুর্নীতি দেখা দেবার কথা নয়।[১]

জমি রাষ্ট্রীয়করণ করা মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়,—জমি-বন্টন নীতিই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করতে পারে। জমি-সমস্যার আদর্শ সমাধান এই বইয়ের অন্যত্র দেখান হয়েছে।

আদর্শে আদর্শে ভারসাম্যের অভাব

আদর্শে আদর্শে ভারসাম্য না থাকায় সমাজ, রাষ্ট্র ও ব্যক্তি সম্বন্ধে এবং ব্যক্তির জীবনের উদ্দেশ্য ও মূল্য সম্বন্ধে একটা সার্বজনীন ধারণায় আসা আজ একেবারেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু তাই নয়, একেকটি আদর্শকে কেন্দ্র করে এসব বিষয়ে একেকটি বিশেষ ধারণা গড়ে ওঠায় আদর্শগুলোর মধ্যে অসহিষ্ণুতা, পরস্পর-বিরোধিতা ও হানাহানি লেগেই আছে। একদিকে মানবজাতির সকল সমস্যার সমাধান দিতে এসব আদর্শ মূলতই অক্ষম, অন্যদিকে, জীবনের একেকটা দিক নিয়ে চরম উগ্রতার পরিচয় দেওয়ায় এই আদর্শগুলি আজ পৃথিবীর শান্তিকে একেবারেই বিপন্ন করে তুলেছে। প্রধানত এর দুটো কারণ আছে ঃ

ক. আদর্শগুলি কোনো এক বিশেষ দেশে, বিশেষ সময়ে, মানবজীবনের কোনো এক বিশেষ সমস্যার তাগিদে সৃষ্টি হয়েছে।

খ. মানুষের দৃষ্টি ও চিন্তার প্রসার—তার পরিবেশ ও অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ায়, আদর্শগুলি দেশকাল-নির্বিশেষে সকল মানুষের সকল কালের সব সমস্যার সমাধান দিতে একেবারেই অক্ষম।

---

১. সামাজিক ও অর্থনৈতিক কয়েকটি ব্যাধি থেকে মুক্তির উপায় হিসাবে এ পর্যন্ত জাতীয়করণ বা রাষ্ট্রীয়করণের উপর জোর দেয়া হয়েছে। ঔপনিবেশিকতা ও পুঁজিবাদ বর্তমানে সামাজিক কাঠামোকে যে স্তরে নিয়ে এসেছে—তাতে প্রথমে অস্ত্রোপচারের মত এ রকম কঠোর চিকিৎসা কোন কোন ক্ষেত্রে আবশ্যক। কিন্তু এর মানে এ নয় যে রাষ্ট্রীয়করণের নামে ব্যক্তিকে ও ব্যক্তির ন্যায়সংগত স্বাধীনতাকে খর্ব করে রাষ্ট্র নামক অশরীরী ভগবানের হাতে সব ক্ষমতা তুলে দিতে হবে। সামাজিক বিপ্লবের সংগে সংগে মানসিক ও আত্মিক বিপ্লবের অবিচ্ছেদ্য আবশ্যকতার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এ যদি সম্ভবপর হয়. উৎপাদন ও বন্টন-ব্যবস্থা ব্যক্তির উপর ছেড়ে দেওয়াও সহজ হবে। ব্যক্তি যদি প্রকৃত মনুষ্যত্বের ভিত্তিতে—উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থায়—তার ন্যায়সংগত অংশগ্রহণ করে, তাহলে এ বিষয়ে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের তেমন দরকার হবে না। সুতরাং রাষ্ট্রীয়করণের পরেই প্রতিটি ভারসাম্যবাদীর কাজ হবে—নৈতিক ও মানসিক শিক্ষায় প্রতিটি মানুষকে উন্নত করা—যাতে দেশের ভারসাম্যে কোন বিচ্যুতি না ঘটিয়েও রাষ্ট্র বা সমাজ নামক শক্তির অনাবশ্যক নিয়ন্ত্রণ থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে।

এর ফলে, নাৎসীবাদ, ফ্যাসিবাদ, নিহিলিজম, পশ্চিমী গণতন্ত্র, বলশেভিজম বা কম্যুনিজম ইত্যাদি পরস্পরবিরোধী একচোখা আদর্শ বা মতবাদ মানুষের মুক্তির নামে দুনিয়াকে একটা চিরন্তন লড়াইয়ের ক্ষেত্রে পরিণত করেছে। জাতির প্রভাব, অর্থনৈতিক সাম্য ও জাতির উন্নতির পরাকাষ্ঠা দেখাতে পারলেও ব্যক্তিকে অস্বীকার করে রাষ্ট্রকে চরম ও পরম মনে করে নাৎসী-বাদ ও ফ্যাসিবাদ পৃথিবীর বুকে যে তাণ্ডবলীলা শুরু করেছিল, মানুষের ইতিহাসে তার কোনো নজীর নেই। পশ্চিমী গণতন্ত্রের নামে, মানবস্বাধী-নতার তথাকথিত সংগ্রামের পরও পশ্চিমের পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থা সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও ঔপানিবেশিকতাবাদকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য প্রাণপাত করেছে এবং বর্তমানে তাদের সৃষ্ট অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ তৃতীয় বিশ্বের বহু গরীব দেশকে দ্রুত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অনগ্রসর ও দুর্বল দেশগুলির কোটি কোটি মানুষের জীবনের কোন মূল্যই তারা দিতে রাজী নয়। কম্যুনিজম — পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করে, মানুষের ভাত কাপড়ের বন্দোবস্তের দিকেই সমস্ত মনোযোগ দিয়েছে, ব্যক্তির অনন্যসাধারণতা, তার আত্মা ও আত্মিক মূল্যবোধ, তার স্বাধীনতা এবং জীবনের আরো আরো সমস্যাকে বিদায় দিয়ে মানুষকে উদরসর্বস্ব এক পেটুক জীবে পরিণত করার প্রয়াস পাচ্ছে। অন্যদিকে নিহি-লিস্টরা রাষ্ট্র সমাজ—সব কিছু ধ্বংস করে ব্যক্তি স্বাধীনতার তথাকথিত অবাস্তব স্বর্গে নির্বাসিত হবার স্বপ্ন দেখছে।

অথচ প্রত্যেকটি মতবাদ বা আদর্শের অনুসারীই ভাবছে তারাই সত্য। তাদের আদর্শই একমাত্র আদর্শ যা মানবজাতিকে মুক্তি ও কল্যাণ দিতে পারে; আর, অন্যসব আদর্শই খারাপ এবং মানবজাতির প্রগতি ও কল্যাণের পরিপন্থী। কাজেই মানবজাতির মুক্তির ও প্রগতির জন্য অন্য আদর্শকে ধ্বংস করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে—এই হল প্রত্যেকটি আদর্শ বা মতবাদের মনোবৃত্তি। এই জঘন্য মনোবৃত্তি থেকেই গত মহাযুদ্ধের বিভীষিকা নেমে আসে, বর্তমানেও এই মনোবৃত্তি সারা দুনিয়া জুড়ে নতুনতর ও ভয়ঙ্কর-তর সংগ্রামের পাঁয়তারা করছে।

এই অশান্তি থেকে মানব-সমাজকে বাঁচাতে হলে দুটো উপায় অবলম্বন করতে হবে ঃ

ক. দলীল-প্রমাণের সাহায্যে, আদর্শগুলির অপূর্ণতা, একচোখিতা, দেশ, কাল ও পাত্রভেদে সর্বত্র প্রয়োগের অযোগ্যতা, মানুষের সকল সমস্যা সমাধানে অপারগতা, অতীতে এদের ব্যবহারের নিষ্ফলতা ও অনর্থকারিতার কথা মানুষের কাছে তুলে ধরে এই সমস্ত অসম্পূর্ণ এক দেশে মতবাদের হাত থেকে তাকে উদ্ধার করতে হবে।

খ. সংগে সংগে তাদের সামনে এমন একটা আদর্শ তুলে ধরতে হবে যা চিরন্তন ও বিশ্বজনীন, যা তাদের সকল সমস্যার প্রগতিশীল সমাধানের এবং সমস্যাগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের পুরা ক্ষমতা রাখে।

ইসলাম মানুষের কোনো জাতিগত, শ্রেণীগত বা কৌলিন্যগত আদর্শ স্বীকার করে না। কোনো বিশেষ সময়ের, জীবনের কোনো একটা বিশেষ সমস্যা নিয়ে সর্বকালের পূর্ণাংগ জীবন-দর্শন গড়ে উঠতে পারে না। মানবজাতির সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, যৌন, মানসিক, আধ্যাত্মিক ইত্যাদি সকল সমস্যার সমাধান আর তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের মৌলিক শক্তি ইসলামে রয়েছে বলে, একমাত্র ইসলামই তথাকথিত আদর্শের ফাসাদ ও রক্তাক্ত হানাহানি থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করতে পারে।

অন্যান্য ব্যাপারে ভারসাম্যের অভাব

এছাড়া, মানুষের যৌন জীবনে, তথা নারী ও পুরুষের মধ্যে ভারসাম্যের অভাব, তার সহজ-স্বাভাবিক বৃত্তিগুলির মধ্যে ভারসাম্যহীনতা—প্রভৃতি পারিবারিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিশৃঙ্খলার দরুন আজকের সমাজে দারুণ অশান্তি দেখা দিয়েছে। নারীর জীবনের পবিত্রতা ও মর্যাদার স্বীকৃতি না দিয়ে নারী-স্বাধীনতার ভুল ব্যাখ্যায় নারীকে পথে বার করে পশ্চিমের তথাকথিত সভ্যতা-গর্বী দেশগুলি নারীর জীবন নিয়ে ছিনিমিনিই খেলছে ; ফলে, এইসব দেশে পারিবারিক জীবন থেকে শান্তি, শৃঙ্খলা ও স্নিগ্ধতা আজ নির্বাসিত ; অগণিত তালাকের মামলা এবং লক্ষ লক্ষ কুমারী

মায়ের অসহায় পরিত্যক্ত জীবন, অসংখ্য নারীর অসহায় ও অবিবাহিত জীবন সেই মর্মন্তুদ ব্যর্থতারই কাহিনী। অপরদিকে, উপমহাদেশ এবং মধ্যপ্রাচ্যের অনেকগুলি দেশে অবস্থা ঠিক তার বিপরীত। এইসব দেশে কোথাও কেতাবী অধিকার দিয়ে বা যুগধর্মের চাপে স্বাতন্ত্র্যের দাবী অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বীকার করে, কার্যতঃ মেয়েদের অবরোধের আড়ালে বন্দী রেখে কিংবা বড়জোর রাস্তায় প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে, অনেক ব্যাপারে পঙ্গু করে রাখা হয়েছে।

এই বিপর্যয় থেকে পারিবারিক শান্তিকে বাঁচাতে হলে—

১. নারী ও পুরুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অধিকার স্বীকার করেও তাদের বহু কাজের ক্ষেত্র যে আলাদা এ সত্যকে স্বীকার করে নিতে হবে।

২. পরিবার পরিচালনায় নারী পুরুষের সম-দায়িত্বের ভিত্তিতে, পরিবারকে কেন্দ্র করে নতুন সমাজ গঠনের কাজে হাত দিতে হবে।[১]

এবার মানুষের সহজাত বৃত্তিগুলির কথায় আসা যাক।[২] বৃত্তিগুলিকে ভাল-মন্দ ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করা একেবারেই অযৌক্তিক; তবে এদের ভাল এবং মন্দ দু'রকম ব্যবহার হতে পারে এবং স্বাধীনভাবে তা ব্যবহার করার শক্তি মানুষের রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কামনা প্রেমে রূপান্তরিত হতে পারে—ব্যক্তি বিশেষের প্রতি প্রেম বিশ্ব-প্রেমে উন্নীত হতে পারে। অথচ বিকৃত কাম ধ্বংস ডেকে আনতে পারে। প্রত্যেকটি বৃত্তি সম্বন্ধেই একথা খাটে। এই বৃত্তিগুলির মধ্যে নিহিত আছে মানুষের দুর্লভ শক্তির সম্ভাবনা। সুতরাং মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ তথা তার পূর্ণ পরিণতির জন্য প্রত্যেকটা বৃত্তিই সমভাবে প্রয়োজনীয়। বৃত্তিগুলিকে আগুন বা অস্ত্রের সংগে তুলনা করা যেতে পারে, ব্যবহারের উপর এগুলির উপকারিতা ও ধ্বংসকারিতা নির্ভর করে।

কাজেই বৃত্তিগুলির কোনোটাকেই সমূলে ধ্বংস করবার চেষ্টা না করে, প্রত্যেকটারই প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিয়ে তাদের সঠিক পথে চালনার জন্য বিবেক-বুদ্ধি ও ধর্ম-মানসিকতার পাহারা বসাতে হবে।

---

১. দেখুন "নারী প্রগতি ও নারীর মর্যাদা" সমাজ ও নারী অধ্যায়।

২. যেমন, ক্রোধ, লোভ, কাম প্রভৃতি।

ইসলাম কোনো কোনো বৃত্তিকে ধ্বংস করে বাকী কটা বৃত্তির উন্নয়ন চায় না। বরং তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে, কল্যাণের পথে রূপান্তরিত, সুন্দর ও মহীয়ান করে তোলাই তার মৌলিক নীতি। এইজন্যই জার্মান দার্শনিক কার্লহারমান কেসালরিঙ ইসলাম সম্বন্ধে বলেছেন :

এই অদ্ভুত ধর্ম ও মানুষের মৌলিক-স্বভাব বা প্রকৃতির মধ্যে নিবিড়-অন্তরংগ সম্পর্ক রয়েছে। আর তাই কুরআনের ভাষায় বলা হয়েছে—ইসলাম হলো ফিতরতের অর্থাৎ স্বভাবের ধর্ম।

আদর্শ রূপায়ণে

উপরে আমরা আমাদের আদর্শের একটা মোটামুটি পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি এবং সেই বিশিষ্ট আদর্শ ও জীবন-দৃষ্টির আলোকে বর্তমান দুনিয়ার জটিল সমস্যাগুলিকে আমরা বুঝতে ও বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছি। আমাদের সমাজ, রাষ্ট্র ও মনোজীবনে যে সর্বাত্মক বিশৃঙ্খলা এবং সংকট দেখা দিয়েছে, আলোচনা প্রসংগে আমরা বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে কোন একচোখা মতবাদ সেই সংকট ও বিশৃঙ্খলা থেকে মানবজাতিকে উদ্ধার করতে পারে না,—তার জন্য দরকার একটা নিখুঁত, পূর্ণ, সমন্বয়ী আদর্শের এবং সেই আদর্শই একমাত্র পথ—যা মানুষকে, আজকের স্বার্থ, ফাসাদ, হানাহানি, দুশমনি-অবিশ্বাস ও দুঃখ-দৈন্য থেকে মুক্ত করে, শান্তি প্রগতি ও পূর্ণতার সোনালী চূড়ায় নিয়ে যাবে।

এখানেই আমরা একটা গুরুতর প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছি। সৃষ্টির সেরা জীব মানুষের বুদ্ধির অভাব কোন দিনই ছিল না। এবং আজ পর্যন্ত মানুষ তার বুদ্ধির সাহায্যে বহু বিরাট আবিষ্কার করেছে। অনেক মহৎ চিন্তা, অনেক রঙীন মতবাদ সৃষ্টি করেছে, কল্পনায় অনেক সুখ-স্বর্গের ছবি এঁকেছে—কিন্তু তবু মানুষের জীবনের যুগ-যুগান্তর সঞ্চিত দুঃখ-দুর্দশা ও অশান্তি ঘোচেনি, তবু পৃথিবীর বুকে দোজখের দাউদাউ আগুন নিভে যায়নি—কল্পনার স্বর্গ কল্পনাই রয়ে গেছে; এই ধূলিমাটির দুঃখের পৃথিবীতে তার স্নেহ-শীতল ছায়াও যদি একটুখানি পড়ত, মানুষ হয়তো হাফ ছেড়ে বেঁচে উঠত।

সুতরাং, বড় আদর্শ দেয়াই চরম কথা নয়, বরং সেই আদর্শকে কিভাবে কোন্ তরিকায় বাস্তবের হাড়-মাংসে জীবন্ত ও সার্থক করে তুলতে হবে, তা স্পষ্ট করে জানা এবং জানানোও আমাদের কর্তব্য। আমরা বিশ্বাস

করি, মানুষ স্বভাবতই কল্যাণ-প্রয়াসী মহতের দিকে—মঙ্গলের দিকেই তার প্রবণতা। এই মঙ্গলকামী মানুষেরা, শুধু কল্পনাতেই মঙ্গলব্রতী এবং মানুষের বন্ধু নন—তাঁরা কার্যক্ষেত্রে এবং বাস্তব জীবনেও সেই কল্যাণাদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, শুধু চেষ্টিত নন, বিরামহীন জেহাদের মন্ত্রেও দীক্ষিত। প্রতিকূল সমাজ-ব্যবস্থার লৌহনিগড় ভেঙে, পৃথিবীকে, ভীতি ও দারিদ্র্যমুক্ত স্বাধীন মানুষের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য, যুগে যুগে এরা একক বা সামাজিকভাবে সংগ্রাম করে এসেছে। মানবতার কল্যাণকামী এই সিপাহীরই আজ এই পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠা তথা মানবজাতির সর্বাঙ্গীন মুক্তির জন্য সংঘবদ্ধভাবে সংগ্রামের ওয়াদা নেবেন।[১] অর্থাৎ এই আদর্শে বিশ্বাসীরা বিচ্ছিন্নভাবে কাজ না করে—একই ভাবুকতা, একই ধ্যান-ধারণা ও জীবনাদর্শকে সামনে রেখে নিজস্ব সংগঠন গড়ে তুলবেন। কারণ, এককভাবে নয়, সমবেত সাংগঠনিক চেষ্টায়ই সে আদর্শকে কল্পনার আকাশ থেকে, বাস্তবের পৃথিবীতে ইট-পাথরের কঠিন গাঁথুনিতে সার্থক ও নির্ভরযোগ্য করে তোলা সম্ভব। সুতরাং আদর্শ রূপায়ণের জন্য বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান অপরিহার্য।

এই প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা, হযরতের সময়কার আদর্শে, নিজেদের চরিত্র, মনোবৃত্তি ও জীবন-যাপন পদ্ধতি গড়ে তুলবেন।[২] মুখে আদর্শবাদের বুলি, আর জীবনে সেই আদর্শের অস্বীকৃতি—সারা দুনিয়ায় এই মোনাফেকী প্রবল হয়ে উঠায়, আজ সাধারণ মানুষের মনে নৈরাশ্যের কালমেঘ জমে উঠছে; এই প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা নিজেদের প্রচারিত আদর্শকে নিজেদের জীবনে গ্রহণ করে, তারি স্থানে এনে দেবেন সুন্দর ও মহৎ জীবনের নিশ্চিত আশ্বাস। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কল্যাণের জন্য এরা দুঃখকে দুঃখ বলে মানবেন না; কারণ, তাঁদের জীবন-মরণ, ধন-সম্পদ, এবাদত-বন্দেগী সবই তাঁরা সমর্পণ করেছেন আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে।[৩] আর আল্লাহ্‌ চাহেন যে প্রত্যেক মানুষের খিদমতের জন্য—তাঁর সুখ-শান্তি বিধানের জন্য প্রত্যেকটি মুহূর্তে প্রস্তুত থাকুক। আঘাতসহ, বজ্রকঠোর কণ্ঠ সহ—এই সব কর্মীর মনে মানুষের প্রতি অগাধ প্রেম, অফুরন্ত মমতা, অশেষ ভালবাসা বিদ্যমান থাকবে। নসিহতের চাইতে দৃষ্টান্ত ভাস-এ-ই হবে তাদের জীবনের ব্রত।

১ মানব জাতির মধ্যে এমন একদল থাকবে যারা সব সময় মানব সমাজকে সত্য ও ন্যায়ের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।—কুরআন

২ "সংস্কার সাধন ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য আমি আমার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করতে সংকল্প করেছি"—কুরআন।

৩ কুরআন।

আগে মানুষের অন্তর্নিহিত কল্যাণকামিতা সম্বন্ধে ইংগিত করা হয়েছে। বিশৃঙ্খলা এবং সংকট যত বড় হয়ে দেখা দিক্ না কেন, মানুষের শুভ-বুদ্ধিতে আস্থা রাখতে হবে। এবং সেই শুভবুদ্ধির কাছেই আজ আবেদন জানাতে হবে। সেই আবেদন কারা জানাতে পারে?—চরিত্রবান কর্মী, যাদের আদর্শ ও জীবনের মধ্যকার সকল পার্থক্য ঘুচে গিয়ে জীবনই সে আদর্শের একটা প্রতিবিম্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁরাই আজ মানুষের শুভবুদ্ধির কাছে সে আবেদন জানাতে পারেন সুন্দর ও যৌক্তিকভাবে এবং আমরা প্রকৃত মুমিন হলে তার সুফলও নিশ্চিত।[১] সুতরাং, এই আদর্শ প্রতিষ্ঠানের, আদর্শ-কর্মীদের কাজ হবে মনোবিপ্লবকে সম্ভব করে তোলার জন্য পরম আত্মবিশ্বাসের সংগে কাজ করে যাওয়া। মনোবিপ্লব আর কিছু নয়, মানুষের শুভবুদ্ধিকে জাগিয়ে তোলা, তাঁর শুভবুদ্ধির দ্বারে ধর্না দিয়ে, আজকের চিত্ত-দৈন্য এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য তাদের তৈরি করা। তারা যদি তৈরি হয়, নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হয়, মেরুদণ্ডটা একটু শক্ত-সোজা করে দাঁড়ায়—আজকের দুর্নীতি পঙ্কিল, শোষণ-সর্বস্ব কৃত্রিম সমাজ-ব্যবস্থা তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়তে বাধ্য।

এই মনোবিপ্লব আনতে হলে, একদিকে যেমন চাই প্রাথমিক মুসলমানদের মত একদল জেহাদী কর্মী, তেমনি অন্যদিকে চাই, ব্যাপক ও শক্তিশালী তামদ্দুনিক আন্দোলন। জোর করে মানুষকে মনুষ্যত্বের সবক দেয়া যাবে না। তার শুভবুদ্ধির কাছে আবেদন করেই তার মনুষ্যত্বের উদ্বোধন করতে হবে। এজন্য শক্তিশালী তামদ্দুনিক আন্দোলন চালানো দরকার। প্রচার, সাহিত্য, ক্লাব, লাইব্রেরী, আন্দোলন, সমাজ-সেবা প্রভৃতির ভিতর দিয়ে আদর্শের বাণী সকলের মনে পৌঁছিয়ে দিতে হবে এবং ভিতর বাইরের সংগ্রামের জন্য তাদের প্রস্তুত করতে হবে। অর্থাৎ প্রথম সংগ্রাম হবে মানুষেরই অন্তরে; নিজের চিত্ত-দৈন্য, অক্ষমতা, দলাদলি, পদলোভ সঙ্কীর্ণতা ও আত্ম-অবিশ্বাসের সংগে তুমুল সংগ্রামে সে যদি জয়ী হবে, বাইরের সংগ্রামেও তার সাফল্যকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। তামদ্দুনিক আন্দোলনের বিভিন্ন অস্ত্র একই সংগে এই উভয় ফ্রন্টে সংগ্রাম করে যাবে।

---

১. কুরআন (১৬ : ১২৫)।

আপাততঃ বাংলাদেশে উক্ত জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠা করবার জন্য বাংলাদেশের আদর্শবাদী কর্মীরা তাঁদের সংহৃত ও সংঘবদ্ধ শক্তিকে নিয়োজিত করবেন। তাদের নিখুঁত চরিত্র, অটল আদর্শনিষ্ঠা, জগত ও জীবনের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা, মমতা ও ভালবাসা—অতি সহজেই জনগণের মনে অনিবার্য প্রভাব বিস্তার করবে; তাছাড়া—সংগঠন, প্রচার ও বিরামহীন কর্ম-চাঞ্চল্যের ফলে নতুন চিন্তাধারা, নতুন ভাবুকতার সৃষ্টি হবে,—বর্তমানের সীমিত সঙ্কীর্ণ, স্বার্থ-সর্বস্ব জীবনের খোলস ভেঙে দিকে দিকে সত্যিকার নতুন মানুষের আবির্ভাব হবে, বিবেকবান, মনুষ্যত্ববান মানুষের জাগরণ হবে। এদের সমবেত চেষ্টায়ই আদর্শ জীবনাদর্শের বুনিয়াদের উপর বাংলাদেশে আদর্শ সমাজ ও আদর্শ রাষ্ট্র-ব্যবস্থা গড়ে উঠবে।

কিন্তু তাই বলে এই আদর্শ বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ থাকবে না,—কারণ এই আদর্শ কোন মানবগোষ্ঠী, ধর্ম সম্প্রদায়, ভাষাগোষ্ঠী বা দেশ-বিশেষের জন্য নয়—দুনিয়ার প্রত্যেকটি মানুষ, তথা মানবজাতি ও বিশ্বের জন্য এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ, কল্যাণময় রহমত।[১] দেশ-প্রেমের নামে অন্ধ বিজয়ের নেশায় মত্ত, অন্ধ জড়বাদ সৃষ্টিতে উন্মাদ,—যে সব ধ্বংসকারী প্রতিষ্ঠান অন্তর্নিহিত স্ব-বিরোধিতার ফলে মানুষের অনেক দুঃখ-লাঞ্ছনা ডেকে এনেছে, তাদের হাত থেকে এই আদর্শই আজ মানবজাতিকে উদ্ধার করতে পারে—কারণ, সকল রকম স্ব-বিরোধিতা থেকে মুক্ত এমন একটি প্রেরণার নীচে আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক জীবনকে স্থাপন করবার নির্দেশ আমরা এ থেকেই পেতে পারি—যাতে করে জীবনের প্রত্যেক স্তরে, সংঘর্ষ ও বিরোধের স্থলে প্রেম এবং মৈত্রীই হবে সত্য; এ আদর্শের ছোঁয়ায়, আন্তর্জাতিক বিরোধের স্থলে আন্তর্জাতিক সহযোগিতাই বাস্তব হয়ে উঠবে; কারণ, সকল সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিন্যাসের মাঝখানে, মানুষকে তার বিশ্বজনীন পূর্ণ ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত করা হবে এবং আরো আরো প্রশ্নকে, তারই প্রয়োজন-অপ্রয়োজন, সুখ-শান্তির আলোকে বিচার করা হবে। তাওহিদ, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব ও পারিবারিক সমানাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত এই যে জীবনাদর্শ —যার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে মানুষ—আজকের পৃথিবীতে ক্লান্ত নিপীড়িত বিপর্যস্ত মানুষ তারি প্রতীক্ষায় চেয়ে আছে। এই আদর্শকে ভিত্তি করেই

১. হযরত (সঃ) কে পাঠানো হয়েছে শুধু মুসলমানদের জন্য নয়—বিশ্বের সকলের জন্য রহমত রূপে—(কুরআন)।

জাতি-বৈরিতা, জাত্যাভিমান, রক্ত ও বর্ণ-কৌলিন্য প্রভৃতিকে অস্বীকার করে পৃথিবীর দেশে দেশে আদম-সন্তানেরা এগিয়ে যাবে।[১] এবং প্রত্যেক মানুষ ও প্রত্যেক জাতির সমানাধিকারের ভিত্তিতে একদিন বিশ্ব-রাষ্ট্র গড়ে উঠবে; দুনিয়াতে সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি নেমে আসবে।

কিন্তু, পারস্পরিক সহযোগিতা, সহনশীলতা ও মৈত্রীর ফলে, শান্তি, সুখ, সমৃদ্ধি ও প্রগতি এলেই যে রাষ্ট্রের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে—একথা আমরা বিশ্বাস করি না। রাষ্ট্রশক্তি শোষণের আধার, তাই নিহিলিস্টরা রাষ্ট্রকে ধ্বংস করতে চান,—আর কম্যুনিস্টরা কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠারজন্য রাষ্ট্র-শক্তির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেও বলেন যে, সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার সংগে সংগেই রাষ্ট্রশক্তি আপনা আপনি উবে যাবে। কিন্তু রাষ্ট্র ধ্বংসও হবে না, আপনা আপনি কর্পূরের মত উবেও যাবে না; মানুষের সহজাত বৃত্তি ও প্রবৃত্তিগুলির বিভিন্নতা, বিরোধিতা ও অসাম্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়—যে কোন রূপের হোক না কেন—কিছুটা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন সকল দেশে, সকল কালে, সকল সমাজেই হবে ও থাকবে। ইতিহাসের সাক্ষ্য ভুলে গেলে চলবে না—যে রাষ্ট্রহীন সমাজের নিশ্চিত ও অনিবার্য গতি হচ্ছে অসভ্য জঙলী সমাজ ব্যবস্থার দিকে। সুতরাং রাষ্ট্র এমন কি পরিবার আপনা আপনি ধ্বংস হয়ে যাবে কিংবা তার কোন প্রয়োজনই থাকবে না, একথা তাদের পক্ষেই বলা সম্ভব, মানুষের চরিত্রের নিগূঢ় রহস্য সম্বন্ধে যাদের কোন জ্ঞানই নেই—মানুষকে যারা গবেষণাগারে বসে মতবাদের চশমা দিয়ে দেখতে অভ্যস্ত। ডিক্টেটরশীপ—হোক্‌না সে সর্বহারাদেরই, রাষ্ট্রের-ক্রম-বিলীয়-মানতায় সাহায্য করে না, তাকে শক্তিশালীই করে এবং পরিণামে এত শক্তি-শালী করে তোলে যে তাতে ব্যক্তি স্বাধীনতার কোন স্থানই থাকে না।

আমরা যে আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার কথা কল্পনা করেছি তাতে রাষ্ট্র থাকবে—কিন্তু এতে মানুষের চরিত্র এতই উন্নত ও মার্জিত হবে যে এই রাষ্ট্রে খুব কম ক্ষেত্রেই ক্ষমতার প্রয়োজন বা আবশ্যকতা দেখা দেবে। ভ্রাতৃত্বের দীক্ষায় দীক্ষিত এই সমাজের রাষ্ট্র একটা সহযোগিতার ও কল্যাণ-কর্মের সংগঠন হিসাবেই বিরাজ করবে।

ইজম-বিভ্রান্ত, শাসন-পীড়িত, দিশেহারা, বিপর্যস্ত, মানবজাতির মুক্তির একমাত্র পথ কি—নৈরাশ্য, অবিশ্বাস ও অজ্ঞানতার এই দিকহীন অন্ধকারে,

---

১. মানব সন্তানেরা একজাতি বৈ কিছু নয়—(কুরআন, ১০·১৯ এবং ২-২১৩।)

কোন্ পথে আশার সূর্যশিখা ঝলমল করছে, সেই মধুর দুর্গম পথের কিছুটা ইঙ্গিতই এখানে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। সেই কবে, সৃষ্টির আদি থেকে মানুষ যাত্রা শুরু করেছে—পথে পথে, মঞ্জিলে মঞ্জিলে যুগ-যুগান্ত-কাল ধরে দুঃখ, গ্লানি আর ব্যর্থতার অভিশাপ জমে উঠেছে।—বারবার দিক ভুল করেছে তারা, তবু পথ চলেছে—এই চলার বিরাম নেই।

আজ, আবার বজ্র-বিদীর্ণ আকাশের নীচে চির-অভিযাত্রী কাফেলা থমকে দাঁড়িয়েছে—সংশয়, নৈরাশ্য আর মৃত্যু-ভীতির গভীর আঁধারে পথের চিহ্ন মুছে গেছে—অনিশ্চয়তার বিভীষিকায় তারা আজ দিশেহারা।

কিন্তু তবু তাদের এগিয়ে যেতে হবে—ঝড়-ঝঞ্ঝা, বজ্র মাথায় নিয়ে, মৃত্যুর সাথে কোলাকুলি করে সামনের দিকে এগিয়ে চলাই তাদের ধর্ম, তাদের সংকল্প। সুতরাং আজকের আচ্ছন্নতা কাটিয়ে আবার তারা যাত্রা শুরু করবে এবং যাত্রা শুরু করার আগে তারা ঠিক করে নেবে তাদের পথ, তাদের দিক—হোক না সে পথ বন্ধুর, দুর্গম আর কণ্টকাকীর্ণ।

তাই, মানবতার এই ঘোর দুর্দিনে, দুনিয়ার প্রত্যেকটি চিন্তাশীল ব্যক্তি—শিল্পী, সাহিত্যিক, কর্মী, মজুর, ছাত্র, ধর্মনেতা, রাষ্ট্রনেতা—সবাইকে আজ নিজ নিজ ক্ষমতা, দায়িত্ব ও ভূমিকা সম্বন্ধে সজাগ হতে হবে, থমকে দাঁড়ানো কাফেলার পথনির্দেশ করতে হবে। বারবার পথ ভুল করায় অশেষ দুঃখ, অসহনীয় দুর্গতি মানবজাতির ভাগ্যে নেমে এসেছে। সেই দুঃখ ও লাঞ্ছনা থেকে মানুষকে বাঁচাতে হবে, সামগ্রিক সঙ্কট থেকে মানবজাতিকে আজ সামগ্রিকভাবে উদ্ধার করতে হবে। এ বড় কঠিন দায়িত্ব—দেশে দেশে মানুষের কল্যাণ-কামীদের কাছে এই কঠোর দায়িত্বের নির্মম আহ্বান এসেছে,··· এদিনে কোন দ্বিধা-সঙ্কোচ আর পলায়নী মনোবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না। মানসিক এবং পরিণামে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় যে অব্যবস্থার ফলে মানুষকেই আজ অস্বীকার করা হয়েছে, দুনিয়ার এই ইনকিলাবী সৈনিকদের আদর্শনিষ্ঠা, জেহাদি-সংকল্প ও সমবেত আঘাতের সামনে তাসের ঘরের মতই তা ভেঙে পড়বে—সকল সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিন্যাসের মাঝখানে মানুষ আবার মানুষের গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হবে—মানুষের জীবনে আবার নেমে আসবে সুখ, সমৃদ্ধি, প্রগতি ও শান্তি। সমস্ত দুনিয়ার একটি মাত্র আদর্শ রাষ্ট্র ও আদর্শ সমাজ গড়ে তোলার এটাই একমাত্র পথ।

টীকা

১. আমাদের কর্ম-কৌশল : কর্ম-কৌশল মানুষকে বলি দেবার জন্য নয়, তার উন্নতি, প্রগতি ও শান্তির জন্য। সুতরাং উদ্দেশ্যকে (end) সফল করার জন্য যে-কোন উপায় গ্রহণ করলে চলবে না। দেখতে হবে সে উপায় ন্যায়সংগত ও যুক্তি-নির্ভর কি না? অপরদিকে মানবতা-বিরোধী কি না? মানবতার জনাই যে সংগ্রাম মানবকে ধ্বংস করে তা সম্ভবপর নয়। সুতরাং তথাকথিত অতি প্রগতিশীল বন্ধুরা যেন-তেন প্রকারের নীতি গ্রহণ করে দেশে ও সমাজে অসময়ে যেভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন, তা গ্রহণযোগ্য নয়। এ পথ পথ নয় — কু-পথ।[১] কুপথে শান্তি যত না আসে তার চেয়ে বেশী আসে অশান্তি। সংগ্রাম করতে হবে — বিপ্লব আনতে হবে - কিন্তু মানবতা ও বিজ্ঞান-গ্রাহ্য উপায়ে। কারণ আমরা পশু নই — মানুষ।

২. আমাদের সাহিত্য : সাহিত্য শুধু সাহিত্যের জন্য নয়, (Art for art's sake)—এ শুধু রুচির জন্যও নয়, আর্ট আর রুচি দুটোই জীবনের কাম্য — জীবনের অপরিহার্য উপকরণ। দুটো নিয়েই হবে সাহিত্য। আর্ট জীবনের বাইরে নয়; চাঁদের-কিরণ — আর সাগর-দেখায় যে বাস্তব আনন্দ মিলে — তাতে জীবনই হয় শোভিত ও সুন্দর। এ আনন্দের আবশ্যকতা আছে জীবনে। এ নিয়ে কবিতা, সাহিত্য হবেই। আবার খাদ্য, বস্ত্র, পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রভৃতির প্রভাবে জীবনে-মনে যে আঘাত পড়ে তার রসময় চিত্র ও সুর ফুটে ওঠে সাহিত্যে। এইজন্য আমরা সাহিত্যে মিলন-বাদী শিল্প আর জীবনে। আর্ট শুধু আর্টের জন্য — অথবা আর্ট হবে শুধু শ্রেণী-সংগ্রাম তথা আর্থিক সমস্যার রূপ দেবার জন্য — এ দুটোর কোনটারই আমরা ভক্ত নই। আমাদের সংজ্ঞা হল — সৌন্দর্য, কল্পনা আর সমাজ ও ব্যক্তি-মানসের শিল্পময় রস-ঘন প্রকাশই সাহিত্য।

ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে সাহিত্য ও সাহিত্যিকের সঠিক স্বাধীনতা কল্পনা করাই যায় না। কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রগুলিতে যুগে যুগে সাহিত্যি-কের উপর যে আমলাতান্ত্রিক অত্যাচার চলেছে — তাঁদের স্বাধীনতা ও সাবলীলতাকে খর্ব করার যে ঘৃণ্য অভিযান চলেছে তা ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র-গুলির চাইতেও জঘন্য। শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক মিকাই জসেন্কো, শ্রেষ্ঠ গীতি

১. কুরআন (২৩ : ৯৬)।

কবিতা লেখিকা আনা আখ্মাতোভা, মাদো কিরসনভ, পিট্রোপস্, ইভানভ, ভার্সভস্কি, গ্রি অক্টভ্, আগাপভ, গস, এম্পাস্কি, স্টেইন, পেস্টারনাক শাখারভ এবং আরো বহু বিখ্যাত সাহিত্যিকদের সাহিত্য সাধনাকে রাশিয়ার নাস্তিকেরা গলাটিপে মেরেছে, তাঁদের সাহিত্যকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়েছে ; তাঁদের সম্মান ও ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে বিপন্ন করা হয়েছে। দোষ তাঁদের—অনাবিল নিখুঁত সাহিত্যের সাধক তাঁরা।[১] নাস্তিকতার একচোখা আদর্শ আজ সাহিত্যের ও সাহিত্যিকদের এ দুর্গতির মূলে।

৩. শ্রেণী-সংগ্রাম— সমাজে শুধু অর্থনৈতিক শ্রেণী-সংগ্রামই সত্য, আর সব মিথ্যা, কাল্পনিক—এটার কু-যুক্তি আছে, যুক্তি নেই। অর্থনৈতিক শ্রেণী-সংগ্রাম তো হয়ই—অধিকন্তু সংগ্রাম হয় বিভিন্ন জাতীয় স্বার্থের সংঘাতে —হয় বিভিন্ন আদর্শের সংঘাতে—হয় বিভিন্ন কালচারের সংঘাতে। একই পরিবারের দুভাই কেউ হতে পারে কম্যুনিস্ট, কেউ হতে পারে সোশালিস্ট, লীগপন্থী ; ঝগড়া বা সংগ্রাম তাদের মধ্যেও হয়—হোক না দুজনেই 'সর্বহারা' কিংবা দুজনেই বুর্জোয়া। এটা আদর্শের সংগ্রাম, শ্রেণীর নয়। শ্রেণীহীন (?) কম্যুনিস্ট দেশগুলিতে মত-বিরোধের অন্ত নেই—অন্য মতকে বা ভিন্ন মতকে চেপে মারবার জন্য সেখানে ডিক্টেটরশীপের চেষ্টার ত্রুটি নেই। এও শ্রেণী-সংগ্রাম নয়— আদর্শের সংগ্রাম। অর্থনীতিই সব সংগ্রামের মূলে—এ সত্য নয়। যৌন বিষয়ে দুই ব্যক্তি এমন কি দুই পরিবারের মধ্যে, সংঘর্ষের সূচনা করতে পারে। সম্মান রক্ষা ও শক্তির মোহ যে বহু সংগ্রামের জন্য দায়ী এটা কে অস্বীকার করবে ?[২]

অন্যদিকে শুধু সংগ্রাম নয়, সহযোগিতাও মানবসমাজকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে পারে।

যতই দিন যাচ্ছে ততই প্রগতির পথে অর্থাৎ উন্নতির পথে সমাজ চলেছে ; কিংবা উৎপাদন-প্রণালীর উৎকর্ষতার সংগে সংগে মানবজাতি উন্নতি ও প্রগতি বা 'শান্তির' পথে এগিয়ে চলেছে—এটাও সব সময় সত্য নয়। গতি শুধু সরল রৈখিক নয় এ পররৃত্তিক, বৃত্তিক সব রকমের হতে পারে। উৎপাদন-প্রণালীতে উৎকর্ষতা সত্ত্বেও অনেক জাতির যে সত্যকার মাপকাঠিতে 'পিছ-গতি' হয়েছে তার বহু প্রমাণ পাওয়া যাবে ইতিহাসে।

---

১. New Humanist Oct. 2, 1949, The New Kulturkamf and Bolshevik, May 1946)।

২. দেখুন লেখকের 'বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে শ্রেণী-সংগ্রাম', পৃঃ ৩৯-৬০।

৪. **বিপ্লবের উপকরণ ঃ** সমাজের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক বৈষম্য শক্তিই শুধু বিবর্তন বা বিপ্লব আনতে পারে, অন্য কিছুই নয়—এও একচোখা দৃষ্টিভংগী। অনেক প্রতিভাবান ব্যক্তিও তাঁর জ্ঞান, বুদ্ধি ও সংগঠন শক্তির দ্বারা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়নে সাহায্য করতে পারেন। লেনিন ও হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর জীবনীই তার উত্তম দৃষ্টান্ত। নতুবা কম্যুনিস্ট বিপ্লব শিল্পে পেছনে পড়া রাশিয়ায় না হয়ে শিল্পোন্নত জার্মানী বা ইংলণ্ডে সংঘটিত হত।

সুতরাং পারিপার্শ্বিক অবস্থা আর ব্যক্তি বা দল বিশেষের সাধনা—এ দুটোরই মিলনে বিপ্লব সাফল্য লাভ করতে পারে।

২

আধুনিকতা ও ঐতিহ্যবোধ

ঐতিহ্য ও তার ভূমিকা

ঐতিহ্য শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ঃ ঐতিহাসিক কথা, (চলন্তিকা), ইতিহাস পরম্পরাগত কথা (বাংলা ভাষার অভিধান), পরম্পরাগত চিন্তা ও সংস্কার (ব্যবহারিক শব্দকোষ), প্রমাণ বিশেষ (নূতন বাংলা অভিধান) ইত্যাদি। ঐতিহ্যের আরো একটি ব্যাপক অর্থ প্রচলিত রয়েছে—অতীতের মহত্ত্ব ও গৌরবময় কীর্তির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও তার অনুশীলন।

মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত পরস্পর সম্পর্কযুক্ত; মানব-ইতিহাসের গতিধারা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বা বিখণ্ডিত ঘটনার সমষ্টিমাত্র নয়। এমন কি রক্তধারা এবং চরিত্রের মধ্যেও মানুষের ঐতিহ্য উত্তরাধিকার-সূত্রে অপরিহার্য অংগ হিসেবে ভবিষ্যতের মধ্যে বিকাশ ও বিস্তার লাভ করে।

যে বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রকে কেন্দ্র করে আধুনিকতার মহীরূহের উদ্ভব, তারও শিকড় যুগ যুগ ধরে রস গ্রহণ করেছে অতীতের আবিষ্কার ও চিন্তাধারা থেকে। তাই দেখি গ্রীক জ্ঞানী-বিজ্ঞানীদের চিন্তাধারা পুষ্ট করেছে মধ্যযুগের মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞান,—তারপর মুসলিম বৈজ্ঞানিক ও চিন্তাবিদদের সাধনা-লব্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানে উজ্জীবিত হয়েছে ইউরোপীয় চিন্তাধারা। ঐ মূল হতে রস উৎসারিত না হলে আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শন হয়ত আরো বহু শতাব্দী পিছিয়ে পড়ত। পিছিয়ে পড়ার পরও এগিয়ে আসতে হত পুরাতনের পদচিহ্ন অনুসরণ করে।

ডারউইন কার্ল মার্ক্স প্রমুখ মনীষীর যে তত্ত্ব ও তথ্য, তাতেও রয়েছে অতীতের বিপুল দান। ভাববাদী হেগেলের দ্বান্দ্বিকতার (dialectics) সঞ্জীবনী সুরা পান না করলে মার্কসবাদের দেহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হত না।

তমদ্দুন বা কালচারের ক্ষেত্রেও তাই। বিভিন্ন দেশ যে আজ আধুনিক কালচারের গর্বে বক্ষ-স্ফীতি প্রদর্শন করছে তার কোনটাই 'মূলবর্জিত

ভুঁই-ফোড় বা upstart নয়। তাই দেখি বস্তুবাদগর্বী নব্য চীনেও ঐতিহ্য-প্রীতির বন্যা বয়ে চলেছে।

মানুষ অতীতের অনেক কিছুকে বর্জন করেছে—কিন্তু সবকিছুকে বর্জন করেনি কিংবা করতে চায়নি। অতীতের সবকিছুকে বর্জন করে যদি আধুনিক মানুষ নূতন যাত্রা শুরু করতে চায় তবে তাকে আবার আদিম ও বর্বর যুগের স্তরে পিছিয়ে যেতে হবে। এ নিশ্চয় কারো কাম্য নয়।

আধুনিক সবকিছু যেমন ভাল ও প্রশংসনীয় নয়, অতীতেরও সবকিছু তেমনি নির্দোষ ও গৌরবোদ্দীপক ছিল না। তাই অতীতের সবকিছুকে বরণ ও অনুসরণ করার কথাও ওঠে না। কিন্তু যুগ যুগ ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সাধনার মাধ্যমে মানুষ যে মহান চিন্তাধারা, নীতি, কার্যরীতি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে মূল ও মূল্যবোধ রেখে গেছে তার সবকিছু বর্জনে মানুষের ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই। যে রেনেসাঁর বদৌলতে সারা ইউরোপে জাগরণের সাড়া পড়েছিল এবং যা আজকের আধুনিকতার মাতৃস্থানীয় বলে স্বীকৃত—তার মূল প্রেরণা যুগিয়েছে অতীত আর ঐতিহ্য। রেনেসাঁ রিভাইভালিজম বা পুরাতনে হুবহু পুনঃ প্রতিষ্ঠা ছিল না সত্য, কিন্তু আধুনিকতা তার মাতৃসদন হলেও—ঐতিহ্যই ছিল তার প্রসূতি।

যুক্তি, ভাব, প্রেরণা ও ঐতিহ্য

মানুষ শুধু যুক্তিবাদী জীব একথা সত্য নয়, সে ভাবধর্মী জীবও। তাই দার্শনিক কবি ইকবাল বারবার যুক্তির সংগে হৃদয়বৃত্তির উপর জোর দিয়েছেন। মনুষ্যত্ব বিকাশের পথে এ এক পরম তত্ত্ব। মানব-ইতিহাসের অধিকাংশ ঘটনা যুক্তি বিচারে ঘটেনি—ঘটেছে ভাব-প্রেরণায়। ভাব বা প্রেরণা মানুষের মনে আগে জাগে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতে, পরে আসে যুক্তি—অনেক ক্ষেত্রে ভাব প্রেরণাকে সবল করে তোলবার জন্য। শুধু যুক্তি বলে বিরাট আত্মত্যাগ বা কঠোর সাধনা সম্ভব নয়—যদি না ভাবপ্রেরণা তার সংগে যুক্ত হয়। যুক্তিকে যদি কোন ক্রিয়ার বা ঘটনার কায়া বলে কল্পনা করি, ভাবপ্রেরণাকে বলতে পারি তার প্রাণ। ভাব-প্রেরণাই হল যুক্তির শক্তি (energy): শক্তিহীন যুক্তি অচল ও অকেজো। পৃথিবীর অতীত ও বর্তমান ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করলেও মনস্তাত্ত্বিক দিকটি পরিষ্কার হবে। আধুনিক কালেও তাই ভাবপ্রেরণা উদ্দীপক শ্লোগানের এত শক্তি, এত কদর।

ভাব কিন্তু কিছুটা অন্ধ, যুক্তি তাকে চক্ষু দান করে। এ জন্যেই মানবতার সুষ্ঠু অভিযাত্রায় ভাব ও যুক্তি দুই-ই অপরিহার্য। যুক্তিদীপ্ত পথে ভাব-শক্তির সবল গতিধারার মধ্যেই রয়েছে মানবজাতির উত্থান ও প্রগতি।

যে প্রেম ভালবাসা সর্বকালের সংস্কৃতির প্রাণ তাও প্রধানতঃ যুক্তি নির্ভর নয়—ভাব-নির্ভর।

ঐতিহ্যের মহৎ ও গৌরবময় দিকগুলি সাধারণত যুক্তি-নির্ভর হয়ে থাকে। এর আর একটি প্রধান কাজ (function) হল প্রেরণা দান। পিতা-পিতামহের মহৎকার্যে প্রেরণা লাভ করে না এমন নীচাশয় ব্যক্তি বিরল। তেমনি জাতীয় বীর ও মহাপুরুষদের কীর্তিতে প্রেরণা পায় সর্ব দেশের মানুষ। গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্য গর্ব বোধ করে না কোন্ ভারতীয়? মার্ক্স-এঙ্গেলস-লেনিনের জন্য তেমনি গর্বানুভব করে আধুনিক কম্যুনিস্টরা। ওদের চিন্তাধারা ও কীর্তি পড়েই তো তাদের অনুসারীরা কর্ম ও চিন্তার প্রেরণা পায়। একই কারণে হযরত মুহাম্মদ (সঃ), হযরত উমর থেকে শুরু করে জামালুদ্দিন আফগানী, শাহ ওলিউল্লাহ্ পর্যন্ত সকল মুসলিম মহাপুরুষ ও চিন্তাবিদ মুসলমানদের প্রেরণা দেন। মনুষ্যত্ব আছে বলেই মানুষ মহত্ত্বের জন্য গৌরব বোধ ও মহতী কীর্তিতে প্রেরণা বোধ করে, নতুবা করত না।

বিভিন্ন দেশের নজীর

এই প্রেরণা বোধ আধুনিক রাষ্ট্রীয় কার্য-পরিচালনাতেও বিশেষ স্থান অধিকার করতে দেখি। ঐতিহ্যের প্রেরণা যোগাতে গিয়েই রাশিয়া থেকে শুরু করে খোদ চীন পর্যন্ত অফিসে-আদালতে ট্রেনে-স্টেশনে সর্বত্র মার্ক্স-লেনিনের ছবির ছড়াছড়ি দেখতে পাই। আর দেখতে পাই স্কুল-কলেজ ও পার্টি ক্লাসে তাদের জীবনী ও কার্যধারা শিক্ষা দেওয়ার সযত্ন প্রচেষ্টা।

আধুনিক ভারতেও ডাক টিকেট থেকে শুরু করে টাকার নোটে পর্যন্ত অশোক, বুদ্ধ এবং ভারতের দূর অতীতের ঐতিহ্যবাহী কীর্তি-কাহিনীর সগৌরব প্রকাশ ও প্রচার লক্ষণীয়। গত মহাযুদ্ধের সময় জার্মানীর বিরুদ্ধে রাশিয়ানদের উদ্বুদ্ধ করার নিমিত্ত স্টালিন রাশিয়াকে 'পিতৃভূমি' বলে গরীয়ান করে তোলেন নাই শুধু, বিপ্লবপূর্ব জারদের আমলে বহু বীর ও সেনাপতির ছবি ও কীর্তি-কাহিনী প্রচার করেছিলেন। শুধু যুক্তি দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকেও বেশী দূর এগোনো যায়

নি ; তাই দেশকে মাতৃরূপে কল্পনা থেকে শুরু করে রাম-রাজত্বের ঐতিহ্য-কেও আন্দোলনের সংগে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। 'বন্দে মাত-রম' সংগীত যে ভারতের কংগ্রেসী স্বাধীনতা আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তার মূল কারণও এখানে। ইসলামের মহান ঐতিহ্যের সরস প্রেরণা না পেলে পাকিস্তান আন্দোলনও নিষ্প্রভ হত—চাইকি অসম্ভব হয়ে পড়ত। ইংল্যাণ্ড, জার্মানী, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার তাগিদ—তার মূলেও সব যুগে কাজ করেছে তাদের ঐতিহ্যবোধ। এ যুগেও তার ব্যতিক্রম দেখা যায় নি। যাবেই বা কেন? আধুনিক কাল বলে তো ঐতিহ্যের মূল্য ফুরিয়ে যায় না। তাই দেখি ঐতিহাসিক মে দিবসে সুদূর অতীতে চিকাগোর শ্রমিকদের আত্মত্যাগের কাহিনীকে কেন্দ্র করে বিশ্বের শ্রমিকদের নূতন সংগ্রামের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করার আহ্বান জানানো হয় পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র। ঐতিহ্যের দুর্দ-মনীয় শক্তি আছে বলেই ফরাসী ও রুশ বিপ্লবের প্রেরণা অতি আধুনিকেরাও সমানভাবে গ্রহণ করে থাকেন।

এখানে একটি কথা পরিষ্কার হওয়া দরকার। পূর্বেই বলেছি : অতী-তের গৌরবময় ও মহত্বর দিকগুলিই হলো ঐতিহ্য। এইগুলি যেমন হওয়া উচিত কুসংস্কারমুক্ত তেমনি হওয়া উচিত মানুষের ভবিষ্যত কল্যাণের দিশারী। অতীতের যে ঘটনা ও কার্যধারা মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায় কুসংস্কার, যুক্তিহীনতা অমংগলের পথে—তাকে ঐতিহ্য বলে আঁকড়ে ধরা কোনমতেই বাঞ্ছনীয় হতে পারে না।

বিভিন্ন দেশের মনীষীদের ঐতিহ্যবোধ

উপমহাদেশে যে কয়জন আধুনিক চিন্তাবিদ ও সাহিত্যিকের কথা আমরা জানি তাঁদের অধিকাংশই ঐতিহ্যগর্বী। রবীন্দ্রনাথ, আল্লামা ইকবাল, হালী, মহাত্মা গান্ধী. মৌলানা মোহাম্মদ আলী, বিনোবাভাবে, শরৎচন্দ্র, নজরুল ইসলাম—এঁরা সবাই ঐতিহ্যমুখী। বিশ্ব-সাহিত্যের দিকে নজর দিলে রুমী, সাদী, গ্যেটে, টলস্টয়, কালিদাস, মিলটন প্রমুখ সাহি-ত্যিকই যে শুধু ঐতিহ্যবাহী ছিলেন তা নয়, বর্তমান যুগের টি, এস, এলিয়ট, নোয়েল বেকার—প্যাস্টারনাকেরাও ঐতিহ্যের প্রেরণাগ্রাহী। যে বস্তুবাদের বরাত দিয়ে ঐতিহ্যকে একেবারে নস্যাত করার ব্যগ্র প্রচেষ্টা—

তার নবতম ব্যাখ্যাতা মাও-সে-তুঙও কম ঐতিহ্যবাদী নন। তাই তাঁর শুধু কথায় নয়—লেখাতেও আমরা অবাক হয়ে পড়ি ঃ

বিভিন্ন দেশের প্রাচীন সংস্কৃতির যে সকল অংশ আমাদের প্রয়োজনীয়, তাও চীন আত্মসাৎ করবে। চীনা সংস্কৃতির একটা স্বতন্ত্র অর্থাৎ জাতীয় রূপ থাকবে। সুদীর্ঘ সামন্ততান্ত্রিক প্রসারের যুগে চীনে একটি প্রাচীন মহান সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। অতএব নতুন সংস্কৃতি গড়ে তোলবার পথে সেই পুরাতন সংস্কৃতির গণতান্ত্রিক অংশ গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা আছে। আমাদের অতীতকে আমরা শ্রদ্ধা করি এবং আমাদের ইতিহাসকেও আমরা অস্বীকার করব না কখনও।

(নিউ ডেমোক্রেসি—মাও সে-তুঙ)

এতদসত্ত্বেও যদি কেউ ঐতিহ্যকে ভয় করেন তবে তাকে ঐতিহ্য-ফোবিয়া রোগ বলে ভাবতে হবে। যাঁরা মনে করেন অতীতের যা তা সবই পরিত্যাজ্য- আধুনিকতা ও বিজ্ঞানের সংগে তার কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না — তাঁরা যুক্তিবাদী নন, তাই আধুনিকও নন তাঁরা।

৩

বিশ্ব-অশান্তি ও ধর্ম

ধর্ম ও আধুনিকতা সম্বন্ধে আলোচনায় কেউ কেউ সিদ্ধান্ত করে বসেন : ধর্ম সমস্ত দ্বন্দ্ব ও অশান্তির মূল—স্বাতন্ত্র্যবোধ ও রক্ষণশীলতার উদ্‌গাতা। কথাটি বিশ্লেষণ করে দেখার মত।

একথা তো অস্বীকার করা যায় না যে, অতীতে ধর্মকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্ব-ফাসাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে যথেষ্ট। ক্রুসেডের যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধের একটি প্রধান দৃষ্টান্ত। এমনি আরো বহু উদাহরণ মেলে ইতিহাসের পাতায়।

তবু গভীরভাবে তলিয়ে দেখা উচিত। অতীতের সমস্ত দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ ও অশান্তি ধর্মের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার মধ্যে যুক্তি ও সত্য রক্ষিত হয়েছে কতটুকু। ছোট থেকে শুরু করি। বাংলাদেশের অতীত ইতিহাস কি ইংগিত বহন করে বিশ্লেষণ করা যাক। এই বাংলার বুকে যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটেছে অনেক এবং বিকটভাবে। যুদ্ধ হয়েছে হিন্দু রাজায় রাজায়, হয়েছে মুগলে-পাঠানে। লুটপাট ও অশান্তি ঘটেছে বর্গীয় হাঙ্গামায়-ধন-সম্পদ লুণ্ঠিত হয়েছে, আর নিরীহ মানবসন্তান আত্মাহুতি দিয়েছে পর্তুগীজ-দের বীভৎস দস্যুতায়। শেষে বাংলার স্বাধীনতা সূর্যও অস্তমিত হয়েছে পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজ-বাঙালীর যুদ্ধে; কোম্পানীর শাসনে, নেমে এসেছে দুর্ভিক্ষ, অশান্তি, অনিশ্চয়তা—চরম নির্মমতা নিয়ে।

এই যে যুদ্ধ হাঙ্গামা বিসম্বাদ বাংলার বুকে বাঙালী হিন্দু মুসলমানের ঘরে ঘরে মৃত্যু ও অশান্তির বিভীষিকা সৃষ্টি করেছে যুগে যুগে—এর কয়টা ছিল ধর্মযুদ্ধ বা ধর্মকেন্দ্রিক? মুগল-পাঠানে বারংবার যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে, তাকে তো আর যাই বলি ধর্মযুদ্ধ বলতে পারি না। বর্গী ও পর্তুগীজ হানা-দাররা সোনার বাংলাকে এক সময় যে শ্মশানে পরিণত করেছিল তা তো ধর্ম প্রচারের তাগিদে নয়। হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্মের লোক ছিল বার-ভুঁঞাদের মধ্যে। তাঁরা যুদ্ধ করেছেন নিজেদের মধ্যে, অনেক সময় মুগল শাসনের বিরুদ্ধে—এর কোনটাই তো ধর্মকেন্দ্রিক ছিল না—ছিল

স্বার্থকেন্দ্রিক। এতে ছিল শক্তির মোহ, স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার তাগিদ। বর্গীয় হাঙ্গামা, পর্তুগীজ দস্যুতা কিংবা পলাশীর যুদ্ধ—এসবই ঘটেছে ধর্মহীন স্বার্থের হানাহানিতে, অর্থলোলুপতায় ও রাজ্যলিপ্সায়। এসবের সঙ্গে তুলনায় ধর্মকেন্দ্রিক সংগ্রামের সংখ্যা ও ব্যাপকতা নগণ্য ও অকিঞ্চিৎকর বলে প্রতিভাত হবে।

গোটা উপমহাদেশের ইতিহাসের দিকে নজর দেওয়া যাক এবার। মহাভারতে প্রাগৈতিহাসিক কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বিবরণ মেলে। এই যুদ্ধেও ছিল "বিনাযুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী'র রাজ্য ও স্বার্থ উদ্ভূত দুই ভ্রাতৃকুলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। রামায়ণে উল্লেখিত রাম-রাবণের যুদ্ধে লংকার সর্বনাশ ঘটেছিল নারী-হরণের অপরাধে, যেমনি ঘটেছিল হেলেনের রূপানলে ট্রয়নগরীর ধ্বংস, আর রূপবতী সংযুক্তার রূপ-মোহে দুই হিন্দু রাজ্যপালের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। মহাবীর আলেকজাণ্ডার (সিকান্দার শাহ) বিশ্ববিজয়ের পথে ভারতেও ধ্বংসলীলা কম ঘটান নি পুরুর আমলে। চেঙ্গিস খাঁ, হালাকু খান, তৈমুর লঙ কিংবা নেপোলিয়নের ধ্বংসলীলার মত এগুলির ছিল রাজ্যলিপ্সা ও শক্তিমোহের এক বিকট প্রকাশ। এতে সভ্যতার ক্রমবিকাশে সাহায্য হয়েছে কিনা তা চিন্তাবিদরা নির্ণয় করবেন। কিন্তু এর কোনটা যে মূলতঃ ধর্মের তাগিদে হয়নি—হয়েছে প্রধানত স্বার্থ ও শক্তির মোহে; এগুলিও ছিল স্বদেশে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের পর পরদেশে আত্মপ্রতিষ্ঠার এক একটি দৃপ্ত-কল্প অভিযান। তারপর যুগে যুগে ভারতের বুকে মুগলে-পাঠানে, রাজায়-রাজায়, সম্রাটে-সম্রাটে যে সমস্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ঘটেছে তার কয়টিতে ছিল ধর্মের প্রেরণা? পাঞ্জাবের শিখ যুদ্ধ কিংবা আওরঙ্গজীবের দক্ষিণ ভারতের সংগ্রামে ধর্ম-প্রতিষ্ঠার তাগিদ কি পরিমাণ ছিল তা গবেষণার বিষয়, কিন্তু জাহাঙ্গীর-শাহজাহানের পিতা-পুত্রের সংগ্রাম, আওরঙ্গজীব ও তাঁর ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যকার যুদ্ধ-বিগ্রহ কিংবা ইংরেজদের সঙ্গে টিপু সুলতানের যুদ্ধে ধর্মের বরাত দিয়ে বেশী দূর অগ্রসর হওয়া যাবে না। ভারতের ইতিহাসে একাধিক পানিপথের যুদ্ধ, ব্রহ্ম যুদ্ধ, আফগান যুদ্ধ রক্তোজ্জ্বল হয়ে রয়েছে; তাঁর মূলে ধর্মের অদৃশ্য হস্ত কল্পনার বস্তু—বাস্তবতার নিদর্শন নয়।

পরবর্তী যুগের সিপাহী বিদ্রোহ, ওহাবী আন্দোলন ও খিলাফত আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলন—ধর্মের প্রেরণা এর প্রত্যেকটিতে কাজ

করেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ ছিল ধর্মের একটি প্রশংসনীয় মহত্তর দিক। বিদেশী শাসন এবং অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে আত্মত্যাগের এই অপূর্ব উদ্বুদ্ধতা ও সংগ্রাম—ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে চিরদিন। এজন্য এই কয়টি আন্দোলন জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে হিন্দু-মুসলমান সকলের প্রশংসা অর্জন করেছে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতের কংগ্রেস পার্টি তো খিলাফত আন্দোলনকে নিজেদের আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে বরণ করে নিয়েছিল।

এভাবে পৃথিবীর সমস্ত দেশের ইতিহাস থেকে নজির নিলে সুস্পষ্ট হবে ঃ অতীতের শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগ যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটেছে রাজ্যলিপ্সা, অর্থ-লোলুপতা ও শক্তির মোহে (যা আজও আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বের প্রধান উৎসকেন্দ্র) কিংবা নারীঘটিত বৈকল্যে। শেষোক্ত বিষয়টি আজকের দিনে আন্তর্জাতিক সংগ্রামের কারণ হয়ে ওঠে না সত্য, কিন্তু এখনও এটা পৃথিবীর সর্বত্র ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা সামাজিক অশান্তির কারণরূপে সদা ক্রিয়াশীল। ইউরোপে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে যে শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ হয় কিংবা জার্মানী ও রাশিয়াকে কেন্দ্র করে যে শত শত সমরানল জ্বলে উঠেছিল তার মূল উৎস ধর্ম নয়, জাতিগত স্বার্থ। কিংবা গোটা এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় সভ্যতাগর্বী ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী জাতিগুলি যে ধ্বংস, অশান্তি, জীবন নাশ ও অত্যাচার করে শত শত জাতি ও কোটি কোটি মানুষকে দাসত্বের হীনতম স্তরে ঠেলে দিয়েছিল কয়েক শতাব্দী ধরে—তাও ধর্মের জন্য নয়—হীন স্বার্থের জন্য। এই সমস্ত যুদ্ধের কাছে ক্রুসেড ধ্বংসলীলায় ও ব্যাপ্তিতে অনেকাংশে নিষ্প্রভ। অপরদিকের বিবেচনায় ক্রুসেডের মূলে শুধু ধর্মবোধই ক্রিয়া করে নি—ক্রিয়া করেছে ধর্মগুরু নামধারী রাজা-সম্রাটদের রাজ্যলিপ্সা ও অর্থলিপ্সার তাগিদ।

মধ্যযুগের কথা বাদ দিই—আধুনিক যুগের প্রশংসায় যারা আত্মহারা হয়ে অতীতের সবকিছুকে পরিত্যাজ্য বলে উল্লাস প্রকাশ করেন তাঁরা স্বীকার করবেন ঃ ১৯১৪-১৮ সালের প্রথম মহাযুদ্ধ এবং ১৯৩৯-৪৪ সালের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ব্যাপ্তিতে ও ধ্বংসকার্যে অতীতের সমস্ত যুদ্ধকে নগণ্য করে দিয়েছে। এই দুটি মহাসমরের ক্ষয়ক্ষতি পরিমাণের হিসাবে মানব-ইতিহাসের পাতায় মহাকলংকরূপে লিখিত হয়েছে। তাতে দেখা যাবে, এর একটি যুদ্ধে যত লোকের জীবন ও সম্পদ ধ্বংস হয়েছে অতীতের হাজার হাজার যুদ্ধেও তা সম্ভব হয়নি। এমনি ব্যাপক এই যে মহাযুদ্ধ

—তা ঘটেছে কোন ধর্মের বা মহত্তর আদর্শের প্রেরণায় নয়—আধুনিকতা ও বিজ্ঞানে বলীয়ান স্বার্থপরতার হীনতম অভিব্যক্তিতে। ধর্ম তো এখন আধুনিক বিজ্ঞানের রাজ-দরবারে অপাঙক্তেয়। তবু যে মানবজাতির উপর এই আসুরিক আক্রমণ এসে মানবতাকে পর্যন্ত উৎখাত করার জঘন্যতম ক্রিয়ায় রত—তার মূলেও ধর্মের তাগিদ আছে বলে অন্ধ আত্মপ্রসাদ লাভ করা যেতে পারে—যুক্তি প্রতিষ্ঠা করা তো সম্ভব হবে না। বিজ্ঞান ও আধুনিকতার নামে আবার যে জগৎ-ধ্বংসী তৃতীয় মহাসমরের পদধ্বনি মাঝে মাঝে শ্রুত হয়; পারমাণবিক শক্তিমত্তা অসহিষ্ণুতার চরম প্রকাশ ঘটিয়েছে অনেক ক্ষেত্রে—তাও চোখ বুজে হেলা করার বিষয় নয়।

গণতন্ত্রী ও সাম্যবাদী বিদেশী শক্তিপুঞ্জের শক্তি-পাগল রাজনৈতিক যজ্ঞে দক্ষিণ আমেরিকা, কোরিয়া, আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন, ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের অসংখ্য নিরপরাধ মানুষকে যে বলি দেয়া হয়েছে তার সমকক্ষ নজীর ইতিহাসে ক'টি আছে?

বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলে গেছেন: অর্থ তথা স্বার্থই যত অনর্থের মূল। আজ যাঁরা ধর্মকে সব অনর্থের মূল বলে প্রচারে ব্রতী হয়েছেন তাঁরা হয়ত ভুলে গেছেন: দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণকায়দের উপর চরম অত্যাচার,[১] আধুনিক সভ্যতম জাতিমণ্ডলীর একটি প্রধান জাতি কর্তৃক মাউ মাউ বধ যজ্ঞ কিংবা অতি আধুনিক ধর্মবিরোধী একটি রাষ্ট্রের গোটা হাংগেরীব্যাপী অমানুষিক হত্যাকাণ্ড ও গোটা পূর্ব ইউরোপের আকাশে-বাতাসে মানবাত্মার ত্রাহি ত্রাহি ক্রন্দন। উপমহাদেশে একশ্রেণীর অন্ধ ভাবালুদের দ্বারা হিন্দু-মুসলিম হত্যা-কাণ্ড আমাদের জন্য লজ্জাকর ঘটনা সন্দেহ নেই (যদিও এই জাহিলদের শান্ত করবার উদ্দেশ্যে ধর্মপ্রাণ মহাত্মা গান্ধীর মত অনেক হিন্দু-মুসলমান আত্মাহুতি দিয়েছেন)—কিন্তু হাংগেরীতে ট্যাংক প্রভৃতি আধুনিকতম মারণাস্ত্রের সাহায্যে পরিকল্পিত উপায়ে দলবদ্ধভাবে গোটা জাতির উপর যে ধ্বংসের বিসুভিয়াস জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিল তার তুলনা কোথায়? তবুও কি আমাদের বিশ্বাস করতে হবে, বিজ্ঞান ও আধুনিকতা আমাদের কেবল শান্তি, মিলন ও সহিষ্ণুতার অমিয় বাণী শোনাচ্ছে, আর ধর্মভক্তি শুধু হিংসা-বিদ্বেষের অগ্নিবর্ষণ করছে দিকে দিকে?

১. এই অমানুষিক বর্বর কার্যধারার বিরুদ্ধে ধর্মীয় পাদ্রী পুরোহিতেরাই প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের বহু উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে যাচ্ছেন।

ধর্মকে স্বার্থপরেরা যুগে যুগে তাদের স্বার্থোদ্ধারে ব্যবহার করেছে এ সত্য অস্বীকার করার নয়--যেমন বিজ্ঞানকে নিয়ে ধ্বংসলীলায় মত্ত হয়েছে আধুনিক রাষ্ট্রনেতাদের অনেকেই। কিন্তু যাঁরা প্রকৃতই ধর্ম প্রচার করেছেন তাঁদের জীবনী ও কার্যধারা থেকে কি সঠিক তথ্য পাই আমরা? বুদ্ধ, কনফুসিয়াস, হযরত মূসা (আঃ), হযরত ঈসা আঃ (জেসাস ক্রাইস্ট), হযরত মুহাম্মদ (সঃ)—এদের সকলের জীবনই তো উৎসর্গিত হয়েছিল বিশ্বের অশান্তি-অত্যাচার বিদূরণে এবং শান্তি ও মঙ্গল প্রতিষ্ঠায়। আধুনিক রাষ্ট্রপতিদের মত এরা যন্ত্রতন্ত্র বিদ্বেষ প্রচার করেন নি, বরং প্রেমের অমিয় বাণী শুনিয়েছেন শত্রু-মিত্র সকলকে। যে উৎকট স্বার্থপরতা অতীতের এবং বর্তমানের সমস্ত অনর্থের মূল তার বিন্দুমাত্রও দেখা যায়নি তাঁদের জীবনে ও জীবনধারায়।

কিন্তু আধুনিক মহামানব বলে যাঁরা কোন কোন মহলে বিপুলভাবে প্রশংসিত ও পূজিত হচ্ছেন—মার্ক্স লেনিন, স্ট্যালিন, মেকিয়াভেলী, হিটলার, মুসোলিনি, তোঁজো—তাঁরা কি শিক্ষা দিয়েছেন জীবনভর?—শ্রেণী-বিদ্বেষ, দল-বিদ্বেষ, জাতি-বিদ্বেষ, বর্ণ-বিদ্বেষ, স্বার্থপরতা, সুবিধাবাদ আর বিপক্ষকে উৎখাত করার জন্য সবল ও 'যৌক্তিক' দর্শন শাস্ত্র এঁরাই যুগিয়েছেন আধুনিক মানুষকে। এঁদের দর্শনের ব্যবহারিক প্রয়োগেই না অশান্তি ও বিদ্বেষের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে সর্বত্র? এই আগুনে অনেক আবর্জনাও যে পুড়েছে তা অস্বীকার করছি না, কিন্তু বিদ্বেষ-সৃষ্টির জন্য শুধু ধর্মকে দায়ী না করে আধুনিকতাকেও করলে অধিকতর যুক্তি-সংগত হত নাকি। 'যোগ্যরাই শাসনের অধিকারী'—এই ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টির উৎস দার্শনিক যুক্তি প্রচারের হোতা ছিলেন নীটশে; তারই প্রতিফলন দেখি জার্মানীর রাষ্ট্রীয় দর্শনে নৃশংস ও বিকটরূপে। ডারউইনের "যোগ্যতমই বাঁচার অধিকারী" তত্ত্ব সমাজের বিদ্বেষমূলক চিন্তাধারার উপর কতটুকু ক্রিয়া করেছে তাও দেখবার জিনিস।

যে যৌনবৈকল্য সংঘাতের অন্যতম কারণ বলে নির্ণীত হয়েছে—তারই গুণ-গান উৎসারিত হয়েছে ধর্ম-বিদ্বেষী ফ্রয়েডের যৌনতত্ত্বে। মানুষের মহত্তর বৃত্তিকে অপ্রধান স্থান দিয়ে যৌনবৃত্তিকে প্রধানতম আসনে আসীন করে মানবতাকে যৌন-লিপ্সার স্তরে নামিয়ে আনা হয়েছে কিনা, সে গবেষণা আজো পুরাপুরি হয় নি। শ্রেণী-বিদ্বেষের শিক্ষাগুরু ছিলেন নাস্তিক কার্ল-মার্ক্স—ধর্মপ্রচারক বুদ্ধ, ঈসা (আঃ) বা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)

নন; যদিও শেষোক্তরা সমাজের পতিত নরনারীর জন্য সংগ্রাম করে গেছেন আজীবন ধর্মীয় সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার প্রেরণায়। এই শ্রেণী-বিদ্বেষই তো আধুনিককালে দুর্লঙ্ঘ্য স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রতিষ্ঠা করেছে—অন্য যে কোন মতবাদকে অপাঙক্তেয় আফিমতুল্য বলে সাম্প্রদায়িকতা ও স্বাতন্ত্র্যবোধের চীনের মহাপ্রাচীর সৃষ্টি করেছে। স্বাতন্ত্র্যবোধ শুধু ধর্মই সৃষ্টি করেনি আধুনিক মতবাদগুলি বিদ্বেষ-ভিত্তিক যে স্বাতন্ত্র্যবোধের উন্মেষ ঘটিয়েছে তার কুফল সুদূরপ্রসারী। ধর্মের বিভিন্ন উপদলের মধ্যকার বিরোধ এখানে উল্লেখযোগ্য। শিয়া-সুন্নী বিরোধ বা ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যান্ট সংঘাত দীর্ঘস্থায়ী,—কিন্তু একথাও ভুললে চলবে না যে আধুনিক রাজনৈতিক দল বা মতবাদগুলির বিভিন্ন দলের সংঘর্ষও কম ভয়াবহ হয়নি। বলশেভিক-মেনশেভিক সংগ্রাম কিংবা স্ট্যালিনপন্থী ও ট্রটস্কীপন্থীদের রক্তক্ষয়ী আন্তর্জাতিক সংঘাত কম অশান্তি ও জীবনহানি ঘটায় নি। টিটোপন্থী ও স্ট্যালিনপন্থীদের বিরোধও ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। ভবিষ্যতে চীনপন্থী ও রাশিয়াপন্থীদের মধ্যেও কোন ভয়াবহ সংঘাত শুরু হয় কি না কে জানে!

ধর্মের রক্ষণশীলতাও সমালোচিত হয়েছে—হওয়ার আবশ্যকতা আছে। কিন্তু চীন ও অন্যান্য কমুনিস্ট রাষ্ট্রে মার্ক্স-লেনিনের বাণীর প্রতি যে বেদবৎ রক্ষণশীল মনোভাব, ইংলণ্ডের রাজনৈতিক রক্ষণশীলতা, আর 'সুসভ্য' 'শ্বেত-আমেরিকান'দের নিগ্রো-বিরোধী রক্ষণশীলতার মূল উৎস ধর্ম নয়। মাও-সে-তুঙীয় চীনের রক্ষণশীলতা ও গোঁড়ামীকে স্বয়ং ক্রুশ্চেভই নিন্দা করেছিলেন কঠোরভাবে ১৯৬০ সালের বুখারেস্ট কম্যুনিষ্ট সম্মেলনে।

আমার বক্তব্য এই নয় যে, সব রকম আধুনিকতা মন্দ। আধুনিকতার প্রশংসনীয় দিক যে বহু বহু রয়েছে—তা অস্বীকার করার নয়। কিন্তু তার মন্দ দিক ভুলে গিয়ে ধর্মের ঘাড়ে সমস্ত অপবাদ বসানো যে অযৌক্তিক ও অন্যায়, এই কথাটুকুই আমি প্রকাশ করার চেষ্টা করছি মাত্র। এ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা না হলে আধুনিক মনে অন্ধ কুসংস্কার জমে উঠবে—জ্ঞানের অনুশীলনে এটা হবে প্রবল বাধা।

৪

কুরআনের আলোকে সার্বজনীন ও চিরন্তন আদর্শ

যে আদর্শ সমস্ত মানব-সমাজের জন্য—যে আদর্শ গ্রহণে ও পালনে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জাতির ক্ষেত্রে কোন তারতম্য থাকে না জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সব মানুষের মঙ্গল, শান্তি ও উন্নতিই যার লক্ষ্য—তাই-সার্বজনীন আদর্শ। আবার আদি মানব আদম থেকে শুরু করে মানব জাতির শেষ অবস্থা পর্যন্ত সব যুগের জন্য যে আদর্শ কার্যকরী সে আদর্শই হল মানুষের জন্য চিরন্তন।

প্রথমেই বলে রাখা ভাল, ইসলামের আবির্ভাব হযরত মুহাম্মদ (সঃ) থেকে নয়, আদি মানব থেকেই। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) পর্যন্ত যে অসংখ্য মহাপুরুষ নবী বা প্রফেট রূপে বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন যুগে আবির্ভূত হয়েছেন তাঁরা সবাই ছিলেন ইসলামের সম্মানিত নবী। ইসলামের একই মৌলিক আদর্শ তাঁরা প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কোন নতুন ধর্ম প্রচার করেন নি।

অন্যান্য বহু আয়াতের মতই কুরআনে সূরা বাকারার ১৩৬ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

> তোমরা বল, আমরা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করি, বিশ্বাস করি আমাদের উপর যা নাযিল হয়েছে, বিশ্বাস করি হযরত ইবরাহিম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং অন্যান্য গোত্রের মধ্যে যা নাযিল হয়েছে, বিশ্বাস করি ঈসা ও মূসাকে যা দেওয়া হয়েছে এবং বিশ্বাস করি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে অন্যান্য সব নবীর কাছে যা এসেছে। আমরা তাদের একজনকে আর একজনের ব্যাপারে পার্থক্য করি না। আমরা সকলেই মুসলমান।

এটা স্পষ্ট যে আগে যে সমস্ত নবী-রসূল বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন নামে আদর্শ প্রচার করে গেছেন তাঁরা এবং তাঁদের অনুসারীরাও ছিলেন মুসলমান। একই সূরার ১২৭-১২৮ আয়াতে এবং সূরা ইমরানের ৫২ আয়াতেও এ কথা পরিষ্কার রূপে বিবৃত হয়েছে।

একজাতি

কুরআনিক চিন্তাধারায় সমস্ত মানুষ একজাতি বৈ নয়। সূরা ইউনুসের ১৯ আয়াতে আর সূরা বাকারার ২১৩ আয়াতে এটা ঘোষণা করা হয়েছে।

كان الناس امة واحدة–

এই যে একক জাতি—যাদের মধ্যে পরবর্তীকালে পার্থক্য এসেছে—এই একক জাতির একক আদর্শই হল ইসলাম—অতীতে যে নামেই তা পরিচিত হোক না কেন।

এই আদর্শের মৌলিক বিষয় হল বিশ্বাস এবং মানবতার কল্যাণের পথে সৎকর্মের জন্য সাধনা। আমানু ওয়ামিলুস্‌সালিহাত। বিশৃঙ্খলামুক্ত সকল মানুষের মধ্যে সৎকর্ম ও শান্তি প্রতিষ্ঠার তাগিদই এই আদর্শের অন্যতম মূলমন্ত্র।

সূরা মায়েদার ৬৮ ও ৬৯ আয়াতে তাই বলা হয়েছে—কিতাবীরা (অর্থাৎ ইহুদী, খ্রীস্টান প্রভৃতি) যদি বিশ্বাসী হত এবং সৎকর্ম করত—তাদের কাছে দেওয়া ধর্মপুস্তক বাইবেল ও তওরাত মেনে চলত, তাহলে তারা তাদের সৎকর্মের ফল লাভ করত। তাদের মধ্যে একদল রয়েছে সঠিক পথে, কিন্তু অধিকাংশ চালিত হয়েছে বিপথে।

সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর এই সার্বজনীন আদর্শ প্রচারের সময় কিতাবী জাতি ইহুদী সম্প্রদায় বলত, হযরত মূসা (আঃ)-এর ধর্মই আল্লাহর মনোনীত ধর্ম। তাই ইহুদী না হলে কেউ বেহেশ্‌তে যাবে না। খ্রীস্টানেরাও তাই বলত।

তারই উত্তরে কুরআন সূরা বাকারার ১১১ ও ১১২ আয়াতে ঘোষণা করেছিল ঃ

> তারা বলে ঃ ইহুদী ও খ্রীস্টান না হলে কেউ বেহেশ্‌তে যেতে পারবে না। এটা হল তাদের শূন্যগর্ভ মনোভাব। বলুন (হে মুহাম্মদ), যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে তার প্রমাণ দাও। তা তো নয়—বরং যে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্ম করে— তার প্রভুর কাছ থেকে সে পুরস্কার পাবে। এই রকম লোকের কোন ভয়ের বা দুঃখের কারণ নেই।

আরো স্পষ্ট করে এই সার্বজনীনতাকে সূরা বাকারার ৬২ নং আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

> নিশ্চয়ই যারা মুসলমান, আর যারা ইহুদী, আর যারা খ্রীস্টান এবং যারা সূর্য ইত্যাদির উপাসক—এদের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌তে ও পরকালে বিশ্বাস করে, আর সৎকাজ করে তারা তাদের প্রভুর কাছ থেকে পাবে পুরস্কার। তাদের কোন ভয়ের বা দুঃখের কারণ থাকবে না।

সূরা আলে-ইমরানের ১১৩ ও ১১৪ আয়াতে কুরআন আবার বলেছে :

> (ইহুদী ও খ্রীস্টানের মধ্যে) সবাই একরকম নয়। কিতাবীদের মধ্যে এমন দলও আছে যারা সঠিক পথে সুদৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান—যারা সারারাত ধরে আল্লাহ্‌র জিকির করে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সিজদা করে, এবং আল্লাহ্‌য় ও পরকালে বিশ্বাস করে, ভাল কাজের জন্য উপদেশ দেয়, খারাপ কাজ করতে বারণ করে এবং তারা সৎকাজে দৌড়ে যায়—তারা সবাই ধার্মিকদের অন্তর্ভুক্ত, তারা যা ভাল কাজ করে তার কিছুই অস্বীকার করা হবে না।

এই যে বিশ্বাস, সৎকর্ম ও মহত্তর জীবনবোধের পরিপোষক ইবাদতের ধর্ম—কল্যাণের ধর্ম, এই ধর্মকে প্রচারের জন্য হযরত মুহাম্মদ (সঃ) শেষ নবী হিসেবে আবির্ভূত হন। ইনি কোন নতুন ধর্ম প্রচার করতে আসেন নি। সেই চিরন্তন ইসলাম ধর্ম বা আদর্শই ছিল তাঁর প্রচারের বিষয়বস্তু—যা যুগে-যুগে দেশে দেশে মৌলিকভাবে অন্যান্য নবী মহাপুরুষেরা প্রচার করে গেছেন—মানবজাতিকে সঠিক পথে এগিয়ে নেওয়ার জন্য।

আর এই সমস্ত নবীই ছিলেন মানুষ -কোন দেবতা নন। সূরা কাহাফ ও আল-ইমরানের যথাক্রমে ১১০ ও ১৪৪ আয়াতে ঘোষিত হয়েছে :

> বলুন (হে মুহাম্মদ) আমিও তোমাদের মত মানুষ, তবে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে ওহীপ্রাপ্ত। মুহাম্মদ একজন নবী ছাড়া আর কিছুই নন। বহু নবী আগে গুজরে গেছেন। মুহাম্মদ যদি মারা যান বা নিহত হন তবে কি তোমরা আদর্শ ছেড়ে দেবে?

এর অর্থ হল ইসলামী আদর্শ সকল মানুষের এবং সকল যুগের জন্যই, নবী-রসূল তা প্রচারের উপলক্ষ মাত্র এবং তাঁরা সবাই ছিলেন একই আদর্শের প্রচারক বা অনুসারী।

সার্বজনীন ও চিরন্তন এই আদর্শের ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার সংকীর্ণতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সতর্ক করার জন্যই কুরআন সূরা বাকারার ১৭৭ আয়াতে বলছে :

পূর্বে বা পশ্চিমে মুখ ফিরানো ধর্মের বড় কথা নয়; বড় কথা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস স্থাপন, বিশ্বাস স্থাপন করা ফেরেশতায়, আল্লাহ্র দেয়া কিতাবে এবং সমস্ত নবীদের উপরে। বড় কথা—ভালবাসার সহিত দুঃস্থ আত্মীয়, অনাথ, এতিম, অভাবী, দুঃস্থ পথিক ও যাচঞাকারীর জন্য এবং দাস সমাজকে মুক্ত করার জন্য খরচ করায়; বড় কথা—আল্লাহ্র ইবাদতে সুদৃঢ় থাকায়, নিয়মিত গরীবের হক বা যাকাত আদায়ে, ওয়াদা পালন করায়, মহাবিপদে ও যন্ত্রণায় এবং মহাভীতির মধ্যেও ধৈর্যশীল ও সুদৃঢ় থাকায়।

এই অসাম্প্রদায়িক উদার ধর্ম আরো বলেছে ঃ "ধর্মে কোন জোর-জবরদাস্ত নেই।" সূরা আনআমের ১০৮ আয়াতে সতর্ক করে বলা হয়েছে ঃ "(মানুষ আল্লাহ্ ছাড়া অনেক কিছুকে পূজা করে) এগুলিকে গালি দিও না। অন্যথা তারাও আল্লাহ্কে অজ্ঞতাহেতু গালি দিতে পারে। প্রত্যেক জাতির কাছে তাদের নিজেদের কাজ আকর্ষণীয় করা হয়েছে। অবশেষে যখন তারা তাদের প্রভুর কাছে প্রত্যাবর্তন করবে তখন তারা প্রকৃত সত্য জানতে পারবে।"

কোন রকম কুসংস্কার যাতে ধর্মের মধ্যে স্থান না পায় তজ্জন্য মানবতার এই একমাত্র ধর্ম কুরআনের ভাষায় বলে দিচ্ছে ঃ

"পূর্ণিমা সম্বন্ধে আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে। বলুন, (হে মুহাম্মদ) উহা সময়ের নির্দিষ্ট পর্যায় নির্দেশক চিহ্ন বৈ কিছুই নয়।"

অন্য কথায় এতে তথাকথিত দেবতা সৃষ্ট অলৌকিকতার ধারণাপ্রসূত কুসংস্কারের কোন স্থান নেই।

সূরা বাকারার ১৭০ এবং সূরা তওবার ৩৪ আয়াত সহ বহু আয়াতে ধর্ম ও ধর্মযাজকদের কুসংস্কার সম্বন্ধে বহু সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

আর এইজন্য দেখি, শেষ নবীর একমাত্র পুত্রের মৃত্যুকালে সূর্যগ্রহণ ঘটলে জনসাধারণ নবীর পুত্রবিয়োগে একে প্রকৃতির অলৌকিক মাতম প্রকাশ বলে মনে করতে থাকে। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তখন ঘোষণা করেন, সূর্যগ্রহণ আল্লাহ্র আইনই অনুসরণ করে—তারা কোন নবী বা সাধারণ লোকের দুঃখে কোনমতে প্রভাবিত হয় না।

৫
অমরত্বের সাধনা

কোন না কোন সময়ে এ প্রশ্ন প্রত্যেকের মনে উঁকি দেয়ঃ

১. কেন সমাজসেবায় মানুষ নিঃস্বার্থভাবে এগিয়ে গিয়ে বলবেঃ

'সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।'

২. কেন সে আত্মত্যাগ ও কৃচ্ছ্র সাধনার কষ্টময় দুরূহ পথে পদচালনা করবে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম-আয়াসকে বিসর্জন দিয়ে?

৩. কেনই বা অপরের দুঃখ-শোক-অপমান জুলুমে বিক্ষুব্ধ হয়ে প্রবলতর সমাজ শক্তি এবং পরাক্রমশালী রাজশক্তির বিরুদ্ধেও সে জিহাদ ঘোষণা করে আওয়াজ উঠাবেঃ

আমি সেইদিন হব শান্ত—
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়গ-কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না।

দর্শনের ভাষায়—কুরআনের ভাষায়ও মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব। এ শ্রেষ্ঠত্বের উপকরণ শুধু শক্তি, বুদ্ধি বা জ্ঞান নয়; এর প্রধান লক্ষণ মহত্ত্ব। মহত্ত্ব-বিহীন জ্ঞান-বুদ্ধি শক্তির দ্যোতক সন্দেহ নেই-কিন্তু 'মহান' ও 'বড়'-র নিয়ামক নয়।

ইতিহাসের নজির

কথাটাকে উদাহরণ দিয়ে পরিষ্কার করা দরকার। হিটলার-মুসোলিনী পরম শক্তিধর ছিলেন; জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বুদ্ধির সর্বপ্রকার উপকরণও তাঁদের হাতের মুঠোর মধ্যে ছিল।

অতীতের চেঙ্গিস খান, হালাকু খানদেরও তাই ছিল। ইতিহাসের পাতায় পাতায় নজির মিলবে জ্ঞানী ও শক্তিধর শত শত নমরূদ ও ফেরাউনের। কিন্তু তাদের নিয়ে মানুষ গর্ববোধ করবে না কোন দিন। মানুষ কি

বলবে এরা ছিলেন শ্রেষ্ঠ বা মহৎ? এদের কি কেউ কোন দিন স্মরণ করবে শ্রদ্ধাসিক্ত অন্তঃকরণ দিয়ে?

কিন্তু যখন ভাবি—হযরত ঈসা (আঃ), মূসা (আঃ) এবং এরূপ আরো শত শত মহাপুরুষের কথা? অত্যাচার-অবিচার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জীবন-ভর লড়াই করেছেন এঁরা। অশেষ দুঃখ-দারিদ্র্য ও জুলুমকে বরণ করে নিতে হয়েছে এঁদের। এমন কি এঁদের অনেককে পরিবার পরিজনসহ জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হয়েছে জালিমদের হাতে। যুগে যুগে এই আত্মভোলা ত্যাগীদের আত্মোৎসর্গেই পৃথিবীতে এখনো মনুষ্যত্ব টিকে আছে, এখনো পাশবতার লীলাক্ষেত্র হয়ে ওঠেনি পৃথিবীর সর্বত্র। এদের এই ত্যাগোজ্জ্বল কাহিনী শুনে মানুষ হিসেবে গর্ববোধ হয় না?—সুগভীর শ্রদ্ধায় ভরে ওঠে না আপনার-আমার সকলের মন? ধর্ম-বৈরী আধুনিক নাস্তিকতাবাদের প্রতিষ্ঠাতা কার্ল মার্ক্সের জীবনও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তে প্রোজ্জ্বল। জার্মানীর ধনী ও উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করেও তিনি নিপীড়িত মানবতার খাতিরে লণ্ডনে পরিবারসহ অশেষ দারিদ্র্য ও অভাব-অনটনের মধ্যে করুণতম জীবন যাপন করে গেছেন। স্বার্থ-নির্ভর বস্তুবাদের এ আত্মত্যাগের কোন দার্শনিক ভিত্তি নেই, তবু এতে নাস্তিকদের শুধু নয় আমাদেরও শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়।

ভারতের মহাত্মা গান্ধীকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়। রাজশক্তি তাঁর হাতে ছিল না—বলতে গেলে জীবনভর তিনি রাজশক্তির বিরুদ্ধে এবং হিন্দু সমাজের উচ্চ বর্ণের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির সাধনাতেই তাঁর জীবন উৎসর্গীকৃত হয়। তিনিও ইচ্ছুক হলে রাজার হালে বিলাসে আরামে জীবন অতিবাহিত করতে পারতেন। তা করেন নি বলেই মানুষ গর্ব করে তাঁকে নিয়ে।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর সাহাবীদের যে ত্যাগ, সাধনা ও সংগ্রাম তার নজির ইতিহাসে বিরল। মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে আনয়ন করার জন্যে, বিপথ থেকে সৎপথে উত্তরণের নিমিত্ত তদানীন্তন আরবে এমন কোন বাধা-বিপত্তি ও জুলুম বাকী ছিল না—যার বিরুদ্ধে তিনি দাঁড়ান নি। বিবাহসূত্রে বিপুল ধনের অধিকারী হয়েছিলেন তিনি, আরবের বিরাট ধনকুবেরেরা অপরিমিত সম্পদের অধিকারী করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তাঁকে; কিন্তু সে সম্পদ, সে অর্থলোভ তাঁর কাছে, তাঁর আদর্শের

কাছে ছিল নেহায়েত তুচ্ছ। মানুষের মুক্তি, জুলুমের অবসান, মহত্তর জীবনপথের সন্ধান দান, কুসংস্কার, অত্যাচার, অবিচার জর্জরিত জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা—এ সবই ছিল তাঁর পরম সম্পদ, সাধনার ধন। আদর্শ রূপায়ণের সাধনায় তাঁকে ফকিরের মত অসীম অনিশ্চয়তার মধ্যে রাস্তায় বের হতে হয়েছে, সর্বহারারূপে সুদীর্ঘকাল নির্বাসিত হতে হয়েছে, পাগলের মত পথে পথে ঘুরতে হয়েছে; অনাহারে-অর্ধাহারে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে তাঁর সাহাবিগণকে গাছের পাতা ও শুকনা চামড়া পর্যন্ত গলাধকরণ করতে হয়েছে। ইসলামী আদর্শকে গ্রহণ করার অপরাধে সর্বহারা ক্রীতদাসরা পর্যন্ত তাদের জালিম প্রভুদের কাছে যে নরকযন্ত্রণা লাভ করেছে, নির্মম প্রহার ও অগ্নিদাহে জর্জরিত হয়েছে, তাতে হয়তো আল্লাহ্‌র আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল, তবুও তাঁরা—সেই ক্রীতদাসরা পর্যন্ত আদর্শচ্যুত হননি—বিশ্বাস বিসর্জন দেননি।

এমনিভাবে দেখি হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ)-এর স্বার্থ ত্যাগের স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস। তারপর যুগে যুগে আবুজর গিফারী, ইমাম আবু হানীফা, সৈয়দ আহমদ বেরেলভী, জামালুদ্দীন আফগানী, হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌র মত হাজার হাজার মহাপুরুষ সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এবং জুলুমের অবসানের কামনায় যেভাবে আত্মত্যাগ ও নিগ্রহকে বরণ করে নিয়েছিলেন তা গৌরবে অবিস্মরণীয়, মহত্ত্বে ভাস্বর। অসংখ্য আরো উদাহরণ পাওয়া যাবে হযরত মূসা (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ) এবং অন্যান্য মহাপুরুষের জীবনে। তাই তাঁরা ছিলেন মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। হাদীসের ভাষায়—"তিনিই তো শ্রেষ্ঠ মানব, যিনি মানবজাতির মংগল সাধনে তৎপর।"[১] ইতিহাসের পাতায় যাঁরা বড় বলে স্বীকৃত হয়েছেন, তাঁরা এ পথেই বড় হয়েছেন। এ যুগেও যাঁরা বড় হতে চান, তাঁদেরও এ পথেই এগুতে হবে। এ পথ ছাড়া বড় হওয়ার, মহৎ হওয়ার দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

পরম শক্তির সাধনা

শ্রদ্ধা মানুষের পরম সম্পদ। পরিজনের কাছে, সমাজের কাছে, দেশের কাছে কোন রকম শ্রদ্ধা না থাকলে মানুষ হিসেবে মানুষ বাঁচতে পারে না। যে জীবনে শ্রদ্ধা নেই—সে জীবনের মূল্য কতটুকু? অথচ শ্রদ্ধার প্রধান উৎস ত্যাগ ও মহত্ত্ব। শক্তি ও বুদ্ধি হয়তো মানুষের মাথা নত করতে বাধ্য

১, খায়রুন্নাসি মইয়নফাউন্নাসা

করতে পারে, কিন্তু, তার হৃদয় অবনমিত করতে পারে না। হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ আসন ত্যাগ-সাধনার জন্য থাকে সর্বদাই উন্মুক্ত। তাই সমাজে যে কেউ ত্যাগ ও সাধনার মাধ্যমে সমাজ সেবায় এগিয়ে যায়—সে যে কোন ধর্মের বা দলের লোক, এমন কি নাস্তিকও হোক না কেন—তার প্রতি আমাদের মন শ্রদ্ধায় ভরে ওঠে।

ত্যাগ ও সাধনায় মানুষের দৈহিক শক্তির উন্মেষ হোক আর না হোক, তাতে তার মানবিক শক্তির অশেষ বিকাশ ঘটে। আণবিক শক্তির মত প্রতিটি মানুষের মধ্যেই বিকাশশীল বিরাট শক্তি আছে সুপ্তভাবে। তাকে লাভ করা যায় সাধনা ও ত্যাগের মাধ্যমে। "সকলের তরে সকলে আমরা" এই মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে ত্যাগ সাধনার কঠোর পথে এগিয়ে না গেলে সে শক্তির বিকাশ হয় না—যেমন মহাশক্তির প্রভাব ব্যতিরেকে আণবিক শক্তির প্রকাশ সম্ভব নয়। এই যে শক্তি, এটাই মনুষ্যত্বের শক্তি; এই শক্তির অভাবে মানুষ থাকে পশুস্তরে, মনুষ্যত্বের নিম্নতম পর্যায়ে। যে যতটুকু করতে পারে এই শক্তির উদ্বোধন, উন্মেষ—ততটুকুই সে হয় উন্নীত ও মহৎ। একজন আধুনিক মনীষী তাই বলেছেন: ত্যাগ ও সাধনার সংগ্রাম ব্যতীত মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির উদগম হয় না। মনুষ্যত্বের এই শক্তির ক্ষমতা সীমাহীন। হযরত উমর (রাঃ) ও খলীফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহঃ) সসাগরা রাজ্যের শাসক হয়েও ফকিরের বেশে জীবন যাপনের যে মহান শক্তি লাভ করেছিলেন, তা-ও ছিল এই-ই। এই শক্তিতে বলীয়ান হয়েছিলেন বলেই সক্রেটিস হাসিমুখে আলিংগন করতে পেরেছিলেন মৃত্যুকে। এই শক্তিবলেই যুগে যুগে মানুষ কারাগার আর ফাঁসি-কাষ্ঠকেও 'প্রিয়' বলে বরণ করতে পেরেছেন। যে শক্তিতে মানুষের কাছে মৃত্যুও হয় তুচ্ছ, সে শক্তি অসীম—তার সাধনাই অমৃতের সাধনা, অমরত্বের সাধনা। এই সাধনার দিকে আকৃষ্ট হবে না কেন জ্ঞানী মানুষ?

এই অমরত্বের সাধনার ইংগিত রয়েছে কুরআনে, বাইবেলে ও বেদে। মহাপুরুষদের প্রদর্শিত পথে যে বিপদ, যে দুঃখ-দারিদ্র্য তা তো পাথেয় মাত্র—পরম শক্তি বিকাশের উন্মেষক মাত্র। এতে যে মৃত্যু সে মৃত্যু নয়—নিত্যজীবন।[১]

---

১. কুরআনের সূরা ফাতিহা, সূরা বাকারার ১৫২ ও ১৫৪ আয়াত ও সূরা নিসার ১২৫ আয়াত দ্রষ্টব্য।

ত্যাগী মহাপুরুষদের যে লক্ষ লক্ষ মানুষ উন্মাদের মত অনুসরণ করে তাঁদের অংগুলি হেলনে মৃত্যুমুখী হতেও যে দ্বিধা করে না—এ শক্তিও আসে অপরের জন্য আত্মবিসর্জনের পথে। এ-শক্তিতে কত রাজ্য ও রাজপ্রাসাদ ভেংগে খান খান হয়ে গেছে, অত্যাচারিত নিপীড়িত মানবের বিপ্লবাগুনে কত অত্যাচারীর বিলুপ্তি ঘটেছে—ইতিহাসই তো তার বড় সাক্ষী।

শান্তি ও স্বস্তি কোথায়

শুধু শ্রেষ্ঠত্ব, শ্রদ্ধা ও শক্তিই নয়—এই সাধনায় আয়ত্ত হয় মানুষের চরম ও পরম সম্পদ—শান্তি ও স্বস্তি। দারিদ্র্য মানুষকে দুঃখ দেয় সত্যি, কিন্তু প্রাচুর্যে মানুষ প্রকৃত শান্তি পেয়েছে তার নজির কোথায়? ত্যাগ ও মহত্ত্বের সাধনার অভাবে ধন হয়ে ওঠে মানুষের কাল—ধ্বংসের কারণ। বস্তু-বাদ-প্রভাবিত মানুষ স্বার্থপরভাবে ধন আহরণের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আরাম আয়াস পরিত্যাগ করেছে—এতে ধন আহরিত ও সঞ্চিত হয়েছে ঠিকই, দালান-কোঠা বিলাস-উপকরণও লাভ হচ্ছে নিশ্চয়ই, কিন্তু শান্তি বিদায় নিচ্ছে তার মন থেকে, তার জীবন থেকে, এমন কি সমাজ থেকেও। ধন আহরণ ও সঞ্চয়ের মত্ততায় সমাজের ভারসাম্য হচ্ছে বিলীন। ফলে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে অশান্তির নরকাগ্নি প্রায় সর্বত্র। অশান্ত মানুষ পতংগের মত ধন-প্রদীপের শিখায় জ্বলে পুড়ে ছারখার হচ্ছে, তবুও মদ্যপ্রীতির মত এই স্বার্থসর্বস্বতা ত্যাগ করতে পারছে না।

মার্ক্সের অর্থই শুধু নয়, বার্ট্রাণ্ড রাসেলের ক্ষমতা-লোভও মানুষকে কম পাগল করেনি যুগে যুগে। নেপোলিয়ান, হিটলার থেকে শুরু করে আধুনিক কালের অনেক পরাক্রমশালী রাজনীতিবিদের স্বার্থসর্বস্ব ক্ষমতা লাভের বৃত্তান্ত পাঠ করলে সুস্পষ্ট হবে যে, সুখ-শান্তির আশায় ক্ষমতা-রূপী মায়ামৃগের পেছনে ঘুরতে ঘুরতে কত বুদ্ধিমান মানুষ অশান্তি ও ধ্বংসের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। এতে না এসেছে চিত্তের প্রসারতা, আর না আয়ত্ত হয়েছে দুঃখ সইবার শক্তি—আত্মত্যাগের মাধ্যমে সাধনা করলে যা সহজলভ্য হয়ে উঠত। ফ্রয়েডীয় যৌন-শক্তির পেছনেও মানুষ কম শক্তি ব্যয় করেনি। শুধু এই পথেও মানুষের সুবিমল শান্তি লাভ হয়নি কোন দিন।

মানব মনের প্রকৃতি

অতি অদ্ভুত মানুষের মন ও প্রকৃতি। নিজের স্বার্থোদ্ধারের জন্য অপরের ক্ষতি করেও যেন বিবেকের দংশন অনুভব করে মানুষ; দেশের কাজে

ডাক এলে যেন অন্তরের মানুষটি লাফ দিয়ে উঠে। অপরের চোখের পানি-বুকের ব্যথায় হৃদয় যেন গুমরে ওঠে। দুর্বলের উপর সবলের জুলুম দেখলে মন যেন বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এ যেন তার কর্তব্য। অন্তরের এ ডাকে সাড়া না দিলে মন খুঁত খুঁত করে, অপরাধ বোধ হয়—অস্বস্তিতে সারা অস্তিত্বই যেন ভরে যায়, অন্তর্লোক যেন গভীর অন্ধকারে ছেয়ে যায়। স্বীয় স্বার্থ-চিন্তা মানুষের এই আত্মভোলা মহৎ প্রকৃতিকে দাবিয়ে রাখতে চায় বারবার, অনেক সময় দাবিয়ে দেয়ও। কিন্তু সূক্ষ্ম কলের যন্ত্র যার বিকল হয়ে যায় নাই, তাতে এ ডাক—যতই সূক্ষ্ম হোক—ধরা পড়ে যায়। এতে চঞ্চল হয়ে ওঠে তার মন, তার সত্তা, একটা বিরাট অপ্রতিরোধ্য শক্তি অনুভব করতে থাকে সে। ফলে আত্মবিসর্জনের সুমধুর উন্মাদনায় চঞ্চল ও উন্মুখ হয়ে ওঠে সারা দেহ মন। দুঃখী জনের দুঃখ মুছাবার জন্য, অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভেংগে খান খান করার জন্য এগিয়ে যায় সে একটি অপার্থিব প্রেরণায়—যাকে বলা যায় আধ্যাত্মিক আবেশ। এই প্রেরণা এত বলবান, এত নিস্বার্থ যে—আত্মীয়-পর বোধ পর্যন্ত রহিত করে দেয় এ। ফলে বুদ্ধের মত পরমাকাঙ্ক্ষিত সিংহাসন, সুন্দরতম স্ত্রী, প্রিয়তম শিশুপুত্র পর্যন্তও অকিঞ্চিতকর হয়ে ওঠে তার মহতী জীবন সাধনার কাছে—বৃহত্তর সমাজের পূর্ণমুক্তিপ্রয়াসের কাছে।

শুধু তাই নয়। যে আত্মবিশ্বাস মানুষের জীবন-তরীর হালস্বরূপ—যার অভাবে মানুষের জীবনের গতি অনিশ্চিত অন্ধকারে হারিয়ে যায়, নৈরাশ্য (pessimism) ও আত্মগ্লানিতে মন গুমরে মরে—সেই আত্মবিশ্বাসও মানুষ ফিরে পায় উপরে বর্ণিত মহত্তর ও বৃহত্তর জীবনের গতিপথে, কর্মচঞ্চল ও শক্তি সবল সাধনায়। লক্ষ্যহীন দিশাহীন বস্তুসর্বস্ব অকর্মণ্য জীবনই তো হতাশা ও নৈরাশ্যের জন্ম সদন।

মানব জীবনের উদ্দেশ্য

এখানে আর একটি গভীর তত্ত্বের কথা এসে পড়ে। মানুষ কি? মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্যই বা কি? এ দার্শনিক তত্ত্বের গভীরতর দিক আলোচনা না করেও বলা যায়ঃ জৈবিক জন্ম-মৃত্যু ও আহার-বিহারের মধ্যে যে জীবন সীমায়িত—সে জীবন আর যাই করুক খুব উঁচু ধারণা দেয় না আমাদের। জীবনের উদ্দেশ্য যদি এতেই পর্যবসিত হয় তবে এ জীবনের মূল্যই বা কতটুকু? মূল্যবোধ মানব জীবনের প্রধান গুরুত্ব দ্যোতক।

উচ্চতর মূল্যবোধই যদি জীবনে না রইল—তবে সে জীবন নিয়ে গর্ব করার কীই বা থাকে ? এর অভাবে মানুষের সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প এমন কি নিস্বার্থ বিজ্ঞান সাধনাও অর্থহীন হয়ে পড়ে। জ্ঞানবান মানুষের কাছে মূল্যহীন, অর্থহীন ও শ্রদ্ধাহীন জীবনের কোন গুরুত্বই থাকে না। দর্শন শাস্ত্রও তাই যুক্তি-উত্থিত কুজ্ঝটিকার মধ্যেও নৈতিকতাপুষ্ট মহত্তর কর্মসাধনাকে মূল্যবোধের মাপকাঠি হিসাবে বিবেচনা করে।

ঈমানদার যাঁরা – যাঁরা বিশ্বাস করেন জীবনের অসীম সম্ভাবনা ও অনন্ত ক্রমবিকাশে, ইহকালের দুর্লংঘ্য প্রাচীর ভেদ করে যাদের বুদ্ধি ও বিবেচনা-শক্তি আরো এগিয়ে যায়—তাদের কাছে জীবন এমন মূল্যহীন ও এত অকিঞ্চিৎকর নয়। তাদের কাছে একটা অদৃশ্য পরমশক্তির বলে সমস্ত মানুষ সমস্ত জীব—সমস্ত বিশ্বজগৎ একটি অচ্ছেদ্য ঐক্যসূত্রে গ্রথিত। এই ঐক্য বিধিই জগতের মংগল সাধনায় আমাদের অন্তরতম আত্মাকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। আর এই মংগল সাধনাই আমাদের জীবনকে স্থান-কালাতীত ক্রমবিকাশের ও ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। একেই ইসলামী ক্রমবিকাশের ধারণায় ধার্মিকেরা বলেন মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত—পরম শক্তির ইচ্ছাপূরণ। জীবনের মূল্যবোধের উৎসও এখানে আহার-বিহার সমন্বিত বিচ্ছিন্ন জড়জীবনের নিকৃষ্ট জীবনবোধ কল্পনায় নয়।

সাধনাই সাফল্য

এখানে আরো একটি কথা বলা দরকার—অনন্ত ক্রমবিকাশের পথের পথিক যে, তাকে আমরা বলি সাধক। সাধকের কাছে সাধনাই সাফল্য। সৎপথের সংগ্রামই তাঁর আত্মশক্তি বিকাশের পাথেয়। পার্থিব অসাফল্য তার কাছে অকিঞ্চিৎকর। সাধনা ও সংগ্রামই জীবন – সাধনা ও সংগ্রামের ইতি যেখানে, সেখানেই মৃত্যু। তাই মন্ত্রিত্ব প্রাপ্তি, ধন প্রাপ্তি, রাষ্ট্রীয় শক্তিলাভ—এসবই তার কাছে তুচ্ছ—সাফল্য তো নয়ই। তাই সাধারণ কর্মীরা যেখানে বিপদে ও পার্থিব অসাফল্যে মুষড়ে পড়ে—নৈরাশ্যে অন্ধকারে আত্মহারা হয়ে যায়, সাধক সেখানে, সেই অসাফল্যের মধ্যে মহত্তর জীবন পথের সন্ধান পায়, বৃহত্তর সাফল্যের পাথেয় আহরণ করে।

মানুষকে বুদ্ধি ও জ্ঞান বিকাশের সাধনাও করতে হয়। এই সাধনা কিন্তু মহত্তর জীবন গঠনের উপায় মাত্র, উদ্দেশ্য নয় ; যেমন অর্থ বা ধন আহরণ

জীবনের উদ্দেশ্য নয়, শুধু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ বিশেষ। এইজন্য প্রত্যেক জ্ঞান ও বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির উচিত মহত্তর জীবন গঠনের জন্য যে ত্যাগ ও সাধনার আহ্বান ও প্রেরণা তারা অন্তরে বিবেকে অনুভব করেন তাতে যথোপযুক্ত পরিমাণে সাড়া দেওয়া। অবশ্য সব মানুষ সমভাবে এই সাধনায় সাড়া দিতে পারে না। মহান ঐক্যবোধের খাতিরে, মহত্তর জীবন বিকাশের উদ্দেশ্যে যার যতটুকু সম্ভব এই সাধনায় অংশগ্রহণ করা অপরিহার্য কর্তব্য। স্বার্থবুদ্ধির তাগিদে এ সাধনাকে এড়িয়ে যাওয়ার মধ্যে যতই বুদ্ধির বাহাদুরী থাকুক না কেন—এতে মনুষ্যত্বের দীপ শিখার নির্বাণ ঘটে—জীবন মূল্যহীন ও উদ্দেশ্যহীন জীবযন্ত্রে পর্যবসিত হয়। এটা কাম্য হওয়া উচিত নয়।

সাহিত্য ও ধর্ম

উপসূচী

১. সাহিত্যে আদর্শের স্থান ২১৬
২. সাহিত্য সৃষ্টি ও উদ্দেশ্য ২২[illegible]

১
সাহিত্যে আদর্শের স্থান

সাহিত্যে আদর্শ ও সাহিত্যের আদর্শ নিয়ে অতীতে বহু কথা উঠেছে, এখনো উঠছে।

বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এজন্য যে, এ নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। মতভেদ যেখানে সেখানেই আলোচনার আবশ্যকতা। আলোচনার প্রারম্ভেই প্রশ্ন জাগে ঃ

সাহিত্য কি? তার আদর্শ কি? দু'টোর মধ্যে সম্বন্ধই বা কি?

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক ঃ

টলস্টয়ের 'ওয়ার এণ্ড পিস' (যুদ্ধ ও শান্তি) বিশ্ব সাহিত্যের একটা মূল্যবান সম্পদ। নেপোলিয়নের রাশিয়া আক্রমণের ঐতিহাসিক পটভূমিতে এটা লেখা। মানুষের সুখ-দুঃখ ও আশা-আকাঙ্ক্ষা, সমাজের ভাঙ্গা-গড়া ও উত্থান-পতন সুন্দর ভাষায় ও মনোরম প্রকাশভঙ্গীতে রূপ লাভ করেছে এই পুস্তকে।

এটা এই মহাগ্রন্থের এক দিক। অন্যদিক—এই ভাঙ্গা-গড়া ও উত্থান-পতনের পেছনে একটা অলৌকিক অদৃশ্য শক্তি নিয়ত কাজ করে গেছে—যে শক্তির কাছে মহাবিক্রমশালী নেপোলিয়নও ছিলেন অসহায়। এই দিকটাতে প্রকটিত হয়েছে টলস্টয়ের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী। সে দৃষ্টিভঙ্গী কায়ার সঙ্গে ছায়ার মত ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর সঙ্গে গ্রন্থের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। এ দৃষ্টিভঙ্গী বলতে চায় মানুষের শক্তি আছে বটে কিন্তু তা সীমাবদ্ধ—তার বাইরে আর একটা অদৃশ্য মহাশক্তি কাজ করে চলেছে অনবরত সূক্ষ্মভাবে। এ মহাশক্তির কাছে মানুষকে শির নোয়াতেই হয়। একে অদৃষ্টবাদ বলুন আর যাই বলুন অনিন্দ্য কলাকৌশলে প্রতিভাবান টলস্টয় এ সত্যকে তাঁর উপন্যাসে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

দ্বিতীয় আর একটা বিষয় তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন। তা হল ঃ মানুষ কামনা করে বিমল শান্তি, অথচ যুদ্ধবিগ্রহ বা নানারূপ সংঘাত

মানুষকে নিক্ষেপ করে অশান্তির মহা অগ্নিকুণ্ডে—যা দহন করে নির্বিচারে নিষ্ঠুররূপে। টলস্টয়ের লেখনী যুদ্ধের প্রতি একটা তীব্র ঘৃণার উদ্রেক করে পাঠকের মনে। এ ক্ষেত্রেও শান্তি ও যুদ্ধ সম্বন্ধে টলস্টয়ের একটা দৃষ্টিভঙ্গী লেখার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

এ দুটো দৃষ্টিভঙ্গীকেই বলতে পারি টলস্টয়ের আদর্শবাদ—যা তিনি নিপুণতার সঙ্গে সাহিত্যের মাধ্যমে সর্বকালের মানুষের হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন।

এবার আসুন গোর্কির 'মা'-এ। এ গ্রন্থটিও আজ বিশ্বসাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে। এখানেও যেমন আছে মনোরম ভাষা, রসঘন প্রকাশভঙ্গী, আর মানুষের সুখ-দুঃখের নিখুঁত চিত্র—তেমনি আছে লেখকের একটা দৃষ্টিভঙ্গী, যা ধীরে ধীরে পাঠকের মনে সঞ্চার করে দিয়েছেন লেখক। সে দৃষ্টিভঙ্গী কম্যুনিস্ট বিপ্লবীদের আদর্শবাদ। শ্রেণী-সংগ্রামকে ভিত্তি করে নিপীড়িত মানুষের জন্য মার্ক্স ও লেনিন যে একটা আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাকেই রূপ দিয়েছেন এই শক্তিশালী লেখক কথা সাহিত্যের মারফত। 'মা' বর্ণিত আদর্শ ত্রুটিপূর্ণ মানি—তবু 'মা' শুধু অসংখ্য পাঠকের হৃদয়ে দোলা দেয়নি—দোলা দিয়েছে রাশিয়ার গোটা সমাজকে। ১৯০৫ সাল থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত 'মা' আন্দোলনের যে প্রধান হাতিয়ার ছিল—তা অস্বীকার করার জো নেই।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের কথাই ধরা যাক। বিশ্বসাহিত্যে রবি ঠাকুরের অমর অবদান গীতাঞ্জলির পাতায় পাতায় একটা চিরন্তন আদর্শবাদ মোহনীয় সুর ও ছন্দের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছে। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন ঃ

সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।
কত বর্ণে কত গন্ধে
কত গানে কত ছন্দে
অরূপ তোমার রূপের ছন্দে
জাগে হৃদয় পুর
আমার মধ্যে তোমার শোভা
এমন সুমধুর।

আবার—

তোমার আমার মিলন হলে সকলি যায় খুলে
বিশ্ব সাগর ঢেউ খেলায়ে উঠে তখন দুলে।

কিংবা—

বিশ্বরূপের খেলাঘরে
এতই গেলেম খেলে
অপরূপকে দেখে গেলেম
দু'টি নয়ন মেলে।
পরশ যারে যায় না করা
সকল দেহে দিলেন ধরা
এইখানে শেষ করেন যদি
শেষ করে দিন তাই।
যাবার বেলা এ কথাটি
জানিয়ে যেন যাই।

এমনিভাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের আদর্শ শত শত গানে ও কবিতায় প্রকাশ করে গেছেন। একে সূফীবাদ বলুন, একত্ববাদ বা তৌহিদবাদ বলুন—এটাই মহাকবির জীবনবোধ বা জীবনাদর্শ।

রাজা রামমোহন রায় একেশ্বরবাদকে ভিত্তি করে ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ইসলাম ধর্ম ও অন্যান্য একেশ্বরবাদী ধর্মের প্রভাবে। এ ধর্মেরই মন্ত্রশিষ্য রবীন্দ্রনাথ। একেশ্বরবাদই তাঁর জীবনদর্শন। তাঁর মতে এ জীবনদর্শনই মানুষের ধর্ম। 'মানুষের ধর্ম' নামক রচনায় তিনি এ বিষয়ে সুস্পষ্ট আলোকপাত করেছেন। আর 'মানুষের ধর্মের' এই আদর্শবাদই বিচিত্র গীতিধারায় বিকশিত হয়েছে তাঁর কাব্যে, তাঁর গানে, তাঁর প্রবন্ধে। তারই পরিচয় পাই আমরা যখন দেখি বিশ্বস্রষ্টায় আত্মসমর্পিত অবস্থায় তিনি সুর তোলেন :

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধুলার তলে—

অথবা

হেরি অহরহ তোমারই বিরহ

অথবা

অন্তর মম বিকশিত কর

প্রভৃতি মরমী গানে। 'মানুষের ধর্মে' কিংবা 'আধুনিক সাহিত্যে'র 'সাকার ও নিরাকার' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি একেশ্বরবাদ সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছেন কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বর্ণিত তৌহিদবাদের সঙ্গে তার যথেষ্ট মিল রয়েছে। তাঁর বহু কবিতা ও গানের ভাবও যে কুরআনিক ভাবের অনুসারী, একটু নিবিষ্ট মনে পড়লে তা ধরা পড়ে। ব্রাহ্মধর্মের বিখ্যাত অনুসারী গিরীশচন্দ্র সেন কুরআনের অনুবাদ করে এবং তাপসকাহিনীর মত গ্রন্থাদি লিখে ইসলামী ভাবধারার সঙ্গে এই ধর্মের অনুসারীদের গভীর পরিচয় লাভের সুযোগ সৃষ্টি করেছিলেন। এ সবের মাধ্যমেই যে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী গঠিত হয়েছিল তা যৌক্তিকভাবেই বলা চলে। শুধু তাই নয়—রবীন্দ্রনাথের পরিবারে বহুদিন ধরে পার্সী ভাষার যথেষ্ট চর্চা ছিল। তার মাধ্যমেও তৌহিদবাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটে।

এই যে আদর্শ—একে শুধু মানুষের আদর্শ বলেই তিনি শেষ করেন নি, তাঁর মতে এটা সাহিত্যের আদর্শ। তাই সাহিত্যের তাৎপর্য নামক প্রবন্ধে তিনি বলেন ঃ

> ভগবানের আনন্দ সৃষ্টি আপনার মধ্য হইতে আপনি উৎসারিত; মানব হৃদয়ের আনন্দ-সৃষ্টি তাহারই প্রতিধ্বনি। এই জগৎ সৃষ্টির আনন্দ-গীতের ঝংকার আমাদের হৃদয় বীণা-তন্ত্রীকে অহরহ স্পন্দিত করিতেছে। সেই যে মানব সঙ্গীত—ভগবানের সৃষ্টির প্রতিঘাতে আমাদের অন্তরের মধ্যে সেই যে সৃষ্টির আবেগ—সাহিত্য তাহারই বিকাশ।

তিনি আরো বলেন ঃ

> সাহিত্য ব্যক্তি-বিশেষের নহে, তাহা রচয়িতার নহে—তাহা দৈববাণী।

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বলে পরিচিত। তাঁর 'আনন্দমঠ' প্রভৃতি উপন্যাসে হিন্দু সম্প্রদায়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শ প্রকাশ হয়েছে উৎকটভাবে। উৎকটভাবে বলার কারণ— এতে শুধু হিন্দু-আদর্শ পরিবেশিত হয়নি; সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রচুর বিদ্বেষ সৃষ্টি করা হয়েছে সজ্ঞানে। এখানে বহু ঐতিহাসিক মুসলিম চরিত্র বিকৃত করে হেয় রূপে অংকন করা হয়েছে। তবুও এ উপন্যাস সাহিত্য-গুণে উন্নত এবং বিদ্বেষের অংশটুকু বাদ দিলে এটা আমাদের ভাল লাগতে পারে—আমাদের আনন্দও দেয়।

বাঙলা সাহিত্যে রবীন্দ্র যুগের মধ্যেই নজরুল যুগের সূচনা। একথা প্রমাণের দরকার পড়ে না যে নজরুলের শ্রেষ্ঠ কবিতা ও গানগুলি তৌহিদবাদ ও ধর্মভিত্তিক। "খোদার প্রেমের শরাব পিয়ে," "বক্ষে আমার কাবার ছবি," "উঠুক তুফান পাপ দরিয়ায়," "শোন শোন ইয়া ইলাহী," "কে যাবি আয় পারে ত্বরা করি," "বাজিছে দামামা বাঁধরে আমামা," "ইসলামের ঐ সওদা লয়ে," "এ কোন মধুর শরাব দিলে," "মোহাম্মদ মোর নয়ন মণি," "আর কত দিন," "অভেদম," "সে যে আমি," সূরা ফাতিহার অনুবাদ— প্রভৃতি গান ও কবিতায় এ আদর্শই রূপ পেয়েছে অপূর্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে।

'খেয়াপারের তরণী'তে তাই আমরা ভাব-বিমুগ্ধ হয়ে পড়িঃ

নহে এরা শংকিত বজ্র নিপাতেও
কাণ্ডারী আহমদ তরী ভরা পাথেয়।
আবু বকর উসমান উমর আলী হাইদার
দাঁড়ী যে এ তরণীর নাই ওরে নাই ডর!
কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা
দাঁড়ী মুখে সারী গান—"লা-শারীক আল্লা।"

সংসার-সমুদ্রের মাঝি ছিলেন মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ), আর সাহাবীগণ ছিলেন অভিজ্ঞ দাঁড়ী, আর পাথেয় হল তৌহিদের বাণী—ভয় কিসের?

আবার –

হে নামাজী আমার ঘরে নামাজ পড় আজ,
তব চরণতলে দিলাম পেতে হৃদয়-জায়নামাজ।
আমি গোনাহ্‌গার বেখবর
নামাজ পড়ার নাই অবসর।
তব চরণ ছোঁয়ায় এই পাপীরে কর সরফরাজ॥

নজরুল সাহিত্যের একটা বড় উপাদান বা বৈশিষ্ট্য হল 'অসংকোচে প্রকাশের দুরন্ত সাহস' ও নির্ভীকতা। তৌহিদ-মন্ত্রে যাঁরা মনে প্রাণে দীক্ষা নিয়েছেন—তাঁদের কাছে দুনিয়াতে কিছুকেই ভয় করার কারণ থাকে না। এ মহাসত্যের উপলব্ধিই ত তাঁর সাহসের মূল উৎস। নজরুল তাই বলেন:

সত্যের শক্তি অন্তরে না থাকলে ত সাহস আসে না।

এ কারণেই তিনি ফরিয়াদ কবিতায় উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করতে পেরেছিলেন—

তোমার দত্ত হস্তেরে বাঁধে কার নিপীড়ন চেড়ী।
আমার স্বাধীন বিচরণ রোধে কার আইনের বেড়ী?
ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে, আছে মোর প্রাণ
আমিও মানুষ আমিও মহান
আমার অধীন এ মোর রসনা এই খাড়া গর্দান—
মনের শিকল ছিঁড়েছি, পড়েছে হাতের শিকলে টান—
এত দিনে ভগবান।

অন্যত্র—

এক আল্লারে ছাড়া কাহারো বান্দা হবে না বল,
দেখিবে তোমার প্রভাবে পৃথিবী করিতেছে টলমল।

এই দুরন্ত সাহসেই বিদ্রোহী কবি রাজদ্রোহী রূপে জবানবন্দী দিয়েছিলেন ঃ

আমার পক্ষে সকল রাজার রাজা, সকল বিচারকের বিচারক, আদি অনন্তকাল ধরে সত্য জাগ্রত ভগবান...। এই মহা বিচারকের দৃষ্টিতে রাজা, প্রজা, ধনী, নির্ধন, সুখী-দুখী সকলেই সমান। এর আইন ন্যায়ধর্ম। সে আইন কোন বিজেতা মানব কোন বিজিত বিশিষ্ট জাতির জন্য তৈরি করে নাই,..... সে আইন সার্বজনীন সত্যের— সে আইন সার্বভৌম ভগবানের।

ইসলামী আদর্শের প্রভাবে যেমন হাফিজ, রুমী, হালী, ইকবাল, নজরুল প্রমুখ কবি মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন—তেমনি করেছেন মিলটন, দাঁতে, কালিদাস প্রমুখ মহাকবি খ্রীস্ট ধর্ম, হিন্দু ধর্ম প্রভৃতি ধর্মের আদর্শকে কেন্দ্র করে। নজরুল যেমন হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে অবলম্বন করে বহু ভক্তিমূলক গান ও কবিতা রচনা করেছেন, তেমনি রচনা করেছেন বহু ইউরোপীয় নামকরা কবি যীশু ও মাতা মেরীকে কেন্দ্র করে। যে বৈষ্ণব সাহিত্যের কথা আমরা বলি, তাও ভক্তি ও ধর্মমূলক। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গকে কেন্দ্র করে যে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে তা তো বাংলা সাহিত্যিকদের অজানা নয়।

পৃথিবীর বড় বড় সাহিত্যিকদের লেখা বিশ্লেষণ করলে আমরা যে সিদ্ধান্তে পেঁছি তা হচ্ছে ঃ অধিকাংশ সাহিত্যের মধ্যে সাহিত্যিকের একটা স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গীর—একটা বিশেষ জীবনবোধের ছাপ পড়েই।

ভাষা ও টেকনিক হল দেহ, ভাব হল প্রাণ, আর এই জীবনবোধ হল আত্মা। আত্মার ছাপ কোথাও স্পষ্ট, কোথাও সূক্ষ্ম, কোথাও ক্ষীণ আর কোথাও বা প্রবল। জীবনাদর্শের ছাপ সাহিত্যে পড়ে বলেই যুগে যুগে মানুষের রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি তথা গোটা সমাজের উপর সাহিত্যের প্রভাব পড়ে বিপুলভাবে।

দ্বিতীয় পর্যায়

সাহিত্যে আদর্শের স্থান নির্ণয় করতে গিয়ে কয়েকটা উদাহরণ পর্যালোচনা করা গেল।

আলোচনা থেকে কি পেলাম ?

১. সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গী বা আদর্শগত ছাপ তাঁর রচিত সাহিত্যে সাধারণত পড়েই থাকে। তাঁর হৃদয়তন্ত্রীতে যে সুর বাজে, তাঁর মানসপটে যে ছবি ফোটে তাতে একটা দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠবেই এবং কোনও না কোন ক্ষেত্রে ভাষার মাধ্যমে তা রূপ পাবেই। রবীন্দ্রনাথের কথায়—

> বহিঃপ্রকৃতি এবং মানব চরিত্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অনুক্ষণ যে আকার ধারণ করছে, যে সঙ্গীত ধ্বনিত করে তুলছে, ভাষায় রচিত সে চিত্র এবং সে গানই সাহিত্য।

একটা সবল দৃষ্টিভঙ্গী বা জীবনবোধ না থাকলে শক্তিশালী লেখাও তে. সম্ভবপর নয়।

তর্কচ্ছলে বলা যায়, কোনো কোনো সাহিত্যিকের আদর্শ বা নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী নাও থাকতে পারে। উত্তরে বলা যেতে পারে : সমাজের নানা ঘাতপ্রতিঘাতে মানুষের মনে একটা দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠবেই। সমাজের দ্বন্দ্বশীল বিচিত্র ঘটনাবলী সাহিত্যিকদের মত ব্যক্তিদের মনে কোনো দাগই কাটতে পারে না—ভালমন্দ যাচাই করার মত কোনো মনোভাবই তাঁর সৃষ্টি হবে না—এ তো মনস্তত্ত্বের নিয়মে অচল।

যাকে আমরা আদর্শ নিরপেক্ষতা বলি, সেটা হয়ত সুবিধাবাদ নয়ত প্রচলিত আদর্শবাদের বিরোধিতা। সুবিধাবাদী সাহিত্যিক আদৌ সাহিত্যিক কিনা সন্দেহ, কারণ সুবিধাবাদের ভিত্তিতে কোনও মহৎ সৃষ্টি আশা করা যায় না। আর প্রচলিত আদর্শসমূহের বিরোধিতাকেও এক প্রকার আদর্শ

বলা যায়। একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী তথা নতুন আদর্শ এরূপ সাহিত্যিকের মনে দানা বেঁধে উঠেছে বলেই তো প্রচলিত আদর্শসমূহের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা জন্মেছে।

মানবতা ও বিশ্বমানবতা বলে একটা কথা প্রচলিত আছে। এটাও একটা মতবাদ বা আদর্শ।

সাহিত্যের আদর্শ থাকবে—এটা অনস্বীকার্য। কিন্তু এ কথাও মনে রাখা আবশ্যক যে ফরমাইশ দিয়ে ভাল সাহিত্য সাধারণত হয় না। ভিতরে যা নেই বাইরের থেকে তাকে পুরিয়ে দিয়ে আদায় করার জিনিস সাহিত্য নয়। কারণ "সাহিত্য অনুকরণ নয়—আবিষ্কারও নয়, ইহা সৃষ্টি।"

লেখককে ফরমাইশ দেওয়া সমীচীন নয় বটে, তবে তাঁদের কোন বিশেষ কিছু সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে প্রেরণা দেওয়া বা উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। লেখক যদি ক্ষমতাবান হন এবং লেখ্য বিষয় যদি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী বা আদর্শানুযায়ী হয়, তবে প্রেরণা দান খুবই কার্যকরী হতে পারে।

২. প্রসঙ্গত আরো একটা কথা এসে পড়ে। সাহিত্য কি উদ্দেশ্যমূলক না সাহিত্য শুধু সাহিত্যেরই নিমিত্ত? "আর্ট ফর আর্টস সেক" কিংবা "আর্ট ফর ব্রেড্স সেক" —কথা দুটি কোন্ সাহিত্যিক না শুনেছেন? "সাহিত্য প্রত্যক্ষভাবে সমাজমুখী হবে, না ব্যক্তিগত ভাব-বাসনা নিয়ে স্বপ্ন বিহার করবে"—এ প্রশ্ন বহু পুরাতন। আমরা যে বিভিন্ন উদাহরণ দিয়েছি তা বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, সাহিত্য শুধু সাহিত্যের জন্য—এ কথাটা যেমন একতরফা—আবার সাহিত্য একটা বিশিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য—একথাও তেমনি সর্বাংশে সত্য নয়। জীবনকে সুন্দর ও মহান করার নিমিত্ত যে উপলব্ধি বা আদর্শ বোধ তা রূপায়ণের ইঙ্গিত সাহিত্যিকরা দেবেন তাতে আর আশ্চর্য কি? কিন্তু একথা ভুললেও ত চলবে না যে নিছক প্রচারণামূলক লেখা তো সাহিত্য হতে পারে না।

সৌন্দর্য, প্রীতি ও আনন্দবোধ মানুষের চিরন্তন বৃত্তি। সুন্দরকে নিয়ে যে লেখা বা আনন্দের অভিব্যক্তি—তা যতই সুন্দর ও আনন্দদায়ক হবে—সে লেখার সাহিত্যিক মূল্য ততই যে বেশী—একথা অস্বীকার করার উপায় নাই।

জীবনকে কেন্দ্র করেই জীবনদর্শন কিংবা সৌন্দর্য ও আনন্দবোধ। আবার জীবনকে কেন্দ্র করেই সাহিত্য। তাই দু'য়েরই স্থান রয়েছে সাহিত্যে। চাঁদের আলো ও সাগর দর্শনে যে বাস্তব আনন্দ মিলে কিংবা প্রেম ও ভক্তি

রসধারায় হৃদয় যে হয় সিক্ত—তাতে জীবনই হয় শোভিত ও সুন্দর। এই বিমল আনন্দের প্রকাশ সাহিত্যে থাকবেই। আবার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও মহত্তর মননশীলতার প্রভাবে হৃদয়-মনে যে আঘাত পড়ে তার কল্পনা-নির্ভর রসময় চিত্রও ফুটে ওঠে সাহিত্যে। তাই আমরা সংজ্ঞা দিতে পারি—

সৌন্দর্য, কল্পনা, হৃদয়াবেগ এবং সমাজ ও ব্যক্তি-মানসের শিল্পময় রসঘন সত্যাশ্রয়ী প্রকাশই সাহিত্য।

৩. সাহিত্যের আর একটা দিক আলোচনা না করলে আলোচ্য বিষয় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

বলা হয়ঃ 'সাহিত্য তাই, যা সার্বজনীন ও সর্বকালের।' কথাটা অনেক সময় ভুল ধারণার সৃষ্টি করে। সার্বজনীন মানে কি ? এর মানে কি এই যে—সাহিত্যের যে উপকরণ তা কোনও বিশেষ ধর্মের নয়, দেশের নয়, আদর্শের নয় ?

শরৎচন্দ্র বাঙালী পরিবেশে বাঙালী চরিত্র সৃষ্টি করে উপন্যাস লিখেছেন। শরৎচন্দ্রের নায়ক-নায়িকার বৈশিষ্ট্য বাঙালীত্বে আর হিন্দুত্বে। তাই বলে কি শরৎ সাহিত্য সার্বজনীনতা হারিয়েছে ? পশ্চিমের মিল্টন এবং পূর্বের নজরুল ইসলামও দেশ প্রেমমূলক বহু কবিতা লিখেছেন। তাই বলে কি বিশ্বের কাছে তাঁদের কবিতা অপাংক্তেয় হয়ে গেছে ?

আবার জসীম উদ্দীনের 'নকসী কাঁথার মাঠ'—যা বহির্বিশ্বেও কদর পেয়েছে—তার চরিত্র, ভাব, ভাষা সবই বাংলাদেশের গ্রাম্য পরিবেশের, এতে তো বিশ্বমন এ সাহিত্য থেকে বিমুখ হয়ে যায়নি।

আসল কথাঃ সাহিত্যের চরিত্র বা উপকরণ কোনও না কোন দেশ, সমাজ বা ধর্ম হতে আহরিত হবেই। যে সাহিত্যিক যে সমাজ ও পরিবেশে অবস্থান করেন, তার হৃদয় ক্যামেরায় সেই সমাজ ও পরিবেশের ছবি ফুটে উঠবে। আর যেহেতু সাহিত্য ভাবের বাহন, তাই সেই সমাজের ছবিই তার সাহিত্যে রূপায়িত হবে। স্থান ও পরিবেশ-নিরপেক্ষ সাহিত্য কল্পনার বস্তু, বাস্তবতায় তার স্থান কোথায় ?

অন্যদিকে পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা, নিবিড় পরিচয় ও গভীর উপলব্ধি হতেই সাহিত্যের উন্নত চিত্র বা চরিত্র সৃষ্টি সম্ভব। এর কোনটাই পরদেশ বা পরসমাজ নিয়ে সম্ভব নয়, অন্তত সহজ ত নয়ই। এজন্যে স্বদেশ ও স্ব-সমাজই সাহিত্যিকদের প্রায় সমস্ত ভাব ও উপকরণ যোগায়।

শরৎচন্দ্র প্রতিভাবান সাহিত্যিক। বাংলাদেশে পাশাপাশি বাস করেও অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির অভাবে তাঁর উপন্যাসে তিনি বাঙালী মুসলমানের চরিত্র আঁকতে পারেন নি বলে দুঃখ করেছিলেন, তাও একই কারণে। মাইকেল মধুসূদনের মত প্রতিভা যে পরভাষায় ও পরোপকরণে সাহিত্য রচনা করতে গিয়ে বিফল হলেন, আবার স্বদেশ ও স্ব-ভাষার কোলে আশ্রয় নিয়ে সাফল্যের আসল সূত্র আবিষ্কার করলেন তার মূলেও একই যুক্তি। উপকরণ, চরিত্র বা চিত্র যে দেশ, সমাজ বা ধর্মেরই হোক না কেন—তার মধ্যে সর্বমানবের গ্রহণযোগ্য উপাদান থাকলেই তা বৃহৎ সৃষ্টি। মহাবিশ্বের এক নিভৃত পল্লীর যে অশিক্ষিত অমার্জিত কৃষক সেও মানুষ, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ-প্রীতি, সুখ-দুঃখ, প্রেম-বিরহের সঙ্গে অন্য দেশের যে কোনও মানুষের অন্তর-আত্মার মূলত মিল রয়েছে। স্বদেশপ্রেম শুধু এদেশে নয়—প্রত্যেক মানুষের মনেই কমবেশী আছে, আর আছে বলেই এক দেশের দেশপ্রেমমূলক সাহিত্য অন্য দেশের মানুষের হৃদয়তন্ত্রীতে সুর তোলে। অলৌকিক ও বিচিত্র ঘটনারাজি সব দেশের মানুষের মনে কৌতূহল ও আনন্দ জাগায় আর এজন্য আরবের 'আলেফ লায়লা' সব দেশেরই প্রিয়।

'সর্বকালীন' কথাটার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। অতীতের সাহিত্যে আর আধুনিক সাহিত্যে কি কোনও প্রভেদ নেই? কালিদাসের শকুন্তলা বা ফেরদৌসীর শাহ্‌নামার সঙ্গে এ কালের যে কোন সাহিত্যের তুলনা করলে বোঝা যাবে—সেকালের টেকনিক, ভাষা, উপমা এমন কি চরিত্র একাল থেকে বহুলাংশে ভিন্ন। এমন কি সেদিনের বঙ্কিমচন্দ্র, মীর মোশাররফ হোসেন বা কায়কোবাদের ভাষা ও টেকনিক পরবর্তীকালের শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ থেকে ভিন্ন। এই ভিন্নতা আছে বলেই তো সাহিত্যকে 'আধুনিক', 'ক্লাসিক্যাল' প্রভৃতি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। সর্বকালের মানে এ নয় যে, সাহিত্য সর্বকালে একই রূপ গ্রহণ করবে; বরং এর অর্থ এই যে মানুষের অনুভূতি বা চরিত্রের যে একটা মৌলিক দিক আছে তা সর্বকালের মানুষের মধ্যে বর্তমান থাকে। তাই ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর ভিন্নতা সত্ত্বেও অর্থাৎ সাহিত্যের কাঠামোর পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও কোন কোন সাহিত্য আনন্দের বস্তু হিসাবে বিভিন্ন যুগে বিরাজ করে। 'কোন কোন সাহিত্য' বলা হল এ জন্য যে এককালে উচ্চমান সম্পন্ন বলে গৃহীত অনেক সাহিত্য পরবর্তীকালের সমালোচক বা পাঠকের কাছে তৃতীয় শ্রেণীর

বলে প্রতিভাত হয় এবং এরূপ সাহিত্যের অধিকাংশই ধীরে ধীরে সাহিত্য জগত থেকে বিদায় নেয় কিংবা কোন সাহিত্যিক যাদুঘরে আশ্রয় গ্রহণ করে।

৪. সর্বশেষে আমরা আর একটা ছোট প্রশ্নে এসে পড়ি—সাহিত্যের কি শ্রেণীভাগ করা চলে? সাহিত্যের তো শ্রেণীভাগ আছেই। ক্লাসিক্যাল আর আধুনিক সাহিত্যের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। যাকে বৈষ্ণব সাহিত্য বলা হয়—তাকেও আলাদা শ্রেণী হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে। 'মা' জাতীয় সাহিত্যকে কম্যুনিস্ট সাহিত্য বলতে আপত্তি কি? 'রামায়ণ' 'মহাভারত' থেকে শুরু করে বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' পর্যন্ত সাহিত্যকে হিন্দু-সাহিত্য বলতে বাধা কোথায়? কিংবা হাফিজ, রুমী, হালী, গালিব, ইকবাল এবং নজরুল ইসলামের যে সাহিত্য ইসলামী ভাবধারায় পুষ্ট তাকে ইসলামী-সাহিত্য বললে নাক সিটকাবার কি আছে? এভাবে 'জাতীয় সাহিত্য', 'বুর্জোয়া সাহিত্য' প্রভৃতি কথা তো সাহিত্যক্ষেত্রে বহুল প্রচলিত। নামকরণ বা শ্রেণীভাগ বিশিষ্ট গুণ প্রকাশের নিমিত্তই হয়ে থাকে। বিশিষ্ট গুণ কিংবা আদর্শ থাকলেই বিশিষ্ট নামকরণ হয় পরিচয়েরই সুবিধার্থে। কাজেই বিভিন্ন গুণসম্পন্ন সাহিত্য আছে এবং সর্বকালে তা থাকবে বলেই সাহিত্যে শ্রেণীভাগও যে থাকবে তাতে আশ্চর্যের কিছুই নেই।

২
সাহিত্য সৃষ্টি ও উদ্দেশ্য

আগের প্রবন্ধে সাহিত্যে আদর্শের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে আরও কয়েকটা দিকে আলোকপাত করার আবশ্যকতা রয়েছে বলে মনে হয়।

আমরা বলি, সাহিত্য হল সৃষ্টি, ঘটনার বিবরণ বা ফটোগ্রাফি নয়। এ কথার তাৎপর্য কি?

কোন কিছু সৃষ্টি করতে হলে আবশ্যক পরিকল্পনার—মননশীলতার। পরিকল্পনা ছাড়া অনুকরণ বা অনুসরণ চলতে পারে, কিন্তু সৃষ্টি চলে না। শুধু সাহিত্য নয়, যে কোন শিল্প সম্বন্ধেই এ কথা খাটে। জয়নুল আবেদিন যখন তাঁর বিশ্ববিখ্যাত দুর্ভিক্ষের ছবি এঁকেছিলেন, তাতে কি তাঁকে একটা পরিকল্পনা নিয়ে এগুতে হয়নি? আবদুর রহমান চুঘতাই যখন ছবি আঁকেন কিংবা নাভেরা আহমদ যখন তাঁর ভাস্কর মূর্তিকে অপূর্ব সৌন্দর্যে সজীব করে তোলেন তখন পূর্বাহ্নে কি একটা সুপরিচিত পরিকল্পনা তৈরি করেন না?

তাজমহলের কথাই ধরা যাক। এই বিশ্ব-বিস্ময় স্মৃতিসৌধটি স্থাপত্য শিল্পের অবিস্মরণীয় কীর্তি; আমরা কি কেউ কল্পনা করতে পারি এই মহান ও বিশাল শিল্প-সৃষ্টি কোনরূপ পূর্ব-পরিকল্পনা ছাড়াই হয়েছে? বিশ্বের যে কোন দেশের যে কোন শিল্প সম্বন্ধেই তো এ কথা প্রযোজ্য। যেখানে শিল্প সেখানে সৃষ্টি, আর যেখানে সৃষ্টি সেখানে রয়েছে কল্পনা কিংবা পরিকল্পনা অন্য কথায় মননশীলতা। ভাব বা প্রেরণা আপনা আপনি হয় কি না বলা না গেলেও সৃষ্টি যে কখনও আপনা আপনি হয় না এ কথা বলাই বাহুল্য। কল্পনা আর পরিকল্পনা তো শিল্পের অবিচ্ছেদ্য কায়ার রূপ দেয়। তার অভাবে ভাবের প্রাণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে কিরূপে? কিন্তু পরিকল্পনার জন্য চাই একটা উদ্দেশ্য (object বা goal)। সৃষ্টির দ্বারা কি দেখতে চাই, কি প্রকাশ করতে চাই আমরা? সমাজের বা সমাজ মনের কোন্ রূপটা তুলে ধরতে চাই—অথবা কোন মহত্তর দিকে সমাজ মনকে নিয়ে যেতে চাই কিংবা কোন্ সৌন্দর্যবোধের ও রুচিবোধের রূপ দিতে চাই—এ সবই হল সৃষ্টির উদ্দেশ্য।

জয়নুল আবেদিনের দুর্ভিক্ষের ছবিগুলির উদ্দেশ্য ছিল দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের একটা করুণতম অবস্থা সমাজের কাছে তুলে ধরে সমাজমনকে সেই দিকে সচেতন করে তোলা। তাজমহল সৃষ্টির পেছনেও ছিল এমন একটি অপূর্ব সুন্দর স্থাপত্যের সৃষ্টি-কল্পনা, যার মাধ্যমে শাহজাহানের মহান প্রেমকে চিরমহিমময় ও চির জাগরূক করে ধরে রাখা যায়। কালের স্রোতে নিজের কীর্তিকে তথা নিজকে অবিস্মরণীয় করে রাখার অভিপ্রায়ও যে এই সৃষ্টির মধ্যে ছিল না তা কি করে বলি?

শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' 'বলাকাসহ' বিভিন্ন কাব্য এবং ছোট গল্প বিশ্লেষণ করেও একই সিদ্ধান্তে আসা যায়। অধিকাংশ উপন্যাসে হিন্দু-নারী, বিশেষ করে অবহেলিত বিধবা নারীদের করুণ চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন শরৎচন্দ্র। এটা যে কোন পাঠকের কাছে স্পষ্ট যে শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে চেয়েছেন হিন্দু সমাজের একটা জঘন্যতর অবিচার ও অব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমাজমনকে সজাগ—এমন কি বিদ্রোহী করে তুলতে। অথচ হিন্দু সমাজের পটভূমিতে রচিত হলেও আমরা মুসলমানরাও তার রস গ্রহণে কোন মতে পরাঙ্মুখ বা অতৃপ্ত থাকি না। শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' কিংবা রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' গল্প দুটি বিশ্বসাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান পাবার যোগ্য। এ দুটি গল্পও তাঁরা কি উদ্দেশ্যহীনভাবে লিখেছেন? গফুরের মাধ্যমে পশু জীবনের প্রতি মানুষের অকৃত্রিম দরদ, আর কৃষক জীবনের সরল সহজ জীবনপদ্ধতিকে সুন্দরভাবে তুলে ধরতে চেয়েছেন শরৎচন্দ্র। কাবুলিওয়ালাতেও একজন বিদেশীর অকৃত্রিম ও স্বার্থশূন্য স্নেহধারাকে সকলের কাছে তুলে ধরে মানবতার একটা মহত্তর দিক ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

'গীতাঞ্জলি'র কথা পূর্বেই আলোচনা করেছি। স্রষ্টার মহিমা প্রচারই এই গ্রন্থের প্রধান ও মহৎ উদ্দেশ্য। 'গীতাঞ্জলি' নামের মধ্যেই রয়েছে এই উদ্দেশ্যের ইংগিত। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যাবে, নিছক প্রেমের গল্পেও রয়েছে একটা না একটা উদ্দেশ্য—যত প্রচ্ছন্নভাবেই হোক না কেন। নর-নারীর চিরন্তন মিলনে সমাজের যে বাধা তারই বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি হল কোন কোন গল্পের উদ্দেশ্য—আবার নায়ক-নায়িকার মাধ্যমেই সমাজের কোন অবিচার বা কুসংস্কারের বিশ্লেষণই কোন কোন গল্পের শিল্প-ময় প্রয়াস।

শিল্প সৃষ্টির এই উদ্দেশ্য নানা রকমের হতে পারে। ব্যক্তিগত জীবন ও সমাজ জীবনকে কুসংস্কারমুক্তকরণ, সমাজকে উন্নত ও মহত্তর দিকে গতিশীল করার ইংগিত ও প্রেরণা দান, শিল্পীর প্রতিষ্ঠালাভ ও অবিস্মরণীয় হবার আকাঙ্ক্ষা, প্রেমাস্পদ বা আপনজনের তুষ্টি সাধন বা দৃষ্টি আকর্ষণ—এমন কি নিছক সৌন্দর্য বা রস সৃষ্টি করে নিজেকে এবং অপরকে তৃপ্ত করাও শিল্প-সৃষ্টির উদ্দেশ্য হতে পারে।

তবে মনে রাখতে হবে শিল্প সৃষ্টিতে উদ্দেশ্যকে রস পরিবেশনের মাধ্যমে যত প্রচ্ছন্ন রাখা যায় ততই উদ্দেশ্য সফলের সহায়ক হয় বেশী। ফুলের জীবনের উদ্দেশ্য হয়ত বীজ ধারণ ও গাছের বংশরক্ষার জন্য ভবিষ্যত বংশ বৃদ্ধি। কিন্তু ফুল যখন ফোটে তখন এর সৌন্দর্য ও সুগন্ধই বড় হয়ে দেখা দেয় ভ্রমরের কাছে, মানুষের কাছে। সৌন্দর্য ও রসের আকর্ষণে মানুষ করে তার যত্ন, ভ্রমর ঘটায় তার পুংকেশর ও গর্ভকেশরের মধুর মিলন। ফলে হয় তার উদ্দেশ্য সাধন—বংশবৃদ্ধি ও বংশরক্ষা। শিল্পও হওয়া উচিত অনুরূপ—উদ্দেশ্য তার থাকবেই; উদ্দেশ্যবিহীন বিশৃঙ্খল কিছু সৃষ্টি শিল্পের লক্ষ্য হতে পারে না কখনো। কিন্তু সে উদ্দেশ্য—আদর্শই হোক বা স্বীয় প্রতিষ্ঠাই হোক—তা থাকবে সৌন্দর্য ও রসের কোরকে লুক্কায়িত। পাঠক বা দর্শক সৌন্দর্য ও রস উপভোগ করার উদ্দেশ্যে সে সৃষ্টিকে বরণ করবে, চর্চা করবে; আর সেই প্রয়াসের মাধ্যমেই শিল্পীর গোপন উদ্দেশ্য পাঠক বা দর্শকগোষ্ঠীর মনে দানা বাঁধবে, রূপ নেবে এবং অনেকটা অলক্ষ্যে সমাজ জীবনে তা দেখা দেবে—হয়ত বিবর্তনের ধারায় কিংবা বিপ্লবের আকারে। শিল্পের উদ্দেশ্য তাই প্রচারধর্মী হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়—যদিও 'মা' ও 'আনন্দমঠের' মত সাহিত্য বেশ প্রচারধর্মী হয়েও সাহিত্য সৃষ্টিরূপে উৎরে গেছে। সাহিত্যের উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন থাকবে এ কথা আরও একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যায়। এ উদ্দেশ্য যেন মহাসাগরের প্রশান্ত জলরাশির নিম্নতম প্রদেশে উষ্ণ জলধারা। উপর থেকে এই স্রোতকে প্রত্যক্ষ করবার উপায় নেই। অথচ এই স্রোতের বিরাম নেই—বিশ্রাম নেই, স্বকীয় উদ্দেশ্য পরিপূরণে এগিয়ে চলছে সতত।

কিন্তু এ কথাও এখানে বলা দরকার যে, প্রবন্ধ-সাহিত্য বলে আমরা যা বুঝি, তাতে উদ্দেশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন থাকে না। একটা উদ্দেশ্যই রসময় প্রকাশভঙ্গীর দ্বারা সহজগ্রাহ্য ও প্রিয় হয়ে ওঠে।

সাহিত্য ফটোগ্রাফি নয়—ইহা সমাজের চিত্র, এ কথাটি বিশ্লেষণ করা যাক এখন।

সাহিত্য ফটোগ্রাফি নয়, একথা অতীব সত্য। সমাজের ঘটনাবলীর হুবহু নকল নয় সাহিত্য, তাই এটা ইতিহাস বা সমাজের বিবরণও নয়—সাহিত্য সৃষ্টি। এই সৃষ্টির উপকরণ অবশ্য সমাজ ও সমাজমন।

চিত্র বলতে নানাজনে অর্থ করেন নানারূপ। কেউ মনে করেন সমাজের ঘাত-প্রতিঘাতের বিবরণের উপর রসের পোঁচ লাগালেই তা হয়ে ওঠে সাহিত্য। আবার কেউ মনে করেন চিত্র মানে সমাজের দর্পণ (mirror)। কিন্তু দর্পণ বলতে কি বুঝি আমরা? দর্পণে যে ছবি আমরা পাই তা হল—প্রতিরূপ বা প্রতিবিম্ব। মূল বস্তুর অনেকটা হুবহু রূপ প্রকাশ পায় এই প্রতিবিম্বে। প্রতিবিম্বে হয়ত মূল বস্তুর ডান—বাম উল্টা হতে পারে কিম্বা মূল বস্তুর আকার হতে তা ছোট বা বড় হতে পারে। কিন্তু মননশীলতার বা সৃষ্টির কি কাজ আছে এতে? আর যেহেতু সাহিত্য শিল্পীর সৃষ্টি, তাই সাহিত্য সমাজের দর্পণ নয় নিশ্চয়ই। সমাজই সাহিত্যের উপাদান-উপকরণ হলেও সাহিত্য তাই প্রতিবিম্ব বা প্রতিরূপ নয়, পরিকল্পিত এবং সৃজিত রূপ। আসলে ফটোগ্রাফি আর প্রতিবিম্বের পার্থক্য মৌলিক গঠনে নয়, প্রকাশের বৈচিত্র্যে। ফটোগ্রাফিতে যে ছবি আমরা পাই তাকে রাসায়নিক পদার্থের মাধ্যমে আমরা ধরে রাখতে পারি কাগজে, কিন্তু প্রতিবিম্বকে আমরা ধরে রাখতে পারি না, তাকে বড় জোর পর্দায় ফেলে দৃশ্যমান করতে পারি। তাই সাহিত্য-বিচারে ফটোগ্রাফি আর প্রতিবিম্বের উদাহরণে মূলত প্রভেদ নেই।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, সাহিত্য মানে সৃষ্টি, সৃষ্টি হতে পারে না কল্পনা বা পরিকল্পনা ব্যতীত। পরিকল্পনা আবার উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতেই সম্ভব। তাই সাহিত্যের উদ্দেশ্য থাকবেই। কিন্তু এই উদ্দেশ্য থাকবে যতদূর সম্ভব প্রচ্ছন্ন—রস ও রূপের মোহনীয় আবরণের অন্তরালে, প্রচার হিসাবে নয়—যদিও প্রচারধর্মী বহু পুস্তক-পুস্তিকা সুসাহিত্য হিসাবে বিভিন্ন যুগে স্থান করে নিয়েছে। আত্মপ্রকাশ বা আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদেও সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে,—রস এবং সৌন্দর্য সৃষ্টিও হতে পারে সাহিত্যের উদ্দেশ্য। সাহিত্য ফটোগ্রাফি নয়, প্রতিবিম্বও নয়। ইহা সমাজের ও সমাজমনের বিবিধ উপকরণে গঠিত মনোমুগ্ধকর সৃষ্টি, রসঘন রূপায়ণ।

কিন্তু প্রবন্ধ সাহিত্যে উদ্দেশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন থাকে না ; রসঘন প্রকাশভঙ্গীর মাধ্যমে উহা সহজবোধ্য ও প্রিয় হয়ে উঠে। প্রচ্ছন্ন হোক আর অপ্রচ্ছন্ন হোক একটা আদর্শ বা উদ্দেশ্যকে রূপায়িত করেন সাহিত্যিক।

আর এই উদ্দেশ্যের বৈচিত্র্যের জন্যই সাহিত্যে শ্রেণীবিভাগ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে এবং হচ্ছেও তাই। বলা বাহুল্য, কবি বা সাহিত্যিক মনের যে পটভূমিতে এই উদ্দেশ্যের বীজ উদ্‌গত হয়, তা সন্দেহাতীত রূপে আদর্শের। মজার কথা এই যে, কোন কোন ক্ষেত্রে এই আদর্শ লেখক তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এমন কি অজ্ঞান্তেই গ্রহণ না করে পারেন না। অজ্ঞান্তে এজন্যে যে, লেখকের ঐচ্ছিক প্রবণতার অন্তরালে প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রভাবে তাঁর অবচেতন মনের কোণে সেই আদর্শের পটভূমি তৈরী হয়ে যায় আপনা-আপনি।

সমাজ ও নারী

·

উপসূচী

১. নারী প্রগতি ও নারীর মর্যাদা ২৩১

১
নারী প্রগতি ও নারীর মর্যাদা

নারী-পুরুষ মিলিতভাবে একজন আর একজনের সংগী ও আপন হিসাবে জীবন-তরণী চালনা করে আসছে—সৃষ্টির প্রথম থেকেই। অথচ এই দুয়ের সম্পর্ক সম্বন্ধে এই বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত মতভেদ ও অনিশ্চয়তার অন্ত নেই। সামাজিকভাবে নারী-পুরুষ কিভাবে অগ্রসর হলে মানব-জাতির শান্তিময় প্রগতি সম্ভব ও সহজ হয়, তার সুষ্ঠু ধারণা এখনও যেন আমাদের বোধের বাইরে।

এই সুষ্ঠু বোধের অভাবে একদিকে স্বাধীনতার নামে নারীকে করা হচ্ছে প্রদর্শনীর বস্তু, অন্যদিকে সতীত্ব রক্ষার নামে করা হয়েছে তাকে পংগু ও অবরুদ্ধ। আমাদের প্রাচ্য দেশগুলির কথা বলতে গেলে অনেকখানে নারীকে আমরা অনেক ক্ষেত্রে অন্ধ করে রেখে দিয়েছি—না দিয়েছি শিক্ষা, না দিয়েছি প্রয়োজনীয় পরিমাণ স্বাধীনতা। কোনও কোনও ক্ষেত্রে নারীকে করা হয়েছে নিকৃষ্ট জীব—পদসেবিকা, তার উপর আর কিছু নয়। আধুনিক কালেও আমরা তাই দেখছি—নারীকে যথোচিত মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না, বড় বড় কথা বলে তথাকথিত প্রগতির নামে তাদের ভোগের বা খেলার সামগ্রী হিসেবে পাবার পথ পরিষ্কার করা হয়েছে। এতদিন ঘরের ভিতর বেঁধে রেখে নারীকে অন্ধ করা হয়েছে, এখন তথাকথিত প্রগতির চোখ-ঝলসানো তীব্র আলোকে তার চোখকে আরও বেশী করে অন্ধকার করে দেওয়া হচ্ছে।

নারী-পুরুষ সম্পর্ক

জগতে শুধু নারী বা নর দ্বারা জীবনধারণ ও সুখ-শান্তি লাভ অসম্ভব। দু'য়ের জীবন এমন মধুর ও পবিত্র সম্পর্কে ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, একজনের প্রতি আর একজনের বিদ্রোহ মানবজাতির অমঙ্গল ডেকে আনবে। নারী পুরুষের সুসম্পর্ক আজও সঠিকভাবে সমাজে স্থিরীকৃত হয়নি সত্য এবং এজন্যে সমাজে অবিচার ও অত্যাচারেরও সীমা নেই—তাই বলে একে শ্রেণী-সংগ্রাম হিসেবে ভাবলে ভুল করা হবে। আমাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর

অনুসারী হওয়া উচিত। জীববিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের রায় হল—নারী-পুরুষ দুটি আলাদা বিবদমান শ্রেণী নয়—যদিও অবিচার অত্যাচার সমাজে বর্তমান রয়েছে এবং পরিবারে অনেক সময় অশান্তি দেখা যায়। যে সমাজেই হোক, মা-ছেলে, পিতা-কন্যা, ভাই-বোন ও স্ত্রী-স্বামীর সম্পর্কে বিবদমান শ্রেণীরূপ দেওয়া এবং তাকে সেভাবে দেখা মানবজাতির জন্য কলঙ্কজনক বৈ কি!

অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য নিশ্চয়ই আছে। শারীরবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে দু'য়ের পার্থক্য অত্যন্ত প্রকট। প্রকট হলেও নারী-পুরুষের মধ্যে এই ভিন্নতা দুইয়ের পরিপূরক বিশেষ। একজনের অভাব ও দরকার—অন্যজনের তা আছে এবং দু'য়ের মিলনে ও সহজীবন ধারণে এই ভিন্নতা তাই অপার আনন্দ ও সুখ বহন করে আনে। এই জন্যেই নারী-পুরুষের সম্পর্কের বড় কথা হল—একজনের আর একজনের উপর পরস্পরনির্ভরশীলতা। এই নির্ভরশীলতা অসহায় দুর্বলের নির্ভরশীলতা নয়; এর মূলে হল নিজের অভাব অন্যের দ্বারা পূরণ করে নেওয়ার স্পৃহা। এই নির্ভরশীলতা ছাড়া সমাজ গড়ে উঠতে পারে না। সম্পর্কহীন হলে নারী-পুরুষের সৃষ্টিটরই কোনো অর্থ হয় না। মনে রাখতে হবে, একজন আর একজনের উপর অংশত হলেও নির্ভরশীল বলেই পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। এই নির্ভরশীলতা না হলে প্রেম, প্রীতি—মহত্ত্ব, আত্মত্যাগ, সবই অর্থহীন হয়ে পড়ে। কারণ পরস্পরনির্ভরশীলতা ছাড়া এই সমস্ত মানবীয় গুণের কোনটারই বিকাশের সুযোগ থাকে না।

শ্রমবিভাগ

সম্পূর্ণ স্বাধীন বা সম্পূর্ণ অন্য-নিরপেক্ষ মানুষ কল্পনার বস্তু, বাস্তব হল পরস্পরনির্ভরশীল মানুষ। এই নির্ভরশীলতা জন্ম দেয় সহযোগিতার, সহযোগিতাই জন্ম দেয় পরিবারের, সমাজের ও রাষ্ট্রের। এই নির্ভরশীলতা শুধু নারী-পুরুষ সম্পর্কের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়—নারী-নারী বা পুরুষ—পুরুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যদিও নারী—পুরুষের নির্ভরশীলতার মত তত প্রবল নয়। অর্থনীতিতে শ্রমবিভাগ বা Division of labour বলে যে একটা কথা প্রচলিত আছে, তাও এই নির্ভরশীলতার জন্যে। কারখানার ম্যানেজার, কেরানী, শ্রমিক প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের লোক না হলে

উৎপাদন অসম্ভব। এই যে পরস্পরনির্ভরশীলতা এবং বিভিন্ন Rank—এর সৃষ্টি, এটাই ত মানব-জীবনকে সম্পূর্ণ করে তোলে। একই শ্রমিককে সব রকমের কাজ জানতে হবে বা করতে হবে—একথা বলা যেমন হাস্যকর, ঠিক তেমনি নারী-পুরুষকে একই রকমের কাজ করতে বলাও অনুরূপ ত্রুটিপূর্ণ।

কার্যক্ষমতা, মানসিক প্রবণতা এবং দৈহিক উপযুক্ততার উপর নির্ভর করে যেমন শ্রমিক বা অন্য যে কোন লোকের কাজ (Profession) নির্ধারিত হয়, ঠিক তেমনি নারী-পুরুষের মধ্যে শ্রমবিভাগ (Division of labour) হওয়া উচিত। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে—নারীর কোন কাজ পুরুষ করতে পারবে না বা পুরুষের কোন কাজ নারী করতে পারবে না। সন্তান ধারণ বা এ ধরনের কোন কোন কাজ একজনের বদলে আর এক জনের দ্বারা হবে না সত্য, কিন্তু এমন অনেক কাজ রয়েছে যা নারী-পুরুষ উভয়েই করতে পারে।

উভয়ে করতে পারলেও সব সময় তা করা উচিত নয়, সহজও নয়। একজন শ্রমিক কয়েকটি কাজ করতে সমর্থ হলেও একই সময়ে যেমন তাকে সব কাজ করতে বলা অন্যায়— নারী-পুরুষের বেলায়ও তা খাটে। বরং দৈহিক বা মানসিক বিভিন্নতার জন্য নারী-পুরুষের শ্রম বিভাজন অনেকটা স্বাভাবিক ব্যাপার।

ভুল ধারণা

দৈহিক শক্তি পুরুষের বেশী, এটা বাস্তব সত্য। কিন্তু দৈহিক শক্তি বেশী থাকলেই কেউ শ্রেষ্ঠ একথা বলা চলে না। দৈহিক শক্তিতে অনেক পশুও মানুষ অপেক্ষা বড় শক্তিমান। পুরুষ দৈহিক শক্তিতে শ্রেষ্ঠ হলেও নারী তার হৃদয় শক্তিতে সৌন্দর্য ও কমনীয়তায় শ্রেষ্ঠতর প্রমাণিত হবার যোগ্য। আসল কথা, দু'য়ের মধ্যে এমনি করেই ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছে। তাই নারী-পুরুষ কারও চাইতে কেউ খাট নয়, উভয়েই সমান মর্যাদার অধিকারী। যদিও প্রাকৃতিক কারণে স্বভাবত পরিবারের প্রধান পুরুষ পরিবারের নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। আমাদের সমাজে কয়েকটি মারাত্মক ভুল ধারণা বর্তমান রয়েছে, যার ফলে নারী-পুরুষ সম্পর্ক দারুণ তিক্ত হ'য়ে উঠছে। নারী যদি সন্তানাদি পালন করে, রান্নাবান্না করে, গৃহ রক্ষণাবেক্ষণ করে আর পুরুষ যদি চাকুরি ইত্যাদি করে তখন মনে করা

হয় নারী কোন কাজের নয়, পুরুষই সব কৃতিত্বের মূলে। আসলে তা নয়। অর্থ সংগ্রহ যেমন অপরিহার্য, তেমনি সন্তান ধারণ, পালন, রন্ধন, ঘর বাড়ী রক্ষণাবেক্ষণও অপরিহার্য ; এ শুধু শ্রম বিভাজন। অর্থ সংগ্রহ সুখের বা শান্তির উপায় মাত্র, অর্থ উদ্দেশ্য নয়, শান্তি বা সুখই উদ্দেশ্য। নারীর কার্য দ্বারাই সে সুখ বা শান্তি বাস্তবায়িত হয়ে ওঠে। অবশ্য যদি কোন পরিবারের অর্থ উপার্জনক্ষম পুরুষ না থাকে কিংবা পুরুষের উপার্জন পর্যাপ্ত না হয় তাহলে নারীকেও অর্থ উপার্জন করতে হবে সন্দেহ নেই। সব ব্যাপারে বড় কথা হল সমন্বয় সাধন (Adjustment)। দৈহিক বিভিন্নতা এবং মনের বিভিন্নতার দিকে নজর রেখে এইরূপভাবে শ্রমবিভাগ করা উচিত যাতে পরিবারের অর্থনৈতিক কাঠামো অটুট থাকে অথচ সুখ শান্তি ও ভালবাসা পরিবার থেকে নির্বাসিত না হয়।

অর্থ উপার্জনকে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য মনে করি বলেই সুখ ও শান্তি আজ আমাদের পরিবার ও সমাজ থেকে সত্যই নির্বাসিত হতে চলেছে।

আজ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী বদলানোর। দৈহিক ও মানসিক পার্থক্যের জন্য যে শ্রমবিভাগ নর-নারীর মধ্যে এতদিন চলে এসেছে তাকে বর্তমানে অস্বীকার করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। পশ্চিমের কতকগুলি রীতি-নীতির সংগে পরিচয়ের ফলেই আধুনিক শিক্ষিত সমাজে দিন দিন এই প্রবণতা প্রবলতর রূপ ধারণ করছে। পুরুষ ভাবছে মেয়েদের দিয়ে আমরা নিকৃষ্ট কাজ করাচ্ছি, আর শিক্ষিতা নারীও ভাবছে পুরুষ নারীকে দিয়ে ঘৃণ্য দাসীবৃত্তি করাচ্ছে। ফলে নারী এতদিন ভালবেসেই স্বামী, পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজনের জন্য কাজ করে যে আনন্দ পেত, আজ তার প্রতি এসেছে তার অশ্রদ্ধা। পরিণামে অশান্তি, উচ্ছৃংখলতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। অথচ ভেবে দেখবার বিষয়, আমাদের সমাজের অশিক্ষিত স্তরটাতে এই শ্রমবিভাগ রয়েছে, কিন্তু তার জন্য নারীর মনে কোন হেয়তাবোধ বা দাস্যমনোবৃত্তি নেই। পুরুষ এজন্য নারীকে ছোট মনে করে না। শিক্ষার অভাবে নারীর উপর বলিষ্ঠ পুরুষ প্রায়ই অত্যাচার করে থাকে, একথা সত্য। কিন্তু নারী পুরুষের বাঁদী নয় ; সে যৌন জীবনে, সংসার পরিচালনায় পুরুষের সংগে সমদায়িত্বে সংসার পরিচালনা করে থাকে। ইসলাম শ্রমের মর্যাদাকে সকলের উপর স্থান দিয়েছে—বাইরে পরের অধীনে কাজ বা

চাকরি করা যদি আত্মমর্যাদার হানিকর না হয়, তবে নিজের স্বামী, পুত্রকন্যাকে ভালবেসে তাদের জন্য কাজ করাকে হীনতা বলে কি করে মনে করা যেতে পারে, তা বোঝা যায় না। অপরাধ এই স্বাভাবিক শ্রমবিভাগের নয়—আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর। নারী-পুরুষের বর্তমান শ্রমবিভাগের মূল-নীতিটুকু বজায় রেখে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের জন্য সচেষ্ট হওয়া দরকার। দৃষ্টিভঙ্গীর এই পরিবর্তন আসলে এই শ্রমবিভাগের মধ্যেই আমাদের বহু কাম্য শান্তি ও সুখের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে।

আজকাল কোন কোন শিক্ষিতা নারী স্বাধীনতাকে বুঝেন নিজের পায়ে দাঁড়ানোকে। স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যাবস্থায় জীবন-টাকে অনেকেই রঙীন চশমার ভিতর দিয়ে দেখে থাকেন, বাস্তব জীবনের সঙ্গে এর সম্পর্ক খুব কম। তার প্রমাণ—ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা জীবন পার হয়ে যখন বের হয়ে আসেন, এমন কি কেউ কেউ চাকুরিও গ্রহণ করে থাকেন[১] তখন তারা বুঝতে পারেন—সমাজে থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও অন্য-নিরপেক্ষ হয়ে চলা সম্ভব নয় স্বাধীনতা মানেই পুরুষকে (নারীকেও) অস্বীকার করা নয়—বরং নারী-পুরুষের পারস্পরিক শক্তির অধিকার ও ক্ষমতার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে পরস্পরকে স্বীকার করে নেয়ার মধ্যেই সত্যিকারের স্বাধীনতা রয়েছে। এই স্বাধীনতার মধ্যেই নারী পুরুষ উভয়ের মুক্তি। এই সত্যকে অস্বীকার করলে নর-নারী উভয়ের জীবনে অভিশাপই ডেকে আনা হয়। যে নারীরা স্বাধীনতা বলতে পুরুষ-নিরপেক্ষ চলাফেরা ও কাজকর্মের অধিকার বুঝেন, তাঁরা ভ্রান্ত সংস্কার নিয়ে কর্মক্ষেত্রে নামেন। তাঁদের বুঝতে বিলম্ব হয় না নিজেদের কী সর্বনাশ তাঁরা করেছেন এবং সমাজকে কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন। এক নিদারুণ বিভীষিকার মধ্যে তাঁদের সমস্ত রঙীন কল্পনা তখন হারিয়ে যায়। এমনও দেখা গিয়েছে, চল্লিশ পার হয়ে এই সব মহিলা বিয়ে করবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছেন। কাজেই নারী স্বাধীনতা-সম্বন্ধে এই সংস্কার দূর না করলে নারী-পুরুষ উভয়ের পক্ষেই অমঙ্গল। পুরুষের

১. বলা বাহুল্য চাকুরি প্রাপ্তিও সহজ ব্যাপার নয়। ঢাকায় ১৯৬০ সনে কিণ্ডারগার্টেন স্কুলের জন্য ম্যাট্রিকুলেশন পাস শিক্ষয়িত্রীর বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হলে তাহাতে বহু-সংখ্যক এম. এ. বি. এ. পাস করা মহিলা প্রার্থী হন ও তার মধ্যে ২/১ জন ব্যতীত বাকী সকলে বিফল হন।

বেলায়ও এ কথা প্রযোজ্য। পুরুষের কেউ কেউ নারী-সঙ্গহীনভাবে (নারীকে মর্যাদা না দিয়ে) জীবন কাটাবার হাস্যকর প্রচেষ্টা করেন। নারী-সঙ্গহীন জীবন যে কত অসহায়, এরা যখন মর্মে মর্মে তা টের পান, তখন হয়ত আর সংশোধনেরও সময় থাকে না।

পরিবার

পরিবার সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা দরকার। সৃষ্টিজগতে দেখা যায়—সূর্য, পৃথিবী, চন্দ্র থেকে শুরু করে অণু-পরমাণু, ইলেকট্রন, প্রোটন পর্যন্ত সবকিছুই দলবদ্ধ বা পরিবারভুক্ত হয়ে বিরাজ করছে। চতুর্দিকে গ্রহ-উপগ্রহ নিয়ে সৌরজগতের অবস্থান। একই বা বিভিন্ন প্রকারের পরমাণুর সম্মিলনে অণুর সৃষ্টি, আবার ইলেকট্রন, প্রোটন প্রভৃতি নিয়ে পরমাণুর অবস্থিতি। এই সবই পরিবারভুক্তির প্রমাণ বহন করে। সৃষ্টির সর্বস্তরেই এর অকাট্য প্রমাণ রয়েছে।

এই বস্তুবাদী দৃষ্টিভংগী আমাদিগকে শিক্ষা দেয় পরিবার আমাদের ভারসাম্য রক্ষাকারী একটা ব্যবস্থা। প্রেম, যৌন মিলন, সন্তান লাভ, সন্তানের প্রতি 'অহেতুক' আকর্ষণ প্রভৃতি পরিবার সৃষ্টি ও রক্ষণের পরিপোষক। পরিবার বড় হলে আকর্ষণ শক্তি হ্রাসের দরুন একটি পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে কয়েকটি পরিবারে পরিণত হতে পারে সন্দেহ নেই—কিন্তু তাই বলে পরিবারকে পরিত্যাগ করা যাবে না। মানব জাতির শান্তি, সহযোগিতা ও প্রগতিই যদি আমাদের কাম্য হয়—এই পরিবার পদ্ধতিটিকে অবহেলা করলে প্রতিক্রিয়াকেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে। এককক বাদ দিয়ে যারা বৃহত্তর সমাজের কল্পনা করেন, তারা আর যাই করুন, বাস্তব চিন্তা করেন না। কম্যুনিজমের প্রবর্তক মনীষী কার্ল মার্ক্স ও এঙ্গেলস পরিবারকে শোষণের ব্যবস্থা হিসেবে চিত্রিত করলেও পরিবার যে মানবীয় সুখ-শান্তির প্রকৃষ্টতম পন্থা, তা খাস রাশিয়ার প্রচলিত পারিবারিক ব্যবস্থাতেই প্রমাণিত হচ্ছে।

বর্তমানে আমাদের সমাজে যে গৃহকেন্দ্রিক বা পরিবারকেন্দ্রিক ব্যবস্থা রয়েছে তাতে অনেকে মনে করেন নারীর কোন মর্য্যাদা নেই। কিন্তু আমার মতে, এই ব্যবস্থায় নারীর মর্যাদার অধিকতর সম্ভাবনা রয়েছে—যদিও ঐ ব্যবস্থার অনেক সংস্কারের প্রয়োজন। এই ব্যবস্থায় নারী যে কাজ করে,

তা যেমন মর্যাদাকর তেমনি আনন্দদায়কও। নারী কাজ করে আপন জনের জন্যে, তাদের সুখ-শান্তির জন্যে। প্রাণপ্রিয় সন্তানের, স্বামীর বা পিতার জন্যে কাজ করে আনন্দ পায় না, এমন নারী বিরল। একে কেউ অমর্যাদাকর ভাববে, এমন বিকৃতমনা লোক অতি অল্পই আছে। অবশ্য প্রত্যেক কাজের একটি সীমা আছে। অতিরিক্ত খাটুনী প্রিয়জনের জন্যে হলেও বিরক্তি উদ্রেক করে বৈ কি।

কিন্তু পুরুষের বেলায় (বিশেষ করে শিক্ষিত) একথা খাটে না। পুরুষ আপন জনের জন্যে কাজ করে বটে, কিন্তু তার কাজ বাইরে, আপন জনের মধ্যে এর কাজ সীমাবদ্ধ নয়। তাকে চাকুরি করতে বা অন্য কাজ করতে হয় অপরের—সে সরকারী অফিসে হোক বা অন্যত্র হোক। চাকুরী ত নয়, অনেক সময় এ দাসত্ব। এক হিসেবে পরের অধীনে কাজ করার মত অমর্যাদাকর ও দুঃখজনক ব্যাপার অনেক মর্যাদাসম্পন্ন লোকের কাছে খুব কমই আছে। তবুও কর্তব্যকর্ম করতে হয়। এর বদলে অর্থ হয়ত উপার্জিত হয়, কিন্তু তার বদলে অনেক সময় বিবেক, স্বাস্থ্য, স্বাধীন মত, স্বাধীনভাবে চলাচল সব কিছু বিসর্জন দিতে হয়। আমাদের সমাজে নারীরা হয়ত অধীন। কিন্তু সে আপন জনের- পিতা কিংবা স্বামীর। সুসম্পর্কিত হলে তা হবে অত্যন্ত মধুর। কিন্তু পুরুষ অধীন হয়, আপন জনের নয়—পরের ; উপরস্থ কর্মচারীর বা অন্যের আদেশের বিরুদ্ধে কাজ করা তাদের সাধ্যাতীত। সময়ের নিয়মেও তারা বাঁধা। স্বাধীনতা এখানে সীমাবদ্ধ, কাজের কিংবা নির্দিষ্ট সময়ের এদিক-ওদিক করা তাদের আয়ত্তের বাইরে।

সুতরাং বলা যেতে পারে এদেশী সমাজে নারীই অধিকতর মর্যাদার আসনে আসীন—পুরুষ নয়। পুরুষ এক হিসেবে অত্যন্ত হতভাগ্য। অর্থের জন্য তাকে অধিকাংশ সময় পরের অধীনে খাটতে হয়—নিজের সত্তা ও মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করেও।

নারীর চাকুরি করা বা মজুরী করা অসম্ভব বা অন্যায় একথা আমি বলছি না। আমার বক্তব্য হল—চাকুরি ও মজুরী দরকার হলে নারী করবে, কিন্তু এটা গৃহকর্তব্যের চাইতে মর্যাদাকর ও আনন্দদায়ক এ-কথা মানতে আমি রাযী নই।

নারী স্বভাবতঃ শান্তিপ্রিয় ও গৃহপ্রিয় এটা সর্বজনস্বীকৃত। এই জন্যই উচ্চ-শিক্ষিতা অবিবাহিতা চাকুরে মহিলাকে কয়েক বছর পর বলতে শোনা যায়—

চাকুরি তাঁদের আর ধাতে সয় না, পরের চাকুরি করতে করতে তাঁরা হাঁফিয়ে উঠেছেন, শান্তি কোথাও পাচ্ছেন না। অর্থ উপার্জনের এই দাসত্বটা আর কারও ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে মুক্তি নিতে পারলে তাঁরা বেঁচে যেতেন।'

একথা সকলের জন্য প্রযোজ্য নাও হতে পারে। তবুও একথার মধ্যে যথেষ্ট সত্য রয়েছে। এমনও দেখা গেছে—স্ত্রী প্রধান-শিক্ষয়িত্রীর কাজ করছেন, স্বামী বিলাতে ; বিলাত থেকে ফেরার পর মহিলা চাকুরি ছেড়ে সন্তান পালন, গৃহকার্য ও স্বামীর বিভিন্ন কার্যে সাহায্য করছেন।

তাঁর মতে টাকার যতদিন দরকার ছিল, ততদিন তিনি চাকুরি করেছেন ; এখন টাকার দরকার নেই, কারণ স্বামী যা' টাকা পান, তা একটি পরিবারের জন্যে যথেষ্ট। টাকা শান্তি ও সুখের জন্যে। অতিরিক্ত টাকার জন্য দু-জনের দুই দূরস্থানে যেয়ে চাকুরি করা—৩/৪টি সন্তানের ভবিষ্যতকে অপরের হাতে ছেড়ে দেওয়া কোন মতেই তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করেন না।

সস্তা শ্লোগানে প্রভাবিত না হয়ে এই সব অভিজ্ঞতাকে কাজে না লাগালে সত্যই ভুল করা হবে। ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই থাকবে। সব ক্ষেত্রে চাকরি ছাড়াও দরকার হবে না ; কিন্তু তবু মানুষের সুখ-শান্তিকে যেন আমরা ছোট করে না দেখি। কারণ সুখ-শান্তির জন্যেই চাকরি।

প্রদর্শনী বাতিক

আমাদের আধুনিক নারীর এক অংশের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ ঘন ঘন শোনা যাচ্ছে। পশ্চিমের কুপ্রভাবে পড়ে আমাদের কোন কোন বোন তাঁদের চালচলনে, সাজসজ্জায়, রাস্তাঘাটে পুরুষদের আকর্ষণের একটা অশোভন মনোবৃত্তি দেখান। অশোভন বললাম এই জন্য যে, নিজেকে প্রদর্শনীর উপ-করণ হিসেবে যারা ব্যবহার করেন, তাঁরা যথার্থ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হতে পারেন না। মানুষের বিশেষ করে নারীর মর্যাদার মূল্য অনেকখানি। যদি কোনো নারী মর্যাদা হারিয়ে ফেলেন তখন তাঁর বাকী রইল কি ?

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ও অন্যত্র এমন কোন কোন ছাত্রীকে দেখা যায়—যারা ঘন লাল লিপস্টিক দিয়ে, পাউডারে মুখ ভর্তি করে, শাড়ী ও ব্লাউজ পরা সত্ত্বেও শরীরের অংশবিশেষ অনাবৃত রেখে হাস্য-লাস্য অবস্থায় হেলে দুলে—ছেলেদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন। পুরুষেরা যেখানে দীর্ঘ জামা পরে শরীরকে আবৃত করে সুশোভিত করে চলে, সেখানে কোন কোন

নারী খাটো ব্লাউজ পরে বিশ্রীভাবে পেট কিংবা শরীরের উপরের অংশ দেখিয়ে রাস্তায়-ঘাটে-বাজারে চলতে দ্বিধা বোধ করেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সংগে কিংবা যে কোন মর্যাদাবান পুরুষের সংগে আলোচনা করে বুঝতে পারা যায়—এই সব মেয়েদের এরা পছন্দ করেন না। এদের তাঁরা সম্মান বা মর্যাদা দিতে রাজী নন। বিশিষ্ট শ্রেণীর ছেলেরা এদের সংগে ঘন ঘন মিলতে মিশতে বা আলাপ করতে যে চায় তা সত্য—কিন্তু তা মর্যাদা দিয়ে নয়, তথাকথিত নাগরালি (ফ্ল্যার্ট) করার জন্যে। পুরুষ সমাজের বেশীর ভাগই এই সব মেয়েদের দেখে ভোগের বস্তু হিসেবে—ভালবাসার বা সম্মানের পাত্রী হিসেবে নয়। প্রদর্শনীর বস্তু করে নিজেদেরকে পুরুষদের কাছে খেলো করে তোলার অধিকার কোনো নারীরই থাকা উচিত নয়। পুরুষের মনোবৃত্তি না জানলে চলবে না। নারীর প্রতি তাদের আকর্ষণ স্বাভাবিক। এই আকর্ষণ মর্যাদা বা প্রেমে উন্নীত কিংবা ছিনালীপনায় পর্যবসিত হতে পারে। নারীর চালচলন কথাবার্তায় এটা নির্ধারিত হয়। প্রদর্শনী বাতিকগ্রস্ত নারীর প্রতি পুরুষেরা যতই আকর্ষণ বা আগ্রহ দেখাক না কেন, তারা সেই নারীকে সম্মান করে না, ভালবাসে না। মর্যাদাহীন ভালবাসাও অত্যন্ত ঘৃণ্য বৈ কি। ছাত্রদের মধ্যে প্রদর্শনী বাতিকগ্রস্ত মেয়েদের সম্বন্ধে যে আলোচনা সচরাচর হয় —তা জানতে পারলেই এর সত্যতা স্বীকৃত হবে। যে ছেলে প্রদর্শনী বাতিকগ্রস্ত মেয়েদের পেছনে দৈনিক কয়েক ঘন্টা ঘোরে, সে হয়ত সংগীদের সংগে তাদের প্রদর্শনিকতার জন্যে বিশ্রী মন্তব্য করতেও দ্বিধা করে না।

নারী-পুরুষ সম্পর্কের মূল বুঝতে হলে, শুধু অর্থনৈতিক সমস্যা বুঝলে চলবে না, মনোবিজ্ঞানও বুঝতে হবে। একজন আর একজনের মন বুঝতে পারে না বলেই আজ উভয়েই অসহায় হয়ে পড়েছে।

নারীর প্রসাধন ও অলংকারপ্রিয়তা স্বাভাবিক; একে দূর করা চলবে না। কিন্তু অলংকারের, পরিধানের ও প্রসাধনের মধ্যেও একটা মর্যদাবোধ আছে, একটা সুরুচিবোধ আছে, একটা স্বাভাবিকতা আছে। স্বাভাবিকতার সীমা লংঘন করলেই বিপদ। গাঢ় লাল লিপস্টিক পশ্চিম থেকে আমদানী। এতে পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ ছাড়া অন্য কিছু হয় কি না আমার বোধের অগম্য। সৌন্দর্যের মধ্যে একটা স্বাভাবিকতা ও সৌম্যভাব থাকা চাই। নতুবা তা হয় উলঙ্গ চিত্রের মত—"বিশ্রী সৌন্দর্যের প্রতীক।"

পূর্বে তৈল ক্রীম দিয়ে আমাদের নারীরা স্বাভাবিক সৌন্দর্য বজায় রাখতেন। আজকাল নানা রকম পাউডার ও রং দিয়ে অস্বাভাবিকতাকে বৃদ্ধি করা

হচ্ছে। ফলে দিন দিন কমনীয়তা ও মসৃণতা লয় পাচ্ছে। প্রসাধন মেয়েদের জন্য যে দরকারী, তা পূর্বেই বলেছি। কিন্তু প্রসাধনের উদ্দেশ্য স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে আরও মহৎভাবে ফুটিয়ে তোলা ; তাকে অস্বাভাবিকতার আড়ালে ঢেকে ফেলা নয়।

পশ্চিমী ঢংয়ে কাপড় পরিধান ও সাজসজ্জা আজ নারীকে আরও খেলো করে তুলছে। মনে রাখতে হবে যে, পাশ্চাত্য সমাজ নারী স্বাধীনতার যত বড় বুলিই আওড়াক না কেন, নারীকে সেখানে বহুলাংশে ভোগের ও প্রদর্শনীর সামগ্রী করা হয়েছে। সেখানে অধিকাংশ নারী তাদের হৃদয় হারিয়ে ফেলেছে — হারিয়েছে তাদের মর্যাদা। অর্থ হয়ত তারা নিজেরা উপার্জন করতে পারে, কিন্তু তা নারীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধন মর্যাদাকে অনেক ক্ষেত্রে বলি দিয়ে।

ইউরোপের একজন বিখ্যাত মনীষী তাই তাঁর 'গিব হার এ প্যাটার্ন' নামক লেখায় ইউরোপের নারীদের এই করুণ অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করে বলেছেন :

'নারীর কোন স্বকীয় সত্তা নেই—পুরুষ যে ভাবে যখন যা কামনা করেছে—নারী তা'ই সেজেছে। পুরুষের ইচ্ছানুসারেই তার চলন ; সাজ, প্রসাধন ; জীবিকা অর্জন প্রণালী নির্ধারিত হয়েছে—পুরুষের ইচ্ছানুসারে সে সাজিয়েছে নর্তকী, সাজিয়েছে গায়িকা।"

নারী পুরুষের শান্তি ও আনন্দদায়িনী হবে নিশ্চয়ই, কিন্তু ভোগ-লালসার সামগ্রী হয়ে পুরুষের হাতের পুতুল হিসেবে পুরুষ যখন যেভাবে নাচায় সে ভাবে 'নাচবে', এটাকে যতই প্রগতি বলা হোক না কেন, আসলে এটা চরম প্রতিক্রিয়াশীলতা।

আত্মঘাতী প্রবণতা

আজকাল পুরুষের সংগী হিসেবে কোন কোন ধনী ঘরের মেয়ে ক্লাবে রেস্তোরাঁয় মদ ইত্যাদিকেও ভালবাসতে আরম্ভ করেছে। পারিবারিক শান্তি নষ্ট করে এরা শান্তি খুঁজছে ক্লাবে, থিয়েটারে, সিনেমায়। নিজের সংসারে, নিজের স্ত্রী-স্বামীতে মন বসছে না, তাই সুখের সন্ধানে ধাওয়া করছে বাইরে। এই সব মহিলা নারী জাতির মহাশত্রু। এরা নারীকে অত্যন্ত অমর্যাদার স্তরে নামিয়ে নিচ্ছে এবং অসংখ্য স্বামীকে বিপথে নিয়ে তাদের সহধর্মিণীদের মহাকষ্ট ও অশ্রুপাতের কারণ হচ্ছে। নারী যতই পুরুষের ভোগের সামগ্রী হিসেবে ধরা দেবে,—ততই নারী জাতির সর্বনাশ এগিয়ে আসবে।

ফড়িং যেমন আগুনের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে প্রাণ হারায়—তথাকথিত আধুনিকতার বাহ্যিক ঝলকে অন্ধ হয়ে আজ আমরাও মরীচিকার পেছনে ঘুরছি।

অধুনা শিক্ষিত ধনী ঘরের মধ্যে নৃত্যশিক্ষার প্রচলন হচ্ছে এবং কোন কোন মেয়ে প্রকাশ্য মঞ্চে, নাটকে, থিয়েটারেও যোগ দিচ্ছেন। এদের নৃত্যানুষ্ঠানে মাঝে মাঝে গ্রাম্য-জীবনের ছবি রূপায়িত হলেও এদের নিজেদের গ্রামের দরিদ্র মানুষের প্রতি কোন দরদ নেই, আর শহরের বৈদ্যুতিক আলোতে বৈদ্যুতিক পাখার নীচে বসে যাঁরা এই নৃত্য উপভোগ করেন, তাঁদেরও এই সব দুর্গত মানুষের প্রতি কোন ভালবাসা নেই। তাঁরা নারীদেহের বিচিত্র ভংগীমার মধ্যে এক প্রকার যৌনতৃপ্তি লাভ করে থাকেন, এটাই তাঁদের পক্ষে আরামদায়ক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সব নৃত্য শুধু যৌন লালসাকে উদ্দীপ্ত করতেই সহায়তা করে। মাঝে মাঝে শখ করে এই সব নৃত্য-পরিকল্পনায় দুর্গত জীবনকে স্থান দিলেও দুর্গত মানুষ তা দেখে না, দেখবার সুযোগ পায় না। অন্যদিকে এই সব 'ফাইন আর্ট' উপভোগ করার মত ক্ষমতাও তারা রাখে না। দেশের সাধারণ মানুষ যখন অন্নাভাবে, শিক্ষাভাবে, স্বাস্থ্যাভাবে মরছে, তখন এই সব নৃত্যানুষ্ঠান শহুরে ধনী লোকদের এক রকম যৌন ক্ষুধাই শুধু তৃপ্ত করছে, কোন মহত্তর জীবনবোধে অনুপ্রাণিত করছে না। শারীরিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যে—বিমল আনন্দ পরিবেশনের জন্যে নারী নৃত্য শিখতে পারে, কিন্তু তার এই প্রদর্শনীমূলক নৃত্য তার জন্যে কিংবা সমাজের জন্যে—কারো জন্যে সংগত মনে হয় না। এটা সমাজ ও পারিবারিক জীবনের শান্তি ও শুচিতাই শুধু নষ্ট করে দিতে সহায়তা করছে। এইসব নারী ধনিকগোষ্ঠীর মনস্তুষ্টির জন্যে নিজের ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদাকে বলি দিয়ে প্রদর্শনীর সামগ্রী হয়ে নিজেকে অধিকতর রিক্ত করে ফেলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে নারী জাতিকেও খেলো করে তুলছেন।

আজকাল সিনেমায়, ভিসিআর-এ এবং তথাকথিত যৌন পত্রিকার মালিকদের পত্রিকাতে প্রগতির নামে যে ভঙ্গী ও ছবি প্রদর্শন করা হয়—তাও আমাদের নারী পুরুষের শান্তি ও আনন্দকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। শিক্ষামূলক বা নির্মল আনন্দদায়ক চলচ্চিত্র আজকাল নেই বললেই চলে। নারী-পুরুষের সস্তা যৌন আবেদনকে এবং ক্ষেত্রবিশেষে গুণ্ডামি—পাণ্ডামিকে সম্বল করে অধিকাংশ ছবি তৈরী হয়। এর ফল সমাজের উপর মারাত্মক না হয়ে

পারে না। এই সব কারণেই বর্তমানে বহু দেশে তরুণ-তরুণীরা উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনে অভ্যস্ত হচ্ছে বলে বিরাট সামাজিক সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। নারী নির্যাতনও এতে বৃদ্ধি পাচ্ছে বিভিন্ন আকারে—বিপুলভাবে।

প্রেম-ভালবাসা

এখানে আর একটি কথা বলা দরকার। আজকাল তথাকথিত সিনেমা দেখে এবং নিম্নস্তরের উপন্যাস পড়ে আমরা প্রেম বা ভালবাসার নামে কেমন যেন পাগল হয়ে পড়েছি। প্রেম-ভালবাসা উচ্চস্তরের বিষয়। এটা মানুষের জীবনের কাম্য হওয়া উচিত, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রেম-ভালবাসার নামে বিশেষ করে আধুনিক সমাজে যে অভিশাপ আমাদের জীবনে নেমে আসে তা যেন না ভুলি।

আমাদের বর্তমান সমাজ অত্যন্ত অবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। এর ফলে নারীরাই বেশী কষ্ট ভোগ করতে বাধ্য হয়; বিশেষ করে প্রেমের ব্যাপারে।

নারী-পুরুষের আকর্ষণ স্বাভাবিক। বিয়ের আগে কৈশোরে ও যৌবনের প্রথম অবস্থায় মন থাকে অত্যন্ত রোমান্টিক ও আকর্ষণশীল। ফলে যে কোন পুরুষের প্রতি এই সময়ে আকর্ষণ বোধ করা অস্বাভাবিক নয়। সিনেমা, সিনেমা-পত্রিকা, উপন্যাস ও অন্যান্য মাধ্যম এই আকর্ষণকে অন্ধ করে তোলে। ফলে বিচার করে হৃদয় দান করবার মত শক্তি ও অবস্থা তার থাকে না। সমাজে সৎলোকের সংখ্যা খুব বেশী নয়। ফলে শতকরা বহু ক্ষেত্রে অসচ্চরিত্র ও অবিবেচক পুরুষের প্রলোভনে সরলমতি মেয়েরা তাদের হৃদয় দান করে সর্বনাশ ডেকে আনে।

এই হৃদয়দানের ফল পবিত্র ও অপবিত্র যাই হোক না কেন, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় এটা অসাফল্যে পর্যবসিত হয়েছে। বহু ক্ষেত্রে পুরুষই এই হৃদয়দানকে তুচ্ছ করে অন্য নারীর দিকে আকৃষ্ট হয়। বহু ক্ষেত্রে পুরুষই একে সামাজিক খেলা মনে করে একের পর এক বহু মেয়ের সর্বনাশ করে। আবার বহু মেয়েই বুঝতে পারে, অল্প বয়সের প্রেম মোহ ছাড়া আর কিছুই নয়। স্বভাব, চরিত্র, আদর্শ, অবস্থা, শিক্ষা ইত্যাদি বহু বিষয়ে মিল না থাকলে প্রেম হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিশাপ। বিবাহের স্থায়িত্ব ও সাফল্যের জন্য সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থার মিল (কুফু) যে একান্ত আবশ্যক, হাদীস থেকে আমরা এর

স্পষ্ট নির্দেশ পাই। ফলে পুরুষের নিষ্ঠা সত্ত্বেও অনেক নারী মন উঠিয়ে নিতে বাধ্য হয়। আবার বহু ক্ষেত্রে বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ অভিভাবক—তাদের মিলনের অযৌক্তিকতা বুঝতে পেরে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ান।

কথাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনেক ক্ষেত্রে অভিভাবক অবিবেচনা ও হৃদয়হীনতার পরিচয় দেন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপাত্রে প্রেমদান বা নিবেদন করার জন্যে নারী যে প্রথম বয়স থেকেই অভি-শপ্ত হয়, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এইরূপ প্রেমগ্রস্ত ছাত্র-ছাত্রীর লেখা-পড়ারও যে সর্বনাশ ঘটে তাও সর্বজনবিদিত।

এই প্রেমযজ্ঞে পুরুষের চাইতে নারীর ক্ষতি হয় বেশী। পুরুষ দুশ্চরিত্র হলেও সমাজে অপাংক্তেয় নয়। তার বিবাহ বা পুনঃপ্রেম ঠেকে না। কিন্তু নারীর বেলায় এটা মারাত্মক। একবার যদি সে হৃদয় দান করে, পবিত্র হোক কিংবা অপবিত্র হোক, তার আর কোনও উপায় থাকে না। বাইরে তার অফুরন্ত বদনাম হয়। অন্য কোন পুরুষ তাকে বিয়ে করতে সহজে এগিয়ে আসে না। শতকরা ৯৫টি ক্ষেত্রে বাল্য বা কিশোর কালের প্রেম অসফল হয় বলে শতকরা ৯৫টি প্রেমে পড়া নারীরই জীবন হয় অভিশপ্ত ও অপমানকর। এরূপ অভিশপ্ত জীবন যে অবস্থা বিশেষে ঘৃণ্য ও দুর্দশাগ্রস্ত পতিতাবৃত্তিতেও অনেককে টেনে নিয়ে অধঃপাতে নিমজ্জিত করে তারও দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

হৃদয়ে একবার দাগ কাটলে সে দাগও সহজে মোছে না—বিশেষ করে সারল্য যার আছে। অসফল প্রেমের পর তেমন কোনো মেয়ের বাইরে বিয়ে হলে সেই বিয়েও জীবনে দোযখের সৃষ্টি করে। পূর্বে অন্য-দিকে আকৃষ্ট মন নতুন স্বামীকে আপন করে নিতে অনেক ক্ষেত্রেই অপারগ হয়। পুরুষ হয় সন্দেহশীল। অমিল ও তাচ্ছিল্যে ঘর হয় বিষময়। এর মারাত্মক ফল সন্তান-সন্ততি পর্যন্ত গড়ায়। অসন্তুষ্ট স্বামী হয়ত চরিত্রহীন হয়ে বাইরে ঘোরে, নয়ত অন্য বিয়ের জন্য পাগল হয়ে ওঠে। নারীও শেষ পর্যন্ত নিজের সত্তা পংকিল আবর্তে বিলীন করে দিতে বাধ্য হয়। নিজের জীবনের উপরও সে শ্রদ্ধা-ভালবাসা হারিয়ে ফেলে তিলে তিলে মরণের দিকে এগিয়ে যায়। সমাজে অনেক আত্ম-হত্যা এজন্যও হয়ে থাকে।

নারী-পুরুষের সম্পর্ক যেমন স্বাভাবিক, তেমনি জটিল। মানুষের শান্তির

প্রায় ৮০ ভাগই নির্ভর করে এই সম্পর্কের উপর। এজন্য বিভিন্ন বয়সে এবং বিভিন্ন পরিবেশে পরস্পর সম্পর্কের রূপ কি হবে তা নির্ধারণ ও অনুশীলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অবশ্যকরণীয়। অথচ এমন একটি বিষয়ে আমাদের স্কুল-কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দেবার কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে অনেকটা আনাড়ীর মতই হাতড়াতে হাতড়াতে আমাদের তরুণ-তরুণী ও যুবক-যুবতীরা ঘর-সংসার পাততে অগ্রসর হয়। এমন গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল বিষয়ে অশিক্ষিত থাকার দরুন পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে তারা ভুল করে বসে। ভুল না করলেও বিবাহিত জীবনে পরস্পর সমঝোতার অভাবে স্বামী-স্ত্রী এবং গোটা পরিবারের পরিবেশ দারুণ তিক্ততায় ভরে ওঠে। ফলে, যে কারণে পরিবার প্রেম-ভালবাসার শান্তির নিকেতন রূপে বিরাজ করতে পারত, তাই হয়ে ওঠে অশান্তি ও তিক্ততার কেন্দ্র। এই তিক্ততা যে শুধু নিজ পরিবার বা পার্শ্ববর্তী পরিবারেও প্রভাব বিস্তার করে তা নয়—ছেলে-পিলের মারফত ভবিষ্যত বংশধরদের মধ্যেও একটা বদ্‌-উদাহরণ রূপে এটা কাজ করে থাকে। আর এজন্যেই তো প্রায় পরিবারে অনেক নারী-পুরুষকে বলতে শোনা যায়ঃ বিয়ে না হলেই ভাল হত; আগে যদি বিয়েকে এত ঝামেলা ও অশান্তির উৎস বলে বুঝতে পারতাম, তাহলে বিয়েই করতাম না। জীবনের সর্ববিষয়ে মানুষকে শিক্ষিত ও উপযুক্ত করে গড়ে তোলাই তো শিক্ষার উদ্দেশ্য। কিন্তু জীবনের শান্তি-অশান্তি, উন্নতি-অবনতি, এমন কি চরিত্র পর্যন্ত যে বিয়ে ও পারিবারিক জীবনের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে সে বিষয়ে আমরা কোন শিক্ষাই দেই না। শিক্ষাজীবনে এর চাইতে লজ্জাকর প্রহসন আর কি হতে পারে!

আমাদের সমাজে প্রেমের পাত্র নির্বাচন অত্যন্ত দুরূহ বিষয়। বিশেষ করে নারীর পক্ষে। আগুনের দিকে পতঙ্গের আকর্ষণের মত এটা অধিকাংশ মেয়েকেই পুড়িয়ে মারে। রূপ দেখে বা দেহ-ভংগী দেখে হৃদয় ও গুণগত বিষয়ের দিকে লক্ষ্য না করে তথাকথিত অন্ধ প্রেম করার ফল যে সমাজে কত মারাত্মক হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত প্রায় প্রতিটি পরিবারের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই বুঝতে কষ্ট হবে না।

অনেকে প্রেমের ব্যাপারে হয়ত পাশ্চাত্যের নজির আনবেন। প্রেমে পড়ে বিয়ে হওয়া ভাল। কিন্তু পাশ্চাত্যে শতকরা আশি ভাগ প্রেমে-পড়া-বিয়ে যে কার্যত অসফল হয়, তা যেন আমরা ভুলে না যাই। তথাকথিত

প্রেমে গুণের বাছ-বিচার নেই বলে দেহের চাইতে গুণের প্রতি আকর্ষণ কম বলে—আমাদের দেশে সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রেমের বিয়ে সাধারণত ঘৃণায় ও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

আজকাল অনেক যুবতী-তরুণী বিভিন্ন অফিসে পুরুষ অফিসারদের সহকারী ও অফিস সেক্রেটারী হিসাবে কাজ করতে গিয়ে দুশ্চরিত্র ও দুর্নীতিবাজ অফিসারদের লোভের আগুনে আত্মাহুতি দিয়ে নিজের, নিজ-পরিবারের ও অফিসারের পরিবারের সর্বনাশ ডেকে এনেছেন অনেক অনেক ক্ষেত্রে। বৃহত্তর সমাজ ও পারিবারিক জীবনের জন্য ইহা করুণ-তম ও অবাঞ্ছিত পরিণতি বয়ে আনে।

উপরে আধুনিক নারী-প্রগতি ও তার সমস্যা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করেছি। এখানে একটা কথা ভুললে চলবে না যে, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বহু নারী আছেন, যাঁদের জীবন আদর্শস্থানীয়; যাঁরা অন্য নারী ও পুরুষের সম্মান ও মর্যাদা আকর্ষণ করেন—যাঁরা পরানুকরণ ও প্রদর্শনী-বাতিকগ্রস্ত নন। সমাজে নারী শিক্ষিত হবে, পর্যাপ্ত স্বাধীনতা ভোগ করবে, দেশের ও সমাজের কাজে নিজেকে বিলিয়ে দেবে—অবশ্য তার মনের শান্তি ও মর্যাদাকে রক্ষা করে—এটাই সকলের মনের কাম্য হওয়া উচিত। সত্যিকার শিক্ষার সঙ্গে দেশ ও সমাজের কাজে নারী নিজের শক্তি যোগ না করলে আমাদের কল্যাণ নেই।

আধুনিক কালে যৌতুক প্রথার নামে আর একটি জঘন্য ও মারাত্মক প্রথা সমাজে শিকড় গেড়ে বসেছে। আগে হিন্দু সমাজে এটা চালু থাকলেও মুসলমান সমাজে তা দেখা যেত না। বরং মুসলমান সমাজে বরপক্ষই ইসলামের নীতি অনুসারে অলংকার, মোহরানা আর অন্যান্য ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রয়োজনে কন্যাপক্ষকে দ্রব্য ও অর্থ প্রদানে রাজী হয়ে বিবাহে এগিয়ে আসত। তখনও অতিরিক্ত অলংকার ও অর্থ দাবীর জন্য ধর্মীয় প্রবক্তারা হযরত ফাতেমা (রাঃ) ও হযরত আলী (কঃ)-এর বিবাহের নজির দেখিয়ে কন্যাপক্ষের এই প্রথাকে নিন্দা ও অনুৎসাহিত করতেন। অতিরিক্ততা ও অপচয়ের ক্ষেত্রে এই প্রথা নিন্দিত হলেও তখন কন্যাপক্ষের জন্য তা হীনমন্যতার কারণ ছিল না—ছিল গৌরবের বিষয়। আর প্রস্তাবকারী বরপক্ষ সব সময় সামাজিক ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে বলে এতে তাদের উপর অত্যাচারের কোন সম্ভাবনা থাকত না।

কিন্তু আধুনিক যৌতুক প্রথা দুর্বল কন্যাপক্ষের শুধু হীনমন্যতার সৃষ্টি করে নাই—তা শোষণ ও নির্মম সামাজিক অত্যাচারে পর্যবসিত হয়েছে। কন্যাপক্ষের সামর্থ্যে না কুলালেও যৌতুকের নামে বাধ্যতামূলকভাবে বড় বড় অংকের টাকা ও বিলাস দ্রব্য আদায় করা হচ্ছে অত্যাচারমূলকভাবে। ফলে সামাজিকভাবে দুর্বল কন্যার পিতাকে জায়গা জমি—এমন কি ঘরবাড়ী পর্যন্ত বিক্রি করে লোভী বরপক্ষকে সন্তুষ্ট না করলে চলছে না। প্রেম-ভালবাসা ও পরিবারের পবিত্র প্রতীক হল বিবাহ প্রথা; অথচ ইহাই একটা জঘন্য স্বার্থ-ব্যবসায়ে রূপ নিয়েছে। আধুনিকতার ছোবলে এমনিতেই তো পবিত্র প্রেম ভালবাসা সমাজ থেকে নির্বাসিত হচ্ছে—তদুপরি অত্যাচারমূলক এই স্বার্থ-ব্যবসায়ে সংশ্লিষ্ট পরিবার চরম অশান্তি ও অত্যাচারের নারকীয়তার অসহায় শিকার হয়ে উঠেছে। আত্মীয়ের মত আপন জনকে এভাবে অন্যায় শোষণে 'ফকির' ও অসহায় করে তোলার নজির আদিম কালের বর্বরতার যুগেও খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। সত্য কথা বলতে কি এই কুপ্রথা আমাদের প্রিয় নারী সমাজের সামাজিক মর্যাদাকে দারুণভাবে অবনমিত করে দিয়েছে। তাই এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো আমাদের সকলের জন্য ফরয হয়ে দাড়ায়েছে। অন্যদিকে শিক্ষিত উঁচু পরিবারে চালু এই কুপ্রথা তাদের অনুকরণে সমাজের নিম্নস্তরেও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে দেশের শতকরা ৯০ ভাগ দুঃস্থ পরিবার এ সামাজিক বিষের জ্বালায় জ্বলে মরছে অসহায়ভাবে। এজন্যই অসংখ্য নিরপরাধ গৃহ-বধূর নির্মম হত্যা ও আত্মহত্যায় দেশের আকাশ বাতাস আহাজারিতে আর অভিশাপে ভরে উঠেছে।

যুগ যুগ ধরে নারী-প্রেমিক বলে পরিচিত পুরুষ সমাজ প্রেম-প্রীতি ধ্বংসকারী এই অনৈসলামিক পাশবিকতা থেকে মুক্ত হয়ে কবে সমাজে শান্তি ও স্বস্তি ফিরিয়ে আনার মত মানসিকতা লাভ করবে-সে আশায় সমাজ দিন গুণছে।

পর্দা সম্বন্ধে এই প্রসংগে কথা ওঠা স্বাভাবিক। পর্দাকে বোরখা ও অবরোধ মনে করার মত লোক আমাদের সমাজে যথেষ্ট আছে। পর্দা কিন্তু এর কোনটাই নয়। পর্দা মানুষের জন্য আবরণ—নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই পর্দা দরকার। নারী-পুরুষের বিশিষ্ট স্থান ঢেকে রাখাই তো পর্দা। দৈহিক পার্থক্যের জন্য পর্দা ভিন্ন হবে সন্দেহ নেই—কিন্তু পর্দা কারও দরকার নেই—এ কথা বোধ হয় মুষ্টিমেয় 'ন্যুডিস্ট' ছাড়া আর কেউই মনে করেন না।

নারী হোক, পুরুষ হোক—আল্লাহ্‌র দেওয়া আলো-বাতাস পৃথিবীতে উপভোগ করার, পৃথিবীতে মর্যাদার সঙ্গে বিচরণ করার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। কোন নারীকে তাই আবদ্ধ করে রাখা বা সময়ে অসময়ে বোরখা নামীয় কাপড়ের থলের মধ্যে পুরে রাখার অধিকার কারও নেই।

কুরআনের স্পষ্ট নির্দেশ :

> পুরুষ হোক, নারীই হোক, তারা দৃষ্টি অবনত করে চলুক—নিজেদের লজ্জাস্থান ঢেকে রাখুক, পর্দা করুক। যে অংশ সাধারণত না দেখালে নয়, তা ছাড়া অলংকারাদির প্রদর্শনী বন্ধ রাখুক।
>
> (কুরআন ২৪—৩০, ৩১)

হাত, পা, মুখ ইত্যাদি ঢেকে রাখার বা কাজের জন্য ঘরের বার না হওয়ার কোন নির্দেশ কোরআনে নেই। পর্দা যে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য দরকার, যা না দেখালে নয়—এই রকম অলংকার যে দেখাতে মানা নেই, নারী-পুরুষ উভয়কেই দৃষ্টি অবনমিত করে চলতে বলার মধ্যে যে তথাকথিত অবরোধের নামগন্ধ নেই—একথা যেন আমরা হৃদয়ঙ্গম করি।

উপরে যা বলা হল সে সম্বন্ধে ইসলামের কি নির্দেশ তা জানতে চাওয়া স্বাভাবিক।

যাঁরা কোরআন সুষ্ঠুভাবে পাঠ করেছেন, তাঁরা জানেন : নারী-পুরুষ সম-শরিকানার ভিত্তিতে আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত জীবনে সমান মর্যাদা ভোগ করুক, এটাই কোরআনের নীতি। (কোরআন : ২০—৩৮, ৪—১২৪, ১৬—৯৭, ৪০—৪০)।

ইসলাম চায় নারী-পুরুষের প্রেম-প্রীতি ভালবাসা হোক। কিন্তু এটা যেন শুধু দেহগত না হয়ে গুণগতও হয়; এটা যেন নারী-পুরুষকে অসহায় ও অভিশপ্ত করে না তোলে।

ইসলাম চায়, নারী দাস না হয়ে শরীর ও মনোবিজ্ঞানের দিকে নজর রেখে পুরুষের সাথে সমান মর্যাদা লাভ করুক। ইসলাম চায়, নারী (পুরুষও) যেন প্রদর্শনীর বা শুধু ভোগের বস্তু হিসাবে নিজের মর্যাদা হারিয়ে না ফেলে, সে যেন অবরুদ্ধ না হয়, যেন নিজের শরীরের আবশ্যকতা অনুযায়ী পর্দা করে পুরুষেরও সম্মান আদায় করে (২৪—৩১, ৬০)।

ইসলাম চায়, মুখ, হাত, পা প্রভৃতি স্থান—যা খোলা না রাখলে চলে না, তা খোলা রেখে কাজেকর্মে নারী ঘরের বাইরেও যাক এবং নিজে যা উপার্জন করে তা ভোগ করুক—নারী পুরুষের মতই শিক্ষিত হোক।

ইসলাম চায়, পরিবারই মানব সমাজের ক্ষুদ্রতম ইউনিট হোক, সৎ পুরুষের নেতৃত্বে পরিবারকে কেন্দ্র করে নারী-পুরুষের সুখ ও সুসম্পর্ক গড়ে উঠুক ; প্রেম-প্রীতি-ভালবাসায় প্রতি ঘর আনন্দময় ও শান্তিময় হয়ে উঠুক।

ইসলাম চায়, নারী-পুরুষ পরস্পর নির্ভরশীল হোক ; সময়, অবস্থা, রুচি, শারীর বিজ্ঞান অনুযায়ী উপযুক্তভাবে শ্রমকে ভাগ করে নিক।

কোরআন চায় না, নারী অবরুদ্ধ হোক, নারী অশিক্ষিত থাকুক, নারী পংগু হোক।

মনে রাখতে হবে, নারীকে প্রথম মর্যাদা দিয়েছে ইসলাম। ইউরোপ এই যুগেও স্বাধীনতার নামে নারীকে করেছে ভোগের বস্তু, প্রদর্শনীর সামগ্রী—পাশ্চাত্য তার হৃদয় পিষে মেরেছে, তার নারীত্বকে দিয়েছে কবর। তার নীড় ভেঙ্গে তাকে করেছে কুলি-মজুর, অনেক ক্ষেত্রেই অবৈধ সন্তানের মাতা। আর প্রাচ্য নারীকে অনেক ক্ষেত্রে করেছে দাসী, অবরুদ্ধ। আজ সময় এসেছে পাশ্চাত্যে প্রগতির নামে, আর প্রাচ্যে রীতি ও ধর্মের নামে নারীর ওপর যে ঘৃণ্য অবিচার চলছে, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার। মহৎপ্রাণ নারী ও পুরুষ এই বিদ্রোহে হাত মিলিয়ে মর্যাদা, সুখ, শান্তি ও উন্নতির দিকে এগিয়ে যাক—এটাই মনে প্রাণে প্রার্থনা করি।[১]

১. সম্প্রতি আধুনিক উচ্চ শিক্ষিতা কোন রমণী পবিত্র বিবাহ প্রথাকে পতিতাবৃত্তির সংগে তুলনা করে বিকৃত মানসিকতা প্রদর্শন করতেও দ্বিধা করছেন না। অথচ অমর্যাদা, অসহায়তা, অধিকারহীনতা, দুঃখ-দারিদ্র্য, শোষণ, অমানুষিক অত্যাচার, আত্মীয়-স্বজন বঞ্চিত, অনিশ্চয়তার নরকে জ্বলা এই পতিতাদের করুণ কাহিনী সাপ্তাহিক রোববার ও অন্যান্য পত্রিকার গবেষণামূলক প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে। বিবাহকে এই জঘন্য-জীবনের সংগে তুলনা করে আমরা কি সম্মানিত নারী-সমাজকে পতিতাবৃত্তির নরকের দিকে ঠেলে দিতে চাইছি? আত্মসুখ ও আত্মমর্যাদা বর্জিত এই বিকৃতমনাদের হাত থেকে সমাজ যত শীঘ্র মুক্তি পায় তাই নারী সমাজের জন্য মংগল। [দেখুন : পতিতা-বৃত্তি আদিম পেশা : সাপ্তাহিক রোববার, ৯ ও ৩০ শে জুন, ১৯৮৫।]

কোরআনিক অর্থনীতি

উপসূচী

১.	অর্থনীতি ও আধুনিক সমাজ	২৫৫
২.	মূলনীতি	২৬০
৩.	জীবন, ব্যক্তি ও সমাজ	২৬৯
৪.	জমি সমস্যা	২৮০
৫.	শিল্প সমস্যা	২৮৮
৬.	রাষ্ট্রীয়করণ বনাম রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ	২৯৬
৭.	সুদ, ব্যাংকিং ও ইনস্যুরেন্স	৩০১
৮.	পরিশিষ্ট—অর্থনীতি সম্বন্ধে কোরআনের রেফারেন্স	৩১১

'বিজ্ঞান-সমাজ-ধর্ম' বইটি বের হওয়ার আগে এর অর্থনীতি বিষয়ক প্রবন্ধগুলো নিয়ে ১৯৭১ সনের মার্চ মাসে আমি 'কোরআনিক অর্থনীতি' বইটি প্রকাশ করেছিলাম। সে বইতে যে মুখবন্ধ আমি লিখেছিলাম ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের এক কালের প্রধান ডঃ খোন্দকার তাফাজ্জল হোসেন সাহেব পাণ্ডুলিপি দেখে যে অভিমত দিয়েছিলেন— তা নীচে সংযোজিত হল।

কোরআনিক অর্থনীতি একটা বৈপ্লবিক মতবাদ। ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে ঃ সেই দাস-সামন্ত যুগে এই মতবাদ মানব সমাজে এনেছিল একটা নজীরবিহীন অভূতপূর্ব বিপ্লব।

গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যাবে ঃ বিশ শতকের এই শত সমস্যা ও অশান্তি জর্জরিত মানব সমাজ একটা অসহনীয় অস্থিরতায় দিন গুজরান করছে। এন্তেজার করছে আর একটা মানবীয় মহাবিপ্লবের জন্য অধীর আগ্রহে। আমি বিশ্বাস করি ঃ কোরআনিক অর্থনীতিই যোগাবে সেই অনাগত মহাবিপ্লবের মূল রসদ।

সেই কারণেই এই অকিঞ্চিতকর ক্ষুদ্র চেষ্টা। আগামী লেখকদের হাতে এই চেষ্টা পূর্ণতা পাবে এই আশা করেই আমি বিদায় নিচ্ছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের আগের প্রধান ডঃ খোন্দকার তাফাজ্জল হোসেন সাহেব এই বই সম্বন্ধে তাঁর মূল্যবান অভিমত লিখে দিয়ে এই বইয়ের গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছেন। তা ছাড়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের বর্তমান প্রধান ডঃ এম. এন. হুদা সাহেব বইটি দেখে দিয়ে বইটি ছাপাবার উৎসাহ দিয়েছেন। এইজন্য এই দুই খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

আবুল কাসেম

আজিমপুরা, ঢাকা

৩রা ডিসেম্বর, ১৯৭০।

অভিমত

ডঃ খোন্দকার তাফাজ্জল হোসেন
রীডার, অর্থনীতি বিভাগ (প্রাক্তন বিভাগীয় অধ্যক্ষ)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

'কোরআনিক অর্থনীতি' ফলিত অর্থবিজ্ঞানের নীতিগত দিক নিয়ে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর বিশ্লেষণ প্রচেষ্টা। দৃষ্টিভঙ্গীটি হচ্ছে কোরআন-ভিত্তিক। লেখক প্রথমে বলেছেন অর্থনৈতিক সমস্যার সাধারণতার কথা, তার-পরে বলেছেন অর্থবিজ্ঞানের অহেতুক জটিলতার কথা, আর তারপরে চারটি অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন জমি-সমস্যা, শিল্প-সমস্যা, রাষ্ট্রীয়-করণ ও সুদ সমস্যার কথা। এসব আলোচনায় প্রথমে রয়েছে সমস্যাটির বিশ্লেষণ আর তারপরে রয়েছে দুনিয়ার বিভিন্ন অর্থ-ব্যবস্থায় ওগুলোর সমাধানপন্থার তুলনা। পুঁজিবাদ, সমাজবাদ ও সম্ভাব্য ইস-লামী অর্থব্যবস্থার মধ্যেই প্রধানত তুলনা করা হয়েছে। লেখক স্পষ্টতঃই কোরআনিক অর্থব্যবস্থার প্রবক্তা। কিন্তু তাঁর বক্তব্য তিনি বিশ্লেষণের ভেতর দিয়েই পেশ করেছেন, শুধু আবেগজড়িত ধর্ম-ভক্তির প্রকাশের ভেতর দিয়ে নয়।

"ভাইয়ালি অংশিদারি" যা তিনি শিল্প সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন, তার ভাবধারার সঙ্গে দুনিয়ার বেশীর ভাগ সমাজবাদী মনীষীদের চিন্তাধারার সম্পূর্ণ মিল রয়েছে। সমাজের অর্থব্যবস্থায় সংঘাত ও সংগ্রামের চেয়ে সহযোগিতার উপরে এতে বেশী জোর দেওয়া হয়েছে।

কোরআনের নানা অনুশাসনের ও নীতির ভিত্তিতে একটি অর্থব্যবস্থার স্পষ্ট ইঙ্গিত বইটিতে আছে। এ ব্যবস্থার বিষয়ে বাঙলা ভাষায় বইয়ের নিতান্ত অভাব। তাই এ বই সর্বত্র সমাদৃত হবার কথা। লেখক মুক্তবুদ্ধি নিয়ে কোরআনের অর্থব্যবস্থা-সংক্রান্ত আয়াতগুলোর বিশ্লেষণ করার ফলে মুক্তবুদ্ধি ব্যক্তিদের কাছে বইটি সুপাঠ্য বলে বিবেচিত হবে। অন্য

ধরনের অর্থব্যবস্থার ইঙ্গিতও যে কোরআনের সূত্রগুলো থেকে দেওয়া যায় না, তা নয়। কিন্তু লেখক বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে সংক্ষেপে ও স্পষ্ট করে সহযোগিতাভিত্তিক এক ধরনের অর্থব্যবস্থার পথ দেখিয়েছেন কোরআনের সূত্রগুলোর ভিত্তিতে। সেজন্য তাঁকে মোবারকবাদ জানান চলে। লেখকের সঙ্গে পাঠক একমত হন বা না হন—এ বই থেকে পাঠক যে উপকৃত হবেন আর লেখকের মুক্তবুদ্ধি সম্পন্ন বিশ্লেষণে তৃপ্ত হবেন, তা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

১

অর্থনীতি ও আধুনিক সমাজ

মানুষের জীবন বিভিন্ন দ্রব্য বা জিনিস-পত্রের ওপর একান্ত নির্ভরশীল। আর জিনিসপত্রের উৎপাদন, লেনদেন, বন্টন প্রভৃতি নিয়েই অর্থনীতির কাজ। এজন্য জীবনের সাথে অর্থনীতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর এই কারণেই সমাজের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যকীয় বিষয় হল অর্থনীতি।

কিন্তু এই অর্থনীতি বা ধনবিদ্যা বর্তমানে একটা জটিল বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা এখন আয়ত্ত করা অতিশয় কঠিন। এর বিভিন্ন তত্ত্ব, বিভিন্ন সিস্টেম ও বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা আধুনিক যুগে এত দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে যে সমাজের খুব কম লোকই এতে সুষ্ঠু জ্ঞান লাভে সমর্থ হয়। দুনিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মানবিক গ্রুপে (হিউমেনিটিজ গ্রুপে) অর্থনীতি একটা জটিলতর বিষয় হিসেবে গণ্য হয়। তাছাড়া এতে আধুনিক জটিল ও দুরূহ অংকের অবাধ প্রবেশ একে আরো দুর্বোধ্য ও দুরায়ত্ত করে তুলেছে।

এই কঠিনতা ও জটিলতার প্রধান কারণ হল ঃ বর্তমানে দুনিয়ার বিভিন্ন সমাজের জটিল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। পুঁজিবাদী ও সামন্তবাদী সামাজিক ব্যবস্থায় জনগণের হাতে লেনদেন ও বন্টন ব্যবস্থা থাকে না। সরাসরি উৎপাদনকারী চাষী ও মজুরের হাত থেকে উৎপাদিত দ্রব্য মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতিদের হাতে চলে যায়—বিভিন্ন আঁকাবাঁকা জটিল অর্থনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে। এর মধ্যে ব্যবসায়, ব্যাংক প্রভৃতি উপ-প্রতিষ্ঠানগুলো অর্থনৈতিক চলাচলকে আরো জটিলতর করে তোলে। এই জটিলতা শুধু দেশের ভিতরে নয়—আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও কঠিনতর অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করে। ফলে কি দেশের ভিতরে—আর কি দেশের বাইরে অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো জটিল হয়ে ওঠে বলে তার সমাধানও জটিলতর এবং অনেক ক্ষেত্রে অসমাধ্য দুর্যোগের পথ তৈরী করে তোলে।

সমাজে সহজ বিষয়ও কিভাবে জটিল হয়, উদাহরণ হিসেবে জমির স্বত্বের কথাই বিবেচনা করা যাক। উপমহাদেশে জমিদারী ব্যবস্থার আমলে উপরতলার লোকদের শোষণের ও শাসনের সুবিধার জন্য জমির বহু রকম স্বত্ব সৃষ্টি করা হয়েছিল। জোত, রায়ত, দর-রায়ত, কোর্ফা, তালুক আরো কত রকম মধ্যস্বত্ব। এগুলোর জন্য জটিলতর আইন-কানুন তৈরী করা দরকার হয়ে পড়ে। ফলে এই আইনগুলো বোঝা সাধারণ লোকের পক্ষে হয়ে পড়ে অসম্ভব। আর তার জন্য সৃষ্টি হয় বিরাট উকিল শ্রেণী—যে উকিল শ্রেণী গরীব চাষী-মজুরের হাড়ভাঙ্গা রক্তে একটি উপশ্রেণী হিসেবে ফুলে ফেঁপে ওঠে। যদি সরকার চাষী-দের মধ্যে একটা মাত্র শর্তে জমি বন্টন করে দেওয়ার ব্যবস্থা নিতেন তাহলে এত আইন ও আইনের মারপ্যাচের সৃষ্টি হত না। এবং এজন্য জটিলতর আইন, আইন-বই ও এই রকম বিরাট ও জটিল ওকালতি ব্যবস্থারও সৃষ্টি হত না। এমনিভাবে সহজতর অর্থনৈতিক উৎপাদন ও লেনদেনের ব্যবস্থা চালু থাকলে অর্থনীতিও এত জটিল ও দুর্বোধ্য হয়ে উঠত না।

আসলে অর্থনীতি নেহায়েত সহজ বিষয়।

আমরা সকলে বুঝি :

১. আমাদের অভাব আছে; এই অভাব পূরণের জন্য আমাদের কতকগুলো জিনিসের দরকার আছে।

২. জিনিসগুলো আহরণ করতে হয় কিংবা উৎপাদন করতে হয়।

৩. আহরিত বা উৎপাদিত দ্রব্য বন্টনের ব্যবস্থা করতে হয়।

এই তিনটেই হল অর্থনীতির মূল বিষয়। আর এতে ব্যাপক জটিলতারও কিছু নেই।

অভাব সম্বন্ধে বলা যায় : মানুষের সুস্বাস্থ্য ও সুরুচি উপযোগী খাওয়া পরা ও বাসের ব্যবস্থাই মূল অভাব। কিন্তু তথাকথিত উন্নতমান, ক্ষতি-কর বিলাসিতা ও অনাবশ্যক উপভোগ মানুষের সহজ অভাবকে জটিল-তায় ভরে দিয়েছে। আর এই কৃত্রিম অভাব পূরণ করতে গিয়ে শুধু যে জটিলতর উৎপাদন ব্যবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে তা নয়—সমাজে অনা-চার, অবিচার, চরিত্রহীনতা এবং 'আরো চাই আরো চাই'—এই মনোবৃত্তির সৃষ্টি করে অতিমাত্রায় অর্থলোভ ও শোষণের পথকে বড় করে দেওয়া হয়েছে।

উৎপাদনের ব্যাপারেও তাই ঘটেছে। উৎপাদনের মূল হোতা হল চাষী ও মজুর। কিন্তু উৎপাদনের ক্ষেত বা যন্ত্র তার হাতে নেই। রাষ্ট্র, জমিদার, জোতদার, পুঁজিপতি বা তাদের শোষণের অঙ্গ হিসাবে হাজারো প্রতিষ্ঠান ও কর্মচারী আর নিয়ম-কানুন তৈরী হয়েছে। আর এজন্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে জটিলতর সংগঠনী ব্যবস্থা কায়েম হয়ে মূল হোতা-দেরে অক্টোপাশের মত চেপে মারছে।

উৎপাদনের মূল জিনিস পাওয়া যায় আল্লাহ্‌র দেওয়া প্রকৃতিতে। আর কিছু জিনিস মানুষের শ্রম, বুদ্ধি ও যন্ত্র দিয়ে তৈরী করতে হয় সেই প্রকৃতিজাত দ্রব্য দিয়ে। দুর্ভাগ্যবশত আল্লাহ্‌র দেওয়া এইসব জিনিসে সব মানুষের সমান অধিকার স্বীকৃত হয়নি। আর স্বীকৃত হয়নি বলেই নানা আইনকানুন ও ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজে জটিলতর অসাম্য সৃষ্টিকারী ব্যবস্থা কায়েম হয়ে আসছে।

বণ্টনের সহজ সরল ব্যবস্থা আধুনিক জগতে একেবারেই বিরল। অবাক হওয়ার কথা এই যে—যারা উৎপাদন করে, প্রায় ক্ষেত্রে উৎপাদিত বস্তুতে তাদের অধিকার থাকে না। এটা নানা ধরনের মালিক বা ব্যবসায়ীর মাধ্যমে আঁকাবাঁকা চোরাপথে গিয়ে উৎপাদন মূল্যের বহুগুণ মূল্যে সাধারণ ব্যবহারীদের বা কনজ্যুমারদের কাছে যখন ফিরে আসে—তখন তার দাম হয় তার ক্রয়-ক্ষমতার বাইরে। মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী বা মালিকেরা এভাবে একটা কৃত্রিম ব্যবস্থার সৃষ্টি করে বণ্টন ব্যবস্থাকে শুধু জটিল করে তোলেনি—এতে গরীবকে আরো গরীব আর ধনীকে আরো ধনী করার পথ খোলাসা করে দিয়েছে।

বণ্টন ব্যবস্থায় বহির্বাণিজ্যও এসে পড়ে। একদেশে কোন জিনিস প্রয়োজনের তুলনায় কম উৎপন্ন হয়, তাই সেই জিনিস বিদেশ থেকে করতে হয় আমদানী। আবার কোন জিনিস একটি দেশে উৎপাদিত হয় প্রয়োজনের তুলনায় বেশী, তাই তা করতে হয় বিদেশে রফতানী। এই আমদানি ও রফতানীর জন্য বর্তমান সমাজে নানা প্রকার এজেন্সি ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও ফড়িয়ার সৃষ্টি হয়েছে। আর এজন্য জটিলতর নিয়ম-কানুন, আইন, অফিস ও বিরাট বেতন-গ্রাসী অসংখ্য কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করে গোটা বণ্টন ব্যবস্থাকে করা হয়েছে জটিল ও সুযোগ-সন্ধানীদের অনায়াসলভ্য মুনাফার মোক্ষম হাতিয়ার—এই শোষণ ব্যবস্থার

অংগ হিসাবেই। সমাজে জটিলতর ব্যাংক, ইনস্যুরেন্স ও আরো বহু রকমের খরচ-গ্রাসী ও সুদভিত্তিক উপ-প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়ে জটিল অর্থ-নীতিকে আরও জটিল করে রেখেছে।

আমরা আগেই বলেছিঃ মূল অর্থনীতি কোন কঠিন ব্যাপার নয়। আমার-আপনার সকলের অভাব আছে। এই অভাব পূরণ করতে শ্রম দিয়ে দরকারী জিনিস আহরণ বা উৎপাদন করতে হবে। উৎপাদিত দ্রব্য সুষমভাবে সকলের মধ্যে বণ্টন করতে হবে। এটাই হল অর্থ-নীতির মোদ্দা কথা। এতে কোন দুরতিক্রম্য জটিলতা থাকার কথা নয়।

সহজ বিষয়কে জটিল করেছি আমরা অপরকে ঠকাবার জন্য—শোষণ করার জন্য। এজন্য প্রতিষ্ঠা করেছি আমরা বহু বহু উপ-প্রতিষ্ঠান। বহু টাকা খরচ করে তৈরী করেছি বহু বহু জটিল আইন-কানুন। আর এই কৃত্রিম ব্যবস্থাকে চালু রাখার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে করেছি জটিল ও কৃত্রিম। এই কৃত্রিম ব্যবস্থায় ধনকুবেরের শত শত মন্দিরে দেশ ভরে গেছে। ভরে গেছে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান ধন লাভের প্রতি-যোগিতায়। মানুষ হয়ে উঠেছে ক্ষুধার্ত বাঘের মত ধন-পাগল। ধন এখন মহৎ সুন্দর জীবন গঠনের উপায় নয়—হয়ে উঠেছে জীবনের সর্বস্ব ও একমাত্র উদ্দেশ্য। তাই একে যেন-তেন-প্রকারে আহরণ করতে হবে, জমিয়ে রাখতে হবে, যক্ষের মত বুকে ধরে রাখতে হবে। আজ সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থাকেই এই ধনপূজার ও ধনাহরণের হাতিয়ার করে তোলা হয়েছে। ফলে প্রতিটি শিক্ষিত ব্যক্তি আজ ধন আহরণের প্রতি-যোগিতায় উন্মাদ। মহত্তর জীবনবোধের কোন জায়গাই যেন নেই আজ শিক্ষা ব্যবস্থায়। যে সামান্য স্থান দেওয়ার চেষ্টা হয় এতে, ধনলিপ্সা-জনিত দুর্নীতির পাগল-বন্যায় তা তলিয়ে যায়। ফলে শিক্ষিতেরাও হয়ে ওঠে আজ শোষণের খেলার গুটি—তারাই হয়ে পড়ে ধন-অসাম্যের প্রধান হোতা। আর তাদেরই বিরাট অংশ আজ বনে গেছে আন্তর্জাতিক লোভ সৃষ্টিকারী হিংসা-বিদ্বেষ ও যুদ্ধ বিগ্রহের নেতা। তারাই তো রাজনীতিকে ব্যবহার করেছে প্রতিটি মহিমান্বিত মানুষকে পদানত করতে। আর তারাই তো অর্থকে বগলদাবা করে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করছে—দুর্বল জাতিগুলিকে পদানত ও পংগু করে রাখতে। আর এসবেরই জন্য ব্যক্তি-জীবনে ও সমাজ জীবনে নেমে এসেছে অসাম্য, বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি।

তাহলে এর প্রতিকার কি ?

প্রতিকার রয়েছে উৎপাদনে ও বণ্টন ব্যবস্থাকে জটিল কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত করে একে সহজ সুন্দর করে গড়ে তোলার মধ্যে।

—এতে অর্থনীতি অনেক সহজ হবে।

—সামাজিক জটিলতা লোপ পাবে।

—মানুষ কেউ অভাবে থাকবে না।

—শোষণের অবসান ঘটবে।

তাতে মানবজাতির সমস্ত শ্রম, শক্তি ও সাধনা উৎপাদনে ব্যয়িত হবে। পরস্পর হানাহানি, হিংসা-বিদ্বেষ, ঝগড়া-ফাসাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহে তাদের শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয়িত হবার সুযোগ পাবে না। আল্লাহ্‌র বান্দা মানুষ ভাই ভাই—এই মহৎ সম্পর্কে মহীয়ান ও বলীয়ান হয়ে অভাব ও জটিলতামুক্ত জীবন যাপন করে উন্নত ও মহত্তর জীবন পথে আগাতে পারবে। এইভাবে বর্তমান শয়তানী দুনিয়ায় নেমে আসবে বেহেশতী সুখ ও শান্তির পরিবেশ।

কিন্তু—কিরূপে ?

সেই ব্যবস্থারই ইঙ্গিত পাব আমরা কোরআনিক অর্থনীতির আলোচনায়।

২
মূলনীতি

মহান কোরআনের ১১৪টি সূরার মধ্যে ৬৬৬৬টি আয়াত আছে ঃ ইহাদের মধ্যে আড়াই শতের অধিক আয়াতে অর্থনীতি সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। আর বেশ কয়েকটি আয়াত অর্থনীতির মূলনীতিগুলোর বিবরণ দিয়েছে। এই আয়াতগুলোর একাংশের তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে।

এইসব আয়াত থেকে আমরা কোরআনিক অর্থনীতির নিম্নলিখিত সূত্রগুলো পাই ঃ

১. দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদের মালিক আল্লাহ্। আল্লাহ্‌র সম্পদে সকল মানুষের সমান অধিকার। মানুষ কোন কিছুর মালিক নয়—উত্তরাধিকারী মাত্র।[১]

২. সম্পদের অধিকার তার—যে শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন ও ব্যবহারযোগ্য করে।

৩. আল্লাহ্‌র সৃষ্ট মানুষ এক জাতি.—এই অর্থে সমাজের মানুষ ভাই ভাই।
এই ভিত্তিতে ধনসম্পদ বণ্টিত হওয়া উচিত।

৪. সম্পদ অর্জন জীবনের উদ্দেশ্য নয়—মহত্তর জীবন লাভের উপায় মাত্র। ধন-সম্পদে মানুষের পরীক্ষা হয়।

৫. প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ সমাজের কাজে খরচ করে ফেলা কর্তব্য। ধনার্জন ও বণ্টন ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত—
ক. যেন সম্পদ বিত্তশালীদের মধ্যে না ঘুরে ফিরে।
খ. যেন কোন সম্পদ কেউ জমিয়ে রাখতে না পারে।

---

১. 'মালিক' শব্দটি প্রচলিত অর্থে নিরংকুশ (absolute) স্বত্ববান বুঝায়। কোরআনিক নীতিতে তওহীদের (একত্ববাদ) মর্মানুসারে মানুষ কোন কিছুরই নিরংকুশ স্বত্ববান নয়। ভুল ধারণা সৃষ্টি এড়াবার জন্য এই বইতে তাই এই শব্দটি মানুষের সম্পর্কে ব্যবহার পরিহার করা হয়েছে।

ঘ. যেন কেউ দুর্নীতির আশ্রয় নিতে না পারে।

ঙ. যেন কেউ অপব্যবহার বা খারাপ ব্যবহার করতে না পারে।

গ. যেন কেউ কাউকেও শোষণ করতে না পারে।

মূল সূত্র

উপরের পয়লা সূত্রটিই কোরআনিক অর্থনীতির মূল সূত্র। মানুষ কোন সম্পদ সৃষ্টি করেনি—সৃষ্টি করতে পারেও না। আমরা আল্লাহ্‌র সৃষ্ট সম্পদে শ্রম ও বুদ্ধি খাটিয়ে তাকে ব্যবহারযোগ্য করতে পারি মাত্র। আধুনিক বিজ্ঞান বলে, একটিমাত্র কণা সৃষ্টিও কোন বিজ্ঞানীর পক্ষে সম্ভব নয়। এমন কি মানুষের শরীর, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি—এগুলিও মানুষের সৃষ্ট নয়—আল্লাহর সৃষ্ট। স্বয়ং মানুষই আল্লাহ্‌র সৃষ্ট।

অতএব প্রমাণিত হল ঃ মানুষ মূলত কোন কিছুর মালিক নয়।

সম্পদের রকম

সাধারণভাবে সম্পদ দু'রকমের হয় ঃ

ক. প্রাকৃতিক সম্পদ (natural wealth)

খ. পরিবর্তিত সম্পদ (transformed wealth)।

প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে আমরা জমি, আলো, পানি, খনি, গাছ, ঘাস প্রভৃতি বুঝি। এগুলির বৈশিষ্ট্য ঃ এগুলিকে প্রকৃতিতে মূল অবস্থায় পাওয়া যায়।

পরিবর্তিত সম্পদ বলতে আমরা বুঝি প্রাকৃতিক সম্পদকে পরিবর্তিত করে আমরা যে সম্পদ পাই। কলম, পেন্সিল, চট, টেবিল, চেয়ার, আলমারি, ঘর-বাড়ি, গাড়ি, ঘড়ি, নৌকা, জাহাজ, কল-কারখানা, টাকা-পয়সা, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি এই রকম সম্পদ। এগুলোর উপাদান প্রাকৃতিক সম্পদ হলেও মানুষের শ্রমের ও বুদ্ধির দ্বারা এই প্রাকৃতিক সম্পদগুলোকে নানা উপায়ে পরিবর্তিত করে ব্যবহার করা হয়। পেন্সিলের উপাদান কাঠ ও সীসার দ্রব্য। ইহাদের একটা বনজ ও অন্যটা খনিজ। মানুষ নানা বুদ্ধি ও শ্রম খাটিয়ে কল-কারখানার মাধ্যমে এই দু'প্রকার দ্রব্যকে পরিণত করে পেন্সিলে। পেন্সিলের উপরে যে রং থাকে তাও প্রাকৃতিক দ্রব্যের পরিবর্তিত রূপ বৈ নয়। চট তৈরী হয় প্রাকৃতিক দ্রব্য পাট থেকে—আর টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি হয় প্রাকৃতিক কাঠ থেকে।

এখানে দুটি কথা মনে রাখা দরকার। প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণেও মানুষকে শ্রম ও বুদ্ধি খাটাতে হয়। জমির ক্ষেত্রে এর আকার পরিবর্তন, সার প্রদান, চাষাবাদ প্রভৃতির মারফত এই কাজ হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত, মানুষের শরীর ও বুদ্ধি মানুষের তৈরী নয়—এও প্রাকৃতিকভাবে আল্লাহ্‌র তৈরি।

এতে সিদ্ধান্ত দাঁড়ায়ঃ মৌলিক বা পরিবর্তিত যে সম্পদই হোক না কেন, প্রাকৃতিক সম্পদ ছাড়া তা তৈরি হয় না।

অন্য কথায়ঃ মৌলিক বা পরিবর্তিত যে সম্পদই হোক না কেন, তার সবটার মূলই আল্লাহ্‌।

সম্পদের অধিকার

এখন প্রশ্ন হল মানুষে আর সম্পদে সম্পর্ক কি? মানুষ হল সম্পদের অধিকারী বা উত্তরাধিকারী। মানুষ ধনসম্পদের অধিকারী হতে পারে তিন উপায়ে।

১. জোর-জবরদস্তি বা রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে বা দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে কিংবা অর্থনৈতিক কৌশল মারফত ধনসম্পদ অধিকার করে।

২. শ্রমের দ্বারা প্রাকৃতিক সম্পদকে পরিবর্তিত তথা ব্যবহারযোগ্য করে।

৩. উত্তরাধিকারসূত্রে।

অতীতে 'জোর যার মুল্লুক তার' এই নীতিতে রাজা-বাদশাহ্‌রা জমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ দখল করে নিয়ে নিজেকে মালিক বলে ঘোষণা করতেন। তারা আবার খাজনা আদায় ও প্রভুত্ব কায়েমের খাতিরে নিজের আপনজন, আত্মীয় ও বংশধরদের জায়গীরদার ও জমিদার বানিয়ে এই সম্পদ তাদের হাতে ছেড়ে দিতেন। এতে আল্লাহ্‌র দেওয়া প্রাকৃতিক সম্পদ গুটিকয়েক লোকের এখতিয়ারে চলে যেত। আধুনিক কালে দুর্নীতির মাধ্যমে কিভাবে ধনসম্পদের 'মালিক হওয়া যায়—তা কারো অজানা নয়। সুদের মাধ্যমে গরীবকে গরীব করে সম্পদ আহরণ একটা অর্থনৈতিক কৌশল। ব্যবসায় বাণিজ্য বা বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে বুদ্ধি ও পুঁজি খাটিয়ে দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে অন্যায়ভাবে বহুগুণ সম্পদ

লাভও আর এক প্রকার অর্থনৈতিক কৌশল। এই সবই এজন্য ধন অর্জনের নাজায়েয উপায়। অবশ্য সৎ ব্যবসায়ের মাধ্যমেও হালাল রুযী সম্ভব।

আর একটি উপায় হল ঃ নিজের দৈহিক ও মানসিক শ্রম খাটিয়ে সম্পদ অর্জন। অতীতে নিজের কায়িক পরিশ্রম খাটিয়ে কৃষকেরা প্রাকৃতিক জমি আবাদ করত। আর নিজে খেটে চাষাবাদ করে জীবিকা চালাত। এটা ছিল হালাল উপায়ে জমি অধিকার। অথচ রাজনৈতিক শক্তির প্রভাবে রাজা-বাদশাহ্ বা জমিদারেরা কৃষকের আবাদ করা এই জমি কেড়ে নিয়ে মালিক বনত আর কৃষকদের ফসলের ভাগ বা খাজনা নিয়ে তাদের ভূমিদাসে পরিণত করত।

বর্তমানে শ্রমিকদের উদাহরণ দেওয়া যাক। আগে ছুতার মিস্ত্রিরা প্রাকৃতিক কাঠ ইত্যাদি আহরণ করে নিজের বুদ্ধি ও শ্রম খাটিয়ে ব্যব-হার-উপযোগী নানা রকম সরঞ্জাম তৈরী করে উহার অধিকারী হত। এভাবে পাটিয়ালরা পাটি তৈরী করত। কুমারেরা বাসন-পাতিল বানাত, তাঁতীরা কাপড় বুনত। এগুলোও ছিল সম্পদ আহরণের হালাল উপায়। আজকালও সাধারণ শ্রমিক-কৃষকেরা শ্রম খাটিয়ে জীবিকা চালায়—চালায় নয়, সে চালাবার কোশেশ করে। কিন্তু বিজ্ঞানের দানে বলীয়ান হয়ে ও রাষ্ট্রীয় ছায়ায় আইন তৈরি করে—গুটিকতক ভাগ্যবান লোক এখানে অর্থনৈতিক কৌশল খাটায়। এইভাবে সংগঠনের মাধ্যমে শ্রমিকেরা হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি খাটে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তাদের খাটুনির অনুপাতে অর্থ উপার্জন করতে পারে না। অর্থনৈতিক ভোজবাজির মাধ্যমে সংগঠনের অধিকাংশ আয় পুঁজিপতিদের ধনাগারে চলে যায়।

অধিকার ও মালিকানা

এই আলোচনা থেকে বুঝা যায় ঃ মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদকে কিংবা প্রাকৃতিক সম্পদের পরিবর্তিত রূপকে নিজের ভোগ-দখলে নিতে পারে—সে হালাল উপায়ে হোক কিংবা হারাম উপায়ে হোক। কোন প্রাকৃতিক সম্পদকে পরিবর্তিত করতে গেলেও একদিকে যেমন আলো-বাতাস থেকে শুরু করে নানাবিধ খনিজ দ্রব্য ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দ্রব্য অপরিহার্য—তেমনি প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া সুষ্ঠু বুদ্ধি ও শ্রমশক্তিরও একান্ত আবশ্যক ঃ

এভাবে প্রকৃতির বদৌলতে পাওয়া সম্পদ (নষ্ট হয়ে না গেলে) মানুষ পুরুষ-পরম্পরায় উত্তরাধিকার হিসেবে পেয়ে থাকে।

মানুষের জীবনই অস্থায়ী। এই জীবনে ধন-সম্পদ কখনও স্থায়ী হয় না। মহাকালের মহাসাগরে মানুষ যেন এক-একটা অতি ক্ষুদ্র বুদ্বুদ। এই বুদ্বুদ অতিশয় অস্থির ও অনিত্য। ব্যক্তি-মানুষ মহাকালব্যাপী অসংখ্য প্রাকৃতিক সম্পদের সামান্যতম মাত্র ভোগ দখল করতে পারে—সামান্য সময়ের জন্য। তাই সম্পদের স্থায়ী ও প্রকৃত মালিক আল্লাহ্—মানুষ নয়। মানুষ মহাকালের মধ্যে অতি সামান্য সময়ের জন্য সীমিতভাবে সম্পদের ব্যবহার করতে পারে মাত্র। যে নিজেই নিজের নিয়ন্ত্রক নয়, নিজেই নিজের মালিক নয়—সে আবার অপরের মালিক হয় কি করে? তাই মানুষ শ্রম ও বুদ্ধি দিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদকে পরিবর্তিত করে ব্যবহার উপযোগী করে তোলে মহাকালের ক্ষুদ্রতম সময়ের আওতায়। অস্থায়ীভাবে সে উহার অধিকারী হয় মাত্র—কখনো মালিক হয় না।

শ্রম ও অধিকার

যে যা শ্রম খাটিয়ে আহরণ করে সেটাই অধিকারী হিসেবে সে পায়। এই নীতিই কোরআনের দ্বিতীয় মূলনীতি। এই অধিকারের মধ্যেও কয়েকটি শর্ত আছে। প্রথমত কেউ নিজের শ্রম খাটিয়ে পরিবর্তিত সম্পদের অধিকারী হলেও সে ভোগের একমাত্র অধিকারী হয় না। ছেলেপিলে, মা-বাপ, পোষ্য প্রভৃতিও তার সংগে ভোগের অধিকারী হয়।

আহরিত সম্পদ ন্যূনতম প্রয়োজনের অতিরিক্ত হলে তা আর দশ-জনের তথা সমাজের প্রাপ্য হয়ে ওঠে। আগেই বলেছিঃ যে কোন সম্পত্তি আল্লাহ্‌র দেওয়া প্রাকৃতিক সম্পদ ও বুদ্ধি-বল ছাড়া তৈরী হয় না। নানা মহত্তর কাজ করার জন্য সমাজেরও নানা রকম অভাব থাকে। কাজেই আল্লাহ্‌র দেওয়া সম্পদে তাই সমাজেরও একটা হক থাকে। এই কারণেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ জমিয়ে না রাখার জন্য কোরআনে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কাজেই হালাল উপায়ে রুজি হলেও সেই রুজিতে সমাজের এবং অভাবীদের একটা অধিকার থাকেই। যাকাত ও আল্লাহ্‌র রাস্তায় অন্যান্য খরচ এই মহান নীতিরই বাহক।

হালাল উপায়ে রুজি হলেও সে সম্পদ যা-তা ভাবে খরচ করার অধিকার কারও নেই। বেহুদা বা বিলাসিতায় খরচ কোরআনিক নীতি

অনুসারে পাপের কাজ। আসলে সম্পদ সৃষ্টির একটা উদ্দেশ্য আছে ; সে উদ্দেশ্য হল : মানুষের অভাব মোচন করা ও জীবনকে মহত্তর পর্যায়ে উন্নীত করা। বেহুদা বিলাসিতায় খরচ হলে সম্পদের আসল উদ্দেশ্য হয়ে যায় ব্যর্থ। শুধু তাই নয়, সমাজের একাংশের বিলাসিতায় যথেষ্ট সম্পদ খরচ হওয়ায় সমাজের অন্য অংশের অভাব দেখা দিতে পারে। ফলে সমাজের অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে। অর্থনৈতিক অসাম্যহেতু সামাজিক অসাম্য, ঘৃণা প্রভৃতি প্রবল হয়ে উঠতে পারে। তদুপরি বিলাসিতা ও বেহুদা খরচ এমন জিনিস যার প্রভাবে শুধু যে অর্থের অপচয় হয় তাই নয়—মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে দুশ্চরিত্রতা, দুর্নীতি এবং নানা কায়িক ও মানসিক রোগের উৎপত্তি ঘটে।

মওজুতদারী ও সম্পদের ব্যবহার

আর একটা বিষয় হল, নিজের হালাল উপায়ে রুজি হলেও সেই সম্পদ অকেজোভাবে মওজুদ করে রাখার অধিকার কারো নেই। সম্পদ হল কাজের জন্য। বিনা কাজে ফেলে রাখলে সেই সম্পদের উপকারিতা কি ? কোরআনিক অর্থনীতির একটা বড় কথা হল ধন-সম্পদ যতই সমাজে চালু থাকে ততই উহা মূল্যবান হয়ে ওঠে।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক—দু'জন লোক হালাল উপায়ে রুজি করে দশ হাজার টাকা করে জমাল। একজন তার টাকায় সোনা কিনে সিন্ধুকে বন্ধ করে রেখে দিল। অন্যজন তার টাকার কিছু অংশ জমির সার বীজ, দমকল ইত্যাদি সংগ্রহে ও গ্রামের খাল খননে এবং চাষাবাদের অন্যান্য কাজে ব্যয় করল। বাকী টাকা বায়তুল মালে জমা দিল। বায়তুল মাল সে টাকা থেকে কয়েকজন কৃষককে বিনা সূদে ধার দিল।

এক বছর পর কি দেখা যাবে ? দেখা যাবে, প্রথম ব্যক্তির টাকা এই সময়ের জন্য কোন কাজে লাগে নি। মূল্যহীন এক টুকরা পাথরকে পুঁতে রাখার মত তা অকেজোভাবে পড়ে আছে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তির টাকা হাল-বলদ কিনে চাষাবাদ করে খাল কেটে পানি সেচে—সার দিয়ে ও ভাল বীজ বপনের কাজে খাটিয়ে বহু টাকার ফসল উৎপন্ন করল। হয়ত বা এই ১০ হাজার টাকা না হলে আর অন্য কোন টাকা পাওয়া না গেলে এই এলাকার চাষাবাদে দারুণ বাধা পড়ত।

হয়ত বা হালের বলদের অভাবে, বীজ, সার ও পানি সেচের অভাবে কয়েকজন কৃষকের শ্রম অকেজো থেকে যেত; কিম্বা উপযুক্ত সার, বীজ ও সেচের অভাবে তাদের শ্রমের বদলে সামান্য মাত্র ফসল উৎপন্ন হত বলে শ্রমের বিরাট অংশের দারুণ অপচয় ঘটত। অপরদিকে এই টাকা খাটিয়ে শুধু সেই বছরই অধিকতর ফসল বা সম্পদ তৈরী হল তা নয়—ঐ সম্পদের ফল স্বরূপ প্রতি বছর আরো বহু সম্পদ সৃষ্টিতে সেটা মূলত কাজ করে গেল। ঐ টাকার সাহায্যে যে খাল কাটান হয়েছে তা যুগ যুগ ধরে কৃষকদের উন্নত চাষের পানি যোগাবে। যে দমকল কেনা হয়েছে তা হয়ত আরো কয়েক বছর চালু থাকলে অধিক ফসল ফলনে সাহায্য করবে। এভাবে এক বছরের সুফলে চাষীরা সম্পদশালী হয়ে যে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করবে তাতে বছর বছর আরো বহুগুণ সম্পদ সৃষ্টি হতে থাকবে। কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ না ঘটলে এভাবে সেই ১০ হাজার টাকার ফল চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে থাকবে। হয়ত বা ঐ ১০ হাজার টাকা কয়েক যুগ পরে কয়েক লাখ কেন কয়েক কোটি টাকার কাজ করতে থাকবে। আর এভাবে সমাজের বিরাট উৎপাদনে ভাগ নিয়ে ঐ টাকা বহুগুণ মূল্যবান হয়ে উঠবে। আর প্রথম ব্যক্তির টাকা পড়ে থাকায় ব্যবহারের অভাবে হয়ে থাকবে মূল্যহীন।

এই কারণে কোরআন চায়ঃ সম্পদ গুদামজাত হয়ে না থেকে ঘুরে ফিরে সমাজের কাজে লাগুক। এই কারণেই ইসলাম সম্পদের মওজুদী (হোর-ডিং) নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছে। কারণ যে কোন উৎপাদনী সম্পদ যত বেশী কাজে লাগবে এর মূল্য তত বেশী বাড়তে থাকবে। সমাজের নানাবিধ জরুরী উন্নয়নে এই সম্পদ বহুপথে অংশ নিয়ে মানব-জাতির মহাকল্যাণ করবে।

সম্পদ ও মানুষের ভ্রাতৃত্ব

সম্পদ ও মানুষ আল্লাহ্র সৃষ্টি। কোরআনের ভাষায়—মানুষ এক উৎস হতে সৃষ্ট হয়েছে, তাই তারা এক জাতি। সব মানুষই ভাই ভাই আল্লাহ্ চান একই মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষ এক ভ্রাতৃত্বে একতাবদ্ধ হয়ে জীবনকে উন্নত করুক।

মানুষের এই ভ্রাতৃত্ব সকল যুগের মানুষের মহাকাম্য। মহান জীবন-বোধের ভিত্তিতে—তথা মহত্তম আদর্শে পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে এক

পরিবারভুক্ত করাই কোরআনের কাম্য। ইসলাম তাই বিভিন্ন ধর্মের নামে হযরত আদম (আঃ) থেকে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) পর্যন্ত এই ঐক্যের জন্য সংগ্রাম করে এসেছে। আমরা যখন একটি আদর্শ পরিবারের কথা ভাবি, তখন কি দেখি? দেখি বাবার সমস্ত আয় ও সম্পদে সকল ভাই-বোনের সমান অধিকার। ছোট, বড়, রোগা, স্বাস্থ্যবান, কম-আয়কারী ও বেশী আয়কারী সকলেই অর্জিত সম্পদ প্রয়োজনানুসারে ভাগ করে ভোগ করে।

এই ভ্রাতৃত্বকে আদর্শের ভিত্তিতে সমস্ত দুনিয়াব্যাপী বিস্তার করাই হবে সকল মানুষের কাম্য ও সাধনার বিষয়।

আল্লাহ্ দুনিয়ার নানাবিধ সম্পদ সৃষ্টি করেছেন ও তার রক্ষণাবেক্ষণের পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে ও সামাজিক-ভাবে তা আহরণ করে সঠিকভাবে পরিবর্তিত ও পরিশোধিত করে কাজে লাগাবার বুদ্ধি ও শক্তি দিয়েছেন। অতএব মানুষ যার যে রকম শক্তি-সামর্থ্য সে সেভাবে এই সম্পদ আহরণে নিজেকে নিয়োজিত করে সম্পদ উৎপাদন করবে—আর যা আবশ্যক, তা সে ভোগ করবে; এই-ভাবে পরস্পরের বৈষয়িক অভাব মিটিয়ে মানুষ মহত্তর জীবন লাভের সাধনা করবে—এর চেয়ে উত্তম কাজ আর কি থাকতে পারে!

আল্লাহ্র দেওয়া সম্পদ আর শ্রমের দ্বারা পাওয়া প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ আল্লাহ্র রাস্তায় সামর্থ্য অনুসারে আমরা কেন খরচ করব না তার কোন যুক্তি নেই। কোরআন এই কথাই বারবার তাগিদ দিয়েছে। আল্লাহ্র রাস্তায় খরচের নির্দেশ, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সমস্তই সমাজের কাজে দিয়ে ফেলার হুকুমে, যাকাত ও অন্যান্য বিধিব্যবস্থায় এটাই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যেঃ মানুষ সামর্থ্য অনুসারে কাজ করে সম্পদ তৈরী করবে—আর প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ সমাজের কাজে বিলিয়ে দিয়ে সমাজে যাবতীয় অভাব মেটানোর সাহায্য করবে। এইভাবে তারা সওয়াবের ও সুনামের ভাগী হয়ে মহত্তর জীবনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে। এটাই ধনার্জনের ও ধন-বণ্টনের মূলনীতি।

ব্যক্তির হালাল রুযী—(সৎ উপায়ে ও পরিশ্রমে পাওয়া আয়) তার বিলাসিতাহীন দরকারী ব্যবহারের জন্য কোরআন অধিকার দিয়েছে। সেই অধিকার ভোগ করে অভাবমুক্ত মানুষ সুখ-সৌন্দর্য ও শান্তিময় জীবন-যাপন করে মহত্তর জীবনের পথে এগিয়ে যেতে পারবে।

এই নীতি বর্জিত হলে সমাজে শুধু যে অভাব অনটন থেকে যায় তা নয়—নানা রকমের অসাম্য, শোষণ ও অব্যবস্থায় সমাজ বিকৃত ও অশান্তির উৎস হয়ে দাঁড়ায়। আর এই কারণেই আজ পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকার ব্যক্তি-মানুষ, সমাজ ও দেশ পরস্পরের স্বার্থের হানাহানিতে শয়তানী লীলায় মেতে নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে। বলতে গেলে আজ প্রায় গোটা পৃথিবীটাই যেন হয়ে উঠেছে মানুষের বাসের অযোগ্য।

৩

জীবন, ব্যক্তি ও সমাজ

জীবনের উদ্দেশ্য কি

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য কি? ধন আহরণ, বাড়ী-গাড়ী-বিলাসিতা, উচ্ছৃঙ্খল জীবন—এই সবই কি জীবনের প্রকৃত কাম্য?

সুখ, সন্তোষ আর শান্তিই বা কি? মানুষ নিশ্চয়ই এই তিনটাকে গভীরভাবে আকাঙ্ক্ষা করে। কিন্তু কি অবস্থায় কোন্ পরিবেশে প্রকৃত সুখ-সন্তোষ ও শান্তি লাভ করতে পারে মানুষ?

আদিকাল থেকে এই নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা আর আলোচনা হয়ে গেছে। কেউ মনে করেছে: বিলাসময় জীবনই আদর্শ জীবন; কেউ মনে করেছে হাশমত ও দবদবাপূর্ণ চটকদার জীবনই সুখের; কেউ ভেবেছে রাজত্ব বা একনায়কত্বের রাজনৈতিক শক্তিই সুখ-শান্তির আধার। আবার কেউ ধরে নিয়েছে ঘর-বাড়ী-মদ-নারী তথা বিলাসময় উচ্ছৃঙ্খল জীবনই সুখ-সন্তোষের মূল। আবার কেউ ভেবেছে ধন সম্পদই সুখশান্তি ও সন্তোষের মূল ভিত্তি।

কিন্তু প্রশ্ন ওঠে: যারা বিলাস, হাসমত-দবদবা, শক্তি ও ধনের অধিকারী হয়েছে তারা কি প্রকৃত শান্তি-সন্তোষ লাভ করেছে? শক্তির কথাই ধরা যাক: শাদ্দাদ, নমরুদ, ফেরাউন, হিটলার-স্তালিন একদিকে অগাধ শক্তি—অপরদিকে অঢেল সম্পদের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু প্রকৃত শান্তি-সন্তোষের নাগাল কি এঁরা পেয়েছিলেন? পরাজয়, দুশ্চিন্তা ও প্রকৃত বন্ধুত্বের অভাবহেতু জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে নৈরাশ্য ও অসহায়তা—এই সবই কি তাদের শক্তি মদ-মত্ত জীবনকে পংগু ও মূল্যহীন করে ছাড়ে নি? যুগে যুগে সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিলাসী ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনের দুঃখময় পরিণতি কে না দেখেছে? বিলাস ও উচ্ছৃঙ্খল জীবন যে মানুষের মনে কোন শান্তি বা সন্তোষ দিতে পারে না এটা মানুষ বহু আগেই বুঝে

নিয়েছে। আর এই জন্যই জ্ঞানীরা বারবার পরামর্শ দিয়ে গেছেন—মহৎ চিন্তা ও সহজ সরল জীবন যাপনের জন্য।

যুগে যুগে দেশে ধনকুবেরের সংখ্যা কম ছিল না। এখনও কম নেই। কিন্তু ধন আহরণ ও ধন সঞ্চয়ের কুহকে পড়ে এরা যে সুখ-শান্তি ও সন্তোষকে চিরতরে বিদায় দিয়েছে এবং ধন-মরীচিকার পেছনে ঘুরে ঘুরে জীবন ঘাটের পাড়ে এসে খালি হাতে অসীম অভাব ও অশান্তির আঁধার সাগরে ডুবে মরেছে—তার হিসাব আমরা নিয়েছি কতটা? আর এজন্যই তো ইতিহাসে দেখি—শাক্য সিংহের মত বহু ধনী ও শাসক ধন ও রাজত্ব ছেড়ে দিয়ে বনের ফকির সাজতে ভাল বেসেছেন। সুলতান নাসিরুদ্দীন, বাদশা ইবরাহীম বিন আদহাম ও ওমর ইবনে আবদুল আজিজের মত মহা সম্রাটেরাও ফকিরের জীবন যাপন করাকে উত্তম মনে করেছিলেন।

সহজ ও সরল জীবন

শাসনে ও রাষ্ট্র-পরিচালনায় সহজ সরল জীবন যাপনের কথা বললে আধুনিক শাসক ও শোষকেরা 'আগের অবস্থা অচল' বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করার চেষ্টা করবে। মনে রাখতে হবে ব্যক্তিগত জীবনে তো বটেই—অধিকন্তু সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সহজ সরল জীবন যাপন শান্তির ও শৃঙ্খলার পরিপূরক। তাই বলে আত্ম-নিগ্রহের কথা বলছি না। সন্ন্যাস-ধর্ম তো নয়ই। এখনকার যুগে মোটরে চড়া বা বাষ্পীয় যানে চড়া বাদ দিতে হবে তাও নয়। বিলাসিতার কথাই বলছি। বিলাসিতার দরুন অতীতে কত সাম্রাজ্যের অধঃপতন ও ধ্বংস ঘটেছিল—আর সমাজে কত মারাত্মক দুর্নীতির প্রভাব বেড়েছিল এবং তজ্জন্য সমাজে কি অবনতি ঘটেছে—ইতিহাসে তার ভূরি ভূরি নজীর পাওয়া যাবে।

ব্যক্তি ও সমাজ

এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে—মানুষের দেহ ও মন যেসব যৌগিক উপাদান ও প্রবৃত্তি দিয়ে গঠিত—তাতে তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক এই দুইটি সত্তা সব সময় থাকবেই। যে সমাধানই আমরা দেই না কেন—এই দুটি সত্তার মিলন না হলে তা সফল হতে পারবে না।

পৃথিবীর ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—বিভিন্ন অবস্থা, দর্শন ও মতবাদের প্রভাবে কোন যুগে ব্যক্তির উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়া হয়েছে,

আর কোন যুগে দেয়া হয়েছে রাষ্ট্রের উপর অতিরিক্ত জোর। ফলে এক সময় ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতার জন্য সমাজে শোষণ কায়েম হয়েছে। আর তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ব্যক্তিকে অস্বীকার করে রাষ্ট্রের বা সমাজের উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়া হয়েছে। এভাবে ব্যক্তি-সত্তাকে রাষ্ট্র বা সমাজের একটা বিরাট কারাগারে বন্দী করে রেখে তাকে পংগু করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ইতিহাসের এই প্রতিক্রিয়াশীল গতিকে আজ রুখে দাঁড়াতে হবে। স্বীকার করে নিতে হবে—মানুষ যেমন সামাজিক জীব, তেমনি তার ব্যক্তিগত সত্তাও রয়েছে। সামাজিক জীব হিসাবে তার প্রয়োজনীয় ব্যক্তি-স্বাধীনতাও অপরিহার্য।

ব্যক্তি তার স্ফুরণে সমাজকেই করবে সমৃদ্ধ—তার স্বাধীনতা সে সমাজকে শোষণ বা পংগু করার কাজে ব্যবহার করবে না। সমাজ বা রাষ্ট্রও শুধু ব্যক্তির সর্বপ্রকার শান্তি ও অগ্রগতির সহায়ক হিসাবে কাজ করে যাবে—ব্যক্তিকে পংগু করার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হবে না।

এটাই হল ভারসাম্য নীতি। এর গতি সব সময় সামনের দিকে—উন্নতির দিকে। এতে প্রতিক্রিয়ার স্থান নেই—আছে প্রগতি। এর গতি নিয়ন্ত্রিত হবে দুটি শক্তি দ্বারা। একটি সৃষ্টিকর্তার বিশ্বাস হতে আসা নৈতিক শক্তি—আর অন্যটি রাষ্ট্রীয় শক্তি। নৈতিক শক্তি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রয়োগ কমে যাবে ক্রমশ। এজন্য নৈতিক শক্তিকে লোকের মনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সমাজ বা রাষ্ট্র সর্বদা চেষ্টা করবে।

আপাত প্রগতিশীল মতবাদ

অন্যদিকে বর্তমানে গণতন্ত্রের নামে যে তথাকথিত অবাধ ব্যক্তি স্বাধীনতা চলছে কিংবা সমাজতন্ত্রের নামে যে রাষ্ট্রতন্ত্র চলছে তাতে শুধু প্রতিক্রিয়াই হয়—সমাজের ব্যবস্থাপনা ঘড়ির দোলকের মত একবার এক সীমান্তে অন্যবার তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ অন্য সীমান্তে চলে যায়—শান্তিময় অগ্রগতি হয় না। আপাতদৃষ্টিতে তথাকথিত গণতন্ত্র বা রাষ্ট্রতন্ত্রের বুলিকে খুবই প্রগতিশীল মনে হলেও এগুলি যুগে যুগে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে মানুষের ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে।

ব্যক্তি-সম্পত্তি

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে—ব্যক্তিগত সম্পত্তি জায়েয কিনা।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ব্যক্তি নিয়েই সমাজ। আবার এককভাবে বা মিলিতভাবে ব্যক্তির চেষ্টা ও প্রেরণাই সমাজে উৎপাদন ও অন্যান্য কাজের (Service) মূল। ব্যক্তি-মানুষ ছাড়া যেমন সমাজ হয় না তেমনি সমাজ ছাড়াও মানুষ চলতে পারে না। অর্থনৈতিক ও অন্যান্য উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাকে কোন কোন ক্ষেত্রে এককভাবে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে মিলিতভাবে এগোতে হয়। সুতরাং অবস্থা বিশেষে আর পরিমাণ বিশেষে ব্যক্তির অধিকারে সম্পত্তি থাকতে পারবে – আবার প্রয়োজনের তাগিদে অধিক উৎপাদনের ও সুবণ্টনের উদ্দেশ্যে ধনের চালুতা বজায় ও অভাব মোচনের খাতিরে সমাজও মিলিতভাবে সম্পদের অধিকারী হতে পারে। যেমন বায়তুল মাল ছিল জনগণের সকলের সম্পদ। মানুষ কোন সম্পত্তির ব্যক্তিগতভাবে বা সামাজিকভাবে মালিক হবে না। কারণ মালিক তো আল্লাহ্ই। কিন্তু প্রেরণামূলক অধিক উৎপাদনের জন্য সে এককভাবে বা সামাজিকভাবে সম্পদের অধিকারী হতে পারবে। মানুষের ব্যক্তিগত সত্তা ও স্বাধীনতাকে স্বীকার করতে হবে— যতদূর সম্ভব সামাজিক সুবিন্যাসের ক্ষতি না করে। তাকে রাষ্ট্র শাসনের যাঁতাকলে পিষে মারা চলবে না। আসল কথা হল—অভাবমুক্ত শোষণহীন সমাজে মহত্তর পথে খরচশীল ব্যক্তিসম্পত্তির যত প্রসার হয় ততই উন্নতি ও সুখ-সমৃদ্ধি বেশী হওয়ার সম্ভাবনা। তবে এজন্য নিঃস্বার্থ সমাজমনা চরিত্র সৃষ্টি অপরিহার্য। আর এটা সহজেই খাঁটি কুরআনিক শিক্ষার মাধ্যমে সম্ভব।

ব্যক্তিপ্রেরণা ও উৎপাদন

যে কোন উৎপাদন ব্যবস্থায় ও সংগঠনে ব্যক্তিগত প্রেরণা একটা প্রধান উপাদান। কোন কাজে সমষ্টিগত প্রেরণা সবসময় রক্ষা করা সম্ভব নয়। বিশেষ অবস্থায় বিশেষ জাতির বিশেষ সংকট ও গৌরবময় পরিবেশে কিছুদিনের জন্য সম্মিলিত প্রেরণা কাজ করলেও জীবনের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রেরণা ও উৎসাহই কাজ করে বেশী। কি শিল্প-কারখানায়, কি চাষাবাদে, কিম্বা ব্যবসায়-বাণিজ্যে যে ব্যবস্থা যত বেশী ব্যক্তি প্রেরণা যোগাতে পারবে—তার উৎপাদন হবে তত বেশী। এবং সাথে সাথে সংগঠন হবে মজবুত। আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত করে

আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এইরূপ ব্যক্তি-প্রেরণার উৎসাহ দিলে অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব। নতুবা ব্যক্তি স্বার্থ অচিরে সমাজকে শোষণের লীলাভূমিতে পরিণত করতে পারে।

মহত্তর জীবনবোধে গরীয়ান ও সমাজের জন্য ত্যাগী চরিত্র সৃষ্টির পর ব্যক্তিগত প্রেরণা-নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা সমাজকে অধিকতর উন্নতিশীল করে তুলতে পারে।

কম্যুনিস্ট দেশ ও উৎপাদন ব্যবস্থা

কম্যুনিস্ট দেশগুলির মধ্যে রাশিয়াতেই সর্বপ্রথম রাষ্ট্রীয়করণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ব্যাপকভাবে চলে আসছে। গত ষাট বছরের অধিককাল পর্যন্ত এই পরীক্ষা প্রমাণ করেছে যে, রাষ্ট্রাধীন কারখানা বা যৌথ খামারের উৎপাদন আশানুরূপ নয়। রাশিয়ায় অফুরন্ত জমি ও অন্যান্য সম্পদ থাকা সত্ত্বেও এজন্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমেরিকা ও পশ্চিম জার্মানীর তুলনায় এই দেশটি অনেক পেছনে পড়ে আছে। অতীতে প্রেরণাহীন শ্রমিকের উপর শাস্তি-ব্যবস্থা ও পুরস্কার চালু করেও এর প্রতিকার বেশী দূর আগায়নি। আর এই জন্যই বর্তমান রাশিয়া ও বিশেষ করে চীন ব্যক্তিপ্রেরণা-নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা চালুর দিকে অধিকতর ঝুঁকে পড়তে বাধ্য হয়েছে।

এ কথা সত্য যে, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদদুষ্ট শোষণমূলক সমাজের অবসানের পর কম্যুনিজম শ্রেণীভিত্তিক একটা সমষ্টিগত প্রেরণা সৃষ্টি করতে পারে। এবং তারই ভর-বেগ (momentum) উৎপাদন ক্ষেত্রে কয়েক যুগ পর্যন্ত উৎপাদনের বেশ কিছুটা উন্নতি দেখাতে সমর্থ হয়। কিন্তু এর একটা সীমা আছে। ব্যক্তিস্বাধীনতাকে খর্ব করে এই যে বাধ্যতা-মূলক উৎপাদন নীতি—এটা এক সময় তার চূড়ায় (optimum) এসে আটকে পড়ে। তখন হাজারো শাসন ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থাতেও ব্যক্তি-প্রেরণাহীন এই ব্যবস্থা আগাতে পারে না। সেই অবস্থাই আজ ইউরোপের বিভিন্ন কম্যুনিস্ট দেশে প্রকট হয়ে উঠছে। সাথে সাথে একথাও মনে রাখতে হবে : রাষ্ট্রীয় কঠোর শাসনে অর্থনীতিক শোষণ দূর করে বন্টন ব্যবস্থায় অনেকটা সুস্থতা আনতে পারা গেলেও, এইসব রাষ্ট্রে মানুষের পরম কাম্য সম্পদ ব্যক্তি-মর্যাদা ও স্বাধীনতা হারাতে হয়। ফলে তার পরম আরাধ্য শান্তিও হয় বিপন্ন। মানুষের সম্মান ও জীবন হয়ে পড়ে নেহায়েত তুচ্ছ—অবহেলার বস্তু : যেমন হয়ে ওঠে সাম্রাজ্যবাদী আমলে

অধীনস্থ জাতিগুলির জীবনে। সবচেয়ে শিক্ষণীয় বিষয় হল ঃ কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে নামকরা কম্যুনিস্ট নেতাদের জীবন ও মর্যাদাও নিরাপদ থাকে না কখনও। রাশিয়ার ও চীনের কম্যুনিস্ট পার্টির ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে হাজার হাজার নয়—লাখ লাখ কম্যুনিস্ট কর্মী ও নেতা কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র দখলকারীদের হাতে নির্যাতিত, নির্বাসিত ও নিষ্ঠুরভাবে নিহত হয়েছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে শুধুমাত্র কম্যুনিস্ট মতবাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা স্তালিনের কম্যুনিস্ট নিধনের তুলনাবিহীন নজীর প্রত্যেককে এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ করে দেবে। আর এই অমানুষিক ইতিহাস—জগৎ লাভ করেছে রাশিয়ার কম্যুনিস্ট পার্টি ও ক্রুশ্চেভের মত কম্যুনিস্ট নেতাদের মাধ্যমেই।

শ্রেষ্ঠ অর্থনীতি

ক্ষুধা মানুষের সমস্যার একটি মূল। এর নিবৃত্তি প্রয়োজন। এটা ও অন্যান্য অভাব মেটানো সম্ভবপর হয় যদি উপযুক্ত পরিমাণে উৎপাদন ও শোষণহীন উপায়ে বন্টন করা হয়। উৎপাদন এবং বিশেষ করে বন্টনের সমস্যা আজকের সবচেয়ে বড় সমস্যা।

বিভিন্ন দেশে উৎপাদন ও বন্টন তরিকা বর্তমানে যেভাবে রয়েছে তা কুরআনিক অর্থনীতি বিরোধী। সুতরাং এর অবসান ও নতুন উৎপাদন ও বন্টন তরিকার প্রবর্তন আশু কর্তব্য।

শ্রেষ্ঠ অর্থনীতির উপাদান দুটি ঃ

১. যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় দেশের একটা অবস্থায় সর্বাধিক উৎপাদন সম্ভব হয়। আর—

২. যে ব্যবস্থায় দেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে উৎপাদিত দ্রব্য সুষমভাবে বন্টিত হয়।

কুরআনিক অর্থনীতিতে সামাজিক বা রাষ্ট্রিক সহযোগিতায় ব্যক্তিগত প্রেরণা ও দেশে মওজুদ অর্থের অধিকতম (maximum) ব্যবহারের সুযোগ থাকায় এইরূপে গঠিত সমাজ ব্যবস্থায় একটা নির্দিষ্ট অবস্থায় সর্বাধিক উৎপাদন সম্ভব।

সমাধান তরিকা

উপরের নীতিগুলি বাস্তবায়নের জন্য তিন রকমের তরিকা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় কার্যকরী করা যেতে পারে।

প্রথম, সমস্ত উৎপাদন ব্যবস্থাগুলি (জমি কারখানা ইত্যাদি) সরাসরি রাষ্ট্রীয় অধিকারে নিয়ে তার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ।

দ্বিতীয়, রাষ্ট্র উৎপাদন ব্যবহারগুলি ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের হাতে ছেড়ে দেবে ; এবং যাতে উপযুক্ত পরিমাণে উৎপাদন হয় ও ন্যায়সংগতভাবে বন্টন হয় তা নিয়ন্ত্রণ করবে।

তৃতীয়, অংশিদারী (বা সামগ্নিক) ব্যবস্থার মাধ্যমে উৎপাদন ব্যবস্থাগুলি পরিচালন।

জাতীয়করণ বা রাষ্ট্রীয়করণ বলা ঠিক নয়, একে বরং মানবীয়করণ বা সমাজকরণ বলা উচিত। জাতীয়করণ বললে শুধু সীমাবদ্ধ একটি নির্দিষ্ট স্থানের অধিবাসীদের সম্পত্তি ও ভোগের অধিকার বোঝায়। এটা সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের পরিপোষক ও বিশ্বভ্রাতৃত্ববিরোধী। কুরআনিক চিন্তাধারায় অতিরিক্ত সম্পত্তি পৃথিবীর সকলের (এমনকি অন্যান্য জীবের) জন্যই।

তবে একথাও মনে রাখতে হবে যে, রাষ্ট্রচালনায় আদর্শ ব্যক্তি ও গোষ্ঠী ছাড়া রাষ্ট্রীয়করণ মারাত্মক কুফল সৃষ্টি করে। অথচ আদর্শ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বর্তমান যুগে দুর্লভ।

রাষ্ট্রীয়করণে একটি সীমাবদ্ধ রাষ্ট্রের মালিকানা বা কর্তৃত্ব ধরে নেওয়া হয়। জাতীয়করণের মত এটাও বিশ্বভ্রাতৃত্বের পরিপন্থী। এই জন্য সব কিছুর মালিক রাষ্ট্র হলে রাষ্ট্র স্বেচ্ছাচারী হবার পুরা সম্ভাবনা। রাষ্ট্র কোন কিছুর মালিক নয়—কুরআনিক ভাবধারা অনুযায়ী সমস্ত সম্পত্তি ও শক্তি আল্লাহ্‌র।

আদর্শ রাষ্ট্র উপরে বর্ণিত এই তিনটি তরিকার যে-কোন একটি বা আংশিকভাবে দুটি বা তিনটিই গ্রহণ করতে পারে। শুধু দেখতে হবে—যে বা যে তরিকাগুলি গ্রহণ করা হবে তাতে মানুষের সার্বিক মঙ্গল হবে কি না।

মানুষের সঠিক মঙ্গল সাধনই কুরআনিক অর্থনীতির মূল কথা ; এই মঙ্গল সাধনের জন্য অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা করাই যৌক্তিক নীতি। এ জন্যই কুরআনে শত্রুদের সম্বন্ধে অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন নির্দেশ দেওয়া

হয়েছে। কোন সময় বলা হয়েছে—সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে, আবার কোন সময় বলা হয়েছে বন্ধুত্ব বা সন্ধি করতে ; আবার কোন সময় বলা হয়েছে নিরপেক্ষ থাকতে। (সূরা কাফিরূন ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।)

শত্রুরা যখন মারতে আসে, তখন যুদ্ধ করতে বলাই উচিত ; তারা যখন নিরপেক্ষ থাকে তখন অতি ঘনিষ্ঠতা বা শত্রুতা ক্ষতিকর। মূল কথা মানুষের মঙ্গলের জন্য সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা—এর জন্য বিভিন্ন অবস্থায় ও পরিবেশে বিভিন্ন যৌক্তিক ব্যবস্থা অবলম্বন করাই আদর্শিক নীতি। হযরত আদম (আঃ) হতে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) পর্যন্ত ইসলামের যে ইতিহাস তাতেও আমরা পাই একই সত্য. মানুষের সব দিকের কল্যাণ সাধনের জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর নবীরা স্থান-কাল ও পরিবেশ অনুযায়ী বিভিন্ন রকমের ন্যায়সংগত প্রয়োগ তরিকার ব্যবস্থা দিয়েছেন। এই জন্যই ইহুদীদের বা খ্রীস্টানদের যে ইবাদত-রীতি দেওয়া হয়েছিল, তা মুসলমানদের রীতি হতে ছিল কিছুটা ভিন্নরূপ। তবে দেখতে হবে ঃ কোন ব্যবস্থা যেন মৌলিক নীতির বিরোধী না হয়।

আগেই বলা হয়েছে মানুষের মঙ্গল সাধনের জন্য উৎপাদন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের তিনটি পরীক্ষা আছে।

(ক) যে তরিকা নেওয়া হবে তাতে সর্বাধিক উৎপন্ন হবে কি না।
(খ) সে তরিকায় সুষ্ঠু বন্টন ব্যবস্থা সম্ভবপর কি না।
(গ) সে তরিকা মানুষের প্রকৃতি অনুযায়ী কি না।

মানুষের মৌলিক প্রকৃতিকে ভিত্তি করে সম্যক উৎপাদন ও বন্টন যে বা যে তরিকাগুলির দ্বারা সম্ভবপর, সেই তরিকাই পরিবেশ অনুযায়ী আদর্শ তরিকা।

বর্তমানে বিভিন্ন দেশে যে পরিবেশ চলছে তাতে অবস্থানুযায়ী উপরে বর্ণিত তিনটির এক বা একাধিক তরিকা (২৬৭ পৃঃ) আংশিকভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

বিভিন্ন অর্থনৈতিক তরিকা

দুনিয়ায় বর্তমান দুইটি প্রধান অর্থনৈতিক তরিকা বিদ্যমান রয়েছে, পুঁজিবাদী তরিকা ও সাম্যবাদী তরিকা। প্রথমটা প্রধানত ব্যক্তিনির্ভর,

দ্বিতীয়টা প্রধানত রাষ্ট্রনির্ভর। এইখানে আদর্শনির্ভর ইসলামী তরিকার রূপরেখাও বিবেচ্য। এইগুলি ২৭৩ পৃষ্ঠায় তুলনামূলকভাবে পাশাপাশি দেখানো হয়েছে।

খিলাফতের সময়ে বায়তুলমাল সম্পূর্ণরূপে খিলাফত দ্বারা পরিচালিত হত। বর্তমানে প্রয়োজনানুসারে ব্যাংকগুলি বায়তুলমালের অংশ হিসাবে রাষ্ট্র দ্বারা পরিচালিত হতে পারবে। এ ছাড়া নির্দিষ্ট জমি ও কারখানা বা অন্যান্য বৃহৎ সম্পত্তিও রাষ্ট্রের সরাসরি পরিচালনায় আনা যায়। অন্যদিকে হযরত ওমর (রাঃ)-এর সময়ে বহু জমিদারী রাষ্ট্রায়ত্ত করে চাষীদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয়েছিল। যারা জাতীয়করণের নামে আঁতকিয়ে ওঠেন তারা যেন ভুলে না যান যে, বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রসহ বহু পুঁজিবাদী দেশেও রেলওয়ে-শিল্প ও অন্যান্য অনেক কিছু জাতীয়-করণের ভিত্তিতে চলছে। তবে মনে রাখতে হবে রাষ্ট্রীয়করণের অবশ্যম্ভাবী কুফলগুলি এড়াতে হলে ভাইয়ালী ব্যবস্থা অনুসরণ করা উচিত। বর্তমানেও জোতদারী ও বড় বড় মালিকানা উচ্ছেদ করে চাষীদের মধ্যে জমি বন্টনও করে দেওয়া যেতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে বন্টিত জমিতে কারো মালিকানা স্বীকৃত হবে না, অধি-কার (possession) স্বীকৃত হবে মাত্র। যাতে ভাল উৎপন্ন হয় ও জনসাধারণের মঙ্গল হয়, তজ্জন্য রাষ্ট্র আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিদের প্রতিনিধি হিসাবে সেই জমির পুনর্বন্টনের অধিকারী হবে। অধিকন্তু যাতে কোন রকম শোষণ ব্যবস্থা কায়েম না হয় তজ্জন্য রাষ্ট্র ন্যায়সঙ্গত ও বিচারসম্মত সব রকম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করতে পারবে।

অতীতে ও বর্তমানে মসজিদ ও তৎসংলগ্ন জমি এবং অন্যান্য সম্পত্তি সর্বসাধারণের সম্পত্তি হিসাবে পরিগণিত হয়ে আসছে। এটা কমবেশী সম-অংশিদারী তরিকা বিশেষ। উন্নত চরিত্র সৃষ্টি করতে পারলে, এই তরিকায় জমি ও কারখানা ইত্যাদি পরিচালনা করা যেতে পারে।

অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রের হাতে না দিয়ে জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত সমবায় মিলন (Federation of Co-operatives) নিয়ন্ত্রণ করলে সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা পাবে বলে অনেকের পুরোপুরি ধারণা। সত্যই রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতা দুটি একই লোক বা লোকগোষ্ঠীর (সরকারের) হাতে পড়লে তার

অপব্যবহার হওয়ার আশংকা প্রায়ই থাকে। এইজন্য শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের মত অর্থনৈতিক বিভাগকেও নিজ নিয়ন্ত্রিত কো-অপারেটিভ-এর হাতে দেওয়া হলে ক্ষমতার অপব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

কিন্তু প্রশ্ন হল—সুষ্ঠু আদর্শ, উন্নত চরিত্র ও সুপরিবেশ সৃষ্টি ছাড়া সমবায় তরিকা যে সফল হয় না তাও বিবেচ্য। বিভিন্ন দেশের শাসন ও গণতন্ত্রগুলির অব্যবস্থার কারণও এই। আল্লাহ্ ও পরকাল-নির্ভর, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ববোধ—এ ধরনের সমবায়কে সাফল্য দান করতে পারে। উন্নত চরিত্র ও দায়িত্ব সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত সমবায়গুলিতে আদর্শিক ও সংরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক হতে পারে।

আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজ

আমরা মনে করি না দুনিয়ার সকল মানুষ ফেরেশতা হতে পারে। সু ও কু—ব্যক্তি-স্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থের সমন্বয়ে মানুষ। এর নিয়ন্ত্রণের জন্য যে কোন রকমের হোক রাষ্ট্রীয় শক্তি মানবসমাজের জন্য অপরিহার্য ; কিন্তু রাষ্ট্রীয় (বা সামাজিক) নিয়ন্ত্রণ হবে যথাসম্ভব কম। এইজন্য কুরআন তৌহিদবাদ ও পরকালের বিশ্বাসের ভিত্তিতে এক মহান নৈতিক শক্তির সৃষ্টি করে—যাতে মানুষ কামেল বা 'পূর্ণ' হবার দিকে এগোতে পারে। এই শক্তির ভিত্তিতেই এক সময়ে ব্যক্তি ও সমাজের উপর রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রভাব নিতান্ত নগণ্যভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। বর্তমানের মত কোন বিরাট অফিস বা কোন অতিরিক্ত রাষ্ট্রীয় আইনের দ্বারা গণ-জীবন নিয়ন্ত্রণ করতে হত না। জনগণ স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও সেবা-মূলক কাজে এগিয়ে আসত। আর সেজন্যই খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে মসজিদে বা খেজুর গাছের নীচে বসেও বিরাট রাজ্য শাসন করা সম্ভবপর হয়েছিল।

বিভিন্ন অর্থনীতির তুলনা

পশ্চিমা পুঁজিবাদী অর্থনীতি (ব্যক্তিনির্ভর)	কুরআনিক অর্থনীতি (আদর্শনির্ভর)	কম্যুনিস্ট অর্থনীতি (রাষ্ট্রনির্ভর)
এখানে—	এখানে—	এখানে—
১। অর্থনৈতিক সংগঠনে ও ভোগে ব্যক্তির বিরাট স্বাধীনতা থাকে। এজন্য এখানে স্বার্থের প্রেরণা (incentive) থাকে। এই ব্যবস্থায় অসাম্য ও শোষণের স্কোপ থাকে।	১। অর্থনৈতিক সংগঠনে ও বন্টনে ব্যক্তির নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা থাকে। রাষ্ট্র এখানে নীতির মাধ্যমে সহযোগিতাপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়। এতে ব্যক্তির অর্থনীতিক প্রেরণা অটুট থাকে—তার সাথে পরকালীন বা মহত্তর জীবনবোধের প্রেরণাও যুক্ত হয়। এই উভয় প্রেরণা উৎপাদনে ও সংগঠনে এবং শোষণহীন ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সমাজ সংগঠনে সাহায্য করে। শোষণের অবকাশ থাকে না।	১। অর্থনৈতিক সংগঠনে ও বন্টনে রাষ্ট্রই সবকিছুর নিয়ামক। উৎপাদনে ও সংগঠনে এখানে প্রেরণার অভাব দেখা দেয়। অর্থনৈতিক শোষণের অবকাশ থাকে কম।
২। রাজনৈতিক স্বাধীনতা স্বীকৃত; যদিও অর্থনীতিক অসাম্যের জন্যে দেশের একটি বিরাট অংশ এই স্বাধীনতার অবাধ স্বাদ ভোগ করতে পারে না। জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকৃত হয়।	২। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তি সর্বাধিক স্বাধীনতা ও মর্যাদা ভোগ করে। সামাজিক সাম্য ও অর্থনীতিক ভারসাম্য বজায় থাকে।	২। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক এ দুটো মূল বিষয় রাষ্ট্রের অবাধ নিয়ন্ত্রণে থাকে বলে রাষ্ট্র হয়ে ওঠে মহাশক্তিশালী ও অদমনীয়। এইজন্য ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তি মর্যাদা এখানে একেবারে নগণ্য। পার্টি-ডিক্টেটরশীপের অধীনে রাজনৈতিক শক্তির অপব্যবহার ঘটে থাকে।
৩। ঢিলা শাসনে দুশ্চরিত্র ও দুর্নীতির অবকাশ থাকে।	৩। দুশ্চরিত্র ও দুর্নীতির অবকাশ কম।	৩। দুর্নীতির অবকাশ কম।

৪
জমি সমস্যা

বিভিন্ন দেশে বর্তমানে জমি ও শিল্পকে কেন্দ্র করে অর্থনৈতিক অব্যবস্থা চলছে। ব্যক্তি বা দল বিশেষের হাতে এ দুটি মূল বিষয় কেন্দ্রীভূত হওয়ায় সমাজে অর্থনৈতিক বিশৃংখলা কায়েম হয়েছে।

অতীতের বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতের উদাহরণ নিলে দেখা যায়—এখানে জোতদারী ও বড় বড় মালিকানাগুলির অধিকাংশই হালাল রুজি ছিল না। ছিল প্রকৃত কৃষকদের থেকে ছলেবলে কৌশলে কেড়ে নেওয়া জমি—বৃটিশ ও অন্যান্য শাসকদের দেওয়া আদর্শ বিরোধী অনুগ্রহ মাত্র। আবার পরবর্তীকালে যারা জোতদারী ও জমিদারী কিনেন—তাঁদের অধিকাংশই সুদের ও ঘুষের মারফত জমানো টাকা দ্বারা তা আয়ত্ত করেছিলেন। অনেক জমিদারী যে নিলামে ওঠে—তার কারণও সুদ ব্যবসায় ও সামাজিক দুর্নীতি।

অতি অল্পসংখ্যক জমিদারী হালাল রুজির দ্বারা অধিকারভুক্ত ছিল বলে অনেকে মনে করতে পারেন। কিন্তু তাও সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত বলা সম্ভব নয়। বর্তমানে ব্যবসায়ের দ্বারা বা চাকুরী দ্বারা বিরাট সম্পত্তি ও কারখানাদির প্রতিষ্ঠা হচ্ছে—তাদের শতকরা কত ভাগ ঘুষ ও দুর্নীতিমুক্ত তা বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে জনগণের হালাল রুজি কিভাবে শিক্ষিত বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা আত্মসাৎ করে লাখপতি হয়েছেন।

দ্বিতীয়ত ব্যক্তি-পূজা, মদ, যৌন-ব্যভিচার ও অন্যান্য সব রকম অসামাজিক কাজের মূলে রয়েছে অভিজাততন্ত্র, জমিদারী, জায়গিরদারী প্রভৃতি ব্যবস্থা। সুতরাং এগুলির উচ্ছেদ—প্রত্যেক আদর্শবাদীর জন্য কাম্য হয়ে ওঠে।

এজন্য চাই—এসব অনাদর্শিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ করে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত আদর্শিক রাষ্ট্র,—সর্বসাধারণের সুখ ও শান্তির জন্য যা যুগোপযোগী বন্টন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কায়েম করবে এবং

উৎপাদনের অন্যান্য ব্যবস্থাগুলিও এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে যাতে কোন রকম শোষণ-ব্যবস্থা (একের পরিশ্রমলব্ধ অর্থ অন্যের বিনাশ্রমে আত্মসাৎ) কিংবা ক্ষতিকর বিলাসিতা কায়েম হতে না পারে আর যাতে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত প্রেরণা অক্ষুণ্ণ থাকে।

জমি-বন্টনের নীতি

বর্তমানে এশিয়া ও আফ্রিকার প্রায় সবখানে জমি সমস্যাই বড় সমস্যা— অন্যান্য মহাদেশেও কম-বেশী এই সমস্যার গুরুত্ব খুবই বেশী। ১৯৬১ সনের আদমশুমারীতে দেখা যায় পূর্ব বাঙলার ৬৪ ৬৪ ৪০০ পরিবারের মধ্যে প্রায় ৬২ লাখ পরিবারের অনেকের জমি নেই কিংবা কোন কোন পরিবারের জমির পরিমাণ ১ বিঘা থেকে ৩ বিঘার মধ্যে। এশিয়া, আফ্রিকা ও অন্যান্য বহু দেশের শতকরা প্রায় ৮০-৯০ ভাগ জমি শতকরা ১০ জনের মত লোক দখল করে আছে। এইসব দেশে প্রকৃত চাষীদের অধিকাংশের নির্ভরযোগ্য কোন জমি নেই।

কুরআনিক নীতি অনুযায়ী—জমির উপর থেকে রাজা, জমিদার বা জায়গীরদারদের মালিকানা উচ্ছেদ করতে হবে। প্রাকৃতিক সম্পদ হিসাবে এতে আল্লাহ্‌র মালিকানাই স্বীকৃতি পাবে। আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্র সেই জমি—জমিনির্ভর ব্যক্তি ও ব্যক্তি-গোষ্ঠীর মধ্যে বন্টন করে দেবে। কারণ জমিতে যারা চাষাবাদ করবে তাদেরই অগ্রাধিকার থাকবে। এই বন্টনের দ্বারা যারা জমি পাবে, তারাও মালিক হবে না—হবে জিম্মাদার মাত্র। রাষ্ট্র জমির পরিমাণ ও গুণের উপর নির্ভর করে দরকার হলে খাজনা ধার্য করবে।

জমির মালিক কোন ব্যক্তি বিশেষ নয় বলে পরবর্তীকালে এর হস্তান্তরে স্থানীয় সরকারী অনুমতি দরকার হবে। জমিতে শ্রমে পাওয়া উৎপন্ন দ্রব্য বেচাকেনা করার অধিকার সকলের থাকবে।

নিজেদের পরিশ্রমে ও উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বস্তুতে উত্তরাধিকার আইন প্রয়োগ করা যাবে। উত্তরাধিকারী ব্যক্তিদের মধ্যেই যথাসম্ভব জমি বন্টন নীতি গ্রহণ করা হবে।

জমিতে যারা শ্রম করে উৎপন্ন করবে তারাই জমির জিম্মাদারী হওয়ার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। শ্রমকারীর শ্রমের পরিমাণ, তার প্রয়োজন

ও সমাজে অন্যান্যের প্রয়োজনের বিচারে বন্টিত জমির পরিমাণ নির্ধারিত হবে। বিভিন্ন কারণে পরিবারগুলির লোকসংখ্যা কমবেশী হয়ে ভারসাম্য নষ্ট হলে গ্রাম্য খিলাফত কয়েক যুগ অন্তর জমির পুনর্বন্টন করার অধিকারী হবে। কিন্তু পুনর্বন্টন ঘন ঘন করা চলবে না। ঘন ঘন হাত বদলে স্থিতিশীলতা ও ব্যক্তিপ্রেরণা নষ্ট হয়ে যাবে। পুনর্বন্টনের সময় দরকার বোধে জমির উন্নয়নের জন্য একটা খেসারত ধার্য করা যাবে।

আদর্শ ব্যবস্থা

জমির ব্যাপারে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে—

(ক) চাষীরা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত প্রেরণার অভাববোধ করবে না।

(খ) আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সার প্রভৃতি ব্যবহারে কোন অসুবিধার সৃষ্টি হবে না।

এই দুইটি নীতি কার্যকরী করতে পারলে একদিকে যেমন উৎপাদন যাবে বেড়ে অন্যদিকে বন্টনেও একটা সুন্দর ও সুষম ব্যবস্থা পাওয়া যাবে।

ব্যক্তিগত প্রেরণা-বৃদ্ধি ও অভাব দূর করার জন্য প্রথম দরকার—খামারের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক চাষীকে যতটুকু সম্ভব আবশ্যকীয় জমি প্রদান। এই জমির অধিকারী হিসাবে তাতে তার যে যে পর্যায়ে দরকার সে সে পর্যায়ে স্বাধীনভাবে ব্যক্তিগত পরিশ্রম দেবে, তদারক করবে এবং খামারের সমিতিগত কর্তব্য পালন করে নিজ নিজ অধিকারের জমির ফসল নিজে ভোগ করার অধিকার পাবে।

ধরা যাক—কোনও গ্রামে অধিবাসীদের নিয়ে এইরূপ একটি খামার ও তার পরিচালনার উদ্দেশ্যে তাদের নির্বাচিত একটি সমিতি বা সমাজ গঠিত হল। বড় বড় যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুবিধা থাকলে এই জমিকে বড় বড় সমতলে ভাগ করা হবে—কিন্তু প্রতি চাষীর অধিকারের জমির সীমা রক্ষা করার জন্য সীমা-ঘাস রোপণ করা বা চিহ্ন রাখা হবে।[১] সমিতির সকল সদস্যের চাঁদায় বা বায়তুলমালের সাহায্যে বা ঋণে ট্রাক্টর, পানি সেচনের দমকল প্রভৃতি সংগ্রহ করে সমিতির অফিসে কিংবা বায়তুলমালে

১. পল্লী অঞ্চলে একরকম বড় বড় ঘাস উৎপন্ন হয়—যা জমির চারপাশে রোপণ করলে স্থায়ীভাবে সীমা নির্দিষ্ট থাকে।

সঠিকভাবে মওজুদ করা হবে। জমির পরিমাণ, অবস্থান ও আবশ্যকতা অনুসারে প্রত্যেক সদস্যের চাঁদা নির্ধারিত হবে। সময় মত জমিতে সমিতির ট্রাক্টর দিয়ে চাষ করা হবে—দমকল দিয়ে পানি সেচন করা হবে—আবশ্যকবোধে সমিতির বা বায়তুলমালের খরচে খাল-নালা কেটে পানি সরবরাহ বা পানি নিস্কাশন করা হবে। কিন্তু সীমা-ঘাস বা চিহ্ন দ্বারা যার যার জমি আলাদাভাবে চিহ্নিত থাকবে। সেই জমিতে চাষীরা নিজে স্বাধীনভাবে ব্যক্তিগত শ্রম দিয়ে সমিতি হতে উপযুক্ত সার কিনে বা ধার নিয়ে জমিতে প্রয়োগ করে এবং যাবতীয় তদারক করে অধিক ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা করবে। ফসলে রোগ ধরলে বা পোকায় ধরলে যেখানে সম্ভব ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় আর যেখানে সম্ভব নয় সমিতির প্রচেষ্টায় ওষুধ প্রয়োগের ব্যবস্থা থাকবে। ফসল কাটবার সময় আবশ্যক অনুযায়ী ব্যক্তিগত ও সমিতিগতভাবে তা কেটে ঝেড়ে যার যার জমির ফসল নিয়ে সে গোলায় তুলবে। ফসল তোলার সময় উৎপন্ন ফসলের একটা অংশ জাকাত হিসাবে সে স্বেচ্ছায় বায়তুলমালের সমিতি অফিসে জমা দেবে। সরকারী কোন সাহায্য পাওয়া গেলে তাও বায়তুলমালের অন্তর্ভুক্ত হবে। এই বায়তুলমাল দুর্ভিক্ষের সময় অভাবগ্রস্ত সদস্যদের ফসল ধার দেবে, দান করবে, অভাবের সময় লাঙ্গল-গরু প্রভৃতি কিনে দেবে। আবশ্যক হলে এই বায়তুলমালের টাকায় যন্ত্রপাতি কেনা হবে। প্রতি বায়তুলমাল অফিসে অন্তত একজন কৃষি-বিশারদ নিযুক্ত থাকবেন। এই বায়তুলমালের টাকায় কৃষকদের ছেলে-মেয়েদের বিনা বেতনে পড়বার মত কৃষিশিক্ষা-প্রধান দিনের ও রাতের স্কুল চালানো হবে। তাছাড়া সময় সময় নির্দোষ গান, আমোদ-আহ্লাদ এবং ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাও বায়তুলমালের টাকায় সমাধা করা যাবে। খামারের মধ্যে নিরক্ষরতা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে।

এইরূপ ব্যবস্থাই হবে আদর্শ কৃষিব্যবস্থা। এতে সমবায় নীতির গুণ থাকবে, কিন্তু তার ঢিলেমী বা দুর্নীতির সুবিধা (scope) থাকবে না। যৌথ খামারের মত বৃহৎ যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ব্যবহারের সুবিধা থাকবে, কিন্তু ব্যক্তিগত প্রেরণা ও স্বাধীনতা হতে চাষীরা বঞ্চিত হবে না। খাঁটি ধর্মীয় আদর্শের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হবে বলে সমিতির ও বায়তুলমালের মাধ্যমে পরোপকারেরও একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। আর এটাই

হবে কল্যাণমুখী ধনবিদ্যার অনুসারী ভ্রাতৃ-সমাজ-সুলভ প্রক্রিয়া। আর এটাই হল আদর্শ তরিকা।

বড় যন্ত্রপাতি ও কৃষক গোষ্ঠী

জমি-নির্ভর ব্যক্তিদের মধ্যে জমি বন্টনের যে সমাধান এখানে দেওয়া হয়েছে—তাতে প্রত্যেক কৃষকই জমিকে আপনার ভেবে অধিকতর ফসল যে উৎপন্ন করবে তাতে সন্দেহ নেই। এতে বড় যন্ত্রপাতি ব্যবহারেরও কোন অসুবিধা হবে না। যে স্থানে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যায় সেখানে তা ব্যবহার করা হবে। ছোট ছোট খণ্ড জমির জন্য যদি তা ব্যবহার করতে অসুবিধা ও ব্যয়বহুল হয়, সেখানে কৃষকেরা সুবিধা মত একটি গোষ্ঠীর সৃষ্টি করে কাজ চালাবে। আগেই বলা হয়েছে বড় যন্ত্রগুলি (যেমন ট্রাক্টর) সকলের খরচে বায়তুলমাল হতে কেনা হবে এবং তা সাধারণ সম্পত্তি হিসাবে বিবেচিত হবে। দরকার হলে স্থানীয় বায়তুলমাল হতে এই সমস্ত যন্ত্রপাতি ধারে বা ভাড়ায় দেওয়া যাবে। অবস্থা অনুযায়ী পানি সেচন বা নিষ্কাশনের ব্যবস্থাও গোষ্ঠীর সকলের খরচে ও পরিচালনায় চলতে পারে। যেখানে যতটুকু ব্যক্তিগত শ্রমের দরকার তা সমাধা করে উৎপন্ন শস্য প্রত্যেক চাষীই গ্রহণ করতে পারবে।

এই ব্যবস্থায় অধিকতর ফসলের জন্য উন্নত বীজ, ভাল সার, বন্যা-নিরোধ, জল-সেচন, শস্য-পরিবর্তন, ক্রস-ব্রিডিং প্রভৃতির আশ্রয় নিতে কোন অসুবিধা হবে না। ধান, পাট, ইক্ষু প্রভৃতিসহ বিভিন্ন শস্যের উপযুক্ত মূল্য যাতে কৃষকেরা পায় তজ্জন্য কৃষকদের শেয়ারে একটি 'অংশিদারী প্রতিষ্ঠান' গঠন করে তার দ্বারা বিক্রির কাজ সমাধা করা যেতে পারবে। অন্যথা গ্রাম্য বায়তুলমাল চাষীদের অভাবের সময়ে ন্যায্যমূল্যে তাদের উৎপন্ন শস্যাদি কিনে রাখবে—উপযুক্ত সময়ে তা ন্যায্যমূল্যে বিক্রয় করা যাবে।

দুর্ভিক্ষ নিবারণ

বন্যা, অনাবৃষ্টি বা পোকায় কাটার জন্য কোন দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হলে—তা হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রতিটি কেন্দ্রে সকলের অংশ নিয়ে এক একটি ধর্ম-গোলা (বায়তুলমালের শাখা হিসাবে) স্থাপন করা যাবে। দেয় ফসলের পরিমাণ সরকারের প্রাপ্য করের অনুপাতে ধার্য করা যাবে। সরকারও

করের সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক ধর্মগোলায় রেখে দেবে। নতুন বছরে নতুন ফসল উঠলে—ধর্মগোলাগুলির পুরাতন ফসল বেচে যার যা প্রাপ্য তা নিয়ে যাবে। নতুন শস্য নিয়ে আবার ধর্মগোলাগুলি ভরে তোলা হবে। এতে শস্য নষ্ট হবার ভয় দূর হবে। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত অঞ্চলে অন্য জায়গার ধর্মগোলা হতেও শস্য অতি সত্বর আনার বন্দোবস্ত করা যাবে।

ধর্ম-গোলাগুলি বায়তুলমাল ও চাষীদের প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত হবে। যাকাত ও ফিতরা হতে পাওয়া টাকা বা ফসলও বায়তুলমালে সঞ্চিত হবে। এইরূপে জমানো শস্য ও অর্থ দ্বারা দুর্ভিক্ষ রোধ ও অন্যান্য অভাব দূর করা যাবে।

যাকাত

শোষণমূলক সমাজ ব্যবস্থায় কুরআনিক নীতি পুরোভাবে কার্যকরী হতে পারে না। শোষণমূলক সমাজ-ব্যবস্থায় হালাল রুজি কল্পনা করা কঠিন। সেই সমাজ ব্যবস্থা উচ্ছেদ করে আদর্শ সমাজ কায়েম করার পরই শুধু এই নীতি বা আইন সফলভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে।[১] এখানে বর্ণিত তরিকা গ্রহণ করার পর যে সমাজ ব্যবস্থা কায়েম হবে তাতে অভাবী বলে কেউ থাকবে না। সেখানে সম্পত্তির শতকরা আড়াই ভাগও প্রকৃত অভাব পূরণে অতিরিক্ত হয়ে পড়বে। তখনই খিলাফতের সময়ের মত এমন অবস্থা হবে 'যেখানে যাকাত দেওয়ার লোক থাকবে কিন্তু নেওয়ার লোক পাওয়া যাবে না'।[২] এভাবেই আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি হবে। তখন যাকাত দ্বারা সরকার (খিলাফত) জনহিতকর অনেক কাজ সমাধা করতে পারবেন।

---

১. জান বাঁচানো ফরজ। যে দেশে লোক কাজ ও খাদ্যের অভাবে স্ত্রী-পুত্রসহ অনাহারে মরে—সে দেশে হতভাগ্যদের চুরি করা গুনাহই নয়। এবং এজন্যে চুরি করলে তাদের হাত কাটার আইনও প্রয়োগ হতে পারে না। সকলের খাওয়া-পরার বন্দোবস্ত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। এরপরই শাস্তি দেওয়ায় কথা ওঠে। এইজন্যই হযরত উমর দুর্ভিক্ষের সময় হাত কাটা সাময়িকভাবে রদ করে দিয়েছিলেন। মূল কথা: আদর্শ-আইন আদর্শ সমাজেই প্রযুক্ত হতে পারে—অন্য সমাজে নয়। অনৈসলামী ফুটা কলসিতে' 'ইসলামী পানি' যতই ঢালা হোক না কেন—তাতে কলসি কখনো ভরবে না। পচা ভিতের উপর নতুন ইটের সমাবেশ শুধু ধ্বংসের আশংকাই বাড়িয়ে তুলবে।

২. খিলাফতের কোন কোন সময় এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে, তখন দেশে যাকাত নেওয়ার লোক পাওয়া যায়নি, ফলে অন্যান্য দেশে তা বিতরণ করতে হয়েছিল।

জমি ও বেকার সমস্যা

দুনিয়ার বহু দেশে আজও কোটি কোটি আদম সন্তান শুধু অনাহারে অর্ধাহারে থাকছে তা নয়—কাজের অভাবে বছরের অধিকাংশ সময় বেকার অবস্থায় ধুঁকে মরছে। এজন্য পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক অব্যবস্থাই দায়ী। কুরআনের ভাষায় পৃথিবীতে সম্পদের অভাব নেই। এই সম্পদ আহরণের জন্য আল্লাহ্ বুদ্ধি ও শক্তি দিয়েছেন। কৃত্রিম সামাজিক অব্যবস্থা সৃষ্টি করে মানুষ—সে জ্ঞান-বুদ্ধি-শক্তির শতকরা ৯০ ভাগকে শোষণ করার কাজে ব্যস্ত রেখেছে অপরকে পদানত করে। এতে ধন-মরীচিকার পেছনে দৌড়ে দৌড়ে নিজে শান্তি পাচ্ছে না—অন্যকেও শান্তি দিচ্ছে না। এই সমস্ত দেশে সম্পদ আহরণের জন্য মানুষেরও অভাব নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, এ সত্ত্বেও মানুষ কাজ পাচ্ছে না। পাচ্ছে না জীবনরক্ষার উপযোগী ব্যবস্থা।

এখানে সেখানে আল্লাহ্‌র দেওয়া অফুরন্ত সম্পদের মাঝে থেকেও মানুষ খাওয়ার, পরার ও থাকার ব্যবস্থার অভাবে অসহায়ভাবে পশুর মত মরণের সাথে এগিয়ে চলছে। এ যেন মহাসাগরের অথৈ পানিতে বিচরণ করেও অসংখ্য মাছ পানির অভাবে মারা যাচ্ছে।

দুনিয়ার মানুষের চেয়ে অর্থনৈতিক বড় সম্পদ আর কিছুই নেই। অথচ বহু দেশে সেই মহান সম্পদ বেকার অবস্থায় নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। এর চেয়ে করুণতর অবস্থা আর কি হতে পারে।

অন্য সম্পদের কথা বাদ দিলেও আল্লাহ্ যে জমিসম্পদ দিয়েছেন, তাও যদি সঠিকভাবে বন্টিত ও ব্যবহৃত হত, তাহলে দুনিয়ার ৬০% বেকার সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। অর্থনীতিকে সঠিকভাবে চালনা করে বাকী ৪০% বেকারকে শিল্প ও অন্যান্য পরিবর্তিত সম্পদ তৈরির কাজে লাগানো যেত অতি সহজে। এখনো অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া ও কানাডার মত বহু বিরাট দেশ আছে, যেখানে মানুষের অভাবে বহু জমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। আবার এশিয়া ও আফ্রিকায় বিভিন্ন দেশ আছে, যেখানের অধিকাংশ জমি গুটিকয়েক লোকের কবলে আবদ্ধ থাকায় সেই জমির সম্যক ব্যবহার হচ্ছে না আর এইসব দেশের অধিকাংশ লোক বেকার অবস্থায় দারিদ্র্যে দিনাতিপাত করছে—প্রতি বছর অসংখ্য লোক অনাহারে মারা যাচ্ছে।

উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, ১৯৭০ সনের দিকে বাংলাদেশের ৪ কোটি চাষীর প্রায় শতকরা ৪৪ ভাগ লোক থাকে বেকার, বাকী ৫৬ ভাগও বছরের

চার মাস কাজ পায় না। অন্য কথায় এখানকার কর্মঠ চাষীদের শতকরা ৭৫ ভাগ মূল্যবান সময় অকেজোভাবে বিনষ্ট হয়। প্রত্যেকের বেতন দৈনিক ৩ টাকা করে ধরেও (তখনকার বেতন হার) হিসাব করে দেখা গেছে ঃ শুধু বাঙলাদেশেই লোক সম্পদের ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় বছরে প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা। আর যদি বেতনের হার দৈনিক ত্রিশ টাকা ধরা হয় তবে তা দাঁড়াত ত্রিশ হাজার কোটি টাকা আর বর্তমান মজুরি ও লোকসংখ্যার ভিত্তিতে এই ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকার বেশী। সারা দুনিয়ায় এই হিসাব নিলে বোঝা যাবে কী অবিশ্বাস্য রকমের বিরাট অপচয় সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানব-জাতি প্রতিদিন সয়ে যাচ্ছে। আরও লজ্জার কথা ঃ এত অপচয় সত্ত্বেও অধিকাংশ সভ্যদেশের অনেক সরকার তাদের আয়ের সিংহভাগ দেশরক্ষার নামে যুদ্ধের সরঞ্জামে এবং সৈন্যদল পালনের অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতায় মানব জাতিকে মহা-ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

দুনিয়াব্যাপী ভ্রাতৃত্বের সমাজ-ব্যবস্থা কায়েম না হওয়া পর্যন্ত এই শয়তানী পরিবেশের শেষ হবে না। সেই ভ্রাতৃ-সমাজে বেকার ও অভাবী বলে কেউ থাকবে না। মানবজাতি সেই দিনের জন্যই প্রতীক্ষা করছে অধীরভাবে।

৫

শিল্প সমস্যা

শিল্প ও মজুর

যে ব্যবস্থা দ্বারা উৎপাদনের উপকরণগুলি লাভজনকভাবে ব্যবহার করে সর্বাধিক উৎপাদন সম্ভব তাই আদর্শ ব্যবস্থাপনা। এইজন্য চাই শিল্প অসন্তুষ্টি দূরীকরণ ও কাজের প্রেরণা দান। শিল্পকারখানায় নিয়োজিত সমস্ত সম্পদের চেয়ে জনসম্পদই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। শ্রমিকদের মনে সন্তুষ্টি না থাকলে শুধু যে উৎপাদন কম ও খারাপ হবে তা নয়, অসন্তুষ্টি অধিক হলে অচল অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। শিল্পে শ্রমিক ও কর্মচারীদের অসন্তুষ্টির জন্য পৃথিবীতে অসংখ্য ধর্মঘট ঘটে এবং তার ফলে বিভিন্ন দেশে শুধু যে প্রতিবছর হাজার হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয় তা নয়—আবশ্যকীয় দ্রব্যের উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় জনসাধারণেরও সীমাহীন দুর্গতি ঘটে। সমাজবাদী দেশগুলিতে এই অসন্তুষ্টি দমনের জন্য সর্বপ্রকার ধর্মঘট ও শ্রমিক সংগঠন নিষিদ্ধ করা হয়। কেউ এরূপ চেষ্টা করলে মৃত্যুদণ্ডেরও ব্যবস্থা আছে। প্রয়োজনের তুলনায় বেতন কম হলেও এই সমস্ত দেশে রাষ্ট্রের খাতিরে শ্রমিকদের এ সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করতে দেওয়া হয় না। এই কারণে শ্রমিকদের অধিকাংশই কাজ-কর্মে আশানুরূপ উৎসাহ ও উদ্দীপনা পায় না। ফলে স্বভাবতই উৎপাদন নিম্নগতি হয়।

কোন কাজে নিয়োজিত মানুষ যদি সেই কাজকে নিজের বলে ভাবতে না পারে তা হলে হাজারো কড়াকড়ি ও শাসন সত্ত্বেও সেই কাজে সে প্রেরণা (incentive) ও উৎসাহ পায় না, অথচ আদর্শ উৎপাদনে প্রেরণা ও উৎসাহ অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় (factor) বলে অর্থবিজ্ঞানীরা স্বীকার করে নিয়েছেন।

কি পুঁজিবাদী আর কি সমাজবাদী কোন অর্থনীতিতেই শিল্প কারখানাকে আপন ভাববার সুযোগ শ্রমিককে দেওয়া হয় না। পুঁজিবাদী শিল্প কারখানায় সে সামান্য বেতনের বিনিময়ে চাকর মাত্র। শিল্প

কারখানায় কোটি কোটি টাকা আয় হলেও তাতে তার কোন অধিকার নেই। সমাজবাদী দেশগুলিতেও সে রাষ্ট্রীয় স্বৈরতন্ত্রের বেতনভোগী মজুর মাত্র। বরং এখানে আর একদিক দিয়ে কোন কোন পুঁজিবাদী দেশ হতেও তার অবস্থা খারাপ। কারণ এই সমস্ত পুঁজিবাদী দেশে শ্রমিকেরা সংগঠনের মারফত নিজের বেতন ও অন্যান্য দাবী আদায় কিংবা কোন অব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন করবার সুযোগ পায়; কিন্তু এখানে তাও সম্ভব নয়। রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপীয় কম্যুনিস্ট দেশ-গুলি কাজের ভিত্তিতে বেতনের তারতম্য সৃষ্টি করে এবং পুরস্কারের ব্যবস্থা করে এই উৎসাহ সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছে। কিন্তু তাতেও তেমন সুফল দেখা যায়নি। পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী উভয় ব্যবস্থাপনার মধ্যে শ্রমিকদের বেতন বাড়িয়ে কিংবা দুই একটা বোনাস ইত্যাদি দিয়ে এদের 'ঠাণ্ডা' রাখার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এতেও কোন সুদূরপ্রসারী সুসমাধান পাওয়া যায়নি।

শিল্পে অসন্তুষ্টি দূরীকরণ এবং উৎপাদনে এদের প্রেরণা ও উৎসাহ দান শুধুমাত্র একটি পন্থায় সম্ভব। সেটা হল ভাইয়ালী[১] অংশীদারী ব্যবস্থা।

শিল্পের অধিকারী হবে কে ?

আগেই বলা হয়েছে শিল্পে কারও ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করা চলবে না। শুধু যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এতে খাটে এবং যারা এর কাঁচামাল সরবরাহ করে বা অন্যবিধভাবে একে সাহায্য করে, শিল্পের স্বত্বাধিকারী হবে তারাই। এই অর্থে শিল্পে কর্মরত শ্রমিক এবং কর্মচারী হতে শুরু করে পিওন দারোয়ান পর্যন্ত তাদের কাজের পরিমাণ ও গুণ অনুসারে অংশীদার হবে। অপরদিকে কাঁচামাল সরবরাহকারী কৃষকরাও এর অংশীদার বলে গণ্য হতে পারবে।

এদের দ্বারা আবশ্যকীয় পুঁজি আহরণ সম্ভব না হলে রাষ্ট্র ঋণস্বরূপ এই অর্থ যোগাবে কিংবা নিজের দায়িত্বে সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের কাছে শেয়ার বিক্রি করে এর অর্থ সংগ্রহ করে দেবে। এই কাজের জন্য রাষ্ট্রও একটা অংশীদার হিসাবে এর লভ্যাংশ পেতে পারবে। কাজের পরিমাণ ও গুণানুসারে শ্রমিক ও অন্যান্য কর্মচারীর একটা নিম্নতম

১. ভাইয়ালী = ভ্রাতৃত্বমূলক। ভাই শব্দ থেকে এ বিশেষণ তৈরি।

বেতন নির্ধারিত থাকবে, আর বছরের শেষে খরচ বাদে যে লাভ দাঁড়াবে তা সকলের মধ্যে শেয়ারের ভিত্তিতে বণ্টিত হবে।

এভাবে প্রতিষ্ঠিত কারখানাকে শ্রমিকেরা আপন ভাববে বলে কলকব্জার যত্ন বাড়বে এবং সজাগ শ্রমিকের প্রচেষ্টায় অনেক অপচয় বন্ধ হয়ে যাবে।

উদাহরণস্বরূপ একটি আদর্শ চিনিকলের কথা বিবেচনা করা যায়। যদি নিয়ম করে দেওয়া হয়—কাজের পরিমাণ ও গুণ হিসাবে প্রত্যেক শ্রমিক ও কর্মচারী এবং আখ সরবরাহকারীরা এর অংশীদার হবে এবং লভ্যাংশ এদের মধ্যে বণ্টিত হবে—তাহলে শ্রমিক হতে শুরু করে আখচাষী পর্যন্ত সকলেই কারখানাটিকে নিজের বলে ভাবতে শুরু করবে। সঠিকভাবে পরিচালিত হলে এর জন্য তারা কাজ করতে প্রেরণা ও উৎসাহ বোধ করবে এবং কারখানার উৎপাদনে ধর্মঘট অথবা কোন প্রকার বিঘ্ন ঘটুক এটা কেউ চাইবে না। এই অবস্থায় সন্তুষ্ট মন নিয়ে উৎসাহের সঙ্গে তারা এর চরম উৎপাদনে সাহায্য করতে কোন রকম দ্বিধা করবে না।

আগেই আলোচনা করেছি—মানুষ কোন কিছুর মালিক নয়, আল্লাহ্ সব কিছুর মালিক। আল্লাহ্র কাজে সকলের খেটে খাবার অধিকার আছে; দুর্নীতি করে বা বিভিন্ন বাঁকা পথে লাখ টাকা জমিয়ে মুষ্টি-মেয় লোক দেশে মূল সম্পদের মালিক বনে বসে বিলাসে গা ঢেলে দেবে—আর অন্যদিকে লাখ লাখ মানুষ দিন-রাত খেটেও নিজের এবং পরিবারের জন্য দু'মুঠো অন্ন জোটাতে পারবে না—এটা অর্থনীতির সর্বাধিক উন্নয়নের এবং মহান মানবতার পরিপন্থী।

শিল্প-পরিচালনা

(ক) সরকার চালিত শিল্প

কুরআনিক নীতি অনুসারে—

১. চরিত্রহীন, দুর্নীতিপরায়ণ স্বার্থপর কোন ব্যক্তিই সরকারী কোন পদের উপযুক্ত নয়।

২. যে কোন কর্মচারী (তিনি খলীফা/রাষ্ট্রনায়ক হোন আর মন্ত্রীই হোন) তার প্রকৃত প্রয়োজনের অতিরিক্ত বেতন নিতে পারেন না।

আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে শান্তি, সম্প্রীতি ও সচ্ছলতা স্থাপনের জন্য প্রত্যেক কর্মচারীই আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করতে বাধ্য। সুতরাং যে শিল্প আগে হতেই রাষ্ট্রের হাতে আছে তার সম্বন্ধে নীচে লিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

১. দুর্নীতিপরায়ণ দুশ্চরিত্র সবরকম অফিসারদের সংশোধিত না হলে বরখাস্ত করতে হবে এবং সচ্চরিত্র ব্যক্তিদের নিয়োগ করে শাসন পরিচালনা ও উৎপাদন ব্যবস্থা হতে সব রকম দুর্নীতির উচ্ছেদ করতে হবে।

২. অল্প বেতনের কর্মচারীদের খাটুনি ও প্রয়োজন অনুসারে বেতন বাড়াতে হবে। আর উর্ধ্বতন কর্মচারীদের অতিরিক্ত বেতন কমিয়ে এমন স্তরে আনতে হবে যাতে তাদের প্রয়োজন মেটে অথচ বিলাসিতায় মগ্ন হবার সুযোগ না ঘটে।

৩. শিল্পের অতিরিক্ত আয় বিভিন্ন প্রকার জাতীয় উন্নতিমূলক কাজে ব্যয় করতে হবে।

(খ) পুঁজিপতিদের পরিচালিত শিল্প

যে কয়েকটি শিল্প বর্তমানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে চলে সরকার আইন করে সাময়িকভাবে নিম্ন উপায়ে তার নীতি নির্ধারণের ভার নেবে।

১. সমস্ত শিল্প কাজের প্রকৃতি ও পরিমাণ এবং প্রয়োজনানুসারে ব্যবস্থাপক (মালিক) শ্রমিক ও কর্মচারীদের সাধারণ সম্পত্তি হিসাবে বিবেচিত হবে।

২. তাদের অতীত দান, কাজের প্রকৃতি ও প্রকৃত প্রয়োজন অনুযায়ী তারা এক একটি শেয়ারের জিম্মাদার হবেন।

৩. জনসাধারণের তরফে সরকারও একটি বড় শেয়ারের অধিকারী হবে।

৪. শেয়ারের ভিত্তিতে আয় সকলের মধ্যে বিলি হবে।

৫. জনসাধারণের প্রয়োজনে সরকার কোরআনিক মৌলিক নীতির ভিত্তিতে নতুন নীতি প্রবর্তন বা পুরাতন ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে পারবে।

এতে কোন রকম শোষণ ব্যবস্থা গড়ে উঠলে নিম্নবর্ণিত আদর্শ ব্যবস্থায় এটাকে রূপান্তরিত করা যাবে।[১]

(গ) ভাইয়ালী অংশীদারী ব্যবস্থা

১. সমস্ত শিল্পটি, সমস্ত কর্মচারী (শ্রমিক হোন আর যেই হোন) ও দেশের জনসাধারণের সাধারণ সম্পত্তি হিসাবে বিবেচিত হবে। কর্মচারীরা তাদের কাজের প্রকৃতি, পরিমাণ ও প্রয়োজন অনুসারে এক একটি শেয়ারের জিম্মাদার (মালিক নয়) হবেন এবং সেই অনুসারে তারা আয়ের অংশ পাবেন।

২. রাষ্ট্র জনসাধারণের তরফ থেকে প্রয়োজনানুযায়ী একটি বড় শেয়ারের জিম্মাদার হবে। সাধারণ অংশীদারের (শ্রমিক ও কর্মচারী প্রভৃতির) স্বল্পতম প্রয়োজন ও রাষ্ট্রের প্রয়োজন আর তাদের দান অনুসারে এই শেয়ারের পরিমাণ নির্ধারিত হবে।

এই শেয়ারের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের যে অর্থাগম হবে তা জনসাধারণের জন্য বায়তুলমালে (সাধারণ কোষাগারে) সঞ্চিত হবে। সরকার এটা নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠাসহ জনহিতকর কাজের জন্য ব্যবহার করতে পারবে। সরকারের প্রতিনিধি ও কর্মচারীদের প্রতিনিধিদের সমবায়ে গঠিত সমিতি দ্বারা সমস্ত শিল্প পরিচালিত হবে। সরকার যে কোন জনহিতকর কাজের উদ্দেশ্যে মৌলিক নীতির ভিত্তিতে যে কোন আইন প্রবর্তন বা পরিবর্তন করার অধিকারী হবে। এটাই ভাইয়ালী অংশীদারী তরিকা।

এই বিকল্প পন্থাটি অধিকতর কার্যকরী হবার যথেষ্ট কারণ আছে। এতে প্রত্যেক কর্মচারীই এবং দেশের সমস্ত জনসাধারণ শিল্পগুলিকে আপনার বলে ভাবতে পারবে। ফলে এতে ব্যক্তি-প্রেরণা ও কাজের উৎকর্ষতা সম্যকভাবে বেড়ে যাবে।

ব্যবসায়

ব্যবসায়ে বর্তমানে নানারকম দুর্নীতি ও মুনাফাখোরী নিয়ম চলছে। ফলে একদিকে বড় বড় পুঁজিপতিরা ব্যবসায় একচেটিয়া (Monopoly)

---

১. বর্তমান সুপ্রতিষ্ঠিত ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে "non deliberate exploitation" এড়ানো কেন সম্ভব নয় তা অধ্যাপক G. F. Eioom তার বিখ্যাত "A Reconsideration of the Theory of Exploitation" নামক রচনায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন।

করে ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের সর্বস্বান্ত করেছে—অন্যদিকে তাদের নানারকম সমাজবিরোধী কাজের জন্য জনসাধারণ অফুরন্ত কষ্ট ভোগ করছে। সরকার এটা অবসানের জন্য সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এভাবে দুর্নীতি ও শোষণ বন্ধ করা সম্ভব না হলে অংশীদারী বা ভাইয়ালী তরিকার পরিচলনার জন্য জনসাধারণকে উৎসাহ ও সুযোগ দেবে এবং সংগঠিত করবে। আর প্রয়োজনবোধে স্থানীয় বায়তুল-মালের মাধ্যমে জরুরী জিনিসের সরবরাহের ব্যবস্থা করা যাবে।

বাধ্যতামূলক শেয়ার বিক্রয় ও শিল্পায়ন

এই ব্যাপারে দেশব্যাপী বাধ্যতামূলক শেয়ার বিক্রির একটা স্কীম নেওয়া যায়। সরকারের নেতৃত্বে শেয়ার কিনতে বাধ্য করা হবে। যারা নগদ টাকা দিতে অসমর্থ তারা পাট, ধান বা অনুরূপ কাঁচামাল দিয়ে কিস্তিতে শেয়ারের টাকা শোধ করবে। যাদের নগদ টাকা বা কাঁচামাল কোনটাই দেওয়ার সামর্থ্য নেই তারাও বিভিন্ন কারখানায় শ্রম দিয়ে তাদের শেয়ারের মূল্য পরিশোধ করবে। এইভাবে আহরিত টাকা দিয়ে ভাইয়ালী অংশীদারী তরিকায় সমগ্র দেশে অসংখ্য শিল্প কারখানা গড়ে তোলা সম্ভব হবে। আবশ্যকবোধে বায়তুল-মাল হতে টাকা ধার নিতে অসুবিধা হবে না।

উদাহরণস্বরূপ বাধ্যতামূলক শেয়ার বিক্রি করে অনায়াসে আবশ্যক মত পাটকল প্রতিষ্ঠা ও পাট ব্যবসা চালনা করা যায়। এইজন্য সরকারী নেতৃত্বে পাট চাষীদের নিয়ে একটি উপযুক্ত সমিতি গঠন করতে হবে। এই সমিতি পাটব্যবসায় চালাবার ও পাটকল প্রতিষ্ঠার ভার নেবে। প্রত্যেক পাটচাষী বাধ্যতামূলকভাবে এই সমিতির শেয়ার কিনবে। প্রত্যেকটি শেয়ারের দাম নির্দিষ্ট থাকবে। কাকেও নিয়মের অধিক টাকার শেয়ার কিনতে দেওয়া হবে না। যারা পাটচাষী নয় তারা কোন শেয়ার কিনতে পারবে না। যারা নগদ টাকা দিতে পারবে না তারা বছর বছর কিস্তিতে শেয়ারের টাকা শোধ করবে। পাটের নিম্নতম মূল্য নির্ধারিত থাকবে বলে এবং এই দরে সমিতির মারফত পাট বিক্রয়ের নিশ্চয়তা থাকবে বলে শেয়ারের টাকা শোধ করতে কারও কোন অসুবিধা হবে না। পাটচাষী ও মজুরেরা পাটকলের শ্রমিকরূপে কাজের ভিত্তিতে সেটার অংশীদারী হতে পারবে। এই তরিকা গ্রহণ করলে মুষ্টিমেয় বড় বড় পুঁজিপতি

সৃষ্টি না করেও দেশকে অতি অল্প সময়ে শিল্পায়িত করা সম্ভব হবে। আবশ্যকবোধে এই উদ্দেশ্যে বায়তুলমাল থেকে ধার পাওয়া যাবে।

এই নীতির একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল ঃ এতে শুধু যে অধিক শিল্পায়ন ও অধিক উৎপাদন সম্ভব হবে তা নয় —এর দ্বারা ধন-বন্টনের একটা সুকঠিন কাজও সুসম্পন্ন হয়ে যাবে। আধুনিক বিজ্ঞানের একটা বড় সমস্যা হল উৎপাদিত সম্পদের সুষ্ঠু ন্যায়ভিত্তিক বন্টন। ব্যক্তি মালিকানা-নির্ভর পুঁজিবাদে তা কোনমতেই সম্ভব নয়। উপরে বর্ণিত নীতি গ্রহণ করলে উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে শেয়ারের ভিত্তিতে এই সম্পদ বন্টিত হয়ে যাবে বলে সমাজে অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি হতে পারবে না। অপরদিকে শ্রম-শোষণের কোন প্রকার উপায় থাকবে না বলে কলকারখানা মারফত পুঁজিবাদের ও শোষণের কোন কোন প্রসার সম্বন্ধে মার্ক্স-এর প্রধান আপত্তিও বিলীন হয়ে যাবে। সবচেয়ে বড় কথা "শ্রমের দ্বারাই মানুষ কোন কিছুর অধিকারী হয়" — কুরআনের এই নীতির প্রতিষ্ঠা এভাবেই সম্ভব হবে।

কুটির শিল্প

শোষণের ভিত্তি বর্জিত সবরকম কুটির শিল্পকে সরকার বায়তুল-মালের মাধ্যমে সব রকমের সাহায্য দেবে।

ব্যাংক

ইসলামী সমাজব্যবস্থা চালু হলে সমস্ত ব্যাংক সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত হবে। সমস্ত ব্যাংক বায়তুলমালের শাখা হিসাবে পরিচালিত হবে। জনসাধারণের বিনা সুদে বায়তুল-মাল হতে ধার পাবার অধিকার থাকবে। সর্বপ্রকার সুদ রহিত করা হবে; জনসাধারণ তাদের টাকা বায়তুলমালে গচ্ছিত রাখতে পারবে। এজন্য তারা কোন সুদ পাবে না। বায়তুল-মালের শাখা গ্রাম পর্যন্ত প্রসারিত করা হবে।

নতুন পরিস্থিতি

এইভাবে সমাজের সকল স্তরে অর্থনৈতিক ভারসাম্য আনা হবে। কোন রকমের শোষণের স্থান এই সমাজে থাকবে না।

কিন্তু এর পরবর্তীকালে যদি উৎপাদন ও বিলিব্যবস্থার জন্য কোন রকম নতুন শোষণকারী পুঁজির সম্ভাবনা দেখা দেয় রাষ্ট্র তার মূল উৎপাটনে সকল প্রকার ন্যায়সঙ্গত নীতি প্রয়োগ করবে।

উত্তরাধিকার আইন

খাঁটি আদর্শ সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার পর—সম্পত্তির বিকেন্দ্রীকরণের জন্য বিভক্ত পরিবারের মধ্যে উপার্জিত সম্পত্তি বন্টনের ব্যবস্থা থাকবে। তখন কুরআনে বর্ণিত উত্তরাধিকার আইন সামাজিক ভারসাম্য স্থাপনে কার্যকরী হবে।[১] এতে সম্পদ এক শ্রেণীর হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার দুর্ব্যবস্থা হতে রক্ষা পাবে।

কাজের ধারা

জমি ও শিল্প সমস্যা সমাধানে যে পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে তার প্রবর্তন রাষ্ট্রের শক্তি ও জনমতের উপর নির্ভর করবে। একদিনে সবকিছু করা সম্ভবপর নয়—উচিতও নয়। হযরতের আমলে মদ খাওয়া যেমন পরিবেশ সৃষ্টির পর ধীরে ধীরে নিষিদ্ধ হয়েছিল—তেমনি ধীরে ধীরে অথচ দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে নতুন কিছু চালু করতে হবে।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও সমাজতন্ত্রবাদ

সমাজতন্ত্রবাদীরা হয়ত শোষণ-বিহীন ব্যক্তিগত জিম্মাদারী সম্পত্তির কথা শুনে অবাক হবেন। তাদেরকে অনায়াসে প্রশ্ন করা যায়—মার্ক্স-এঙ্গেলস ও লেনিনের অনুসারীরা যে রাষ্ট্রবিহীন কম্যুনিস্ট সমাজ-ব্যবস্থার কল্পনা করে সেখানে সম্পত্তির অধিকারী বা মালিক হবে কে?

১· মনে রাখা দরকার—শরীরের গঠন, রক্ত, স্বভাব, মেজাজ এমনকি অনেক রোগও মানুষ পূর্ব-পুরুষ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়ে থাকে।

৬

রাষ্ট্রীয়করণ বনাম রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ

আগের লেখায় কিভাবে জমি সমস্যা ও শিল্প সমস্যা সমাধান করা যায়, তা বর্ণনা করা হয়েছে ; দুনিয়ার আর্থিক অবস্থার সমাধান হিসাবে অতীতে ও বর্তমানে বহু সমাধানের পথ অর্থনীতিবিদ বা দার্শনিকেরা দেখিয়েছেন। বর্তমানে শোষণমূলক যে সমাজ-ব্যবস্থা চলছে—তার অবসানের জন্য এইসব সমাধানের মাত্র দুটি তরিকা কার্যকরী বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

১. প্রথমত, মালিকানা উচ্ছেদ করে ব্যক্তিগত সম্পত্তির (জমি, কারখানা ইত্যাদি) রাষ্ট্রীয়করণ।

২. দ্বিতীয়ত, শোষণমূলক জমিদারী, জোতদারী ও কারখানা প্রভৃতির একচেটিয়া মালিকানা উচ্ছেদ করে কর্মরত ব্যক্তিদের মধ্যে শরিকানা বন্টন। আর যাতে ভবিষ্যতে শোষণমূলক ব্যবস্থা গড়ে উঠতে না পারে, তজ্জন্য রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ।

সত্যিকথা বলতে কি, এই দুটির যে কোন একটি গ্রহণ করলে বর্তমানের ঘৃণ্য শোষণ ব্যবস্থার অবসান করা চলে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে কোন্ তরিকা অধিকতর উত্তম।

আগেই বলা হয়েছে কোনটি উত্তম, তা বিচার করতে হলে তিনটি বিষয় বা factor-এর উপর নির্ভর করতে হবে। এই বিষয়গুলির মাপকাঠিতে যে তরিকা উত্তম বলে উত্তীর্ণ হবে, সেটিই হবে আমাদের অনুসরণীয়।

১. কোন্ তরিকা গ্রহণে অধিকতর পরিমাণে উৎপাদন সম্ভব হবে ?

২. কোন্ তরিকা গ্রহণ করলে উৎপন্ন দ্রব্যের সুষ্ঠু বন্টন করা যাবে ?

৩. যে তরিকা গৃহীত হবে তা সঠিকভাবে কার্যকরী করা যাবে কি না ?

আপাতদৃষ্টিতে ভাল অনেক তরিকা দেওয়া যায়—দেখতে হবে তা সমাজে প্রবর্তন করা ও চালু রাখা যাবে কি না। যদি না যায়, তবে এই পদ্ধতি ভাল মনে হলেও অবাস্তব বা ইউটোপিয়ান বলে পরিত্যক্ত হতে বাধ্য। উৎপাদনের জন্য সাধারণত যা দরকার তা দুটি সমাধানের মধ্যেই পাওয়া যাবে। কিন্তু এর জন্য যে প্রেরণার (incentive) দরকার তা রাষ্ট্রীয়করণে পাওয়া যায় না। মানুষের প্রকৃতি (nature) হল—যা কিছু আপন ভাবা যায়, তার জন্য সে প্রাণপণে খাটতে পারে। 'দশজনের কাজ কারো কাজ নয়'। সব সময় অধীনতার মধ্যে থেকে কর্মচারী হিসাবে খেটে মানুষ সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে না। মানুষ সামাজিক জীব সন্দেহ নেই। সামাজিক কর্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে যদি ব্যক্তিগত প্রেরণা দেওয়া যায়, সেটাই হয় সবচেয়ে কার্যকরী। মানব ইতিহাস ও জীব-বিজ্ঞান এই কথার অকাট্য প্রমাণ দেবে।

সুতরাং উৎপাদন ব্যবস্থার দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে রাষ্ট্রীয়-করণের চাইতে নিয়ন্ত্রণযুক্ত শরিকানা ব্যবস্থাই যে অধিকতর উত্তম তা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

তারপর বন্টনের কথা। রাষ্ট্রীয়করণে এর যেমন সুবিধা রয়েছে, রাষ্ট্রীয়করণে রাষ্ট্র উৎপাদন দ্রব্য বন্টন করে—আর দ্বিতীয় তরিকায় উৎপন্ন দ্রব্যের উৎপাদনের উপায়গুলিকেই বন্টন করে দেওয়া হয়। তাছাড়া দ্বিতীয় তরিকাতে উৎপাদিত দ্রব্যও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে বন্টন করা যায়। উদ্দেশ্য দুটিতেই সাধিত হয়।

বন্টনের দিক দিয়ে বিচার করলে দুটি সমাধানই সমান দাঁড়ায়। বাকী থাকে পদ্ধতির কার্যকারিতার (practicability) প্রশ্ন। যেহেতু মানুষের দুটি সত্তা আছে—একটি সামাজিক ও অন্যটি ব্যক্তিগত সেজন্য সে চায় রাষ্ট্র বা সমাজের অধীনে থেকেও যতদূর সম্ভব স্বাধীনভাবে কাজ করতে। ইনসেন্টিভ বা প্রেরণার প্রশ্ন আগেই আলোচিত হয়েছে। স্বভাব-বিরুদ্ধ কোন তরিকাই মানব-সমাজে বেশী দিন টিকতে পারে না। বৌদ্ধ এবং খ্রীস্টান পাদ্রীদের দ্বারা যৌন মিলন বন্ধ করার বিফল প্রচেষ্টা তার প্রমাণ। রাষ্ট্রীয় শক্তি বা সামাজিক শক্তিকে জোর করে সাময়িকভাবে চাপানো গেলেও অচিরে তজ্জন্য অসন্তুষ্টি ও শেষে বিদ্রোহ দেখা দেয়।

অর্থাৎ মানুষের মন ও দেহের পরিপন্থী এই সব ব্যবস্থার দ্বারা সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হয়। ভারসাম্যহীন কোন নিয়মকেই অধিক সময় সুষ্ঠুভাবে সচল রাখা যায় না। এইজন্যই অতিরিক্ত রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা কোন ব্যবস্থাকে জোর করে চাপানোর চেষ্টা শেষ পর্যন্ত বিফল হতে বাধ্য। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, ব্যক্তিকে অবাধ স্বাধীনতা দিতে হবে। কারণ ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতাও আবার সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট করে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে।

অতএব কার্যকারিতার দিক দিয়ে রাষ্ট্রীয়করণের চেয়ে দ্বিতীয় পন্থাটি অধিকতর কার্যকরী হবে।

সত্যি কথা বলতে গেলে—আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা তাই, যেখানে রাষ্ট্রের বা সমাজের শাসন খুব কমই থাকবে—অথচ শোষণ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে না। দ্বিতীয় ব্যবস্থাই এই আদর্শ সমাজের দিকে আমাদের নিয়ে যায়।

প্রশ্ন উঠতে পারে—জমি বা শেয়ারবন্টন তরিকা গ্রহণ করলে ব্যক্তি বা পরিবার অতিরিক্ত পরিশ্রম ও গুণাবলীর জন্য অধিকতর সচ্ছল হয়ে শোষণ ব্যবস্থা কায়েম করতে পারবে। দ্বিতীয় তরিকায় যদি এটা সংঘটিত হয়, তাহলে রাষ্ট্রীয়করণেও তা হবে। রাষ্ট্রীয়করণ করলেও কার্যক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তার তারতম্যের জন্য আয়ের পরিমাণ ভিন্ন হতে বাধ্য। আর এই তারতম্যের নীতি স্বয়ং রাশিয়া, এমনকি চীনও গ্রহণ করেছে। সুতরাং এ ব্যাপারে দুটি তরিকারই সমান অবস্থা। সব মানুষকে একই রকম মনোবৃত্তি বা একই শারীরিক শক্তিসম্পন্ন করা যাবে না বলে এই সমস্যা স্বভাবত দেখা দেবে। এ স্বভাবেরই দান। এই সমস্যার সমাধান আদর্শিক, সামাজিক, নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় শক্তির দ্বারা করতে হবে। এইজন্য আমাদের মতে রাষ্ট্র উবে যাবে না—যে কোন 'রূপ' নিয়ে হোক, থাকবে। যারা এর বিরুদ্ধাচরণ করেন, তাঁরা বেওকুফের স্বর্গেই বাস করেন।[১]

আসলে আদর্শের ভিত্তিতে ভ্রাতৃত্ব কায়েম করার মাধ্যমেই সব ক্ষতিকর অসাম্য দূর করা যাবে। পরকালভিত্তিক মহত্তর জীবনবোধ মানুষকে স্বার্থত্যাগে উদ্বুদ্ধ করবে বলেই এই কাজ সহজ হয়ে পড়বে।

---

১. মার্কসবাদ অনুসারে কম্যুনিস্ট সমাজ স্থাপিত হলে রাষ্ট্র উবে যাবে।

সবকিছুর রাষ্ট্রীয়করণ পারিবারিক ভারসাম্য রক্ষায় পরিপোষক নয়। দ্বিতীয় তরিকাই এর পরিপোষক। সুতরাং এই দিক দিয়ে বিচার করলেও এই পন্থা অবশ্যই গ্রহণীয়। তবে এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে—রাষ্ট্র সংগঠন ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষের মঙ্গলের জন্য কোন কোন বিষয় রাষ্ট্রের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দেওয়া উত্তম হতে পারে। এই যুগেও বহু বিষয় রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া সুষ্ঠু পরিচালনা সম্ভব নাও হতে পারে। তবে এই রাষ্ট্র হতে হবে নীতিভিত্তিক—দল বা ব্যক্তি ভিত্তিক নয়।[১]

কুরআনিক নীতির বিচারে সমাধান

এইবার দেখা যাক, কুরআনিক নীতির সাথে জমি বন্টন তরিকা ও অংশীদারীর কতটুকু মিল রয়েছে। আগেই বলা হয়েছে সম্পত্তি সম্বন্ধে কুরআনিক ধারণা হল ঃ

১. সমস্ত সম্পত্তি আল্লাহ্‌র। মানুষ পরিশ্রম করে তা ভোগ (অপভোগ নয়) করতে পারে। শ্রমের অতিরিক্ত সে পেতে পারে না। আর অন্যের চেয়ে বেশী পরিশ্রম করে প্রাপ্ত অর্থ সে বিলাসিতায় খরচ করতে বা শোষণে নিয়োজিত করতে অথবা অনর্থক জমা করে রাখতেও পারবে না।

২. সমস্ত সম্পত্তি আল্লাহ্‌র বলে কোন সম্পত্তির মালিক কেউ নয়। প্রত্যেক মানুষ তার জিম্মাদার মাত্র।

৩. আল্লাহ্‌র সম্পত্তি—আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি (খিলাফত) মানবের কল্যাণের জন্য সুবিচারমূলক দখল করার, পরিচালনা করার এবং বন্টন করার সম্পূর্ণ অধিকারী।

৪. কুরআন রাষ্ট্রকে যেমন স্বীকার করে তেমনি স্বীকার করে ব্যক্তিকে। তাই ব্যক্তির স্ফুরণের সহায়তার পরিপোষক হিসাবে সমাজ ও রাষ্ট্রের শাসন (control) কুরআন অনুমোদন করে। অবশ্য ব্যক্তিকে খর্ব করে নয় আবার ব্যক্তিকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়েও নয়। রাষ্ট্র ও সমাজের নিয়ন্ত্রণের পরিমাণ সামাজিক অবস্থা ও ব্যক্তিচরিত্রের উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হবে।

---

১. নীতি-ভিত্তিক রাষ্ট্র কাকে বলে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে লেখকের 'ইসলামী রাষ্ট্র-নীতি' নামক পুস্তকে।

৫. প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে খরচের তাগিদ দিয়ে কুরআন অভাবমুক্ত ভ্রাতৃ-সমাজ গঠন করতে চায়।

৬. তৌহিদ ও পরকালের ভিত্তিতে কুরআন ব্যক্তিচরিত্রে ও সমাজ-চরিত্রে নৈতিক শক্তি প্রতিষ্ঠা করতে চায়। (প্রথমটি "সমস্ত মানুষ এক" এই ভ্রাতৃত্ববোধের মানবতার পরিপোষক আর দ্বিতীয়টি ন্যায়, সুবিচার, আত্মত্যাগ প্রভৃতি মানবীয় মহৎ গুণের দার্শনিক ভিত্তি)। তাই কুরআন নৈতিক শক্তির উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে অবান্তর রাষ্ট্রীয় শক্তির অবসান কামনা করে।

৭. উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জিত সম্পত্তি বন্টন কুরআনের একটা বড় নীতি। সুতরাং দেখা যায়ঃ কুরআন যে সমাজ-ব্যবস্থা চায়—জমি ও অংশীদারী ব্যবস্থায় তাই উত্তমরূপে অনুসরণ করা চলে।

৭

সুদ, ব্যাংকিং ও ইনস্যুরেন্স

আগেই আমরা বলেছি কুরআনিক নীতি অনুযায়ী সমস্ত ব্যাংক বায়তুলমালের শাখা হিসাবে পরিচালিত হবে। বায়তুলমালের শাখা গ্রাম পর্যন্ত প্রসারিত থাকবে। সবরকম সুদ রহিত করা হবে। জনসাধারণ বিনা সুদে দরকার মত কর্জ পাবে। যে কেউ বায়তুলমালে টাকা বা অন্য সম্পদ গচ্ছিত রাখতে পারবে; কিন্তু সে সেজন্য কোন সুদ পাবে না।

এতে প্রথমেই প্রশ্ন জাগে :

সুদ ছাড়া কি বর্তমান জগৎ চলতে পারে ?

পুঁজিবাদের প্রথম উন্মেষে বিভিন্ন দেশের মনীষী, অর্থনীতিবিদ প্রত্যেকে রায় দিয়েছিলেন—সুদ ছাড়া বর্তমান যুগে কোন কাজ কারবারই চলতে পারে না। ব্যাংকই যে বর্তমানে অর্থ পরিচালনায় স্নায়ুস্বরূপ এবং এ ছাড়া যে কলকারখানা ব্যবসায়-বাণিজ্য অচল হবে এ ছিল অনেকটা স্বতঃসিদ্ধ।

অথচ সুদ কুরআনে নিষিদ্ধ। এ জন্য ধর্ম যে বর্তমানে অচল তাই প্রমাণ করার জন্য অনেকে উঠেপড়ে লেগে যান। অন্যদিকে অনেক মুসলিম মনীষী প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে, সুদ বহুগুণে নেওয়াই হারাম—ব্যাংকের মারফত যে সুদ নেওয়া হয় তা নিষিদ্ধ নয়।

কিন্তু আজ অবস্থার মোড় ফিরে গেছে। মানুষের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান প্রমাণ করেছে—সুদ ছাড়াই রাষ্ট্র ও সমাজ চলতে পারে। শুধু চলতে পারে বললে সম্পূর্ণ বলা হয় না। সুদবিহীন সমাজ ব্যবস্থাই আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা।

পুঁজিবাদই পৃথিবীতে সুদ ব্যবসায়ের প্রধান সমর্থক। পশ্চিমা পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদরা অতীতে যাই বলুন না কেন—বর্তমানে অনেকে পুরাতন সুদ-তত্ত্বের (Theory of Interest) ভুল বুঝতে আরম্ভ করেছেন। বর্তমান

যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ কেইনস্, প্রফেসর কাসেল, বার্টিল অহিল, লারনার প্রমুখ বহু মনীষী আলোচনা করে প্রমাণ করেছেন; টাকা জমানো সুদের উপর নির্ভরশীল—এই তত্ত্ব ভুল। তারা আরও দেখিয়েছেন: অনেক সময় সুদ ক্রমশ নীচের দিকে এগিয়েছে। অর্থাৎ আগে যেখানে শতকরা ৫০-৬০ টাকা পর্যন্ত সুদ দেওয়া হত সেখানে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় অনেক দেশে শতকরা ½ টাকা পর্যন্ত সুদ দেওয়া হয়েছে এবং এই গতিতে চললে সুদ শূন্যের কোটায় গিয়ে পৌঁছবে।[১] এই মত ইংগিত করে: ধনবৃদ্ধি ও অভাব মোচনের উদ্দেশ্যে পুঁজিকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগাতে হলে সুদবিহীন অর্থনীতিই উত্তম।

এ তো গেল পুঁজিবাদী শিবিরের অর্থনীতিবিদদের কথা। অন্যদিকে মার্ক্সবাদীরা প্রমাণ করেছে—সুদ ছাড়াই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সুষ্ঠুরূপে চলতে পারে। বর্তমানে রাশিয়া এই নীতি ভঙ্গ করলেও সুদবিহীন অর্থ পরিচালনা নীতিই রাশিয়া প্রথম গ্রহণ করেছিল। কারণ কম্যুনিজমের রায় হল সুদও শোষণ বৈ আর কিছুই নয়। এই জন্যই অনেক কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে সুদের প্রচলন ছিলনা।

সুতরাং সুদ সম্বন্ধে সর্বদলের সিদ্ধান্ত কুরআনের নীতিকে সমর্থন করছে। যারা যখন-তখন কুরআনের মূলনীতিকে বদলাবার কথা বলেন, এ থেকে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার মূল কারণও জানা দরকার। কুরআনে বার বার বলা হয়েছে—জীবিকার্জনের উপায় হল শ্রম। শ্রম ছাড়া উপার্জন মানেই অপরের শ্রম শোষণ এবং মহাক্ষতিকর পুঁজিবাদের সৃষ্টি। কুরআন শোষণ ব্যবস্থার ও বিনাশ্রমে টাকা উপার্জনের সম্পূর্ণ বিরোধী আর এইজন্য সুদ হারাম হয়েছে। পৃথিবীতে শোষণের বিরুদ্ধে সুষ্ঠু ও সবল সংগ্রাম ঘোষণা করেছিল প্রথম কুরআন। সমাজবাদী কোন কোন দেশে সুদ আবার চালু হয়েছে বলে এগুলিতেও পুরোপুরি শোষণমুক্ত সমাজ কায়েম হয়েছে বলা চলে না।

ইসলামী ব্যাংক ও সুদ

অধুনা বিভিন্ন দেশে সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংক স্থাপিত হয়েছে। বাংলাদেশ সহ বহু মুসলিম দেশে এই ব্যাংক যথাযথ কাজ করে যাচ্ছে। ইরানের

---

১. বিস্তৃত আলোচনার জন্য দেখুন—Islam and the Theory of Interest—A.I. Qureshi, Head o the Department of Economics. Osmania University. P. 1-43.

ইসলামী সরকারের অধীনে তো বহু পূর্ব থেকে সুদবিহীন অর্থ ব্যবস্থা চালু হয়ে গেছে। জমা টাকা ব্যবসায়ে, শিল্পে ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে খাটায়ে লাভ-লোকসানের শরীকানার ভিত্তিতে এই সব ব্যাংক ও অর্থ ব্যবস্থা চালিত হচ্ছে। গত কয়েক বছরে এইরূপ অনেক ব্যাংক আমানতকারীকে শতকরা ৮ থেকে ১০ ভাগ পর্যন্ত লভ্যাংশ দিয়ে এই সুদবিহীন ব্যবস্থাটি অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে সবল অবস্থা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে এর যে আরও উন্নতি ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে তা বলাই বাহুল্য। ফলে প্রতিষ্ঠিত বহু অর্থনীতিবিদ আস্থাবান হয়েছেন যে, সুদ ও তজ্জনিত শোষণ থেকে সমাজ (বিশেষ করে মুসলমানেরা) মুক্তি পাবে।

বায়তুলমালের আয়

ব্যাংকের বদলে সমাজ-সহযোগিতার ভিত্তিতে বায়তুলমাল মারফত রাষ্ট্র দেশের আয় নিয়ন্ত্রণ করবে। এইভাবে আয়ের উৎস জাকাত, জমি ও কলকারখানার খাতে আয় প্রভৃতি প্রত্যেকটি সঙ্গত বিষয়ই—বায়তুলমালের আওতায় আসবে। ফলে বায়তুলমালের অর্থের কোন অভাবই দেখা দেবে না; রাষ্ট্র চালনার খরচ, নতুন কারখানা স্থাপন প্রভৃতি যাবতীয় কাজই বায়তুলমালের নিয়ন্ত্রণে সমাধা হতে পারবে।

ব্যক্তিগত শ্রমের দ্বারা জমানো অর্থও বায়তুলমালে সঞ্চিত হবে। নিরাপদের জন্য বিনা সুদেও যে লোক অর্থ সঞ্চয় করে তার ব্যবহারিক প্রমাণ হল—ব্রিটিশ আমলে অনেক মুসলমান ব্যাংকে টাকা জমা রাখতেন, কিন্তু সুদ নিতেন না। কিভাবে সেই টাকা খরচ করা হবে—শেষ পর্যন্ত গভর্নমেন্টের কাছে তা এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

আসলে বায়তুলমালের মাধ্যমেই দেশের ভিতরের ও বাহিরের আবশ্যকীয় লেনদেনের কাজ চালিত হবে। প্রতিটি গ্রামে এই বায়তুলমালের শাখা থাকবে। সৎ সমাজকর্মীদের তত্ত্বাবধানে প্রতিটি গ্রাম্য বায়তুলমাল পরিচালিত হবে। খিলাফতের অধীনে উপরিস্থ বায়তুলমালও সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের পরিচালনায় চলবে।

ব্যাংক ও শোষণ

পৃথিবীর বিভিন্ন পুঁজিবাদী তথা গণতান্ত্রিক দেশে ব্যাংকগুলি শোষণের বড় হাতিয়ার রূপে কাজ করছে। প্রায় দেশেই বেসরকারী ব্যাংকগুলির

তো কথাই নাই—অনেক ক্ষেত্রে আধা সরকারী বা সরকারী ব্যাংকগুলিও সাধারণতঃ বড় বড় পুঁজিপতিদের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ প্রভাবে সংগঠিত ও চালিত হয়। ব্যাংকের মারফতে ধনী গরীব নির্বিশেষে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সমিতির টাকা জমা হয়। সাধারণতঃ গরীব জনসাধারণ সেই টাকা ঋণ পায় না। ব্যাংকের নিয়ম স্বভাবতই এমন যে, সাধারণতঃ ধনিক গোষ্ঠী ছাড়া ব্যাংকের ঋণ পাওয়া সম্ভব নয়। ফলে দেশের জমানো টাকার শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ ব্যাংকের মারফত ধনীদের শোষণমূলক ব্যবসায়ে ও শিল্পে নিয়োজিত হয়ে ধনীকে আরও ধনী, আর গরীবকে আরও গরীব করতে সুপরিকল্পিত উপায়ে সাহায্য করে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ব্যাংকগুলি দেশের উৎপাদনে ও ব্যবসায়ে বিরাট সাহায্য করে, কিন্তু কার্যত এগুলি দেশের প্রভাবশালী ধনিক গোষ্ঠীর সেবায় নিয়োজিত থাকে আর দেশের মনোপলি বা একচেটিয়া কারবারের সুযোগ করে দেয়। এই সুযোগে দেশের উৎপাদন ব্যবস্থাগুলিও গুটিকতক লোক কুক্ষিগত করে তোলে। এতে যে শুধু দেশের দুর্ভোগ নেমে আসে তা নয়—অর্থনীতিক অব্যবস্থায় দেশ চরম অবস্থার সম্মুখীন হয়। একে তো গরীবেরা ঋণ পায় না, কারণ ব্যাংকগুলি তাদের বিশ্বাস করতে পারে না, গরীব আরও গরীব হয় বলে সময়ের আবর্তনে ব্যাংকের কোন বড় ধরনের সুবিধাই গরীব জনসাধারণ পেতে সমর্থ হয় না।

কুরআনের স্পষ্ট নির্দেশ ঃ এমন ব্যবস্থা করা যাবে না যাতে ধন-সম্পদ অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। ব্যাংক হল এমনি একটি নিষিদ্ধ ব্যবস্থা।

ফলতঃ যে ব্যাংক-ব্যবস্থা গুটিকতক ধনিকের স্বার্থে আবর্তিত হয়—যে ব্যাংক থেকে দেশের শতকরা ৯০ জন লোক উপকার ফলতঃ পায় না বরং তার মাধ্যমে তারা আরও শোষিত ও গরীব হওয়ার দিকে এগিয়ে যায়, সেই ব্যাংক ব্যবস্থাকে কোনমতে সমর্থন করা যায় না। মনে রাখতে হবে ঃ ব্যাংকগুলি দেশের কোন কিছু উৎপাদন করে না। সুদ জিনিসটা আসলে একটা ফাউ মাত্র। ব্যাংকগুলি ধনীদের পায়রবি করে এই ফাউ দিয়ে ভোজ-বাজির মত দেশের লোকের রক্ত শোষণ করে অর্থ জমায়—আর ব্যাংকের বিরাট খরচ পুষিয়েও বিরাট লাভ করে। এইভাবে ধনের

ধনে জঘন্য পোদ্দারী চলে। ব্যাংক তাই একটা ফাউ প্রতিষ্ঠান—ধনীদের টাকা ধরার 'চাই'[১] মাত্র।

এমনকি তথাকথিত কৃষি ব্যাংকগুলির টাকাও প্রয়োজনীয় বন্ধকি ও জামিনের অভাবে গরীব কৃষক মজুরেরা আবশ্যকমত ভোগ করতে পারে না। অবস্থা বিশেষে কর্জ পেলেও তার সুদের হার এত বেশী থাকে যে চাষের খরচ পোষায়ে সে কর্জ শোধ করার শক্তি কৃষকদের থাকে না।

সর্বপ্রকার শোষণমুক্ত সমাজ গঠন করতে হলে এইজন্য ব্যাংক ব্যবস্থার উৎখাত করে বায়তুলমাল ব্যবস্থা কার্যকরী হওয়া উচিত।

বায়তুলমাল হল সর্বসাধারণের সম্পদ। সরকার বা বায়তুলমাল কমিটি তার জিম্মাদার মাত্র। এই টাকা বিনাসুদে কর্জ বা সাহায্য পাবার অধিকারী গরীব কৃষক-মজুর সবাই। প্রয়োজনবোধে এই টাকাতেই সরকারী তত্ত্বাবধানে কিংবা অংশিদারী তরিকায় দেশের নতুন নতুন শিল্প ও কৃষি-ব্যবস্থা গড়ে উঠবে—পুরাতন ব্যবস্থাগুলির উন্নয়ন হবে। এই টাকা কোনমতেই গুটিকতক লোকের স্বার্থে নিয়োজিত হবে না। এইভাবে মানুষের শরীরের রক্ত চলাচলের মত সম্পদের প্রতিটি অংশ সমাজের প্রতিটি কিনারে চালিত হয়ে সমস্ত সমাজটিকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাস্থ্যবান ও সামাজিকভাবে ভারসাম্যময় করে তুলতে সাহায্য করবে।

আন্তর্জাতিক ব্যবসায়

আর একটি প্রশ্ন উঠতে পারে —রাষ্ট্রের ভিতরে সুদবিহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা সম্ভবপর বটে, কিন্তু অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যবসা -বাণিজ্য সুদ ছাড়া চলবে কিভাবে ?

প্রথমতঃ বায়তুলমালের মাধ্যমে সরকারী পর্যায়ে এই ব্যবসায় সহজে চলতে পারে। অন্য দেশের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে এনে মালের পরিবর্তে মাল নিয়ে (বার্টার নিয়মে) সুদকে সম্পূর্ণভাবে এড়ানো সম্ভবপর। দ্বিতীয়তঃ পৃথিবীময় আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করে

১· বাঁশের শলায় তৈরী এক প্রকার মাছ ধরার যন্ত্র, যার মধ্যে মাছ ঢুকতে পারে—বের হতে পারে না।

কিংবা সব দেশে সুদ-বিরোধী-শোষণবিহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা হলে এর সহজ সমাধান সম্ভব হবে।[১]

ইনস্যুরেন্স

অল্প অল্প করে সঞ্চয় করে হঠাৎ মৃত্যু বা অন্য কোন বিপদের সময় টাকা পাওয়ার ব্যবস্থা হিসাবে ইনস্যুরেন্স কোম্পানীগুলি সমাজের একটা বড় খিদমত করে আসছে বলে সকলের ধারণা। কথাটা অংশত সত্য হলেও একে সমর্থন করা যায় না।

আমরা যে আদর্শ সমাজের কল্পনা করছি, তাতে বায়তুলমালের মাধ্যমেই হঠাৎ বিপদের সময় ঋণের বা সাহায্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকবে। গোটা বায়তুলমাল ব্যবস্থাই ইনস্যুরেন্সের কাজ করবে—এজন্য আলাদা কোন কোম্পানীর দরকার হবে না।

আসলে ইনস্যুরেন্স তরিকাটি কি? এই সমাজের গুটিকয়েক ধনী ব্যক্তির দ্বারা সংগঠিত ও চালিত প্রতিষ্ঠান—এর বিরাট মুনাফার প্রধান অংশ এরাই পেয়ে থাকেন। বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে এতে পলিসি ও শেয়ার কিনে যারা উপকৃত হয় তাদের শতকরা ৯০ জন উপরতলার সচ্ছল লোক।

আসলে বায়তুলমাল ব্যবস্থা চালু হলে ইনস্যুরেন্সের কোন আবশ্যকতাই থাকবে না। কুরআনিক অর্থব্যবস্থা চালু হলে প্রথমতঃ কেউ অভাবগ্রস্ত থাকার কথা নয়, দ্বিতীয়তঃ বিপদে ও মরণে অভাবগ্রস্তদের বায়তুলমালের অর্থে হক থাকে বলে তারা সাহায্য ও বিনাসুদে ঋণ পাওয়ার অধিকারী। এই কারণে ইনস্যুরেন্সের মূল উদ্দেশ্য বায়তুলমালের দ্বারা পূরণ হবে। শুধু তাই নয় ইনস্যুরেন্স যেখানে দেশের জনসাধারণের সামান্য এক অংশের মধ্যে বিশেষ করে ধনীদের স্বার্থে কাজ করে—সেখানে বায়তুলমাল দেশের সমস্ত জনসাধারণের মধ্যকার অভাবগ্রস্তদের অভাব দূরীকরণে কাজ করে যাবে।

এখানে আরও একটা কথা ভাববার বিষয়। ব্যাংক ও ইনস্যুরেন্স কোম্পানীগুলি দেশের সরাসরি উৎপাদনের কাজ করে না। এগুলিকে বলা

১. মদ খারাপ হলেও যেমন সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করার পর ধীরে ধীরে তা নিষিদ্ধ হয়েছিল—সুদও সেইভাবে ক্রমশঃ সব জায়গায় নিষিদ্ধ হতে পারবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোন কারণে সুদবিহীন ব্যবসায় চালানো যদি সম্ভব নাও হয় প্রথমে রাষ্ট্রের ভিতরে—পরে অন্যান্য স্থানে তা ক্রমশঃ চালু করার নীতি গ্রহণ করতে হবে।

হয় পরগাছা প্রতিষ্ঠান। এগুলি জনসাধারণের টাকা আহরণ করে এ টাকা বিরাট ও জটিল সংগঠনে নিয়োজিত করে। অন্য কথায় এগুলি অনেকটা মধ্যবর্তী ফড়িয়া ও দালালী প্রতিষ্ঠানের কাজ করে দেশের অর্থনীতিতে জটিলতা ও অসাম্য সৃষ্টিতে সাহায্য করে। এইগুলির পরিবর্তে দেশের সরাসরি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান যত বেশী সংগঠিত হয় ততই মঙ্গল। বায়তুলমাল ব্যবস্থা উৎপাদনকারীদের সরাসরি মদদ করে অর্থনীতির এই বড় কাজটিই সমাধা করবে—আর দেশের উপযুক্ত ও শিক্ষিত হাজার হাজার লোককে এই অনুৎপাদক বিশাট উপপ্রতিষ্ঠানগুলির কাজ থেকে মুক্ত করে সমাজের উৎপাদনী ও অন্যা সংগঠনিক কাজে নিয়োগের সুযোগ দেবে। অনেকে মনে করেন ব্যাংক ও ইনস্যুরেন্সগুলিকে রাষ্ট্রীয়করণ করলে তাদের কুফল থেকে অনেকাংশে রক্ষা পাওয়া যায়—কিন্তু সর্বকল্যাণময় বায়তুল-মাল পদ্ধতি থাকলে এগুলি অনাবশ্যক হয়ে পড়ে। অনর্থক সংগঠন রাষ্ট্রের জটিলতা ও ব্যয় বৃদ্ধি করে। রাষ্ট্রীয়করণেও বাংলাদেশের ব্যাংক ও ইনস্যুরেন্সগুলি কি অব্যবস্থার সৃষ্টি করেছিল তা পর্যালোচনা করলে প্রতিষ্ঠানগুলি জিইয়ে রেখে দেশের অপব্যয় বাড়ানোর কোন যুক্তিই খুঁজে পাওয়া যাবে না।

জুয়া

আধুনিক সমাজে ঘোড়দৌড়, হাউজী, গেট-এ-ওয়ার্ড, ফ্লাস প্রভৃতি নানা ধরনের লোকপ্রিয় জুয়া চলে আসছে।

জুয়ার প্রধান কাজ হল ঃ বিরাট অংকের লাভের লোভ দেখিয়ে একটা ছোট অংকের টাকা বহু সংখ্যক লোক থেকে আদায় করা। এভাবে প্রচারের ও সংগঠনের উসিলাতে লাখ লাখ টাকা অর্জন করা হয়। জুয়ার কর্তারা এর একটা অংশ মাত্র বাজিতে জেতা কয়েকজনকে দেয়—বাকী বিরাট অংশ কর্মচারীদের বেতন, সংগঠন, এজেন্টদের কমিশন, বিজ্ঞাপন, অন্যান্য খরচ এবং নিজেদের লভ্যাংশ হিসাবে আত্মসাৎ করে। হাজার হাজার লোকের মধ্যে কয়েকজন লোক বিরাট একটা অংক পেয়ে বসলে জনসাধারণ মনে করতে পারে—কী বিরাট লাভ! দু এক টাকা দিয়ে হাজার হাজার টাকা! অথচ দেখা যায়—যারা জুয়া খেলে তাদের শতকরা ৯০ ভাগ লোক এই লোভজনক শয়তানি চক্রে পড়ে দিন দিন গরীব হতে থাকে। এমন কি

সময়ে হয়ে পড়ে অনেকে সর্বহারা। এখানেও পরের ধনে পোদ্দারী করে জনসাধারণের লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করা হয়। অথচ এতে কোন রকমের উৎপাদন হয় না। বরং সময়ের অপচয় হয় বিরাট। এই কারণেই কুরআনে জুয়াকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। এর অবসান অর্থনৈতিক নীতির কারণেই অপরিহার্য। এতে একদল লোক অকেজো অলস জীবন যাপন করতে কিংবা চুরি ডাকাতির মত খারাপ কাজে লিপ্ত হতে আকৃষ্ট হয়।

৮

পরিশিষ্ট—অর্থনীতি সম্বন্ধে কোরআনের রেফারেন্স

মূলনীতি বিষয়ক আয়াতগুলির মধ্যে সম্পদের মূল উৎস বা মালিকানা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেওয়া হয়েছে—সূরা বাকারার ১০৬, ২৫৫, ২৮৪ প্রভৃতি—সূরা ইমরানের ১০৯, ১২৯, ১৮৯ ইত্যাদি—সূরা নিসার ১২৬, ১৩১, ১৩২, ১৩৩ ; সূরা মায়েদার ৪৩ ; সূরা আরাফের ১৫৮ ; সূরা ইবরাহিমের ৩২ ; ইত্যাদি আরো বহু আয়াতে। এ ছাড়া ১৯-৬৪, ২০-৬, ৯০-৬৬, ১৬-৭২, ৫৭-৭, ৫৭-১৮ প্রভৃতি আয়াতও উল্লেখযোগ্য।

এখানে প্রথম অংক সূরার নম্বর ও পরের অংকগুলি আয়াতের নম্বর নির্দেশ করে।

সম্পদের উৎপাদন ও বণ্টন সম্পর্কে মূলনীতি রয়েছে : ৩৬-৪৭ ২-৬১, ৪৭-৩৮, ২-২১৫, ২-২১৯, ২-১৯৫, ২-২৫৪, ৬৩-১০, ৩-১৩৪, ৪-৩৭, ৪-২৯, ২-১৭৭, ২-১৮০-১৮২, ৮-২৮, ৪-৩২, ২-২৬৭, ২-২৬৮, ২-২৭৫, ৩-১৭, ৪-৭ ৮,৯, ৪-১১,১২, ৪-২৯,৩০, ৪-৩২, ৪-৩৭, ২৫-৬৭, ৬-১৪১, ৭-৩২, ২০-৮১, ৮-৪১, ৯-২০ ৯-৬০, ৯-৭৯, ৯-১০৩, ৯-৩৪, ৫৯-৭, ৫৯-৭,৮, ৫১-১৯, ৪-৫,৬,৮,৯, ৬-১৫২, ৩৬-৪৭, ৫১-১৯ প্রভৃতি আয়াতে।

ধন জমিয়ে রাখা (hoarding) ও শোষণের বিরুদ্ধে কঠোর বাণী আছে : ১০২-১, থেকে ৮, ৪৭-৩৮, ৭-৪৮, ৯-৩৪-৩৫. ১০৪-২,৩,৪ ইত্যাদি আয়াতে।

দুর্নীতি সম্বন্ধে আছে : ৩-১৮০, ২-১৮৮, ৬-১৫২, ৫৫-৯, ২-২৬৭. ৪-১০, প্রভৃতি আয়াতে।

মানুষের একত্ব ও ভ্রাতৃত্ব (brotherhood) সম্পর্কে আছে : ২-২১৩, ৩-১১, ১১৪-১১৫, ১০-১৯, প্রভৃতি আয়াতে।

শ্রম ও সামাজিকীকরণ সম্পর্কে আছে : ৪-৩২, ৩৩, ৪-৫, ৪-৯, ৫৩-৩৯, ৪০ ইত্যাদি আয়াতে।

ইসলামী রাষ্ট্রনীতি

উপসূচী

১. আদর্শ রাষ্ট্রের রূপ ৩১৪
২. আদর্শ সরকার ৩২৭
৩. খিলাফতের গঠন, নির্বাচন ও কর্তব্য ৩৩৯
৪. ইসলামী মেনিফেস্টো (ঘোষণা) ৩৫০

এ বইয়ের কিছু প্রবন্ধ ও অন্যান্য প্রবন্ধ নিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রনীতি নামক বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৭ সনের সেপ্টেম্বর মাসে। উহার দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয় ১৯৭৩ সনে। সেই বইতে প্রকাশিত মুখবন্ধটি বর্তমান রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে বইটি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা দিতে সাহায্য করবে আশায় নীচে সংযোজিত হল। —লেখক

রাষ্ট্রনীতি বড় বিতর্কমূলক বিষয়। রাষ্ট্র সম্পর্কে আধুনিক বিভিন্ন মতবাদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ফলে এই বিতর্ক আরো উৎকটতা পেয়েছে। এর মধ্যে কোন্‌টা যে আদর্শ বা শ্রেষ্ঠ মতবাদ তা বেছে নেওয়া আরো বিতর্কমূলক। বিতর্ক আরো বড় হয়—ইসলামী রাষ্ট্রনীতির কথা উঠলে। এই আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে কি চলবে সেই চৌদ্দশ বছর আগের নীতি? – সেই নবী নাই, সে মদীনাও তো নাই… !

এই হল ছবির একদিক।

অন্যদিকে আমরা—ইসলামপন্থীরা সগৌরবে ইসলামী শাসনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে থাকি। কিন্তু যখন কেউ ছওয়াল করে বসেন: আচ্ছা ভাই! বর্তমান যুগে ইসলামী শাসনের রূপ কি হবে কিংবা তার নির্বাচন তরিকাই বা কি রূপ নেবে?—তখন আমাদের অনেকে ঢোক গিলতে শুরু করি!

অথচ শুধুমাত্র অতীতের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে আধুনিক সমাজে ইসলামী রাষ্ট্রের যৌক্তিকতা প্রমাণ করা কঠিন।

এই বইটি আকারে ছোট হলেও বিতর্কের এই বড় বিষয়টি এতে বিচার করা হয়েছে। বিচারের সাফল্য কিংবা অসাফল্য আদর্শবাদী ও যুক্তিবাদী পাঠকেরা ঠিক করবেন।

মোহাম্মদ আবুল কাসেম

তাং—২—৬—৭৩

১

আদর্শ রাষ্ট্রের রূপ

উত্তম রূপের সন্ধানে

পশ্চিমের জনৈক কবি বলেছিলেন : সরকারের রূপ নিয়ে বেকুবেরা তর্ক করুক, যে রূপ দিয়ে দেশ উত্তমভাবে শাসিত হয়, শ্রেষ্ঠ রূপ তাই।

প্রশ্ন জাগে— এ যুগের শ্রেষ্ঠ সরকাগুলির রূপ কি ?

এ প্রশ্নের উত্তরে রাজনীতিকদের কেউ কেউ বলবেন : অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ব্রিটেন, জাপান বা পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি এক কিম্বা একাধিক গণতান্ত্রিক দেশ। কেউ কেউ বলবেন : সমাজতান্ত্রিক দেশ চীন বা রাশিয়া,— আবার কেউ কেউ তৃতীয় বিশ্বের কোন রাষ্ট্রের কথাও উল্লেখ করতে পারেন।

তবে একথা জোর দিয়ে বলা চলে : রাজনীতিবিদদের সকলে কোন একটি দেশের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে একমত হতে পারবেন না। গণতন্ত্রীদের কাছে যা ভাল, কম্যুনিস্টদের কাছে তা নিকৃষ্ট বলে চিহ্নিত হবে। আবার কম্যুনিস্টদের কাছে যা উত্তম, গণতন্ত্রীদের নিকট তা মন্দ বলে পরিগণিত হবে।

এই তো গেল বাম ও ডানপন্থীদের কথা। অন্যদিকে মধ্যপন্থীরা হয়তো এই দুটি সরকারের কোনটাতে সন্তুষ্ট হবেন না; তাঁরা তৃতীয় কিম্বা চতুর্থ ধরনের একটি সরকারের গুণ বর্ণনা করতে আনন্দ পাবেন।

শ্রেষ্ঠ বলে কথিত এই যে বিভিন্ন দেশের নাম করা হয়েছে, এদের প্রত্যেকটির গুণ ও অনেক ক্ষেত্রে সাফল্য রয়েছে।

ধনী আরব দেশগুলির মধ্যে রাজতন্ত্রী, গণতন্ত্রী, ডিক্টেটরী বহু পদের রাষ্ট্র বিদ্যমান। সবগুলির মধ্যে কোন কোনটা যে গুরুত্ব পেয়েছে একথা অস্বীকার করা যায় না। অথচ এদের মধ্যে কয়েকটির রূপ হল : ডিক্টেটরী বা রাজতন্ত্রী।

অন্যদিকে চীন, রাশিয়া প্রভৃতি দেশ গণতন্ত্রী নয়—এইগুলি এক পার্টি নিয়ন্ত্রিত ডিক্টেটরী। যুগোস্লাভিয়া সরকারও একই শ্রেণীর। এইসব দেশে ভিন্ন মতাবলম্বী কিম্বা ধর্মীয় কোন সম্প্রদায়ের স্বাধীনভাবে কাজ করার বা মত প্রকাশের কোন স্বাধীনতা নেই।

আবার গণতন্ত্র বলে কথিত সরকারগুলির রূপও এক নয়। আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র হল প্রেসিডেন্ট প্রধান আর বৃটেন হল কেবিনেট প্রধান। পৃথিবীতে রাজতন্ত্রী কোন কোন সরকারও কোন কোন সময় বেশ নাম ও গুরুত্ব লাভ করে—বিশেষ করে অতীতে।

উপরে বর্ণিত দেশগুলির কথা বাদ দিলে আরো বহু দেশ আছে যেগুলির অধিকাংশই এখনো বেশ অনুন্নত। পিছনে পড়া দেশগুলিতেও রয়েছে সরকারের বিভিন্ন রূপ: গণতন্ত্রী, রাজতন্ত্রী, একনায়কতাবাদী তথা ব্যক্তি-তন্ত্রীও।

সুতরাং আমরা কি সিদ্ধান্তে পৌঁছি—পৌঁছি সেই একই কথায়। নিজ নিজ দেশের বিচিত্র পরিবেশ অনুসারে উত্তমভাবে পরিবেশিত যে কোন রূপই অনেক ক্ষেত্রে সফল সরকার হিসাবে গুরুত্ব লাভ করতে পারে। আধুনিক কালে অতি নিকৃষ্ট বলে পরিগণিত রাজতন্ত্র—তথা বাদশা-তন্ত্রও যে অতীতে বহু ক্ষেত্রে আদর্শ স্থানীয় শাসন পরিচালনা করতে পেরেছিল ইতিহাসের পাতায় তার বহু নজির মিলবে। এতদ্‌সত্ত্বেও আমরা দৃঢ়ভাবে বলতে পারি: উত্তমরূপে পরিবেশিত হলে তো ভালই, তার সাথে যদি সরকারের রূপটাও ভাল হয় তবে সর্বোত্তম তথা আদর্শ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পাওয়া সম্ভব। অতীত ইতিহাসের পাতায় তার উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

গণতন্ত্রের উত্থান ও পতন

ইতিহাসের ধারা লক্ষ্য করলে আর একটি বিষয় চোখে পড়ে। বিশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন রাজতন্ত্রের প্রাধান্য দেখি। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে দেখা যায়—বিভিন্ন দেশের উপনিবেশই রাজতন্ত্রী সরকারগুলি ভেঙ্গে একের পর এক গণতন্ত্রে পরিণতি লাভ করছে। মানুষ তখন ভাবতে শুরু করছিল: গণতন্ত্রই বুঝি সরকারের শ্রেষ্ঠ রূপ আর এটাই চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে।

কিন্তু এ ধারণা বেশীদিন বজায় রাখা সম্ভব হয় নাই। গণতন্ত্র বা রাজতন্ত্র উৎখাত করে একদিকে দেখি কম্যুনিজম প্রভাবিত দেশগুলিতে একটার পর একটা ব্যক্তি ডিক্টেটরীয় শাসন কায়েম হচ্ছে—অন্যদিকে দেখি প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের বহু দেশে দলীয় একনায়কত্ব আসন গেড়ে বসতেছে। ইহাতে গণতন্ত্রের চিরস্থায়ী ধারণা বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। এই সময়ে অনেকে বিশেষ করে বিভিন্ন দেশের কম্যুনিস্ট ও সোশ্যালিস্টরা গণতন্ত্রের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠে।

রাজনীতির এই বিচিত্র গতিধারায় আরো একটি সত্য ভেসে উঠে। ফ্রান্সকে গণতন্ত্রের ও গণ-বিপ্লবের জন্মদাতা বলে সম্মান দেখানো হয়। কারণ হিসাবে বলা হয়— ফরাসী বিপ্লবের ফলে তথায় গণতন্ত্রের গোড়া-পত্তন হয়েছিল। অথচ সেই ফরাসী দেশেই গণতন্ত্র বহু দিন ধুঁকে মরেছে। এক সময় তুরস্ককে ইউরোপের রুগ্ন দেশ বলে ঠাট্টা করা হত। গণ-তন্ত্রী ফরাসী দেশ কয়েক দশক আগ পর্যন্ত অতিশয় দুর্বল জাতিরূপে চিহ্নিত ছিল। সেই দুর্বল জাতি পরবর্তী সময়ে সবল ও উন্নত হয়ে শক্তিশালী আমেরিকার সাথে টেক্কা দেয়ার সাহস ও শক্তি খুঁজে পায়। সেটা সম্ভব হয় ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত জেনারেল দ্যগলের এক-নায়কত্ববাদী কঠোর শাসনামলে।

চীনের চিয়াং কাইশেক সরকার নাকি গণতন্ত্রী আমেরিকার মুরু-ব্বিয়ানায় গণতান্ত্রিক রূপ গ্রহণ করেছিল। তা ব্যর্থ হয়েছিল, আর তথায় কম্যুনিস্ট ডিক্টেটরশিপ কায়েম হয়েছে। শুধু কায়েম হয়েছে বললে সব বলা হয় না। তথায় উহা আগেকার সরকার থেকে শতগুণ ভাল শাসন চালাচ্ছে। অন্তর্কলহে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে দুর্বল ও বিশৃঙ্খল চীনা জাতি আজ বেশ জোর কদমে আত্মবিশ্বাস নিয়ে আগায়ে চলেছে।

অতএব বলা যায় এখানেও ইতিহাসের শিক্ষা গণতন্ত্রের দিকে নয়।

নয়া গণতন্ত্র

আগেই বলেছি চলতি শতাব্দের প্রথম থেকে গণতন্ত্র বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। সম্ভবতঃ এই কারণে কোন একটি কম্যুনিস্ট সরকারকে নয়া গণতন্ত্র বলে প্রচার করা হত। আসলে কোন কম্যুনিস্ট সরকারই গণতন্ত্রী সরকার নয়। দেশের জনসাধারণের স্বাধীন ও অপ্রভাবিত

ভোটে এই সরকারগুলি কস্মিনকালেও নির্বাচিত হয় না। অথচ এই দেশগুলিতে কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য সংখ্যা সমস্ত জনসংখ্যার একটা ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র।

বেশ কয়েক বছর আগে সোভিয়েট রাশিয়ার কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য সংখ্যার একটা হিসাব প্রকাশিত হয়েছিল। প্রায় ৪৭ বছর পর্যন্ত দোর্দণ্ড কম্যুনিস্ট শাসনে শাসিত হওয়া সত্ত্বেও সেদিন পর্যন্ত সেখানকার পার্টির সদস্য সংখ্যা শতকরা আধা জনেরও কম ছিল। অথচ কম্যুনিস্ট পার্টি-নেতাদের দ্বারা মনোনীত কম্যুনিস্টরাই শুধু সেখানে নির্বাচনে প্রার্থী ও মনোনীত হতে পারেন।

বলা দরকার যে কম্যুনিস্ট পার্টির ভিতরেও সব সময় গণতন্ত্র চলে না। ইহার গঠন এইরূপ যে পার্টির এক বা একাধিক নেতৃত্ব সমস্ত পার্টিকে অপপ্রভাবিত করতে পারে। আর কোন বিষয়ে একমত হতে না পারলে সংশোধনের নামে হাজার হাজার পরীক্ষিত ও পুরাতন সদস্যকে পার্টি থেকে বিতাড়িত করা যেতে পারে। শুধু বিতাড়ন নয়—নেতা বা নেতারা আবশ্যক বোধে বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের চির নির্বাসন, মৃত্যুদণ্ড বা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে ধুঁকে মরার ব্যবস্থা করা অথবা গুপ্ত পুলিশের দ্বারা দুনিয়া থেকে অজ্ঞাতভাবে চিরবিদায় করার ঘটনাও কম্যুনিস্ট ইতিহাসে বিরল নয়। স্তালিনের বিভীষিকাময় পার্জিং ও চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে রক্তাক্ত উৎসাদন এ কথার বড় নজির। এসব পার্জিংএ বিপ্লবী লক্ষ লক্ষ কম্যুনিস্ট নেতা ও সদস্যকে দুনিয়া থেকে চিরতরে অসম্মানজনকভাবে বিদায় নিতে হয়েছিল। আসল কথা কম্যুনিস্ট পার্টিগুলিতে বিরুদ্ধ মতের তথা স্বাধীন মতের কোন স্থান নাই বলে ইহা গণতান্ত্রিকভাবে চালিত একথা বলা চলে না। হয়ত বা পার্টিতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নাই বলেই ভীতিতন্ত্রের মাধ্যমে এদেশগুলিতে এতো শৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হয়।

ডিক্টেটরশিপের ত্রুটি

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা ডিক্টেরশীপ ও গণতন্ত্রের বহু ত্রুটি লিখে গেছেন। ব্যক্তি-ডিক্টেটরশিপের বড় ত্রুটি হল: ডিক্টেটর যদি ভাল হয়ত ভালই—নতুবা হিটলার-মুসোলিনীর মত একজনের ভুলে ও খামখেয়ালীতে গোটা দেশ বা গোটা পৃথিবীই দারুণভাবে দুর্ভোগ ভুগতে থাকে। এতে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সুবিচারের আশা চিন্তাতীত। পার্টি ডিক্টেটরশিপকে অনেকে এসব ত্রুটি থেকে মুক্ত বলে মনে করেন। ব্যক্তি-ডিক্টেটরশিপ থেকে পার্টি

ডিক্টেটরশিপ যে অনেক দিক দিয়ে ভাল, তাতে সন্দেহ নাই—কিন্তু পার্টি ডিক্টেটরশিপ কিরূপে বহু দেশে বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের অধিকতর ব্যাপকভাবে সর্বনাশের কারণ হয়ে থাকে আর তাতে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সুবিচার ব্যাহত ও পর্যুদস্ত হয় তার দৃষ্টান্ত কম্যুনিস্ট ইতিহাসের দিকে নজর দিলেই বুঝা যায়।

গণতন্ত্রের বিকট রূপ

গণতন্ত্রের বড় ত্রুটি হল ইহার পরিচালনায় ঢিলেমী ও কঠোর শৃঙ্খলার অভাব। ইহার আরো মারাত্মক ত্রুটি হলঃ ধনিক গোষ্ঠীর স্বার্থে ইহাকে অপব্যবহার ও দুর্নীতির অবাধ বিচরণ। আসলে পৃথিবীর বড় বড় গণতন্ত্রী দেশে আজো ধনীদের স্বার্থপর ইচ্ছানুযায়ী এইসব দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও তার কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদী ধনকুবেরদের অপ্রতিহত প্রভাবে যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও অর্থনীতি চালিত হয় তা আজ সুবিদিত। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে—ব্যবসা-বাণিজ্যে, তার বহুজাতিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে, বাটার মত বহু সংখ্যক বিশ্বগ্রাসী প্রতিষ্ঠানের আন্তর্জাতিক রাজ' কর্মকাণ্ডে এইসব ধনিক গোষ্ঠীর অপপ্রভাব তো কারো অজানা নয়। মধ্যপ্রাচ্যে হতভাগ্য ফিলিস্তিন ও আশেপাশের আরব দেশগুলির উপর ইসরাইলের নজিরবিহীন অত্যাচার ও নিরীহ অসহায় অধিবাসীদের নির্বিচারে হত্যা—ব্যাপক উচ্ছেদ ধনী ইহুদীদের প্রভাবিত সুপার পাওয়ার আমেরিকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে ও সাহায্যে সংঘটিত হতে পারছে। এই প্রভাবেই জাতিসংঘও বহু ন্যায়সংগত প্রস্তাব পাস করলেও অগণতান্ত্রিক ভেটোর কারণে তা বাতিল ও অকার্যকরী হয়। তার ফলে আন্তর্জাতিক দস্যুবৃত্তির মত বহু অপরাধমূলক ঘটনাজনিত সমস্যা বিশ্বের ভারসাম্য ও শান্তির মূলে কুঠারাঘাত করছে।

পৃথিবীর সর্বত্র যে ঔষধগুলি তৈরি ও পরিবেশিত হয় তাও উন্নত গণতান্ত্রিক দেশগুলির বহুজাতিক শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মারফত বিশ্বের শত শত দেশের কোটি কোটি লোকের স্বাস্থ্য ও জীবন ধ্বংসকারীরূপে প্রমাণিত হয়েছে। অথচ গরীব দেশের মানুষের জীবনের বিনিময়ে অমানবিক ব্যবসায় চালিয়ে কোটি কোটি টাকার মুনাফা লুটে খেতেও তারা দ্বিধা করে নাই—স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীদের দীর্ঘ নিষেধ সত্ত্বেও।

আর আজকাল যে দুই সুপার পাওয়ার আমেরিকা ও রাশিয়া সর্বাধুনিক মারণাস্ত্রের খেলা খেলে বহু দেশের ধ্বংস ও বিলুপ্তির কারণ ঘটাচ্ছে এবং এই পথে আণবিক অস্ত্রের সাহায্যে তৃতীয় মহাযুদ্ধের দিকে বিশ্বকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—তারও মূল কারণ হল আমেরিকার নেতৃত্বে ধনী গণতান্ত্রিক সরকারগুলি আর অন্যদিকে রাশিয়ার নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী কম্যুনিস্ট সরকারগুলি।

লিবিয়ার দৃষ্টান্ত

মধ্যপ্রাচ্যে লিবিয়া একটি ব্যতিক্রমধর্মী রাষ্ট্র। তথায় ঘৃণ্য রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে কর্নেল গাদ্দাফী একটি প্রগতিশীল পুঁজিবাদ বিরোধী গণভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন।

কর্নেল গাদ্দাফীর ডেমোক্রেসীর সমস্যা বিষয়ক পুস্তিকা গ্রিনবুকে বর্তমানে বিভিন্ন দেশে চালু গণতন্ত্রের কঠোর ও মূল্যবান সমালোচনা করে দেখানো হয়েছে ঃ দল, বর্ণ, ট্রাইব ও সম্প্রদায় প্রভাবিত বিভিন্ন তথাকথিত গণতন্ত্রে প্রবল পক্ষ যে গণতন্ত্র চালু করে তা প্রকৃতই দলগত ডিক্টেটরশীপ, উহা শোষণমূলক ও অবিচারমূলক। তজ্জন্য এই গ্রীনবুকেই গ্রামপর্যায় থেকে মৌলিক গণ কংগ্রেসের মাধ্যমে দেশের প্রশাসনিক কর্মকর্তা নির্বাচন থেকে শুরু করে যাবতীয় কাজ সমাধা ও তদারক করার নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে। দল নির্ভর সরকার দ্বারা প্রশাসনিক কর্মকর্তা মনোনয়ন ও তদারকী হলে প্রকারান্তরে অবিচারমূলক ডিক্টেটরশিপই চালু হয় বলে এতে বলা হয়েছে।

লিবিয়ার এই নীতির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল ঃ

দেশ শাসনে ঐতিহ্যবাহী প্রাকৃতিক আইনই প্রকৃত মহৎ গণতান্ত্রিক আইন বলে বর্ণিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে ঃ এটা নিশ্চয়ই অকেজো ও অগণতান্ত্রিক যে—একটা কমিটি বা পার্লামেন্ট সমস্ত সমাজের জন্য আইন প্রণয়ন (draft) করবে। ইহাও অযৌক্তিক ও অগণতান্ত্রিক যে একজন ব্যক্তি, কমিটি বা আইন সভা সমাজের আইনকে সংশোধন করে কিংবা বাতিল করে দেয়। গাদ্দাফীর মতে ঐতিহ্যবাহী সামাজিক রীতি অথবা ধর্মের মাধ্যমেই সমাজের প্রকৃত আইনের উদ্ভব হয়। এই রীতি ও ধর্মেই বিকাশ ঘটে—সর্বস্তরের মানুষের প্রকৃতি-উদ্ভূত যুগে যুগে অভিজ্ঞতালব্ধ কল্যাণভিত্তিক সেই অকৃত্রিম আইন।

সংবিধান বলে বর্ণিত আইনও যেহেতু সমাজের আইন নয়—উহা দল বা গ্রুপ প্রভাবিত মানুষ-সৃষ্ট আইন, তাই উহাও অকার্যকর ও অযৌক্তিক (invalid and illogical)। এই সংবিধান প্রচলিত গণতন্ত্রে ডিক্টেটরিয়াল নীতির হাতিয়ার হিসাবে অপব্যবহৃত হয়। যদিও মানুষের স্বাধীনতা সকলের জন্য সমান—তবু সংবিধানে তা সমান গণ্য করা হয় না—স্বার্থপর দল বা গ্রুপের ডিক্টেটরিয়াল শাসন স্থায়ী করার উদ্দেশ্যে। গ্রীনবুকের মতে সবখানে মানুষ একই। তার স্বাভাবিক প্রবণতাও (instinct) একই। এইজন্য প্রাকৃতিক আইন একই মানুষের জন্য যৌক্তিক বিধান। মানুষের তৈরী আইন বা সংবিধান মানুষকে এক সমান ভাবে না। এই আইন শাসনেচ্ছু কিছু দলের শাসনের হাতিয়ার (instruments of governing) হিসাবে ব্যক্তি বা দলের দ্বারা দমনমূলক কাজে ব্যবহৃত হয়। এ কারণেই—শাসন-হাতিয়ার বদল হওয়ার সংগে সংগে সংবিধানও পরিবর্তিত হয়ে যায়। গ্রীনবুকের মতে মৌলিক সামাজিক রীতি অনুযায়ী প্রাকৃতিক সংবিধান সৃষ্টি হয়। শাসনযন্ত্রের পরিবর্তনে তা পরিবর্তিত হওয়ার জিনিস নয়। প্রাকৃতিক ভাবে উদ্ভূত সামাজিক আইন শুধু বর্তমান বংশধরদের সম্পদ নয়—উহা সর্বকালের মানুষের অলংঘনীয় উত্তরাধিকার। গাদ্দাফীর মতে বর্তমানে প্রচলিত গণতন্ত্র মানে প্রবল পক্ষের চালিত ডিক্টেটরশিপ বৈ কিছু নয়।

খাঁটি গণতন্ত্র কোথাও নাই

খাটি গণতন্ত্র বলতে যদি দেশের সকলের স্বাধীন মতানুসারে আইন প্রণয়ন ও শাসন বুঝায়—জাতি-ধর্ম ও দল-মত-নির্বিশেষে সকলের ব্যক্তি স্বাধীনতা, সমান অধিকার ও সুবিচার বুঝায় তবে বড় ছোট কোন গণতান্ত্রিক দেশেই তা পাওয়ার নয়। আমেরিকার দুইশত বছরের গণতান্ত্রিক শাসনেও সেই দেশের একটা বিরাট অংশ নিগ্রোদের স্বাধীনতা, সমান অধিকার—এমনকি ভোটাধিকার সেইদিন পর্যন্ত কার্যত স্বীকৃতি পায় নাই। তথায় যে নির্বাচন হয়—তা নিয়ন্ত্রিত করে ধনিক গোষ্ঠী পরিচালিত পত্র-পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতি বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম ও তাদের অফুরন্ত ধনভাণ্ডার। সংখ্যাগরিষ্ঠ অপেক্ষাকৃত গরীব জনগণের এতে কার্যতঃ কোন প্রভাব থাকে না।

রাজতন্ত্রের টোপর-পরা যুক্তরাজ্যেও চলে ধনীদের বিভিন্ন কারসাজি।

তথায় মেজরিটি শাসন সবসময় দেখা যায় না। ১৯৬৪ সনের সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিক দল সাধারণ ভোটারদের মধ্যে অর্ধেকের কম ভোট পেয়েও ক্ষমতা লাভ করে—পার্লামেন্টে তাদের কয়েকজন সদস্য বেশী নির্বাচিত হতে পেরেছে বলে। ১৯৪৭ সনে স্বাধীনতা লাভের পর গণতান্ত্রিক ভারতে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস পরিষদের আসনে সংখ্যা বেশী লাভ করলেও প্রত্যেক বারই গোটা ভোটার সংখ্যার শতকরা ৩০/৪০ ভাগের বেশী ভোট পায় নাই। অথচ এই দল সে দেশ শাসন করছে দীর্ঘ বহু বছর ধরে। শুধু কি তাই, গণতন্ত্রকে মেজরিটি শাসন বলা হলেও একদিকে যেমন এই বৃহৎ গণতন্ত্রী দেশে নিম্ন বর্ণের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যেমন সুবিচার পায় না, তেমনি সুবিচার পায় না শিখ ও মুসলিমরা—বিশেষ করে মুসলিমরা। তাই শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাদের পশ্চাৎপদতা চোখ এড়াবার নয়।

ইসলামী শাসনের ওয়াদা

আলোচনার এই পর্যায়ে ইসলামী শাসন ব্যবস্থার কথা এসে পড়ে। এসে পড়ে এজন্য যে আমাদের দেশের জনসমর্থিত প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলনের মূলকথা ছিল ইসলামী শাসন কায়েম। তাছাড়া মুসলিম লীগ সরকার থেকে শুরু করে আইউব সরকার ও যুক্তফ্রন্ট পযন্ত সকলেই ইসলামী শাসন কায়েমের ওয়াদা ঘোষণা করেছিলেন। ১৯৬৪ সালে গঠিত কপের ৫টি অঙ্গ-দলের মধ্যে ৩টি— জমাতে ইসলামী, কাউন্সিল মুসলিম লীগ ও নেজামে ইসলামই যে শুধু ইসলামী শাসন কায়েমের ওয়াদা দিয়েছিল তা নয়, গোটা কপও তা সমর্থন করেছিল। বলা বাহুল্য, আওয়ামী লীগ, ন্যাপ প্রভৃতি দল এই যুক্তফ্রন্টে অঙ্গীভূত ছিল। তাদের নয় দফা প্রোগ্রামের ৮ম দফায় খাঁটি ইসলামী সমাজ কায়েমের আর শাসনতন্ত্রে ইসলামী ধারা চালুর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছিল। জেনারেল জিয়ার আমলে—পরবর্তীকালে জেনারেল এরশাদের আমলেও ইসলামী শাসনের কথা বহুবার বিবৃত ও ঘোষিত হয়েছে। যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার মূল নীতিতেই ছিল কোরআন ও সুন্নাভিত্তিক ইসলামী সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব কায়েমের তাগিদ।[১]

কিন্তু প্রশ্ন দাঁড়ায়ঃ ইসলামী শাসনের রূপ কি? ইসলামী শাসন কি এক নায়কতান্ত্রিক কিছু— নাকি গণতান্ত্রিক ধরনের কিছু? আর যদি

১. দেখুনঃ একুশ দফার রূপায়ণঃ অধ্যাপক আবুল কাসেম, ৩য় পৃষ্ঠা।

একনায়কতাবাদী কিংবা গণতান্ত্রিক কোনটাই না হয় তবে ইহা কোন্ তন্ত্ররূপে পরিচিত হবে? তাছাড়া ইহার রূপ যাই হউক না কেন—ইহা কি আধুনিক কালের রাষ্ট্রনৈতিক ও সংশ্লিষ্ট জটিল সমস্যাবলীর সঠিক সমাধান দিতে পারবে?

বিভিন্ন আধুনিক তন্ত্রের সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক পর্যালোচনা

উপরে বর্ণিত প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতে গিয়ে আধুনিককালে চালু তন্ত্রগুলি সম্বন্ধে আরো একটু সংক্ষিপ্ত আলোকপাত প্রয়োজন। আমরা আগেই বিভিন্ন তন্ত্রের ত্রুটির ইংগিত দিয়েছি। ইহাতে সুস্পষ্ট যে একনায়ক-তন্ত্রের শাসন ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছা, রুচি ও নীতিবোধের উপর নির্ভর করে। আর ব্যক্তি বিশেষ যেহেতু কদাচিৎ নিখুঁত ও আদর্শ চরিত্রের হয়—আর যেহেতু ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর— উহার অপব্যবহারের লোভ থেকে অধিকাংশ মানুষ নিরত থাকতে পারে না, তাই বিরল ব্যতিক্রম ব্যতীত এই তন্ত্র মানুষের কল্যাণ সাধন করতে পারে না। এই কারণে এই তন্ত্র কোন মতেই সমর্থনযোগ্য নয়। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বাধীনতা ও জনমতের মূল্য দেওয়া হয় না বলে ইহাকে আদর্শ রূপ বলা চলে না।

গণতন্ত্রের বহু ত্রুটি পর্যালোচনা করে কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী একে আবশ্যকীয় খারাপ ব্যবস্থা বলে (ইভিল নেসেসিটি) আখ্যায়িত করেছেন। খারাপ হলেও আবশ্যকীয় এইজন্য যে, এই মতের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা অন্য কোন উত্তম ব্যবস্থা সম্বন্ধে পরিচিত বা অবহিত না।

দার্শনিক কবি ইকবাল পশ্চিমা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির রূপ বিচার করে বলেছিলেন: 'গণতন্ত্রে মানুষ গণা হয়— ওজন করা হয় না।' মানে এখানে মানুষের সংখ্যার স্বীকৃতি আছে— গুণের স্বীকৃতি নাই। অথচ সংখ্যার চাইতে গুণের দাম যে বহু ক্ষেত্রে অধিক একথা সমাজবিজ্ঞানীরা স্বীকার না করে পারেন না।

একনায়কতন্ত্র ও গণতন্ত্র থেকে পার্টি-ডিক্টেটরশিপকে কেউ কেউ তুলনায় উন্নত শাসন ব্যবস্থা মনে করেন। সাম্যবাদীরা এই মতের গোঁড়া সমর্থক। আগেই আলোচনা করেছি ইহাও ব্যক্তি স্বাধীনতাবর্জিত ও সব সময় জীবনসংশয় সৃষ্টিকারী নির্মম পুলিশী শাসন। ইহাও মাইনরিটি শাসন। ইহার প্রতিষ্ঠা বস্তুবাদ তথা স্বার্থবাদের উপর—মানবীয়

মহত্তর কোন নীতিবাদের উপর নয়। হয়তবা এই কারণেই জনসাধারণের স্বাধীন বিকাশের ক্ষেত্রেই শুধু ইহা বিরাট বাধার সৃষ্টি করে না—নিজ দলের সদস্যদের জন্যও এই শাসন মারাত্মক ও ভীতিজনক রূপ নেয়। এই কারণেই দেখি রাশিয়ায় কম্যুনিস্টদের দীর্ঘতম কালের শাসন স্তালিন আমলে শুধুমাত্র পাওয়ার পলিটিক্সের নিমিত্ত হাজার হাজার বলি কেন—লাখ লাখ খাঁটি ও নামকরা কম্যুনিস্টকে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছিল। যার জন্য এই দেশের পরবর্তীকালের একাধিক রাষ্ট্রনেতার আমলে স্তালিনের নিন্দাবাদ করে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন, বিভিন্ন কম্যুনিস্ট শাসনে যত সংখ্যক কম্যুনিস্ট প্রাণ হারায়েছেন, সারা দুনিয়ার অ-কম্যুনিস্ট সরকারের কাছে তার তুলনায় কম্যুনিস্টদের একটা বড় ভগ্নাংশকেও প্রাণ হারাতে হয় নাই।

আসলে ব্যক্তি বিশেষ বা দল বিশেষের ইচ্ছার উপর যে সরকার নির্ভর করে কোন মহত্তর নীতির উপর নয়—সে সরকার ডিক্টেটরী বা তথাকথিত গণতান্ত্রিক যাহাই হউক না কেন তা রাজনৈতিক সমস্যাবলীর আদর্শ সমাধান দিতে পারে না। অন্যত্র এরই প্রকট ও অমানুষিক জঘন্য রূপ দেখি বর্ণবাদী দক্ষিণ আফ্রিকা ও মুসলিম বিরোধী ইসরাইল প্রভৃতি ফ্যাসিস্ট সরকারগুলির বর্বর কার্যকলাপে। আরো দুঃখের বিষয়, এই বর্বর ফ্যাসিস্ট সরকারগুলিকে আমেরিকা ও তার অনুগত গণতান্ত্রিক দেশগুলি ছলে বলে ও কৌশলের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের বর্বরতাকে নির্লজ্জভাবে সাহায্য করে যেতে দ্বিধা করে নাই।

তাহলে আবার প্রশ্ন জাগে ডিক্টেটরীয় বা গণতান্ত্রিক সরকারের কোনটাই যদি নিখুঁত সরকার না হয় তবে সরকারের আদর্শ রূপটা কি?

ইরানের বিপ্লব ও ইসলামী শাসন

অতীতে সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক শক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, পরিচালিত ও লালিত অত্যাচারী শাহতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে ১৯৭৯ সনে প্রবল গণবিপ্লবের মাধ্যমে বিশ্বখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ বিপ্লবী নেতা ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বে ইরানে ইসলামী প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়। বিপ্লবোত্তরকালে শোষণবাদী পশ্চিমা পরাশক্তি ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী নাস্তিক পরাশক্তির এজেন্টদের দ্বারা সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা কাটাবার প্রচেষ্টা-কালেই

পরাশক্তিগুলির প্ররোচনা ও তাহাদের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ সাহায্যে—এই দেশকে স্বাভাবিক পর্যায়ে আনার আগেই—ইরানের উপর বর্বর আক্রমণ সংঘটিত হয়। সর্বাধুনিক মিশাইল, অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র ও রাসায়নিক অস্ত্রের দ্বারা শত্রুপক্ষকে পরাশক্তি ও তাদের ইউরোপীয় সহযোগীরা শক্তিশালী করা সত্ত্বেও— যতদূর বুঝা যায়—ঈমানের বলে ও শহীদি প্রত্যয়ে বলীয়ান ইরানের জনসাধারণ দীর্ঘকাল ধরে বাস্তবতঃ দুই পরাশক্তি ও তাদের অধীন স্বার্থান্বেষী দেশগুলির বিরুদ্ধে সদ্য প্রতিষ্ঠিত এই ইসলামী দেশটিকে অনেকটা একক-ভাবে আত্মরক্ষায় সগৌরবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

বহুজাতিক ধনতান্ত্রিক প্রচার মাধ্যমগুলি ও তাদের দেশী-বিদেশী এজেন্টরা পৃথিবীর সর্বত্র এই দেশটির বিরুদ্ধে নানারূপ কুৎসা ও মিথ্যা প্রচার করে একটা বিরাট অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ সৃষ্টি করায় অনেকে এই দেশটি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা ও মূল্যায়ন করতে পারছে না। এই কুৎসার অন্যতম একটি বিষয় হইল ঃ শিয়াসুন্নী বিরোধ। অথচ অতীতে শাহ আমলে শিয়া-সুন্নী বিরোধ যত প্রকটই থাকুক না কেন—বর্তমানে কোরআনিক নীতি কঠোরভাবে প্রচলনের মাধ্যমে ইসলামী সরকার এই ভ্রাতৃঘাতী প্রবণতা থেকে এই দেশকে অনেকটা সফলভাবে মুক্ত করতে সমর্থ হয়েছে। বলা বাহুল্য, সুন্নীপ্রধান দেশে সুন্নী মতবাদকে ভিত্তি করেই ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

এত অপপ্রচার সত্ত্বেও যে সব বুদ্ধিজীবী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও ধর্মবিদ ইরানে অবস্থান করে নিরপেক্ষভাবে স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করে এসেছেন—তাদের সুচিন্তিত অভিমত হল ঃ কোরআন-হাদীসভিত্তিক খাঁটি ইসলামী শাসন যদি কোথাও থাকে তবে এই একটি দেশেই আছে। তাদের আরো অভিমত হল ঃ পশ্চিমা পুঁজিবাদী অপসংস্কৃতি ও পূর্বের নাস্তিক্য পরিবেশ থেকে যদি কোন দেশের জনগণকে রক্ষা করতে হয় তবে ইরানী ধরনের বিপ্লব ও শাসনই মুসলিম দেশগুলির কাম্য হওয়া উচিত। ইসলামী পরিবেশের আওতায় যে গণমুখী রাজনীতি ও অর্থনীতি সেখানে গড়ে উঠেছে তা স্থায়ী হলে বিশ্বাসীদের জন্য এটা একটা বিরাট বিজয় বলে গণ্য হবে।

সে যাই হউক, এই দেশটি সম্বন্ধে শেষ কথা বলার সময় হয়ত এখনো আসে নাই। আমি বিশ্বাস করি ঃ বিদ্বেষ, কুৎসা ও মিথ্যার কালকুয়াসা অদূর ভবিষ্যতে অপসারিত হবে— আর তখনই পৃথিবীর জনগণ ইরানের সঠিক রূপ বুঝে সঠিক মূল্যায়ন করতে পারবেন।

ইসলামী শাসন তথা নীতিতন্ত্র

আসুন এবার আমরা এমন একটা আদর্শ সরকারের কল্পনা করি —যেখানে প্রত্যেকটা মানুষ নির্বিবাদে ব্যক্তি স্বাধীনতা ভোগ করে, আইনের চোখে শাসক ও শাসিতের মধ্যে শুধু কিতাবে নয়—কাজেও কোন প্রভেদ নাই, রাষ্ট্রের প্রধান কর্ণধার দোষ করলেও সাধারণ নাগরিকের মত তাঁর বিচার হয়, সরকারী টাকা ও জিনিসপত্র ভোগের অধিকার যতটুকু সাধারণ নাগরিকের আছে—উচ্চপদস্থ কর্মচারী বা শাসকদেরও তার বেশী অধিকার নাই; যেখানে রাষ্ট্রের শাসকদের বেতন ও জীবনমান সাধারণ কর্মচারী ও সাধারণ নাগরিকদের চাইতে বেশী হওয়ার কোন সুযোগ নাই—শাসকদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের যেখানে রাষ্ট্রের ছায়ায় বিপুল সম্পদ উপার্জনের কোন উপায় নাই; এই নিয়মের এদিক-ওদিক হলে যেখানে একজন সাধারণ নাগরিকও রাষ্ট্রপ্রধানের কার্যকর কৈফিয়ত তলব করতে পারে; যেখানে হিন্দু মুসলমান ইহুদী খৃস্টান—জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পুরা স্বাধীনতা বর্তমান, হাবশী নিগ্রো থেকে শুরু করে কুলি মুচি মেথর পর্যন্ত সকলেই যেখানে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমানাধিকার ভোগ করে; যেখানে যে কোন ব্যক্তি বিরুদ্ধ মত পোষণ করতে পারে, এজন্য যেখানে সমালোচকদের জেলে, ফাঁসিতে বা নির্বাসনে যেতে হয় না; যেখানে ভিন্নমত পোষণকারীদের জন্য গেস্টাপো বা সাভাক তথা গোপন পুলিশ বাহিনী রাখার আবশ্যক হয় না কিংবা স্বাধীন মত প্রকাশের জন্য গোপনে (আণ্ডার গ্রাউণ্ডে) ঘুরে বেড়াতে হয় না। যেখানে জুলুমকারী পুলিশী শাসন বলে কিছু নাই—রাষ্ট্রের কর্ণধারদের যাতায়াতকালে যেখানে দীর্ঘ পথে পুলিশ পাহারা বসায়ে রাস্তায় সাধারণের চলাচল বন্ধ করে রাখতে হয় না—যেখানে ন্যায়বিচার ও অধিকার আদায় করতে গেলে ঘুষ, দীর্ঘসূত্রিতা ও পুলিশী জুলুমে সর্বহারা হতে হয় না—যেখানে রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে সমস্ত অফিসারদের দরজা সাধারণের জন্য খোলা থাকে—যেখানে না খেয়ে উপোসে মরতে হয় না, অন্যদিকে কিছু লোক বালাখানায় অঢেল বিলাসে গা ভাসায়ে দেবার সুযোগ পায় না—যেখানে সকলের জন্য বিদ্যা শিক্ষা অবশ্য কর্তব্য—যেখানের রাষ্ট্রপতি সুদূর ফোরাত নদীতে অনাহারে একটা কুকুর মারা গেলেও আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করতে হবে বলে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকেন, যেখানে ব্যক্তির কিংবা মাইনরিটি বা

মেজরিটি দলের ইচ্ছা অনিচ্ছা বা তাদের খাম-খেয়ালীর উপর রাষ্ট্র পরিচালনা নির্ভর করে না—নির্ভর করে একটা মহান নীতির উপর, মহত্তর মানবতাবাদের উপর—স্বার্থবাদ বা শক্তিবাদের উপর নয়।

এই যে আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনা করা হল ইহার রূপায়ণ ব্যক্তিতন্ত্রে, দলতন্ত্রে বা মাথা গোণা গণতন্ত্রে খুঁজে পাওয়া যাবে না। একটা মহান ভ্রাতৃত্ববোধ কায়েমের কাজে নিয়োজিত এই রাষ্ট্র একটা মহান নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ; তাই ইহা নীতিতন্ত্র। এখানে নির্বাচন যেই তরিকাতেই হউক না কেন মানুষের ন্যায্য অধিকার ও শান্তি কায়েম করতে এই তন্ত্র সমর্থ বলে ইহাই রাষ্ট্রের আদর্শ রূপ।

উপরে বর্ণিত আদর্শ রাষ্ট্রের সংগে এখন আপনারা বহু শত বছরের আগের হযরত মোহাম্মদ (সঃ) ও প্রথম খলীফাদের শাসনামলের তুলনা করতে পারেন। তুলনা করতে পারেন আরো পরের — দুষ্ট রাজতন্ত্র কায়েমের পরেও খলীফা দ্বিতীয় উমরের শাসনের সাথে। যদি সেই সহজ শাসন ব্যবস্থা—উপরে কল্পিত আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থার সংগে মিলে যায় তবে তাই হবে আমাদের সকলের গ্রহণীয়। অশান্তি, অসাম্য, অবিচার, অত্যাচার ও অভাব জর্জরিত ও স্বাধীনতা বঞ্চিত মানুষের ইহা ছাড়া অন্য কোন উত্তম পথ নাই। হাজার বছরের পুরানা হলেও খাঁটি সোনা যেমন বরণীয়—সৃষ্টির আদি সময় থেকে কোটি কোটি বছর চালু থাকলেও যেমন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি একই রূপ মহান কাজে রত—চৌদ্দশ বছর কেন, তার বেশী অতীতের হলেও মহান কোন নীতিকে বর্জন করে চললে ক্ষতি হবে গোটা মানব জাতিরই। মানুষের মুক্তির জন্য আর সমাজে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য—আর সবার উপরে মানব সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করে উদারভাবে মহৎ ব্যবস্থা বরণ করে নেওয়াই হবে আধুনিক মানুষের বড় কাজ। অতীতের বা বর্তমানের যে কোন মানবতা উৎকর্ষকারী মহৎ ব্যবস্থা কোন ব্যক্তি বা জাতি বিশেষের একার সম্পত্তি নয়—উহা গোটা মানব জাতিরই সম্পদ।

২

আদর্শ সরকার

আগের প্রবন্ধে আমি আদর্শ রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। সেই আলোচনায় আমরা সরকারের কয়েকটি রূপের সাথে পরিচিত হয়েছি। বর্তমানে প্রধানতঃ তিনটি রূপ বিভিন্ন দেশে চালু হয়েছে : ১. গণতন্ত্রী, ২. ডিক্টেটরীয়, ৩. রাজতন্ত্রী।

গণতন্ত্রী সরকার আবার বহুরূপী। কোনটা প্রেসিডেন্ট প্রধান, কোনটা কেবিনেট প্রধান, আবার কোনটার গণতন্ত্রী রূপ থাকিলেও উহা বাস্তবত ডিক্টেটরীয় রূপে কাজ করে। ইন্দোনেশিয়ার শোয়েকার্নোর ভাষায় ইহাকে সামলানো বা নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র (Controlled Democracy) বলা হয়েছে!

ডিক্টেটরীয় সরকারের রূপও অনেক :

১. ব্যক্তি ডিক্টেটরীয়,
২. পার্টি ডিক্টেটরীয়,
৩. আবার কোনটা ব্যক্তি-নির্ভর গ্রুপ-ডিক্টেটরীয়।

বর্তমানে কম্যুনিস্ট দেশগুলির ও তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশে এইরূপ সরকার চালু আছে।

আবার রাজতন্ত্রী সরকারেরও বহুরূপ দেখা যায়। কোনটা ব্যক্তি-নির্ভর, আবার কোনটা ব্যক্তি-নির্ভর হলেও পার্লামেন্ট-নির্ভর, যেমন বৃটিশ সরকার। এখানে রাজা নির্বাচিত না হলেও পার্লামেন্টের নির্বাচিত সদস্যেরা সাধারণ-ভাবে নির্বাচিত হন ও সরকার গঠন করেন।

আমরা আগের প্রবন্ধে বলেছিলাম: সরকারের যে রূপই হউক না কেন—ভাল শাসন যার কাছে পাওয়া যায় সেটাই ভাল কাজ করে। কথাটা মোটামুটি সত্য হলেও একটা বিশেষ অবস্থায় সরকারের রূপ কি তা ঠিক করার আবশ্যকতা আছে। অনেক সময় দেশের, সমাজের ও ঐ সমাজের প্রচলিত আদর্শের অনুসারী সরকার গঠিত না হলে সেই সরকার ক্ষণস্থায়ী ও অকেজো হবার সম্ভাবনা থাকে।

আদর্শের বিচারে সরকারকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় :

১. আদর্শ সরকার ২. নিরপেক্ষ সরকার

বর্তমান দুনিয়ায় কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রগুলিকে আদর্শিক সরকার হিসাবে পরিচয় দেয়া যায়। বিপ্লবোত্তর ইরান সরকারও আদর্শিক সরকার; কারণ এই সরকার ইসলামী নীতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। তা ছাড়া বিপ্লবায়িত ইসলামপন্থীরাই এই সরকারের নেতৃত্বে সমাসীন। বাকী প্রায় সব সরকারই নিরপেক্ষ সরকার। নিরপেক্ষ এইজন্য যে —এইসব দেশের সরকারগুলি কোন একটা নির্দিষ্ট মতবাদকে অনুসরণ করে না। কিংবা নির্দিষ্ট আদর্শের ভিত্তিতে গোটা সমাজকে ঢেলে সাজায়ে আগায়ে নিতে চান না। ব্যক্তি বা গ্রুপ বিশেষের মত ও প্রোগ্রামকে ভিত্তি করে কিংবা নির্বাচনকালীন দেশের সাধারণ লোকের দাবী-দাওয়া নিজের দলের প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত করে এইসব দেশের প্রতিনিধিরা শাসনকার্য চালায়ে থাকেন। তাই দুনিয়ার বিভিন্ন প্রকারের গণতন্ত্রী সরকারগুলি হল নিরপেক্ষ সরকার।

আদর্শ রাষ্ট্র কিভাবে গঠিত হয়

আদর্শ রাষ্ট্র গঠন করতে হলে আদর্শ মানুষ দরকার। যারা শাসন করবেন তারা যদি ঐ মতবাদের ভিত্তিতে আদর্শ চরিত্রের না হন, তাহলে আদর্শ রাষ্ট্র গঠিত হতে কিংবা টিকে থাকতে পারে না।

কাজেই সিদ্ধান্ত দাঁড়ায়ঃ যে কোন আদর্শ রাষ্ট্র গঠনের মূল উপাদান হল আদর্শ চরিত্রের মানুষ।

আদর্শ মানুষ আবার এমনি হয় না। এজন্য চাই একটা আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত কঠোর একতাবদ্ধ সংগঠন—আর সমাজের সর্বপ্রকারের বাধা-বিপত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের মাধ্যমে কর্মী গড়ে তোলার সাধনা।

ধীরে ধীরে খাঁটি কর্মী গড়ে তোলার এই কাজ যে সংগঠন করে সেটাই হল বৈজ্ঞানিক সংগঠন। বৈজ্ঞানিক সংগঠন তাই নির্ভর করে ঐ আদর্শের বিচারে গুণের (quality) উপর—সংখ্যার উপর নয়। বিভিন্ন দেশের সাধারণ দলগুলি নির্ভর করে সংখ্যার উপর। এই দলগুলি সাধারণ সংগঠন; তারা প্রচার ও সামান্য চাঁদার মাধ্যমে যত বেশী সংখ্যক সম্ভব মেম্বার যোগাড় করে—অনেকটা সাধারণভাবে। আর বৈজ্ঞানিক সংগঠন খুঁজে সংখ্যা নয়— আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত খাঁটি মানুষ। এই রকম গুণের মানুষ ছাড়া কেউ বৈজ্ঞানিক সংগঠনের সদস্য হতে পারে না। এইজন্য আদর্শ

সংগঠনে সংখ্যা-নির্ভর গণতন্ত্র চলে না। সংখ্যা-নির্ভর গণতন্ত্র চালালে—আদর্শগত গুণের প্রাধান্য থাকে না। আর গুণের প্রাধান্য না থাকলে আদর্শ সংগঠন হয় না।

আদর্শ সংগঠনের ব্যাপারে যে কথা আদর্শ রাষ্ট্রের ব্যাপারেও সেই কথা। জনসাধারণের সাধারণ ভোটে আদর্শ রাষ্ট্র হতে পারে না। কারণ সাধারণ ভোটে আদর্শগত গুণের স্বীকৃতির চাইতে সংখ্যার স্বীকৃতিই প্রধান। অধিকাংশ লোক যা চায় তা আকাঙ্ক্ষিত আদর্শ নাও হতে পারে। কিংবা যাদের অধিকাংশ লোক চায় তারা আদর্শবাদী নাও হতে পারে। হয় না বলেই কোন গণতান্ত্রিক দেশই আদর্শবাদী রাষ্ট্র নয়। এইজন্য এইগুলি হয় আদর্শ-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র।

সবচাইতে বড় কথা—বৈজ্ঞানিক সংগঠন ও আদর্শ রাষ্ট্র যাঁরা পরিচালনা করবেন, তাঁরা একমতের ও এক পথের লোক হওয়া চাই, শুধু এক আদর্শের হলে চলবে না। মূল বিষয়ে একমত হয়ে দলবদ্ধ না হলে—দল ভাঙ্গনের সংঘাতে সেই প্রতিষ্ঠান—রাষ্ট্রই হউক বা সংগঠনই হউক তা ভেঙে যায় বা অন্তর-কলহে দুর্বল ও অকেজো হয়ে যায়। এইজন্য আদর্শ সংগঠনে ও আদর্শ রাষ্ট্রের-নেতৃত্বে উপদলের স্থান নাই।

আধুনিক একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। কম্যুনিজম একটা আদর্শ। এই আদর্শ আমরা পছন্দ করি বা না করি সে আলাদা কথা। আদর্শ বলেই এটা প্রতিষ্ঠার জন্য চাই বৈজ্ঞানিক সংগঠন—তাই কম্যুনিস্ট পার্টিগুলি বৈজ্ঞানিকভাবে গঠিত হয়। এই পার্টি শক্তিশালী হলে এরা রাষ্ট্রশক্তি দখল করার প্রয়াস পায়। সেও আবার গণতান্ত্রিক নিয়মে নয়—মারামারি কাটাকাটি তথা রক্তাক্ত বিপ্লবের মাধ্যমে।[১]

যে ভাবেই হউক রাষ্ট্রশক্তি আয়ত্ত হলে সেখানে যাঁরা শাসন চালান তাঁরা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হন না। কম্যুনিস্ট পার্টির দ্বারাই নির্বাচিত হন। আর এই পার্টির সদস্যসংখ্যা থাকে দেশের জনসাধারণের তুলনায় একেবারে নগণ্য। এইজন্য রাশিয়া হতে শুরু করে পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, রোমানিয়া, চীন, চেকোস্লোভাকিয়া এমনকি যুগোস্লাভিয়া পর্যন্ত প্রত্যেকটি কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের একটিও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নয়। এগুলি মূলত

১. বর্তমানে কেউ কেউ 'গণতান্ত্রিক বিপ্লবের' কথা বলিলেও উহা 'সোনার পাথর বাটির' মত অবাস্তব প্রমাণিত হয়েছে।

পার্টি ডিক্টেটরশীপ। যদি গণতান্ত্রিক হত, এই সব রাষ্ট্র একদিনও কম্যুনিস্ট আদর্শ নিয়ে টিকে থাকতে পারত না। কারণ দেশের অধিকাংশ লোক কম্যুনিস্ট নয়—তাছাড়া নানা মুনির নানা মতে রাষ্ট্রের আদর্শের কর্মধারার ও নেতৃত্বের ওলট-পালট হয়ে যেত; আদর্শানুসারে একমতের লোকের নেতৃত্বে ঠিক প্ল্যান পরিকল্পনা করে একই নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব হত না।

আদর্শ রাষ্ট্রের আর একটা বৈশিষ্ট্য হল: ইহার প্রধান ব্যক্তি সাধারণতঃ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত হন না। যদি পার্টির মধ্যে ভিন্ন মত না হয়— তবে লেনিন বা স্তালিনের মত জীবনভর তিনি প্রধান হিসাবে থেকে যান। গণতন্ত্রে রাষ্ট্রপ্রধান সাধারণত তিন থেকে পাঁচ বছরের অধিক সময়ের জন্য নির্বাচিত হন না। জীবনব্যাপী নির্বাচিত হলে উহা আর খাঁটি গণতন্ত্র হত না।

রাষ্ট্রপ্রধান যদি আদর্শের বিচারে ঠিক ও সমর্থ থাকেন, তিনি যদি আদর্শচ্যুত না হন তবে তাঁকে বছর বছর বা সময়ান্তরে বাদ দেয়া ক্ষতি বৈ লাভ নাই। কারণ রাষ্ট্র পরিচালনার অভিজ্ঞতা পেতে হলে, আর দীর্ঘ সময়ের পরিকল্পনায় প্রোগ্রাম কার্যকরী করতে হলে—তাছাড়া ঘন ঘন রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনজনিত দলাদলি হতে রক্ষা পেতে হলে এই ব্যবস্থা বেশ ভালভাবে কাজ করে থাকে। অধিকন্তু ভাল নেতৃত্ব হলে উহার প্রতি বেশ কিছু দিন ধরে স্থায়ী আস্থা ও ভক্তি সৃষ্টি করতে পারলে জনসমর্থনে রাষ্ট্রও শক্তিশালী ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে উঠে।

আর একটা উদাহরণ দেই। ইসলাম একটি আদর্শ। প্রথম দিকে এই আদর্শের অনুসারীরা মুসলিম হিসাবে একজন একজন করে— ঈমান ও আকিদায় দৃঢ়, চরিত্রে মহান, সংগ্রামী ও দৃঢ়চেতা হয়ে একতাবদ্ধ হয়েছিলেন— একই জামাতে— একই নেতৃত্বের পেছনে। এই জামাতে অবিশ্বাসী ও চরিত্রহীনদের স্থান ছিল না। এইভাবে যে মুসলিম জামাত তৈরী হয়েছিল তাহা ছিল বিশ্বাসে ও চরিত্রে অনেকটা বৈজ্ঞানিকভাবে সংগঠিত জামাত। এখানে উল্লেখ্য যে, সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ সমৃদ্ধ আদর্শিক বিপ্লবের অনুসারীরা সাধারণত বিশ্বাসে ও চরিত্রে বৈজ্ঞানিক সংগঠনের সদস্যদের মত গুণান্বিত হয়ে থাকেন। এই জামাতের বৈপ্লবিক চেতনা ও ভাবধারা সমগ্র আরব দেশে মহাবিপ্লবের সৃষ্টি করে। সমাজ বিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্রশক্তি এই জামাতের হাতে এসে পড়ে। এই বিপ্লবের

আদর্শের স্রোতা ও নেতা ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (স.)। স্বভাবত তিনিই এই রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে পরিগণিত হয়েছিলেন।

তারপর ইসলামী আদর্শের অধিকতর গুণী ও উপযুক্ত ব্যক্তিরা খলীফা নির্বাচিত হতে থাকেন।

একটা কথা এখানে পরিষ্কার হওয়া দরকার। আগেই বলেছি: বৈজ্ঞানিক সংগঠনের দুইটা বৈশিষ্ট্য; এক: একটি সার্বিক আদর্শের ভিত্তিতে ধীরে ধীরে এক একজনকে আদর্শায়িত করে সংগঠনে আনয়ন। দুই: কোন রকম দলাদলি বা উপ-দলীয় মনোভাব না রেখে এক নেতৃত্বের অধীনে কাতারবন্দী হওয়া।[১] বৈজ্ঞানিক সংগঠন চায়: শুধু এক আদর্শের লোক হলে চলবে না—মূল বিষয়ে একমতের ও এক পথের লোক হতে হবে। এইরূপ সংগঠনে মতবিরোধের কোন স্থান নাই। তা না হলে সুষ্ঠু শৃঙ্খলা ও দৃঢ়তার সহিত আদর্শকে আগায়ে নেওয়া কোন মতে সম্ভব হবে না।

মক্কা বিজয়ের আগ পর্যন্ত মুসলমানেরা এইরূপ বৈজ্ঞানিকভাবে সংগঠিত ছিলেন। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর অসংখ্য লোক সহজে মুসলমান হতে শুরু করে। মুসলমানদের বিজয়ে আকৃষ্ট হয়ে অনেকটা গড্ডালিকা প্রবাহে বহু লোক দলে দলে মুসলমান হতে থাকে। সাধনা ও সংগ্রামের ট্রেনিং পায় নাই বলে, ইহাদের অনেকের ঈমান ছিল দুর্বল—আর চরিত্র ছিল অপূর্ণ। অনেক মোনাফেকও এই জামাতে শামিল হয়ে যায়। ফলে গোটা মুসলিম সমাজের অনেকের মধ্যে আগের সমাজ হতে পাওয়া গোষ্ঠি-প্রীতি, নানা স্বার্থ, বিচ্ছিন্নতা তথা অনৈক্য লুপ্ত অবস্থায় থেকে যায়। এই সময় সুষ্ঠু সংগঠন ছিল না বলেও নানারকম ভুল বুঝাবুঝি ও উপদলীয় মনোবৃত্তি মাথা-চাড়া দিয়ে উঠবার সুযোগ পায়।

রসূলে করিমের সময় এই অবৈজ্ঞানিক উপাদানগুলি মাথাচাড়া দিবার সুযোগ পায় নাই। তাঁর অতুলনীয় প্রভাবে ও তাঁর প্রতি সকলের অবিচলিত ভক্তিতে নও-মুসলিমদের এই দুর্বলতা চেপে থাকে।

---

১. আসলে বৈজ্ঞানিক সংগঠনের বৈশিষ্ট্য হল তিনটি: (১) একটি সার্বিক আদর্শ: (২) ত্যাগ ও সাধনার মাধ্যমে আদর্শিক কর্মী ও সদস্য বাছাই; (৩) এক আদর্শ ও নেতৃত্বের ভিত্তিতে কঠোর একতা ও শৃঙ্খলা।

কিন্তু খিলাফতের সময় হতে এই দোষগুলি নানা পরিবেশ ও ঘটনাচক্রে প্রকাশ পেতে শুরু করে। এই সময় যদি হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রাঃ)-এর মত আদর্শ-নিষ্ঠ মহাপুরুষদের হাতে শাসনভার ন্যস্ত না হত, তবে সেই মুসলমান সমাজ নানা স্বার্থ ও ভাবধারায় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে ধ্বংস হয়ে যেত। বৈজ্ঞানিক সংগঠন না থাকলেও এই সময়ে খিলাফতের নেতৃত্বে উপযুক্ততম ব্যক্তির মনোনয়নে মানুষের ইতিহাসের সুন্দরতম রাষ্ট্র ব্যবস্থা —খিলাফত প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল।

আদর্শ রাষ্ট্রের দুটি বৈশিষ্ট্য

আদর্শ রাষ্ট্রের দুটি বৈশিষ্ট্যের একটা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। এই রাষ্ট্রের কাঠামো সংখ্যাভিত্তিক নয়—আদর্শের বিচারে গুণ-ভিত্তিক।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল এই রাষ্ট্র জাতীয়তাবাদী হতে পারে না, ইহা স্বভাবতই আন্তর্জাতিকতাবাদী হয়। ইহার কারণ হল আদর্শ-বাদী রাষ্ট্র একটা পূর্ণদর্শনের (ফিলসফির) উপর নির্ভর করে। সেই দর্শন কোন একটা এলাকার বা দেশের বা বর্ণের হতে পারে না। ইহা সমগ্র মানবজাতিকে মুক্তির আশ্বাস দিতে আগায়ে আসে। এই কারণেই খিলাফত ও কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রগুলি আন্তর্জাতিকতাবাদী। অন্যদিকে নিরপেক্ষ (গণতান্ত্রিক) রাষ্ট্রগুলি হয়ে উঠে জাতীয়তাবাদী। নির্দিষ্ট এলাকার বা নির্দিষ্ট বর্ণের অধিবাসীদের সুখ-সুবিধা ও উন্নতি-অবনতিই এর প্রধান কাম্য হয়ে পড়ে।

গণতন্ত্রী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য

গণতন্ত্রী সরকারগুলি হয় আদর্শ-নিরপেক্ষ। ইহারও দুইটা প্রধান বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমতঃ ইহারা জাতীয়তাবাদী। কোন কোন ব্যাপারে ইহাদের যে আন্তর্জাতিক কার্যকলাপ দেখা যায়—তাহাও নিজ দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে ঘটে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ গণতন্ত্রী সরকার হল দল-নির্ভর—মেজরিটি ভিত্তিক তথা সংখ্যা ভিত্তিক শাসন। সাধারণত দেশের বা অধিবাসীদের কতকগুলি দাবী দাওয়াকে ভিত্তি করে দলীয় প্রোগ্রাম তৈরী হয়। এক বা

একাধিক পার্টি মিলে মেজরিটি প্রতিনিধি পেলে সরকার গঠনের সুযোগ পায়। সংখ্যা-নির্ভর বলে এইসব রাষ্ট্রের কোন একটা নির্দিষ্ট বা অলঙ্ঘনীয় দর্শন (বা আদর্শ) নাই। অধিকাংশ লোকের সুবিধা-অসুবিধা বা ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর ইহা নির্ভর করে। কোন নির্দিষ্ট আদর্শের উপর নয়। আসলে গণতন্ত্র একটা তরিকা (Process) —সমাজের একটি মাত্র দিকের—নির্বাচনী অধিকার প্রতিষ্ঠার নিয়ম। ইহা জীবনের সার্বিক দর্শন নয়।

গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য মেজরিটি শাসন হলেও অনেক ক্ষেত্রে তা মাইনরিটি শাসনে পর্যবসিত হয়। দুইটির অধিক সবল দল থাকলেই ইহার উলটা অবস্থা দেখা দেয়। ইংলণ্ড ও ভারতের নির্বাচন ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ভারতের ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দল বহুবার শতকরা ৩০—৪৮ ভাগ ভোট পেয়েও সরকার গঠন করতে পেরেছে। নীচের উদাহরণ হতেই তা স্পষ্ট হবে।

ধরা যাক দাক্ষিণাত্যের একটি কেন্দ্রের ভোটের সংখ্যা ২০,০০০। মনে করা যাক এই কেন্দ্রে কোনও নির্বাচনে বিভিন্ন দলের ও আলাদা প্রার্থীরা নিম্নরূপ ভোট পেয়েছেন ঃ

কংগ্রেস প্রার্থী	ভোট পেয়েছে		৫০০০
সোশ্যালিস্ট ,,	,,	,,	৩০০০
কম্যুনিস্ট ,,	,,	,,	২৫০০
মুসলিম লীগ ,,	,,	,,	১৫০০
অন্যান্য দল মোট	,,	,,	২৬০০
৩ জন আলাদা প্রার্থী মোট ,,		,,	২৪০০
			১৭,০০০
	না দেওয়া ভোট	...	৩০০০
		মোট	২০,০০০

এখানে দেখা যাবে কংগ্রেস প্রার্থী ভোট পেয়েছে শতকরা মাত্র ২৫টি। অন্য কথায় এই কেন্দ্রের মাত্র ¼ ভাগ সমর্থন পেয়ে এককভাবে অধিক ভোট পেয়েছে বলে কংগ্রেস-প্রার্থী নির্বাচিত বলে ঘোষিত হয়েছেন।

অবশ্য শতকরা পঞ্চাশটির অধিক ভোট না পেলে যদি কাহাকেও নির্বাচিত বলে ঘোষণা না করার ব্যবস্থা রাখা যেত তবে গণতন্ত্রের মধ্যে এই অগণতান্ত্রিক অবস্থা হতে পারত না। বলা বাহুল্য যে, কার্যক্ষেত্রে সেই ব্যবস্থা করাও সম্ভব হয়ে উঠে না। ফলে দেশের অধিকাংশ লোক কোন দলকে না চাইলেও সেই দল ক্ষমতা পেয়ে যায়।

তাছাড়া সাধারণ ভোটারদের কি ইচ্ছামত ভোট দেওয়ার অধিকার থাকে এইরূপ নির্বাচনে? পার্টির মাত্র গুটিকয়েক ব্যক্তি নির্বাচনে মনোনয়ন দিয়ে থাকেন। পার্টির অনুসারীরা এইভাবে মনোনীত ব্যক্তিদের ভোট দিতে বাধ্য হন। পার্লামেন্টারী বোর্ডের নামে দলের কয়েকজন নেতাই এই মনোয়ন করে থাকেন। ফলে পার্টিভিত্তিক গণতন্ত্রে প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে সাধারণ ভোটারদের কোন হাত থাকে না।

গণতন্ত্রী নির্বাচনে কয়েকটি অসুবিধা

গণতান্ত্রিক নির্বাচনের দুইটা অসুবিধার কথা উপরে বলা হয়েছে। ইহার আরও কয়েকটি মারাত্মক অসুবিধা আছে। এই নির্বাচনে অনেক ক্ষেত্রে **সরাসরি নির্বাচন** সম্ভব নয়।

পার্লামেন্টারী তরিকার কথা ধরা যাক। এখানে প্রধান শাসক (প্রধান-মন্ত্রী) নির্বাচিত হন পরোক্ষ উপায়ে। উপরে যে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে সেই উপায়ে কোন দলের খাঁটি কিংবা কৃত্রিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা ঘটে, তারপর পার্লামেন্টের সেই দলের সদস্যরা তাদের নেতা নির্বাচিত করেন। সেই নেতাই প্রধান মন্ত্রী হিসাবে ক্ষমতায় বসেন ও অন্যান্য মন্ত্রী মনোনীত করেন।

এইভাবে প্রধান যিনি নির্বাচিত হন—তাতে জনগণের বা সাধারণ ভোটারদের কোন সরাসরি হাত থাকে না। প্রেসিডেন্সিয়াল তরিকাতেও এই রকম পরোক্ষ নির্বাচন প্রচলিত আছে।

এই হল সাধারণ অবস্থার কথা। অনেক ক্ষেত্রে এই পরোক্ষ নির্বাচনও স্বীকৃতি পায় না। ইংলণ্ডে কোন প্রধানমন্ত্রী অবসর নিলে তিনিই পরবর্তী রাষ্ট্রপ্রধান মনোনীত করে যান।

খিলাফত

ইসলামী রাষ্ট্রের রূপ হইল খিলাফত। খিলাফত মানে প্রতিনিধিত্ব।

ইহা আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্ব—তাঁর নীতির প্রতিনিধিত্ব। মানুষের প্রতিনিধিত্ব নয়। খিলাফতে খলীফা নির্বাচিত হন মানুষের দ্বারা। কিন্তু তার শাসন-কার্য চলে মানুষের খামখেয়ালীতে নয়—আল্লাহ্র নির্ধারিত নীতিতে দুনিয়ার সকল মানুষের ও জীবের মঙ্গলের জন্য—তাদের অধিকার রক্ষার জন্য। আসলে প্রত্যেক মানুষই আল্লাহ্র খলীফা, মানুষের সার্বিক মঙ্গলের জন্য সমাজের কাজ চালনা প্রত্যেকেরই কর্তব্য। ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফা হলেন এই খিলাফতের প্রধান রূপ—গুণে ও কর্মক্ষমতায়। ইসলামের 'ফা আল্লাহ্র নীতির কাছে দায়ী। কোন মানুষের কাছে নয়। নীতি ভঙ্গ করলে যে কোন সাধারণ মানুষ এইজন্য কৈফিয়ত তলব করতে পারে—যে কোন সাধারণ বিচারক এইজন্য রাষ্ট্রপ্রধানকে শাস্তি দিতে পারে। এই নীতি ভঙ্গ করে বসলে রাষ্ট্রপ্রধান পদে থাকবার তার কোন অধিকারই থাকে না।

এই কারণে খিলাফত হল নীতিতন্ত্র। এখানে কোন মানুষ বা জনগণ মূল ক্ষমতার অধিকারী নয়। এখানে মূল ক্ষমতা আসে আল্লাহ্র নির্ধারিত নীতি থেকে। এইজন্য খিলাফতে সার্বভৌমত্ব কোন ব্যক্তি মানুষ বা জনগণের নয়—ইহা একমাত্র আল্লাহ্র।

খিলাফত তাই রাজতন্ত্র নয়, ডিক্টেটরশীপ নয়—গণতন্ত্রও নয়। ইহা একটি নিজ-সম্পূর্ণ একক ব্যবস্থা—আদর্শতন্ত্র।

গণতন্ত্র ও খিলাফত

আসলে গণতন্ত্র, ডিক্টেটরশিপ কিংবা রাজতন্ত্র—এইগুলির কোনটাই মানব জাতির লক্ষ্য নয়—লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায় মাত্র। লক্ষ্য হল: মানুষের সুখশান্তি ও উন্নতি। এজন্য চাই: দুর্নীতিবিহীন ও শোষণমুক্ত পরিবেশ, সামাজিক ভ্রাতৃত্ব, ন্যায়বিচার, অর্থনৈতিক সাম্য, পর্যাপ্ত ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও ব্যক্তি মর্যাদা, মৌলিক অধিকার, মহত্তর জীবনবোধ ইত্যাদি।

পূর্ববর্তী প্রবন্ধে আমরা দেখায়েছি: খিলাফতের সময় এই লক্ষ্যের চরম সফলতা লাভ করে। আজ এই বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জ্ঞান বিজ্ঞানের এত প্রসার সত্ত্বেও—কোন একটি দেশ মানুষের এই লক্ষ্যে পৌঁছতে পেরেছে বলে বলা যাবে না। আধুনিক গণতন্ত্রের দেশ ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, ভারত প্রভৃতি দেশে সামাজিক ভ্রাতৃত্ব, অর্থনৈতিক সাম্য ও

শোষণমুক্ত পরিবেশ কল্পনা করা যায় না। নিগ্রো হইতে শুরু করিয়া শুদ্র পর্যন্ত সংখ্যালঘু কেউ এই সব দেশে পর্যাপ্ত মর্যাদা, স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার ভোগ করিতে পারেনি। অপরদিকে কম্যুনিস্ট দেশগুলিতে কি দেখি? অর্থনৈতিক প্রাচুর্য না ঘটলেও এইসব দেশ অর্থনৈতিক সাম্যের দিকে অনেক দূর এগুতে পেরেছে। কিন্তু ব্যক্তি-স্বাধীনতা, ব্যক্তি-মর্যাদা, ন্যায়বিচার, মত-পোষণের স্বাধীনতা প্রভৃতি মৌলিক বিষয় এইসব পার্টি ডিক্টেটরশিপের দেশে কল্পনার বিষয়।

গণতন্ত্রের সবচাইতে বড় লক্ষ্য হল দুটি : ১। ব্যক্তি-স্বাধীনতা ২। ব্যক্তি-মর্যাদা।

আগের প্রবন্ধে আমরা দেখিয়েছি খিলাফতে যেভাবে ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা ও ব্যক্তি-মর্যাদার স্বীকৃতি ঘটেছিল, আর কোন শাসনে তা সম্ভব হয় নাই। রিসালতে ও খিলাফতে বর্বর পুলিশ শাসন যে ছিল না শুধু এটা বড় কথা নয়—খেজুর পাতার ঘরে থেকে—অবিলাসী সহজ সরল জীবন যাপনের মধ্যে শুধু যে অনাড়ম্বরতা ছিল তা নয়—শাসক ও শাসিতের মধ্যে জীবন-মানেও কোন প্রকার পার্থক্য স্বীকার করা হত না। গুণের বিচারে বড় ছোট স্বীকার করা হত সত্য, কিন্তু অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিচারে সবাই ছিল সমান—সকলে ভাই ভাই—এই নীতির ভিত্তিতে সবাই ছিল একই সামাজিক মর্যাদা ও স্বাধীনতার অধিকারী। এইজন্যই বলি ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও ব্যক্তি-মর্যাদাই যদি গণতন্ত্রের সবচাইতে বড় কথা হয়ে থাকে তবে খিলাফতেই ইহার বেশীতম স্ফুরণ হয়েছিল। আর এইজন্য এইদিকে খিলাফতীদের কাছে গণতন্ত্র বিশেষ কোন আকর্ষণ বহন করে না। গণতন্ত্রে একটি ভোট দিয়েই কর্তব্যের ইতি হয়, খিলাফতে মানুষের মঙ্গল ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত কারও কর্তব্য শেষ হয় না।

গণতন্ত্র ও দুর্নীতি

গণতন্ত্রের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হল : নির্বাচনে জনসাধারণের অংশ নেওয়ার স্বীকৃতি। এই নীতি খিলাফতে যে উত্তমরূপে দেওয়া যেতে পারে তা আমরা পরে দেখাচ্ছি।

কিন্তু গণতন্ত্রের এই অধিকারের মধ্যে যে একটা মারাত্মক ত্রুটি নিহিত থাকে তা হল দুর্নীতি। দুর্নীতি সংখ্যাভিত্তিক গণতন্ত্রের সংগে অনেকটা

ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। ইংলণ্ডের গণতন্ত্রের ৭০০ বছরের ইতিহাসে দেখা যায়ঃ অধিকাংশ সময়ে সেখানে ঘুষের দ্বারা নির্বাচনকে প্রবল-ভাবে প্রভাবিত করা হত। বড় বড় জমিদার ও শিল্পপতিরা টাকা ও গুণ্ডাবাহিনী দ্বারা কিভাবে এই নির্বাচনকে প্রভাবিত করে নিজেদের দল ভারী করিতেন তা ইতিহাসের পাতায়ও স্থান পেয়েছে। এমনকি পার্লামেন্টের মেম্বারেরাও যে ঘুষের দ্বারা কর্তব্যচ্যুত হতেন তার নজিরও ইতিহাসে বিরল নয়। আমেরিকাতেও এই দুর্নীতি বিভিন্ন সময়ে কম ক্রিয়া করে নাই। ৭০০ বছরের দুর্নীতি ও ঘাত-প্রতিঘাতে এখন ইংলণ্ডের নির্বা-চনের কাজ বহুদূর উন্নত হয়েছে সত্য, কিন্তু তজ্জন্য যুগে যুগে যে মূল্য দিতে হইয়াছে তার ক্ষতিপূরণ হবার নয়। চীনে গণতন্ত্রী আমে-রিকা-পোষিত চিয়াং কাইশেকের তথাকথিত গণতন্ত্রের দুর্নীতির কাহিনী সকলের জানা আছে। কম্যুনিস্ট ডিক্টেটরশিপ কায়েমের পর সে দুর্নীতি পর্যুদস্ত হয়ে গেছে।

আজ বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতে কি অবস্থা দেখি! এখানে দুর্নীতি চলে বিভিন্ন পর্যায়ে। প্রথমত বড় বড় ধনী ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, কন্ট্রাক্টর টাকার প্রভাবে প্রচলিত বড় বড় পার্টির নেতাদের তথা পার্লামেন্টারী বোর্ডকে প্রভাবিত করে মনোনয়ন লাভ করে। এই মনোনয়নে টাকা ও গ্রুপ প্রীতিই বড় হয়ে উঠে—গুণ নয়। এইজন্য গরীব অথচ সৎ লোকেরা প্রায় ক্ষেত্রে মনোনয়ন হতে বঞ্চিত হন।

এরপর আসে সাধারণ নির্বাচন। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে ভোটারকে ঘুষ দিয়ে অর্থবলে বলীয়ান প্রার্থীরা ভলান্টিয়ার ও স্তাবক নিযুক্ত করে সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য প্রমাণ করে ঘুষখোর ও দুর্নীতিবাজরাই এই তরিকায় অধিক সংখ্যায় নির্বাচিত হয়ে যায়। কিভাবে নির্বাচনী বৈতরণী পার হয় তা কারও অজানা নয়।

গণতন্ত্রের চিল্লামী ও উচ্ছৃঙ্খলতা অনেক সময় মারাত্মক হয়ে পড়ে, আর এইরূপ অবস্থার সুযোগ নিয়ে মিলিটারী ডিক্টেটরশিপ গড়ে উঠবার সুযোগ পায়। এই শতকের মধ্যভাগে দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়া ও ইউরোপের বহু দেশে গণতন্ত্রের পতন ও মিলিটারী ডিক্টেটরশিপ কায়েমের ইতিহাস এই কথার জ্বলন্ত উদাহরণ।

এইসব কারণেই খিলাফতী শাসন অনেকের কাছে অতিশয় কাম্য বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু প্রশ্ন হল—খিলাফতের গঠন হবে কিরূপ ?—তার কর্তব্য এবং তাতে নির্বাচন তরিকাও বা হবে কেমন ?

পরের প্রবন্ধে ইহাই আলোচনা করা হয়েছে সংক্ষেপে।

৩

খিলাফতের গঠন, নির্বাচন ও কর্তব্য

খিলাফতের স্তর

খিলাফত বিভিন্ন স্তরে প্রসারিত থাকবে। কেন্দ্রীয়, দেশীয়, সুবা, জেলা ও গ্রাম ব[illegible]না। শহরের ছোট ছোট এলাকাকে মহল্লা বলা যাবে।

খিলাফতের গঠন

প্রত্যেক খিলাফতে ১৫ হতে ৫০ জনের একটি পরামর্শী মজলিস থাকবে। প্রত্যেক খিলাফতে থাকবেন ১ জন করে আমীর বা অলী। তাঁরা বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন নামে অভিহিত হবেন। কেন্দ্রীয় খিলাফতের আমীরের নাম হবে খলীফা। খলীফা সাধারণত পরামর্শী মজলিসের সদস্যদের মধ্য হতে তাঁর প্রধান মন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগ করবেন। আবশ্যকবোধে কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি পরামর্শ কমিটির বাহির হতেও অতি উপযুক্ত ব্যক্তিকে মন্ত্রী নিযুক্ত করতে পারবেন।

খিলাফতের নির্বাচন

ভোটার: যে কোন সৎ ব্যক্তি নির্দিষ্ট বয়স পার হলে ভোটার হতে পারবেন। সৎ ব্যক্তি বলতে তাঁকে বুঝাবে—যিনি দুর্নীতিবাজ, মিথ্যাবাদী, সমাজবিরোধী বা সমাজের অপকারী নন। খিলাফত প্রতিষ্ঠার কিছু সময় পর আবশ্যকবোধে অন্তত প্রাইমারী শিক্ষাকে ভোটার হওয়ার শর্ত হিসাবে আরোপ করা যেতে পারে। এইজন্য খিলাফতে সরকারী আওতায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন করে শতকরা ১০০ জনকে শিক্ষিত করে তোলার নীতি গ্রহণ করতে হবে। কারণ শিক্ষা গ্রহণ নারী পুরুষ সকলের জন্য ফরজ।

আদর্শ সংগঠনের পরামর্শানুসারে ভোটার তালিকা তৈরী হবে। ইসলামী

আদর্শের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিকভাবে যে সংগঠন গঠিত হয়ে খিলাফতের প্রতিষ্ঠা করবে তাহাই হবে আদর্শ সংগঠন।[১]

পরামর্শী মজলিসের মেম্বার

পরামর্শী মজলিসের মেম্বারেরা এলাকা ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন। পরামর্শী মেম্বারদের অবশ্যই ভোটার হতে হবে। আর তাদের বেলায় নীচের শর্ত থাকবে।

(ক) সাধারণত তাঁরা অশিক্ষিত হবেন না। শুরুর দিকে কেউ জ্ঞানী, গুণী ও সৎ হলে বিশেষ ক্ষেত্রে কোন কোন অশিক্ষিত লোককেও এইজন্য মনোনীত করা যেতে পারবে।

(খ) তাঁরা স্বার্থপর, কৃপণ, দুর্নীতিপরায়ণ বা সুদখোর হবেন না।

(গ) গোষ্ঠীগত বা এলাকাগত দলাদলি ও গীবত হতে তাঁরা মুক্ত থাকবেন।

(ঘ) অতীতে সমাজকল্যাণমূলক কাজের সার্টিফিকেট তাঁদের থাকতে হবে। আদর্শ সংগঠনই এই সার্টিফিকেট দেবেন।

(ঙ) আদর্শের বিভিন্ন দিক ও দেশের সমস্যা সম্বন্ধে তাঁদের ভাল জ্ঞান থাকতে হবে। কুরআন, আদর্শ অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, দেশের কৃষি ও শিল্প সম্বন্ধে তাঁদের মোটামুটি পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে। প্রত্যেক গ্রামে বা মহল্লাতে আদর্শ সংগঠন বছরে অন্তত ১ মাসের জন্য একটি আদর্শ ট্রেনিং ক্লাস খুলবে। এই ক্লাসে উপরে বর্ণিত বিষয়গুলি ছাড়াও সৎ কাজ ও সৎচরিত্র সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট শিক্ষা দেওয়া হবে। এইভাবে ট্রেনিংপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা পরামর্শী মেম্বার হওয়ার উপযুক্ত হবেন।

অতিশয় নিষ্কলুষ চরিত্র, গভীর জ্ঞানসম্পন্ন নিঃস্বার্থ দেশসেবক ও সৎ সাহসীরাই অলী নির্বাচিত হওয়ার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন।

---

১. আদর্শ রাষ্ট্র কায়েম ও রক্ষার জন্য এই সংগঠন অপরিহার্য। এইরূপ সংগঠন ছিল না বলেই হযরত উসমানের সময় হতে অবাঞ্ছিত দলাদলি ও বিশৃঙ্খলা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে এবং শেষ পর্যন্ত খিলাফতই ধ্বংস হয়ে যায়। বিভিন্ন কম্যুনিস্ট দেশগুলিতেও কম্যুনিস্ট পার্টি নেতৃত্ব না দিলে বহু আগেই এই রাষ্ট্রগুলি ধ্বংস হয়ে যেত।

নির্বাচনের আদর্শ তরিকা

সাধারণ ভোটারদের ভোট থাকবে একাধিক—বিভিন্ন স্তরের পরামর্শী মেম্বার, গ্রাম বা মহল্লার আমীর ও খলীফা নির্বাচনের জন্য।

খিলাফতের কোন নির্বাচনে কেউ প্রার্থী হবেন না। সর্বপ্রকার ক্যানভাসিং ও আত্মপ্রচার নিষিদ্ধ থাকবে। অতীতের কাজের মাধ্যমে পরিচয়ের ভিত্তিতে ভোটাররা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজেদের পছন্দমত যে-কোন ব্যক্তিকে ভোট দেবে। সবচাইতে বেশী ভোট পাওয়া ব্যক্তিকে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা হবে।

উদাহরণ

একটি উদাহরণ দিলে এই নির্বাচনের তরিকা পরিষ্কার হবে। ধরা যাক একটি গ্রামে ভোটারের সংখ্যা একশ'। এখানে তিনজন মেম্বার নির্বাচিত হবেন। ভোটারেরা ভোটকেন্দ্রে এসে তাদের ইচ্ছামত যে কোন লোককে ভোট দিতে পারবেন। প্রত্যেক ভোটারের ৩টি করে ভোট থাকবে। কেউ প্রার্থী হবেন না। সুতরাং যাহাকে উপযুক্ত ও ভাল মনে হবে তাহাকেই ভোট দেবে। ধরা যাক, এইভাবে ২০ জন লোক ভোট পেয়েছেন। এর মধ্যে হয়ত কেউ পেলেন ৫০ ভোট, কেউ ৪০, কেউ ৩৫, কেউ ২৮, কেউ ১৪, কেউ ১১ ইত্যাদি। তাঁদের মধ্যে যে ৩ জন বেশী ভোট পেয়েছে অর্থাৎ ৫০, ৪০ ও ৩৫ ভোট পাওয়ার ব্যক্তিরাই নির্বাচিত ব্যক্তি বলে বিবেচিত হবেন। এর মধ্যে কেহ মেম্বার হতে গররাজী হলে পরবর্তী ব্যক্তি নির্বাচিত হবেন। অন্য কথায় ২৮ ভোট পাওয়া ব্যক্তি নির্বাচিত বলে ধরে নিতে হবে।

আদর্শের খাতিরে মানুষের মঙ্গলের জন্য ভাল ও উপযুক্ত ব্যক্তিকে নির্বাচিত করার দায়িত্ব পুরাপুরি ভোটারদের। এই জন্য ভোটারেরাই নিজেদের খরচে ভোটকেন্দ্রে যাতায়াত করবেন ও অন্যান্য খরচ বহন করবেন। খিলাফতে কোন পদে নির্বাচিত হওয়া লাভজনক ব্যবসায় নয়—এটা একটা গুরুদায়িত্ব। এইজন্য নির্বাচিত কোন ব্যক্তি এই উদ্দেশ্যে কোন খরচ করতে পারবেন না।

অন্যান্য স্তরের পরামর্শী মজলিসের মেম্বাররাও একই নীতিতে গ্রাম বা মহল্লার পরামর্শী মেম্বারদের ভোটে বা সাধারণ ভোটে নির্বাচিত হবেন।

গ্রাম বা মহল্লার আমীর ছাড়া অন্যান্য স্তরের আমীর মনোনীত হবেন—স্বয়ং খলীফা বা তার মনোনীত উর্ধ্বতন আমীর বা কমিটি দ্বারা আদর্শ-বাদিতা, সততা ও উপযুক্ততার ভিত্তিতেই।

গ্রাম বা মহল্লার আমীর নির্বাচিত হবেন সাধারণ ভোটারদের দ্বারা সরাসরিভাবে। এই ক্ষেত্রেও কেউ প্রার্থী হতে পারবেন না।

খিলাফতের শুরুর দিকে কেন্দ্রীয় পরামর্শী কমিটির ও আদর্শ সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটি আদর্শ উপায়ে দেশের সেরা ব্যক্তিদের মধ্য হতে কয়েক ব্যক্তিকে মনোনীত করবেন। এই মনোনয়নও আদর্শ তরিকায় হতে হবে। এইভাবে মনোনীত কয়েকজনের যে কোন একজনকে সাধারণ ভোটারেরা সরাসরি আদর্শ তরিকার খলীফা নির্বাচিত করবেন।

দীর্ঘদিন খিলাফতের শাসন চালু থাকবার পর সমাজে আদর্শ ব্যবস্থা ও চরিত্র গঠিত হলে খলীফার প্রাথমিক মনোনয়ন প্রথাকে বাতিল করা যাবে। তখন উপরে বর্ণিত আদর্শ তরিকায় খলীফা নির্বাচিত হবেন।

অযোগ্য ও অক্ষম প্রমাণিত না হলে সাধারণত খলীফা নির্বাচিত হবেন দীর্ঘ সময়ের জন্য। নেতৃত্বের প্রতি আস্থা, সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা কার্যকরী-করণ ও স্থিতিশীলতার জন্য ইহা একান্ত প্রয়োজন। দেশ ঘন ঘন ক্ষমতার লড়াইয়ে পড়ুক ইহা কাম্য হতে পারে না।

খোলাফায়ে রাশেদীন বা কম্যুনিস্ট দেশগুলির মত অক্ষমতা, মৃত্যু বা বরখাস্ত না হওয়া পর্যন্ত নূতন কেন্দ্রীয় খলীফা নির্বাচিত হওয়া উচিত কি না তা বিবেচনার যোগ্য। গ্রাম বা মহল্লার আমীর হবেন অন্তত পাঁচ বছরের জন্য।

কাজে অবহেলা বা অযোগ্য ও অক্ষম প্রমাণিত না হলে অন্যান্য আমীর খলীফার নির্ধারিত যে কোন সময় পর্যন্ত বহাল থাকবেন। গ্রাম বা মহল্লার আমীর ছাড়া যে কোন আমীরকে খলীফা আবশ্যকবোধে বদলী করতে পারবেন। গ্রাম বা মহল্লার আমীরের ক্ষেত্রে খালি পদে খলীফাই নির্বাচনের হুকুম দেবেন।

খলীফার মৃত্যু, বরখাস্ত ও পদত্যাগের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা কিংবা কেন্দ্রীয় পরামর্শ কমিটি অস্থায়ীভাবে পরবর্তী অস্থায়ী খলীফা আদর্শিক পদ্ধতিতে মনোনীত করবেন। মনোনীত হবার ছয় মাসের মধ্যে সাধারণ

ভোটারদের দ্বারা স্থায়ীভাবে খলীফা নির্বাচিত হবেন। উপযুক্ত থাকলে যে কোন খলীফা পুনর্নির্বাচিত হতে পারবেন।

খিলাফত ও গণভোট

খিলাফতে জাতীয় বড় বড় প্রশ্ন ও সমস্যার ক্ষেত্রে গণভোট নিয়ে তা সমাধান করতে হবে।

গণভোট ও নির্বাচনের জন্য গ্রাম ও মহল্লায় ভোটার তালিকা সর্বদা তৈরী থাকবে।

কেন্দ্রীয় খিলাফতের আওতা

খিলাফত একাধিক দেশ নিয়ে গঠিত হলে ইহার রূপ হবে অনেকটা ঢিলা ফেডারেশনের মত। ইহার আওতায় থাকবে সাধারণত ৪টি বিষয় :

১। দেশরক্ষা ২। মুদ্রা ৩। বৈদেশিক সম্পর্ক ৪। নীতি-নির্ধারণ। বাকী বিষয়গুলি বিভিন্ন স্তরে দেশীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকবে। বিশ্ব খিলাফত গঠিত হলে প্রতিরক্ষা বিভাগ বা সৈন্যদল কিছুরই প্রয়োজন হবে না।

খিলাফত একটি মাত্র দেশ অথচ বিভিন্ন অসম এলাকা নিয়ে গঠিত হলে ইহার ক্ষমতা আরও কিছুটা বিস্তৃত হতে পারবে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই দরিদ্রতর এলাকার কোন সম্পদ যাতে উন্নততর এলাকায় না যায় তার দৃঢ় ব্যবস্থা থাকবে। উন্নত এলাকার সাথে সর্বপ্রকার এলাকাগত শোষণ নিষিদ্ধ থাকবে।

খিলাফত যদি একই ভাষাভাষী ও স্বার্থের অনুসারী একটি মাত্র দেশ বা এলাকা নিয়ে গঠিত হয় তবে উহা হবে সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এককেন্দ্রিক খিলাফত।

খিলাফত ও বায়তুলমাল

খিলাফতে বায়তুলমাল তরিকা হবে দেশীয় ও বৈদেশিক লেন-দেনের প্রধান মাধ্যম। এই পদ্ধতি গ্রাম পর্যন্ত প্রসারিত থাকবে। খিলাফতের যাবতীয় আয়, যাকাত, চাঁদা, জনসাধারণের গচ্ছিত টাকা প্রভৃতি বায়তুলমালে গচ্ছিত থাকবে। খিলাফতের কর্মচারীদের বেতন, বিনা

সুদে ধার, অভাবীদের সাহায্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ব্যাপার সম্পর্কিত যাবতীয় কর্তব্য সম্পাদন ও দেশের যাবতীয় উন্নয়ন কাজে বায়তুল-মালের টাকা ব্যয় হবে। গ্রাম খিলাফতের অধীনে প্রতি বায়তুলমালে কৃষি যন্ত্রপাতি—যেমন ট্রাক্টর, দমকল, সার, বীজ, ছোট-খাট শিল্পের যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সরকারী খরচে মওজুত থাকবে। এই সমস্ত জিনিস বিনা পয়সায় বা ভাড়ায় কিম্বা কোন কোনটা নির্ধারিত মূল্যে গ্রামের কৃষক ও শিল্পীরা ব্যবহার করতে পারবে। আবশ্যকবোধে বায়তুলমাল অভাবী কৃষক ও শিল্পীদের উৎপন্ন মাল যেমন, পাট, কাপড় ইত্যাদি নগদ টাকায় যথাযোগ্য মূল্যে কিনবে—যাতে বিক্রেতারা অসময়ে অভাবে পড়ে উৎপন্ন দ্রব্য কম দামে বেচতে বাধ্য না হয়। খিলাফতের অধীনে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্থসম্পদ অকেজোভাবে জমিয়ে রাখা (Hoarding) পুরাপুরি নিষিদ্ধ থাকবে। অকেজো অর্থ বায়তুলমালে গচ্ছিত থাকবে।

খিলাফত ও জমি

খিলাফতে সমস্ত জমি আল্লাহ্‌র জমি হিসাবে গণ্য হবে। শুধুমাত্র কৃষকেরাই কৃষিযোগ্য জমির অধিকারী হবে। প্রয়োজনবোধে গ্রাম খিলাফত ১০/১৫ বছর পর পর ইসলামী নীতি অনুসারে জমির পুনর্বন্টন করতে পারবে।

খিলাফত ও শিল্প কারখানা

শিল্পের কেউ মালিক থাকবে না। কার্যরত শ্রমিক ও পরিচালকদের কাজের পরিমাণ ও গুণ অনুসারে শেয়ার ধরে ঐ শেয়ার উহাদের মধ্যে বন্টিত হবে। এতে খিলাফতেরও একটি শেয়ার থাকবে। আবশ্যকবোধে খিলাফত নতুন শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠায় ও পুরানা শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসারে বায়তুলমাল হতে টাকা ব্যয় করবে। লভ্যাংশ শেয়ার অনুসারে অংশীদারদের মধ্যে বিলি হবে। শিল্পে কাঁচামাল সরবরাহকারী কৃষক ও শ্রমিকেরাও তাদের মাল ও শ্রমের ভিত্তিতে শেয়ারের অধিকারী হতে পারবে।

মধ্যে মধ্যে শেয়ারের পুনর্মূল্যায়ন হতে পারবে। শিল্পের এই ব্যবস্থায় শোষণ পুরাপুরি বন্ধ হবে। প্রত্যেকের কাজের প্রেরণা থাকবে

আর এতে শিল্প বিরোধের বা ধর্মঘটের কোন প্রয়োজনীয়তা থাকবে না।

প্রয়োজনবোধে প্রথম অবস্থায় শ্রমিক ও কর্মচারীদের বেতন দেওয়া হবে। এই টাকা পরে শেয়ারের লাভের অংশ হতে কাটা হবে।

দেশে আদর্শ চরিত্র গঠিত হলে হালাল রুজী, সংগঠন ও নির্দোষ খরচ নির্বাহের শর্তে ব্যক্তি-পরিচালনায় শিল্পকারখানা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করা যাবে।

খিলাফত ও শোষণ

খিলাফতে কোন প্রকার শোষণ থাকবে না। সুদ নিষিদ্ধ থাকবে। একমাত্র শ্রমই (কায়িক ও মানসিক) নূতন সম্পদ অধিকারের ভিত্তি বলে গণ্য হবে। সুষ্ঠু বণ্টনের খাতিরে সম্পদের উত্তরাধিকার স্বীকৃত হবে। কিন্তু অনাবশ্যকভাবে কোন সম্পদ নষ্ট করতে বা অপব্যয় হতে দেওয়া হবে না।

খিলাফতে খলীফা হতে শুরু করে গ্রামের আমীর বা অন্যান্য ছোট কর্মচারী পর্যন্ত বেতনের বিশেষ তারতম্য থাকবে না। তারতম্য থাকবে দায়িত্বের ও ক্ষমতার। খিলাফতে শাসক ও কর্মচারীদের অর্থনৈতিক আয়ের তারতম্য হওয়া নীতিগতভাবে অবাঞ্ছনীয় বিবেচিত হবে।

বিনা কাজে সম্পদ ও টাকা জমিয়ে রাখা খিলাফতে অপরাধ বলে গণ্য হবে। অব্যবহৃত টাকা বায়তুলমালে গচ্ছিত থাকবে।

খিলাফত ও জনহিতকর কাজ

খিলাফতে কাউকে অভাবী ও বেকার থাকতে দেওয়া হবে না। অবসরকালে গ্রামের ও অঞ্চলের সমর্থ লোকদের কম বেতনে বা বিনা বেতনে গ্রামে ও মহল্লার খাল খনন, রাস্তাঘাট, পুল, বাঁধ তৈরী, গরীব জনসাধারণের ঘর, স্কুল-মাদ্রাসা তৈরী প্রভৃতি জনহিতকর ও উন্নয়নমূলক কাজে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করা হবে।

খিলাফত ও শিক্ষা

সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষা যথাসম্ভব অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলকভাবে খিলাফতের অধীনে পরিবেশন করা হবে। সমস্ত সিলেবাস ও কারিকুলাম

আদর্শানুসারে সাজিয়ে লিখিত হবে। আর সেই অনুসারে পাঠ্য বই তৈরী করতে হবে। আদর্শ শিক্ষা পাওয়া শিক্ষকেরা শিক্ষা দেবেন। শিক্ষার্থীদের মহত্তর জীবন যাপন, চরিত্র গঠন ও পরোপকারের কাজে উদ্বুদ্ধ করার বিশেষ ব্যবস্থা করা হবে।

খিলাফতের কোন স্তরে কেউই অশিক্ষিত থাকতে পারবে না। শুরুতে দিনে বা রাতে গ্রাম ও মহল্লা খিলাফতের অধীনে বয়সীদের স্কুল চালিয়ে দেশে ছাত্র ও শিক্ষিত সমাজের দ্বারা বাধ্যতামূলকভাবে লেখা-পড়া শিখাতে হবে। খিলাফত প্রতিষ্ঠার দুই এক বছরের মধ্যে যাতে কেউ অশিক্ষিত না থাকে তার নিশ্চিত ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে কম সময়ে ও কম খরচে শিক্ষা পরিবেশিত হয় তার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য আমাদের ভাষায় অদরকারী বর্ণ ও অনুচ্চারিত বানান বাদ দিতে এর অবৈজ্ঞানিকতা, কৃত্রিমতা ও জটিলতা দূর করতে হবে।

খিলাফত ও স্বাস্থ্য

সকল অধিবাসীর স্বাস্থ্য-রক্ষার প্রধান দায়িত্ব থাকবে খিলাফতের। সমস্ত কঠিন রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা ও ব্যয়ভার খিলাফতকে বহন করতে হবে। খরচে অসমর্থ নাগরিকদের চিকিৎসার ব্যয়ভার বায়তুলমাল হতে দেওয়া হবে।

খিলাফতে আহার, বাসস্থান ও বস্ত্র

খিলাফতে কেউ অনাহারে, বিনা বস্ত্রে ও বাসস্থানবিহীন অবস্থায় থাকবে না। ন্যূনতম প্রয়োজনের ভিত্তিতে প্রত্যেক নাগরিকের আহার, বাসস্থান ও পরিধান নিশ্চিত করা খিলাফতের মৌলিক দায়িত্ব বলে গণ্য হবে।

খিলাফত ও নারী

খিলাফতে কুরআনিক নীতিতে নারীকে যথোপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করা হবে। নারীকে বিলাসের ও প্রদর্শনীর সামগ্রী হিসাবে ব্যবহৃত হতে দেওয়া হবে না। তাদের মূল প্রকৃতি অনুসারে আদর্শ মা-বোন ও স্ত্রীরূপে গড়ে তোলাই হবে খিলাফতের বড় কাজ। পুরুষের মত সমস্ত নারীকে শিক্ষিত হতে হবে। কুরআনিক নীতি অনুযায়ী নারীদের

প্রকৃতিসম্মত কাজ করতে দেয়া হবে এবং তাদের আয় ইসলামী নীতির ভিত্তিতে খরচ করার অধিকার তাদের থাকবে।

খিলাফত ও সরকারী কর্মচারী

খিলাফতের কর্মচারীরা হবেন একনিষ্ঠ দেশসেবী। কোন চাকুরীকে অর্থ আহরণের উপায় হিসাবে গণ্য করা যাবে না—গণ্য হবে জনসেবার উপায় হিসাবে। এজন্য নিয়োগের আগে এদের আদর্শ ট্রেনিং পেতে হবে। তাদের সৎচরিত্র ও আদর্শ প্রীতির সার্টিফিকেট থাকতে হবে। সম্পর্কিত মন্ত্রী ও বড় বড় কর্মচারীদের গ্রামে ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে গিয়ে সমাজের সমস্যা সম্বন্ধে সরাসরি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আহরণ করতে হবে। যেমন: কৃষিমন্ত্রী ও কৃষি কর্মচারীকে অবশ্যই কয়েক মাসের জন্য সুদূর গ্রামে গিয়ে কৃষকদের মধ্যে বসবাস করতে হবে ও তেমনি মৎস্য বিভাগের প্রধানদের ও কর্মচারীদের জেলেদের সঙ্গে বসবাস করে তাদের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করতে হবে।

সরকারী পর্যায়ে সর্বপ্রকার অনাবশ্যক বিলাসিতা ও অপচয় নিষিদ্ধ করা হবে। সরকারী কাজ-কর্ম যথাসম্ভব সহজ ব্যবস্থায় ও কম খরচে পরিচালিত হবে।

খিলাফত ও বিচার ব্যবস্থা[১]

খিলাফতে বিচার ব্যবস্থা হবে শাসন-ব্যবস্থা হতে স্বাধীন। গ্রাম খিলাফত পর্যন্ত কাজী ব্যবস্থা প্রসারিত থাকবে। কাজী হবেন অত্যন্ত সৎ, জ্ঞানী ও নির্ভীক। খলীফা হোন আর আমীর হোন দেশের যে-কোন লোকের বিরুদ্ধে কাজীর কাছে যে-কোন ভুক্তভোগী বিচার চাইতে পারবে। এইজন্য কারও অনুমতি নিতে হবে না। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হলে যে-কোন ব্যক্তিকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। সামাজিক বড় বড় দোষে দোষী সাব্যস্ত হলে আমীর বা খলীফা শাস্তি পাবেন। আবশ্যকবোধে বিচার বিভাগই কাজীদের বদলী, পদোন্নতি বা পদচ্যুতির জন্য দায়ী থাকবেন।

বিচার হবে সম্পূর্ণ খরচাহীন। খিলাফতের কোন নাগরিককে এইজন্য কোন খরচ করতে হবে না। বিনা খরচে সুবিচার পাওয়ার অধিকার থাকবে প্রত্যেকটি মানুষের আর সুবিচার দেওয়ার পুরা দায়িত্ব থাকবে

---

১ কুরআন IV—১৩৫, II—১৯০।

খিলাফতের। এইজন্য খিলাফতে কোন ওকালতি ব্যবসা থাকবে না। কাজীদের নিযুক্ত জ্ঞানী পরামর্শদাতারা বিনা পারিশ্রমিকে ফরিয়াদী ও আসামীদের আইনের বিষয়ে সঠিক পরামর্শ দেবে। পরামর্শদাতাদের বেতন বায়তুলমাল হতে দেওয়া হবে।

খিলাফতের সমাজ-ব্যবস্থা অত্যন্ত সরল ও সহজ হবে বলে আইনও অত্যন্ত সহজ হবে।

খিলাফত ও অপরাধ

খিলাফত এর জনসাধারণকে এমনভাবে শিক্ষিত করে তুলবে ও শাসন করবে যাতে কোথাও কোন প্রকার অপরাধ (চুরি, ডাকাতি, দুর্নীতি ইত্যাদি) না ঘটে। এইজন্য খিলাফতের কোথাও কেউ যেন খাওয়া, পরা ও থাকার অভাবে কষ্ট না পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। কেউ এরূপ কষ্ট পেলে সম্পর্কিত খিলাফত সেজন্য দায়ী হবে। ইহা সত্ত্বেও কোন অপরাধ ঘটলে কুরআনের নির্দেশমত কঠোর আদর্শ শাস্তি দেওয়া হবে।

খিলাফত ও পুলিশী ব্যবস্থা

খিলাফতে পুলিশী ব্যবস্থা না রেখে যথাসম্ভব সৎচরিত্র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী দ্বারা শৃঙ্খলা রক্ষার কাজ সমাধা করা হবে। এই বাহিনীতে কঠোর শৃঙ্খলা রক্ষা করা হবে। দেশ সেবায় উদ্বুদ্ধ ও ট্রেনিং পাওয়া লোকদের দ্বারাই এই বাহিনী গঠিত হবে। শৃঙ্খলা রক্ষা ছাড়াও এই বাহিনী রাস্তাঘাট তৈরী, খাল-কাটা, গ্রামে-মহল্লায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা, গরীবদের ঘর-বাড়ি তৈরী ও নানা সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ, বন্যায়, দুর্ভিক্ষে, তুফানে দুঃখীদের সর্বপ্রকার সাহায্য দান প্রভৃতি কাজে কর্তব্য হিসাবে আগায়ে যাবে। তাহাদের বেতন বায়তুলমাল হতে দেওয়া হবে। এই বাহিনীকে সর্বপ্রকার দুর্নীতি হতে মুক্ত রাখা হবে।

খিলাফত ও মাইনরিটি

খিলাফতে সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করা হবে। ধর্মের ব্যাপারে সকল প্রকার জোরজবরদস্তি নিষিদ্ধ থাকবে।

আদর্শ-রাষ্ট্রের পরিপন্থী না হলে আর উপযুক্ত প্রমাণিত হলে যে কোন ব্যক্তি খিলাফত পরিচালনায় অংশ নিতে পারবে।

খিলাফত ও ব্যক্তি-মর্যাদা

খিলাফতে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ব্যক্তি-মর্যাদাকে অত্যন্ত উপরে স্থান দেওয়া হবে। সমাজের জন্য অকল্যাণমূলক না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তির স্বাধীনতাকে খর্ব করা হবে না।

বেশ্যাবৃত্তি ও মদ

খিলাফতে বেশ্যাবৃত্তি ও মদ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে।

খিলাফত ও নির্দোষ আনন্দ

খিলাফতে প্রত্যেক লোকের যথেষ্ট অবসর মিলবে। এই অবসরে নির্দোষ আনন্দের জন্য প্রত্যেক গ্রাম ও মহল্লা খিলাফতের অধীনে এক একটা মিলনায়তন ও খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকবে। ঈদ ও অন্যান্য উপলক্ষে নির্দোষ মেলার ব্যবস্থা করা হবে। কবিগান, পুঁথিপাঠ, ভলীখেল, হাডুডু প্রভৃতি গ্রাম্য শিল্প ও খেলাধুলার সুপ্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন করা হবে। যাবতীয় জুয়া ও চরিত্র-দূষণীয় অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ থাকবে।

খিলাফত ও মসজিদ

খিলাফতে মসজিদ বিশিষ্ট ভূমিকা নেবে। প্রতি শুক্রবার বিভিন্ন মসজিদে মাতৃভাষার মাধ্যমে গ্রামের ও দেশের অবস্থা পর্যালোচনা করা হবে। এলাকাগত কোন সমস্যা বা অভিযোগ থাকলে মসজিদে তাহা আলোচনা হবে। মসজিদ এভাবে সুশৃঙ্খল পরামর্শ সভার কাজ করবে। সম্ভব হলে সম্পর্কিত আমীরই মসজিদগুলির ইমারতের কাজ করবেন।

বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্ব খিলাফত

খিলাফতের সবচাইতে বড় কর্তব্য ও লক্ষ্য হবে খিলাফতের অধীনে প্রতিটি মানুষের মধ্যে আন্তরিক ও অকপট ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা। এই ভ্রাতৃত্ব যাতে সারা দুনিয়ায় প্রসারিত হয় তজ্জন্য খিলাফতে অবিরাম চেষ্টা থাকবে। এই মহৎ উদ্দেশ্যেই বিশ্ব খিলাফত গঠনের ক্ষেত্র তৈরী করবে। বিশ্ব খিলাফত গঠিত হলে যুদ্ধ চিরতরে বন্ধ হবে। বিশ্ব খিলাফতে দেশ-রক্ষা বিভাগের কিংবা নিয়মিত সৈন্যবাহিনী রাখার কোন আবশ্যকতাই থাকবে না।

৪

ইসলামী মেনিফেস্টো

(ঘোষণা)

[আমরা বিশ্বাস করি : এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন প্রভু নাই। আল্লাহ্র সৃষ্ট সমস্ত মানব এক পরিবারভুক্ত, তাই মানুষ মানুষের ভাই। মানুষ মানুষের প্রভুও নয়—দাসও নয়।[১] আমরা বিশ্বাস করি : পৃথিবীর সবখানে আজ যে সমাজ ব্যবস্থা ও শাসন ব্যবস্থা চলিতেছে তাহা শোষণ-মূলক ও অত্যাচারমূলক। সুতরাং তাহার উৎসাদন এবং প্রকৃত মানব কল্যাণকর সমাজ প্রতিষ্ঠাই আমাদের অবশ্য কর্তব্য বলিয়া মনে করি।]

১. কুরআন IV—১, [৪২ : ১৩ : ১৪], [২ : ২১৩], [৪ : ১৩৫;] [২ : ১৯৩] ও [৪ : ৭৫] এবং হাদীসে বুখারী।

আন্তর্জাতিক

আমরা বিশ্বাস করি : মানবসমাজ এক জাতি।[১] সুতরাং ভৌগোলিক কারণ অথবা রক্ত, বর্ণ ও অন্যান্য সম্বন্ধের জন্য আজিকার পৃথিবীতে জাতীয়তার নামে যে ফাছাদ, শোষণ, অবিচার ইত্যাদি চলছে—আমরা তার অবসান চাই। আমরা কাজের সুবিধা ও অন্যান্য কারণে পৃথিবীর এক এক খণ্ডের ইউনিটকে অস্বীকার করি না। কিন্তু আদর্শের ভিত্তিতে নৈতিকতাকে কেন্দ্র করে পৃথিবীব্যাপী এক মহাজাতি গড়ে উঠুক—ইহাই আমরা চাই। তাই আমরা জাতীয়তাবাদী নই—আমরা মানবতাবাদী। পৃথিবীর সকলের কল্যাণ সাধনই আমাদের লক্ষ্য।

অবশ্য আমরা ইহাও বিশ্বাস করি : যে পর্যন্ত আদর্শভিত্তিক ভাবে পৃথিবীর সমস্ত জাতি একত্রিত না হচ্ছে ততদিন জাতীয়তাবোধ ও বিভিন্নতা থেকেই যাবে। তাই, আমাদের চেষ্টা হবে—এক মহান আদর্শের দিকে মানবজাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

আমরা এক জাতি দ্বারা অন্য জাতি আক্রমণের কিংবা এক দেশ দ্বারা অন্য দেশ দখলের বিরোধী। পৃথিবীর ক্ষমতামদমত্ত বহু দেশ আজ অন্যান্য বহু দেশকে পদানত করে শোষণ ও অত্যাচার চালাচ্ছে। —আদর্শের খাতিরে শক্তি অনুযায়ী এই সমস্ত অত্যাচারী ও শোষক দেশের বিরুদ্ধে জিহাদ করা আমরা আমাদের অন্যতম কর্তব্য বলে মনে করি।

আমরা বিশ্বাস করি : আল্লাহ্‌র পৃথিবীর সবখানে সকলের স্বাধীনভাবে বিচরণের এবং জীবিকা আহরণের অধিকার আছে। বর্ণ, জাতি ও ধর্মগত পার্থক্যের কারণে পৃথিবীর বহু উদ্বৃত্ত দেশে আজ অপর দেশের অভাবগ্রস্ত লোকেরা স্থায়ী নাগরিক হিসাবে জীবিকা অর্জনের অধিকার হতে বঞ্চিত হচ্ছে—আমরা ইহা সম্পূর্ণ অন্যায় বলে মনে করি।

আমরা বিশ্বাস করি : এক দেশের অতিরিক্ত উৎপন্ন সম্পদে অন্য দেশের দুর্ভিক্ষগ্রস্ত বা অভাবগ্রস্ত লোকের অধিকার রয়েছে। এজন্য আমরা মনে করি : এক দেশ দুর্ভিক্ষে অন্য দেশের নিশ্চেষ্ট থাকলে বা সুযোগ বুঝে দর বাড়িয়ে মানুষের দুর্গতি সৃষ্টি করলে তাহা মানবতার শত্রুতা করা হয়।

---

১. কুরআন এবং [২ : ২১৩] ২৩—৫২, ৫৩, ৫৪।

আমরা দেখেছি ঃ বর্তমান জগত বস্তুবাদী বিভিন্ন শিবিরে বিভক্ত হয়ে স্বার্থগত বিবাদে ও আঞ্চলিক খুন-খারাবি ও খণ্ডযুদ্ধে লিপ্ত আছে এবং স্বার্থগত কারণেই ক্রমশ এক মহা ধ্বংসকারী যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা মনে করি ঃ ইহা মানবতার জন্য এক মহাসংকট-সময়। আমরা বিশ্বাস করি—স্বার্থ (যাহা বস্তুবাদ হতে উদ্ভূত) যতদিন আমাদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য বলে স্বীকৃত হবে, ততদিন এরকম ধ্বংসকারী যুদ্ধকে এড়ানো যাবে না। আমরা মানবকল্যাণকে আমাদের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছি।

আমরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি ঃ যে সমস্ত দেশে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়বে সেই সব দেশের সর্বনাশ অনিবার্য। কোটি কোটি মানব সন্তান এই সব স্বার্থপর যুদ্ধবাজদের দ্বারা প্রাণ হারাবে। তাই আমরা যত বেশী সংখ্যক দেশকে সম্ভব যুদ্ধের আওতা হতে মুক্ত রাখা আমাদের অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করি। মানবতার কল্যাণই আমাদের সাধনা। আমরা বিশ্বাস করি ঃ পুঁজিবাদী বা নাস্তিক্যবাদী—যাহার পক্ষেই যাই না কেন, আমরা এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হব। তাই বর্তমান অবস্থায় আমরা যুদ্ধবিরোধী তৃতীয় ব্লক আন্দোলনে বিশ্বাসী।[১]

আমরা মনে করি ঃ দুনিয়ায় বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা ও শাসন-ব্যবস্থা শোষণ ও অত্যাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং আমরা ইহার অবসান কামনা করি।

আমরা বিশ্বাস করি ঃ এই শাসন-ব্যবস্থা ও সমাজ-ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য চাই দুটি জিনিস—একটি পূর্ণ আদর্শ ও আর এক দল নিঃস্বার্থ আদর্শবান কর্মী। আমরা বিশ্বাস করি ঃ ইসলামই আমাদের পূর্ণ আদর্শ এবং ইহাকে ভিত্তি করে বৈজ্ঞানিক তরিকায় নিঃস্বার্থ আদর্শবান কর্মীদের দ্বারা যে সংগঠন গঠিত হবে তাই এই সমাজ ও শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে নতুন আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে সক্ষম।

আমরা মনে করি—বর্তমানে যে সমস্ত দল অবৈজ্ঞানিকভাবে স্বার্থের ভিত্তিতে গঠিত হয়েছে তাদের দ্বারা শোষণহীন ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।[২] শুধু মুখে মুখে আদর্শের কথা বললেই আদর্শ প্রতিষ্ঠা হয় না। যে দলের নেতৃত্ব আদর্শবাদী নিঃস্বার্থ কর্মীদের দ্বারা গঠিত নয়—

১. লেখকের 'তৃতীয় ব্লক আন্দোলন' দেখনীয়।
২. 'মুক্তি কোন্ পথে' পুস্তিকা দেখনীয়।

ব্যক্তিগত নেতৃত্ব, হীনস্বার্থ, পদলোভ বা শক্তির মোহই যে দলের ভিত্তি তাদের দিয়ে জনগণের কোন স্থায়ী কল্যাণকর সামাজিক পরিবর্তন সম্ভবপর নয় বলেই আমরা বিশ্বাস করি।

আমরা জানি শোষণহীন ভাইয়ালী (ভ্রাতৃত্বমূলক) খাঁটি ইসলামী সমাজ কায়েম করার জন্যই পাকিস্তান আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। পাকিস্তান হওয়ার আগে সমস্ত শিক্ষিত সমাজ এই প্রতিশ্রুতি দিয়েই জনগণের সমর্থন লাভ করেছিল। আমরা মনে করি: সেই প্রতিশ্রুতি পালন করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য। আমরা ইহাও মনে করি যে, এই প্রতিশ্রুতিকে কাজে পরিণত করার ভার যে দলের উপর দেয়া হয়েছিল তারা তা পালনে দারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তাই আমরা সেই প্রতিশ্রুতি অর্থাৎ শোষণবিহীন ইসলামী সমাজ কায়েম করে জনগণকে সর্বপ্রকার দুর্দশা ও দুরবস্থা হতে মুক্তিদানের জন্য ওয়াদাবদ্ধ। তাছাড়া শোষণমুক্ত ও সর্বপ্রকার গ্রাসন মুক্ত পূর্ণ স্বাধীন বাঙলা দেশের জন্যই এ দেশের জনগণ সংগ্রাম করেছিল। তাই বাইরের প্রভাব মুক্ত এদেশের সার্বভৌমত্ব এবং এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের আদর্শ ও সংস্কৃতি রক্ষা করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করি।

রাজনৈতিক

আল্লাহ্ই আমাদের একমাত্র প্রভু[১]—পৃথিবীতে কেহ কাহারও প্রভু নয়, দাসও নয়। এই মহান সত্যে বিশ্বাসী বলে আমরা সর্ব প্রকার রাজতন্ত্র যাজকতন্ত্র বা একনায়কত্বের বিরোধী। আমরা বিশ্বাস করি: ব্যক্তি, দল বা জাতি বিশেষের প্রভুত্বের অবসান করে এক আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব স্বীকৃতির মধ্যেই মানব জাতির শান্তি, মুক্তি ও প্রগতি নিহিত।

আমরা প্রতিটি মানুষ আল্লাহ্র প্রতিনিধি বা খলীফা।[২] সুতরাং আমরা প্রত্যেকে একক ও সমষ্টিগতভাবে সমস্ত মানব কল্যাণকর কাজ সমাধা করাকে পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করি এবং সকলে মিলে আল্লাহ্র খিলাফত গঠন করে মানব সমাজকে সর্ব প্রকার শোষণ, অবিচার ও জুলুম হতে মুক্ত করতে বাধ্য বলে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি।[৩]

আমরা মনে করি: শোষক-শ্রেণী ও ক্ষমতাশালীদের ভয়ে ভীত অসচেতন জনসাধারণ সচরাচর ভোটের সদ্ব্যবহার করতে পারে না।

---

১. কুরআন ৫: ৪৩, ৩: ১০৯ ইত্যাদি।
২. কুরআন ২: ৩০।
৩. কুরআন ৪: ৭৫।

আমরা তাই সংখ্যার সংগে গুণেও বিশ্বাসী। এইজন্য আমরা প্রতিটি মানুষকে শিক্ষায় দীক্ষায় আল্লাহ্‌র প্রতিনিধির উপযুক্ত করে গড়ে তুলে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বমূলক খিলাফতে বিশ্বাসী।

অর্থনৈতিক

আমরা বিশ্বাস করি : আসমান জমিনের সব কিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ্ এবং এতে তাঁহার সৃষ্ট সকল মানুষের খেটে ভোগ করবার অধিকার রয়েছে।[১] আমরা ইহাও বিশ্বাস করি : আল্লাহ্‌র রাজ্যে সকলের খাদ্য-বস্ত্র, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা দেওয়া খিলাফতের অবশ্য কর্তব্য।

যেহেতু আল্লাহ্‌ই সব কিছুর একমাত্র মালিক—এইজন্য আমরা কাহাকেও কোন জায়গা-জমি বা সম্পত্তির মালিক (Owner) বলে স্বীকার করি না। কেহ ন্যায়সঙ্গতভাবে উপার্জন করলে অথবা সঙ্গতভাবে উত্তরাধিকারী হলে এবং সমাজের অন্যান্য দায়িত্ব পালন করলে তাকে আমরা সম্পত্তির অধিকারী (Possessor) বা জিম্মাদার বলে স্বীকার করি।

আমরা বিশ্বাস করি : সক্ষম হয়ে সরাসরি বা অসরাসরি অপরের শ্রম আত্মসাৎ করা সম্পূর্ণ অন্যায়। এই জন্য আমরা সর্বপ্রকার শোষণের বিরোধী।[২]

আমরা বিশ্বাস করি : সমাজের ক্ষতি না করলে যে কেহ তার পরিশ্রমের ন্যায্য মূল্য ভোগের অধিকারী।[৩] কিন্তু উপার্জিত সম্পদ অকেজোভাবে বসায়ে রাখবার এবং অপভোগ বা বিলাসিতায় ব্যয় করবার অধিকার কারো নাই।[৪]

আমরা বিশ্বাস করি : যদি কেহ পুরাপুরি হালাল উপায়ে কোন সম্পদ প্রয়োজনমত উপার্জন করে তাতেও সমাজের আর দশজনের হক থাকে। কারণ হালাল রোজগারকারীর উপার্জন ক্ষমতাও আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। এইজন্য আমরা বিশ্বাস করি : আল্লাহ্‌র রাস্তায় অর্থাৎ সর্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য খিলাফত কারো সদুপায়ে অর্জিত সম্পদও ন্যায়ের ভিত্তিতে দখল করে মানব সমাজের মঙ্গলের জন্য খরচ করবার অধিকারী।[৫]

১· কুরআন।
২· কুরআন।
৩· কুরআন ৫৩ : ৩৯ এবং ৪ : ৩২।
৪· কুরআন ১০২ : ১-২ ১০৪ : ২-৪ এবং ৪ : ২৯।
৫· বিপ্লবী উমর।

আমরা মনে করি ঃ জমি (Land) প্রাকৃতিক সম্পদ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সম্পত্তি। সুতরাং কোন বাদশা বা রাষ্ট্রপতির উহা দান করবার অধিকার নাই। এইজন্য আমরা মনে করি ঃ বিশ্বাসঘাতকতা বা চাটুকারিতার উপর ভিত্তি করে যে জমিদারী বা জোতদারী প্রথা সৃষ্টি হয়েছিল তা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং তা কোন ক্রমেই হালাল রুজি নয়।[১]

আমরা মনে করি ঃ পরবর্তীকালে সুদ এবং অন্যান্য দুর্নীতিমূলক ব্যবসা দ্বারা যে সমস্ত সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয়েছে তাও হালাল রুজি নয়।

আমরা এও বিশ্বাস করি যে, সম্পদের প্রকৃত উৎপাদনকারী কৃষক এবং মজুর বর্তমান সমাজের শোষণমূলক উৎপাদন তরিকার আওতায় তারা ন্যায্য পাওনা হতে বঞ্চিত। সুতরাং এই শোষণমূলক অনৈসলামী উৎপাদন তরিকার আমূল পরিবর্তনে আমরা বিশ্বাসী। আমরা মনে করি ঃ হারামের উপর প্রতিষ্ঠিত জমিদারী ও জোতদারী খিলাফতের নিয়ন্ত্রণে প্রকৃত চাষীদের মধ্যে পুনর্বণ্টন করে বৈজ্ঞানিক তরিকায় চাষা-বাদের ব্যবস্থা করা খিলাফতের অন্যতম কর্তব্য। এবং যাতে ভবিষ্যতেও কৃষি ব্যবস্থার মধ্যে কোন রকম শোষণ গজায়ে না ওঠে তজ্জন্য খিলাফতের দ্বারা সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণে আমরা বিশ্বাসী।

আমরা মনে করি ঃ বর্তমানে যে ব্যবসা-পদ্ধতি চালু আছে তাও দুর্নীতি এবং শোষণের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং আমরা খিলাফতের নিয়ন্ত্রণে বর্তমানের ব্যবসা-পদ্ধতি আমূল পরিবর্তনের পক্ষপাতী।[২]

আমরা বিশ্বাস করি ঃ বর্তমানে যে তরিকায় শিল্প কারখানা চলছে তা শোষণমূলক।[৩] এইজন্য আমরা মনে করি ঃ শিল্প কারখানা ইত্যাদির পরিচালনা ও উৎপাদন খিলাফতের নেতৃত্বে শ্রমিকদের সাধারণ শরিকানার ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত এবং সাধারণ জীবন-মানের ভারসাম্য রক্ষার্থে প্রয়োজন হলে উৎপাদনে খিলাফতের একটি অংশ থাকবে।

---

১. ফলসফায়ে ওমরানিয়া ওয়া মশিয়াত: মৌলানা ওবায়দুল্লা সিন্ধী—পৃ: ১১৮ এবং **Note of Dissent P. 56**

২. কুরআন ৪ : ২৯ ; বিপ্লবী উমর (তমদ্দুন মজলিস কর্তৃক প্রকাশিত) পৃঃ ৫৭।

৩. কুরআন ৫৩ : ৩৯ ; বিপ্লবী উমর, পৃষ্ঠা ৫৭।

যেহেতু আমরা বিশ্বাস করি সমস্ত সম্পদের মালিক আল্লাহ্ এবং সমগ্র মানব গোষ্ঠী এক জাতি—অতএব আমরা ব্যক্তিগত মালিকানা এবং প্রচলিত সংকীর্ণ অর্থে জাতীয়করণ বা রাষ্ট্রীয়করণ (জাতীয় মালিকানা) নীতিতে বিশ্বাসী নই।[১] আমরা মনে করি: এক ধনী দেশের সম্পদে অপর অভাবী দেশের জনগণেরও অধিকার আছে। তাই আমরা সংকীর্ণ জাতীয়করণ বা রাষ্ট্রীয়করণের পরিবর্তে সার্বিকরণ (Universalisation) বা ইসলামীকরণ (Islamization) নীতিতে বিশ্বাসী।

আমরা পরিবারকে শোষণের হাতিয়ার বলিয়া মনে করি না। বরং মানুষের শান্তি ও পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য ইহা অপরিহার্য বলে মনে করি।[২]

'সুদ' মানুষকে শোষণ করবার অন্যতম হাতিয়ার বলে সুদ প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত সমস্ত ব্যাংক জনগণের সাধারণ সম্পত্তি হিসাবে গ্রহণ করে সাধারণ কোষাগার বা বায়তুলমাল প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই বায়তুলমাল হতে প্রয়োজনবোধে বিনা সুদে টাকা কর্জ নেবার বা এতে বিনাসুদে টাকা জমা রাখবার অধিকার জনসাধারণের থাকবে।[৩]

আমরা প্রকৃত কাজ ও যোগ্যতা অনুযায়ী পারিশ্রমিকের ন্যায়সংগত তারতম্য অস্বীকার করি না। কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত বেতন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অন্যায় ও শোষণমূলক বলে মনে করি।

আমরা হালাল উপায়ে অর্জিত সম্পদের উত্তরাধিকারে বিশ্বাসী। আমরা মনে করি অর্জিত সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণের জন্য ইহা এক ন্যায়সংগত ও বিজ্ঞান-নির্ভর পন্থা।

শিক্ষা

আমরা বিশ্বাস করি: প্রত্যেক নরনারীর জন্য শিক্ষা ফরজ (অবশ্য কর্তব্য)[৪] এবং সকলের প্রতিভা বিকাশের জন্য প্রত্যেকটি নর-নারীকে শিক্ষার সমান সুযোগ দেওয়া এবং প্রত্যেককে শিক্ষিত করা খিলাফতের অপরিহার্য কর্তব্য।

আমরা বিশ্বাস করি: আজিকার শিক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ এবং উপযুক্ত নাগরিক ও সুস্থ সমাজ-জীবন গড়ে তোলবার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

---

১. কুরআন ২ : ২১৩।
২. কুরআন ৭ : ১৮৯।
৩. কুরআন ২ : ২৭৫ এবং Islam and the Theory of Interest.
৪. হাদীস।

অতএব আমরা এই শিক্ষা ব্যবস্থার অবসান কামনা করি।

আমরা বর্তমান ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার স্থলে বিশ্ব-মানুষের সৌভ্রাতৃত্বের আদর্শে সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন চাই।[১]

আমরা বিশ্বাস করি: উন্নত ও সুষ্ঠু শিক্ষাব্যবস্থা কায়েমের জন্য ইসলামের ভিত্তিতে সহজ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান অপরিহার্য।

ভিন্ন মতাবলম্বী সমস্যা

আমরা বিশ্বাস ও মতবাদের স্বাধীনতা স্বীকার করি।

আমরা বিশ্বাস করি: মানুষ বিবেক অনুযায়ী ভিন্ন মত গ্রহণ বা বর্জনের সম্পূর্ণ অধিকারী। আমরা ধর্ম বা মতবাদ গ্রহণে জোরজবরদস্তির সম্পূর্ণ বিরোধী।[২]

আমরা জন্ম, বংশ বা বর্ণগত কৌলিন্যে বিশ্বাসী নই।[৩] জন্ম, বংশ বা বর্ণগত পার্থক্যের ভিত্তিতে গঠিত সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘুত্বে আমরা বিশ্বাস করি না। তবে আমরা মনে করি—ভিন্নমত বা আদর্শের ভিত্তিতে বিভিন্ন মতবাদের লোক বিশ্বে চিরকালই বিদ্যমান থাকবে। তাই আমরা বিশ্বাস করি: ভিন্নমত পালন ও প্রচারে যে রাষ্ট্র ভিন্ন মতাবলম্বীদের যত বেশী স্বাধীনতা দিতে পারে সে রাষ্ট্র তত বেশী মহৎ। আমরা বিশ্বাস করি: খিলাফতের ভিতর প্রত্যেকটি লোক তার নিজস্ব আদর্শ পালন এবং প্রচারের সম্পূর্ণ অধিকারী।[৪]

আমরা বিশ্বাস করি: আমাদের রাষ্ট্র হবে আদর্শভিত্তিক—সম্প্রদায়-ভিত্তিক নয়।[৫] আদর্শকে সুষ্ঠু রূপদানের জন্য অধিকতর উপযুক্ত ব্যক্তিরাই এই রাষ্ট্রের পরিচালনার ব্যাপারে যোগ্য বিবেচিত হবেন।

ব্যক্তি-স্বাধীনতা

আমরা মানব কল্যাণকর ব্যক্তি-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী।

আমরা বিশ্বাস করি: ব্যক্তি-স্বাধীনতা অস্বীকার করা মানে মনুষ্যত্বকেই

---

১. ইকবালের শিক্ষা দর্শন।

২. কুরআন ২: ২৫৬; ৪: ১৭১।

৩. হযরতের শেষ খোতবা।

৪. কুরআন ২: ২৫৬; ২: ৬২; ৬: ১০৮ এবং বিপ্লবী উমর; পৃষ্ঠা ৪৮—৬০।

৫. কুরআন ২১: ৯২; পাকিস্তানের শাসন সংবিধান—মৌলানা আবদুল্লাহিল কাফি, পৃষ্ঠা ৫৬।

অস্বীকার করা। তবে আমরা তথাকথিত পশ্চিমা গণতন্ত্রের মত সমাজের ভারসাম্য নষ্টকারী নীতিবর্জিত ব্যক্তি-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী নই। আমরা রাষ্ট্র বা অর্থনীতির নামে একনায়কত্ববাদের মত ব্যক্তিসত্তাকে পংগু করারও ঘোর বিরোধী। আমরা মনে করি মানুষের সামাজিক ও ব্যক্তিগত—এই দুই রকম সত্তা রয়েছে। তাই এই দুই সত্তার ভারসাম্যময় নিয়ন্ত্রণে আমরা বিশ্বাসী।

নারী-পুরুষ সম্পর্ক

আমরা নারী পুরুষ সম্পর্ককে এক পবিত্র সম্পর্ক বলে বিশ্বাস করি। আমরা বিশ্বাস করি: নারী এবং পুরুষ কেউ কারও দাস বা প্রভু নয়; কেউ কারো অপেক্ষা হীন নয়,—একে অন্যের পরিপূরক। তাই আমরা বিবাহ (স্বাধীনভাবে স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপন প্রণালী) মারফত মানুষের সুখ-শান্তি লাভের অধিকারে বিশ্বাসী। কিন্তু যুক্তিসঙ্গত কারণে এই সম্পর্ক বিষময় হয়ে উঠলে তা ছিন্ন করার অধিকারেও বিশ্বাসী।

আমরা মনে করি উচ্ছৃঙ্খলার মধ্যে (তাকে যতই স্বাধীনতা বলে প্রচার করা হউক না কেন) মানুষের অশান্তি ও ধ্বংস ছাড়া শান্তি ও সুখ নাই। এইজন্য আমরা যৌন উচ্ছৃঙ্খলা ও যৌন প্রদর্শনীর ঘোর বিরোধী।[১]

আমরা বিশ্বাস করি: আত্মমর্যাদা বজায় রেখে সৎপুরুষের সামাজিক নেতৃত্বে নারী পুরুষে সুসম্পর্ক স্থাপিত হলেই মানুষ বিপুল শান্তির অধিকারী হয়; নারী-পুরুষ পরস্পর নির্ভরশীল হলেই সংসার শান্তিতে ভরে উঠে।

আমরা মনে করি: নারী-পুরুষে শ্রমবিভাগ (Division of Labour) অপরিহার্য। নারী ও পুরুষ প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ। আমরা বিশ্বাস করি না—সব নারীকে পুরুষের মত যোদ্ধা হতে হবে কিংবা সব পুরুষকে সন্তান পালনে নারীর সমান কৃতিত্ব দেখাতে হবে।

আমরা মনে করি: কাকেও বন্দী করে যৌন পবিত্রতা রক্ষার চেষ্টা করা অন্যায়, আবার যৌন প্রদর্শনী করে নারী জাতির অমর্যাদা করা আর যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দেওয়াও চরম অন্যায়। তাই আমরা প্রাচ্যের

---

১. কুরআন: ২৪ : ৩০ ও ৩১।

অবরোধ প্রথা আর পাশ্চাত্যের যৌন প্রদর্শনী ও উচ্ছৃঙ্খলা এই দুয়েরই ঘোর বিরোধী। আমরা নারী পুরুষ উভয়ের প্রয়োজনীয় পর্দার ব্যবস্থা, পরিবেশ সৃষ্টি ও শিক্ষার মারফত নৈতিক চরিত্র গঠনের দ্বারা নারী-পুরুষে সমশরীকানার ভিত্তিতে সুসম্পর্ক স্থাপনে বিশ্বাসী।[১] আমরা সর্বপ্রকার যৌতুক প্রথার বিরোধী এবং নারী নির্যাতনকারীদের শরীয়ত আইনে কঠোর শাস্তি প্রদানে এই নির্যাতন প্রশমিত করা উচিত বলে বিশ্বাস করি।

খিলাফত

আমরা বিশ্বাস করি ঃ সৎ ব্যক্তি ছাড়া সৎকাজ বা সৎ-প্রতিষ্ঠান হয় না। আমরা এইজন্য সৎ ব্যক্তিদের দ্বারা গ্রাম্য বা মহল্লা খিলাফত গঠনের পক্ষপাতী। তাঁরা স্থানীয় অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি পরিচালনা করবেন।

আমরা মনে করি ঃ গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সমস্যাগুলির সমাধান অপ্রভাবিত গণভোটের দ্বারা স্থির করা উচিত। খিলাফতের উচ্চতম ব্যক্তি বা কর্মচারী-রাও সমভাবেই আইনের নিকট দায়ী থাকবেন।

বিচার ও শাসন

আমরা বিশ্বাস করি ঃ একমাত্র ন্যায় বিচারই দেশে শান্তি, শৃঙ্খলা ও জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষার শ্রেষ্ঠতম গেরান্টি।[২] তাই কার্যকর ভাবে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য বিচার-বিভাগকে শাসন-বিভাগ থেকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাখা অপরিহার্য বলে মনে করি।

আইন সভা ও সরকার

আমরা বিশ্বাস করি ঃ আমাদের সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা আল্লাহ্‌র দেয়া। সুতরাং আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীবের মঙ্গলের জন্য তার সদ্ব্যবহার করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য।

আমরা বিশ্বাস করি ঃ খিলাফতের কাজ গুরুদায়িত্ব বৈ কিছুই নয়। এটাকে লাভজনক ব্যবসা এবং আয়ের পথ হিসাবে ব্যবহার করা জঘন্যতম অন্যায়।

---

১. কুরআন ৪ ঃ ১২৪ ; ১৬ : ৯৭ এবং ৪০ : ৪০।

২. কুরআন ৪ : ৫৮ ; ১৬ : ৯০ এবং খিলাফতের দৃষ্টান্ত।

আমরা আরও বিশ্বাস করি ঃ সাধারণ নাগরিক আর খলীফা বা উজির-দের জীবনযাত্রা একই মানের হওয়া অবশ্য কর্তব্য। সুতরাং তাঁদের জন্য সাধারণ নাগরিক অপেক্ষা উচ্চতর জীবন মানের ব্যবস্থা করা একান্ত গর্হিত কাজ।[১]

আমরা বিশ্বাস করি ঃ জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করতে হলে তাদের মতই খাওয়া-দাওয়া চলাফেরা করতে হবে। নতুবা কিছুতেই উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব গড়ে উঠতে পারে না।

আমরা বিশ্বাস করি ঃ খিলাফতের কাজে খলীফা, মন্ত্রী বা সদস্যগণ কর্তৃক দাওয়াত বা উপঢৌকন নেওয়া সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অন্যায়। কারণ এই প্রথাই খিলাফত-পরিচালকদিগকে জনগণ হতে বিচ্ছিন্ন করতে এবং দুর্নীতিপরায়ণ করে তুলতে সহায়তা করে।

নির্বাচন

যেহেতু খিলাফতের দায়িত্ব নেওয়া লাভজনক পেশা নয়—বরং এক গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য, সুতরাং খিলাফতের কোন পদ কিংবা আইনসভার সদস্যপদের জন্য নিজ হতে প্রার্থী হওয়া অবাঞ্ছনীয় ও অশোভন। এইজন্য আমরা নিজকে সদস্য পদ-প্রার্থী বলে জাহির করা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও স্বার্থান্বেষী স্তাবকদের দ্বারা ভোট প্রভাস করার পদ্ধতিকে, অশোভন ও অন্যায় বলে মনে করি। আমরা চাই : স্থানীয় খিলাফতের যোগ্যতম ব্যক্তিরা তাদের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিকে নির্বাচিত করুক। আমরা মনে করি ঃ যিনি স্বেচ্ছায় নির্বাচনের প্রার্থী হবেন তিনি খিলাফতের যে কোন পদের জন্য অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। এই আদর্শিক নির্বাচনে কেউ প্রার্থী না হলেও ভোটারেরা নিজ থেকে যোগ্য ব্যক্তিদেরে নির্বাচিত করবেন।

সরকারী কর্মচারী

আমরা মনে করি সরকারী কর্মচারীরা দুর্নীতিগ্রস্ত হলে দেশের সুশাসন পরিচালনা অসম্ভব হয়ে পড়ে। আমরা এইজন্য মনে করি ঃ অসংশোধিত সমস্ত দুর্নীতিবাজ সরকারী কর্মচারীদের অপসারণ করা কর্তব্য।

আমরা মনে করি : কর্মচারীদের এমন বেতন দেওয়া উচিত নয়—

১. আলফারূক, বিপ্লবী উমর, সাদের প্রতি উমরের ফরমান, উমর ইবনে আবদুল আযীয।

যাতে তারা নিজেদের কমতম প্রয়োজন মিটাতে অক্ষম হয় কিংবা এত বেশী বেতন দেওয়াও উচিত নয়, যাতে তারা ক্ষতিকর বিলাসিতায় গা ঢেলে দিতে সুযোগ পায়।[১] আমরা যে পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাই উহাতে খিলাফতের চাকুরী বা কাজ টাকা উপার্জনের উপায় না হয়ে জনসেবার পবিত্র দায়িত্ব হিসাবে বিবেচিত হবে।

আমরা বিশ্বাস করি ঃ উপরের ঘোষণাকে ভিত্তি করে বৈজ্ঞানিক তরিকায় নিঃস্বার্থ কর্মীদের দ্বারা গঠিত সংগঠন মারফত দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গেলে শুধু এ দেশের জনসাধারণকে নয়—সমগ্র বিশ্বের নিপীড়িত মানুষকে কালে সর্বপ্রকার শোষণ-অত্যাচার আর দুর্দশা হতে মুক্তি দেয়া যাবে।

আমরা এই উদ্দেশ্যে সমস্ত বিশ্বে আল্লাহ্‌র খিলাফত কায়েমের দুর্বার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলাম।

এই আন্দোলনে স্বার্থপর মতলববাজ তথাকথিত নেতাদের কোন স্থান নাই। একমাত্র নিঃস্বার্থ কর্মীরাই—খাঁটি তৌহিদী সেনারাই এই সংগঠনের নেতৃত্বের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

আমরা নৈরাশ্যবাদী নই। আমরা বিশ্বাস করি ঃ বিশ্বের মানব কল্যাণকামী, সৎ ও সাহসী ব্যক্তিরা একতাবদ্ধভাবে এগিয়ে এলে সত্যের বিজয় অবশ্যম্ভাবী।

আজ আমরা সমস্ত অন্যায়, জুলুম, শোষণ, অবিচার ও স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র নামে জিহাদ ঘোষণা করলাম।

এই মহান সংগ্রামে আমাদের জয় সুনিশ্চিত।

আজ মহা জাগরণের আহবান এসেছে—

* সত্যের সৈনিকেরা—এক হও।
* আল্লাহ্‌র খিলাফত—কায়েম কর।
* ইসলামী বিপ্লব—জিন্দাবাদ।[২]

---

১. কিতাবুল খিরাজ ঃ ১৭ এবং ১৪০-১৪১ ; পাকিস্তানের শাসন সংবিধান ঃ ১০৯—১০।

২. এই ঘোষণা 'ইসলামী মেনিফেস্টো' নামে পরিচিত হয়েছে

আরো দুটি মেনিফেস্টো

উপসূচী

১. কৃষক ভাইয়ের জমি চাই ৩৬৫
২. শ্রমিক ভাইয়ের অংশ চাই ৩৬৮

১
কৃষক ভাইয়ের জমি চাই

মানুষ অন্যের গোলাম হয়ে থাকতে চায় না। সে হতে চায় স্বাধীন—বাঁচতে চায় স্বাধীন। সবচেয়ে বড় কথা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। যার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নাই তার অন্য স্বাধীনতা হয়ে যায় অকেজো।

পশ্চিমের প্রভাবিত পুঁজিবাদী সমাজ আমাদের সর্বশান্ত করেছে—শোষণে শোষণে অনেককে সর্বহারা করে ফেলেছে।

আমাদের অনেক দেশের শতকরা প্রায় সত্তর জনই চাষী। এদের অনেকের জমি নাই, থাকলেও সামান্য। তাই এই জমিহীনদের জমি দিতে হবে। জমির মালিক কে?—জমি তো মানুষের সৃষ্টি নয়—জমিদারেরও নয়, সরকারেরও নয়। জমি আল্লাহ্‌র। আল্লাহ্ জমি সৃষ্টি করেছেন মানুষের জন্য, তাতে খেটে ফসল ফলাবার জন্য। তাই জমির মালিক আল্লাহ্;—আর তার অধিকারী সে, যে সেই জমিতে খাটে। চাষীরাই জমিতে খাটে—তাই চাষীই অধিকার পাবে সেই জমির।

অতিরিক্ত জমি তাই কৃষকদের মাঝে বণ্টন করে দিতে হবে। তাতে কৃষকের অভাব ঘুচবে, অধীনতা ঘুচবে, আর দারিদ্র্য ঘুচবে। কৃষক জমিকে ভালবাসবে—মন প্রাণ দিয়ে তাকে উর্বর করবে--দেশে ফসল বেড়ে যাবে, দেশের উন্নতি হবে, দেশের অশান্তি দূর হবে।

আমাদের রসূল বলেছেন: দারিদ্র্য মানুষকে কাফের করে—নাস্তিক করে তোলে। আল্লাহ্‌র জমি কৃষককে বণ্টন করে দিলে সেই দারিদ্র্য থাকবে না, মানুষও আর নাস্তিক হবে না। মানুষ সুখে শান্তিতে জীবন গুজরান করবে, আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে, একারেক ভাই হিসাবে সমাজকে সুন্দর করে তুলবে। অভাবমুক্ত সমাজে চুরি থাকবে না, হিংসা থাকবে না, ঈর্ষা থাকবে না, বিদ্বেষ থাকবে না, অশিক্ষা থাকবে না। দুনিয়ার বুকে আল্লাহ্‌র খিলাফত কায়েম হবে—বেহেশতী পরিবেশে মানুষ সুখে শান্তিতে আনন্দে আল্লাহ্‌র শোকর গুজারি করবে।

কিন্তু ভয় আছে আর একটা। কৃষকদের পরম দুশমন আছে একদল। তারা চায় কৃষকের জমি কেড়ে নিয়ে সরকারের হাতে তুলে দিতে। কৃষকদের সরকারী কর্মচারীদের অধীনে কামলা খাটাতে, কৃষকদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ধ্বংস করে তাকে গোলাম বানায়ে রাখতে। ছদ্মবেশী দুশমন তাই কৃষকের বন্ধু সেজে এসে কৃষকদের ধোঁকা দেয়।

সরকার কি? কতকগুলি কর্মচারীই সরকার চালায়। আমি কৃষক: চাষ করব আমি, জমির সেবাযত্ন করব আমি। সরকার আমাকে এ কাজে সাহায্য করুক—ট্রাকটর দিয়ে, পাম্প দিয়ে, সার দিয়ে। তার বদলে আমি সরকারকে ফসলের একটা অংশ দিয়ে খাজনা দেব। সেই ফসল বায়তুলমালে থাকবে—দুর্ভিক্ষে ও অভাবে সে ফসল কাজে লাগবে। কিন্তু সরকারের হাতে জমি আমি দেব না। জমির মায়া আমি বুঝি। জমিকে আমি ভালবাসি—তার সেবা যত্ন করে তাকে ভাল করে উর্বর করি—তার ফসল বাড়াই। জমি আমার ছেলে-মেয়ের মত। আল্লাহ্‌র দেয়া এ জমি আমি কারো হাতে ছেড়ে দিতে পারি না।

নাস্তিক দেশের ইতিহাস জানেন? সেখানে বিরাট কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল। কেন বলতে পারেন? কৃষকদের জমি কেড়ে নিয়ে সরকারের হাতে তুলে দেওয়ার প্রস্তাব হওয়ায় কৃষকেরা বিদ্রোহ করল। সে বিদ্রোহে হাজার হাজার কৃষক প্রাণ হারাল। তবু সরকার কৃষককে জমি দিল না। সরকারের হাতে সব জমি চলে গেল, সেখানে কৃষক চিরতরে কামলা বনে গেল। জালিম সরকারী কর্মচারীদের গোলাম হল সে, তার স্বাধীনতা বলে কিছু থাকল না। দিন রাত জমিতে খেটে মরছে কৃষক—তার উপযুক্ত পারিশ্রমিক সে পাচ্ছে না। তাকে কথায় কথায় শাস্তি দেওয়া হচ্ছে অবহেলার অভিযোগ এনে। সরকারী কর্মচারীদের দয়ার উপর তাকে—তার পরিবারকে নির্ভর করে চলতে হচ্ছে। জাঁদরেল সরকার তাদের অক্টোপাসের মত বেঁধে রেখেছে—তারা নড়তে পারছে না এক পা-ও সেই বাঁধন থেকে।

তাই বলছি: এ দেশের কৃষক, তোমাদের হুঁশিয়ার থাকতে হবে। তোমাদের দারিদ্র্যের আর অভাবের সুযোগ নিয়ে ছদ্মবেশী শয়তান যেন তোমাদের ওয়াসওয়াসা দিতে না পারে—তোমার ঈমান নষ্ট করতে না পারে।

তুমি ঘোষণা করে দাও—আমি ঈমানদার—বিশ্বাসী। আমি আল্লাহ্‌র বান্দা, আর কারো গোলাম নই আমি। আল্লাহ্‌র দেওয়া জমিতে আমার হক আছে। সেই জমি আমাকে ভাগ করে দিতে হবে। সেই জমি কেড়ে নিতে পারবে না কেউ। সরকারের দাস বানাতে পারবে না আমাদের। আমরা স্বাধীন সুখী মানুষ হিসাবে বাঁচতে চাই। কাফের দাজ্জালের দাস হয়ে কিংবা ঘৃণা পুঁজিবাদের দাস হয়ে দুনিয়া-আখিরাত ডুবাতে চাই না।

২

শ্রমিক ভাইয়ের অংশ চাই

শ্রমিক ভাইরা আজ স্বাধীন নয়, লাখ লাখ শ্রমিক আজ কিছু সংখ্যক মালিকের অধীনে খাটছে।

যে কারখানায় সে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটছে, তাতে তার কোন অধিকার নাই। তার চাকুরির নিশ্চয়তা নাই, তার বেতনের স্থিরতা নাই। সে যেন মালিকের গোলাম।

মানুষ কারো দাস নয়, প্রভুও নয়। আল্লাহ্ তার একমাত্র প্রভু। তাঁরই সৃষ্ট মানুষ সব ভাই ভাই। অথচ সমাজে সে ভাইয়ালি আজ নাই।

পশ্চিমা পুঁজিবাদী সমাজ আমাদের ভাইয়ালিকে ধ্বংস করেছে; আমাদের শ্রমিক ভাইদেরে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। উৎপাদনের উপায় আজ তার হাতছাড়া। পশ্চিমা পুঁজিবাদ আজ আমাদের দেশকেও অক্টোপাসের মত জড়ায়ে ধরেছে—আমাদেরে শোষণ করে অসহায় করে পথে বসায়েছে।

শুধু বেতন বাড়ালেই এই সমস্যার সমাধান হবে কি? হবে না। কয় টাকা বাড়াবে বেতন? জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে হু হু করে। কয়েক টাকা বেতন বাড়ায়ে কি হবে?

তা ছাড়া কলকারখানায় খাটব আমি। আমার আরামকে হারাম করে উৎপাদন করব আমি, অথচ সেই কারখানায় আমি কোন অংশিদার হব না! এর লাখ লাখ টাকা মুনাফা হবে—আর সে মুনাফার ভাগ পাব না আমি—এ তো হতে পারে না।

আমি আল্লাহ্‌র বান্দা; আমি আল্লাহ্ ছাড়া কাকেও প্রভু মানি না। আমি স্বাধীন হতে চাই। মিল-কারখানায় আমি খাটি। সে খাটুনির ফলে কারখানায় আমার অধিকার জন্মে। আমি ভাবতে চাই: কারখানাও আমার; তাতে আমার অধিকার আছে। আমি অপরের অধীন গোলাম বনে থাকতে চাই না। মিলিত শরিকানার ভিত্তিতে অংশীদার হয়ে আমি উৎপাদন বাড়াতে চাই। আমি যেরূপ খাটি সেই অনুপাতে অংশ পেতে

চাই। আমি প্রয়োজনীয় বেতন পাব—অংশীদার হিসাবে লাভের অংশও নেব। আর সব কর্মচারীও তাদের অংশ পাবে কাজের গুণ ও পরিমাণ হিসাবে। সরকারের এবং উদ্যোক্তাদেরও অংশ থাকবে এতে। সকলে মিলে আমরা শিল্প কারখানায় ভাইয়ালি গড়তে চাই। এতে উৎপাদন বাড়বে—কাজের প্রেরণা আসবে, ধর্মঘট বন্ধ হবে। সবখানে সুখ আসবে, শান্তি কায়েম হবে।

বছর বছর ধর্মঘটে কোটি কোটি টাকা ক্ষতি হয়, উৎপাদন ব্যাহত হয়। শিল্প এলাকাগুলি অশান্তিতে ও হিংসা-বিদ্বেষে ভরে উঠে। শ্রমিকেরা মন দিয়ে কাজ করতে পারে না। পেটে ক্ষুধা রেখে আর পরের কাজ বলে আপন ভাবতে পারে না সে তার কাজকে। যদি শ্রমিক ও কর্মচারীরা অংশীদার হিসাবে গণ্য হয় তবে শিল্প কারখানায় শৃঙ্খলা ফিরে আসবে—ধর্মঘট চিরতরে লোপ পাবে, নিজের সম্পদ বলে উৎপাদনে সকলেই প্রেরণা পাবে—কাজে উৎসাহ পাবে।

আমরা তো জানি আল্লাহ্ই সব কিছুর মালিক—মানুষ নয়। কুরআন তা বারবার ঘোষণা করেছে। কলকারখানার মালিকও সে নয়। আমার বুদ্ধি, তোমার স্বাস্থ্য, কাঁচামালের ক্ষেত্র, জমি সবই তো আল্লাহ্র। বান্দা হিসাবে আল্লাহ্র সম্পদে আমারও সমান অধিকার আছে। আমার খাটুনি অনুসারে সে অধিকার আমি পাবই।

কিন্তু পশ্চিমা পুঁজিবাদ সে অধিকার থেকে আমাকে বঞ্চিত করেছে। আমাকে বানায়েছে কারখানার গোলাম। আমার শ্রম থেকে মুনাফা করে অন্যেরা বড় হচ্ছে আর আমি হচ্ছি দিন দিন সর্বহারা।

কিন্তু আবার আরো বড় দুশমন দেখা দিয়েছে। আমার বন্ধু সেজে আমাকে দাসত্বের শিকলে বাধতে আগায়ে এসেছে ছদ্মবেশে। তারা চায় সমস্ত কলকারখানা ডিক্টেটরি জালিম সরকারের হাতে তুলে দিতে; আমাদেরে সরকারের গোলাম বানাতে। আমার কথা বলার অধিকার ছিনায়ে নিতে। আমাদের জবান চিরতরে বন্ধ করে দিতে।

ডিক্টেটরি দেশগুলির খবর জান? সেখানে মানুষের স্বাধীনতা নাই, মানুষকে কলকারখানায় মেশিনের মত খাটায়। শ্রমিক সেখানে কলের মত, জাঁদরেল সরকারী কর্মচারীর অধীন।—কারো বিরুদ্ধে কিছু বলার, ধর্মঘট করার, বিক্ষোভ করার কোন অধিকার নাই সেখানে।

পূর্ব জার্মানীর ইতিহাস জান? সেখানে শ্রমিকেরা একবার ধর্মঘট করতে জোট করেছিল। আর যায় কোথায়! ডিক্টেটরি সরকার শত শত শ্রমিককে গুলী করে মারে—নির্মমভাবে, অমানুষিকভাবে। আমরা সে জুলুমের হাতিয়ার হতে চাই না, সে জুলুমের টারগেট হতে চাই না।

আমরা মানুষ, সৃষ্টির সেরা জীব। আমরা আল্লাহ্‌র বান্দা, আল্লাহ্‌ ছাড়া কারো কাছে মাথা নোয়াই না। আমরা কোন ডিক্টেটরশীপ মানি না, কলকারখানায় আমরা গোলাম বনতে চাই না।

আমরা বিশ্বাস করি ঃ সুদ হারাম, শোষণ হারাম, তাই পুঁজিবাদও হারাম। তাই আমরা পুঁজিবাদ উচ্ছেদ করে কলকারখানায় আমাদের শরিকানা পেতে চাই।

কুরআনে টাকা পয়সা জমায়ে জমায়ে রাখা কিংবা অপরের শ্রম শোষণ করার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। কুরআনে ধন-পূজার বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী দেওয়া হয়েছে। ধন-সম্পদ মানুষের পরীক্ষার জন্য—মানুষের মঙ্গলের জন্য—জমায়ে রেখে অপরকে শোষণ করার জন্য নয় কিংবা বিলাসিতায় অপব্যবহার করার জন্যও নয়।

আল্লাহ্‌র বান্দা আমরা, সব মানুষ আমরা ভাই ভাই—যেন এক পরিবার আমরা সবাই। যে যার কাজ করব, কাজের অনুপাতে অংশ নেব, দেশের উৎপাদন বাড়াব। অতিরিক্ত উৎপাদন জমা হবে বায়তুলমালে। বায়তুলমাল হবে সর্বসাধারণের সম্পত্তি। সেই সম্পত্তি দেশের কাজে, দশের কাজে খরচ হবে।—মানে আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয়িত হবে। এমন সমাজ আমরা চাই, যেখানে কেউ বেকার থাকবে না—কেউ বিনা চিকিৎসায় থাকবে না, কেউ অশিক্ষিত থাকবে না। কারণ এলেম শিখা ফরজ।

আমরা পুঁজিবাদের গড়া ব্যাংক চাই না। এই সুদী ব্যাংক পুঁজিবাদকে সাহায্য করে—পুঁজিবাদী শোষণের হাতিয়াররূপে একচ্ছত্র ব্যক্তি মালিকানার পত্তন করে। এই ব্যাংক গরীবের কাজে লাগে না—পুঁজিবাদ বিস্তারে সাহায্য করে। তাই আমরা চাই সমস্ত ব্যাংক বায়তুলমালের শাখা হিসাবে গণ্য হউক। বায়তুলমালের টাকায় দেশের দরকারী খরচ চলবে—দেশের মঙ্গলের কাজ চলবে—দেশের উন্নয়নের কাজ চলবে। বায়তুলমালের টাকাতেই নতুন নতুন কলকারখানা কায়েম হবে। সেই কলকারখানায় আমাদের শরিক থাকবে। আর অতিরিক্ত মুনাফা বায়তুলমালে

যাবে। যদি কারো টাকার দরকার হয় বিনা সুদে বায়তুলমাল থেকে টাকা পাবে; যদি কেউ পঙ্গু হয়, শ্রমের অযোগ্য হয়—সে আর তার পরিবার বায়তুলমাল থেকে অংশ পাবে।

এইভাবে সব অভাব দূর হবে। আল্লাহ্‌র দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র রাজত্ব কায়েম হবে। মানুষ অভাবমুক্ত হয়ে আল্লাহ্‌র খলীফারূপে সুখে শান্তিতে বাস করে আল্লাহ্‌র শোকর-গুজারি করবে।

এই ভাইয়ালি সমাজে কৃষক জমি পাবে, শ্রমিক কারখানার অংশ পাবে, কোন মানুষ কারো গোলাম হয়ে থাকবে না।

আমরা জানি সরকারের হাতে বিরাট রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকে। তার উপর যদি সরকারকে সাবিক অর্থনৈতিক ক্ষমতা দেওয়া হয়—জমি ও কলকারখানা সব কিছুর মালিক বানায়ে দেয়া হয় তবে সেই সরকার হয়ে উঠে একনায়কতাবাদী, স্বেচ্ছাচারী। গুটি কয়েকের আমলা-তন্ত্রের হাতের মুঠার মধ্যে চলে যায় সেই সরকারের সব ক্ষমতা। আমরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সব ক্ষমতা হাতে তুলে দিয়ে সরকারকে মহাদেবতা বানাতে চাই না—ডিক্টেটর বানাতে চাই না।

আমরা জানি ঃ অনেক দেশে চলছে সেই ডিক্টেটরি,—সেই স্বেচ্ছাচার। আমরা ছদ্মবেশী বন্ধুদের কথায় এই জালিম ডিক্টেটরি শাসনের গোলাম বনতে চাই না। আমরা স্বাধীনতা হারাতে চাই না—আমরা ঈমানও হারাতে চাই না।

আমরা প্রত্যেকেই আল্লাহ্‌র খলীফা। খিলাফতী সরকার কায়েম করে আমরা প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও মর্যাদা কায়েম করতে চাই।

খিলাফতী শাসনের ইতিহাস পড়েছ?

হযরত ওমর (রাঃ) সব সময় শ্রমিক কিংবা কৃষকের মত গরিবী হালে থাকতেন। খেজুর পাতার ঘরে বাস করতেন, সামান্য কাপড় পরতেন, সামান্য আহার করতেন।

তাঁর খিলাফতের যুগে কাপড়ের কল ছিল না, তাই অভাবের সময় বায়তুলমাল থেকে কাপড় বিলি করা হত। বিরাট রাজ্যের খলীফা আর সাধারণ কৃষক মজুর একই সমান কাপড় পেতেন।

একবার কাপড় বিলির পর মসজিদে দেখা গেল হযরত ওমর দুই-খণ্ড নতুন কাপড় পরে এসেছেন। আর যায় কোথায়? অমনি অভিযোগ

উঠল : হযরত ওমর বায়তুলমালের কাপড় বেশি নিয়ে আত্মসাৎ করেছেন ! হযরত ওমর তখনই তার কৈফিয়ত দিলেন, অন্য কাপড় নাই বলে নামায পড়ার জন্য তিনি তাঁর ছেলের ভাগে পাওয়া খণ্ডটি চেয়ে এনেছেন। তাঁর ছেলে তাই সাক্ষ্য দিল। সামান্য কারণেও এইভাবে সাধারণ লোকের কাছে মহামহিম খলীফা কৈফিয়ত দিয়ে রেহাই পেলেন।

এটাই আল্লাহ্‌র খিলাফত। আল্লাহ্‌র খিলাফতে অবিচার থাকবে না, জুলুম থাকবে না, শোষণ থাকবে না, সামাজিক অসাম্য থাকবে না, আর বাক-স্বাধীনতা ও ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে টুটি চেপে মারা হবে না।

একনায়কত্ববাদের যাঁতাকলে ফেলে এখানে মানুষকে পশু বানানো হবে না। মুক্ত মানুষ আল্লাহ্‌র খলীফা হিসাবে স্বাধীনভাবে নিজের ও সমাজের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করে পূর্ণতার দিকে আগায়ে যাবে।

পরিশিষ্ট ২

উপসূচী

১. আদর্শ খিলাফতের নমুনা
—মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ৩৭৬

২. ইসলামী রাষ্ট্র সম্পর্কে
—আবুল মনসুর আহমদ ৩৯০

৩. ইসলামী নীতির কারণে
—তফাজ্জল হোসেন ৩৯৩

৪. খোলাফায়ে রাশিদীনের আদর্শ
—মৌলানা নূর মোহাম্মদ আজমী ৩৯৬

৫. কুরআনের উত্তরাধিকার আইন ও সোভিয়েত রাশিয়া
—আবুল কাসেম ৪২৩

[০ মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ছিলেন আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত ভারতের শ্রেষ্ঠ মৌলানা ও ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি—প্রথম সারির নেতা। তিনি ভারতের শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে সমাসীন থেকে দীর্ঘ সময় ভারতীয় শাসনের সংগে যুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন আরবী ও উর্দু সাহিত্যের একজন প্রথম শ্রেণীর দিকপাল।

[০ মৌলানা নূর মোহাম্মদ আজমী ছিলেন বাংলাদেশের বিখ্যাত ধর্ম-বিদ গভীর জ্ঞানী, অক্লান্ত গবেষক, সাহিত্যিক এবং বহু বাঙলা বই ও অন্যান্য ভাষার প্রথম শ্রেণীর লেখক, বিশেষভাবে অনুরোধ করে আমি এই লেখা তাকে দিয়ে লেখায়েছিলাম।]

—গ্রন্থকার

১

আদর্শ খিলাফতের নমুনা

যে জাতিকে আল্লাহ্‌তায়ালা শাসনদণ্ড পরিচালনার সৌভাগ্য দান করেন, সে জাতির জন্য হযরত উমর ইব্‌নে আবদুল আজীজের জীবন একটি মহান আদর্শ। সত্যের নামে আত্মোৎসর্গ করিতে যাহারা আগ্রহান্বিত, তাহাদের জন্য তাঁহার মৃত্যুও একটি জীবন্ত আদর্শ।

মদীনার শাসক

খলীফা ওয়ালীদ যখন উমর ইব্‌নে আবদুল আজীজকে মদীনার শাসনকর্তা করিয়া পাঠাইতে চাহিলেন, তখন তিনি বলিলেন ঃ

> যদি পূর্বের শাসনকর্তাগণের ন্যায় আমাকে অত্যাচার করিতে বাধ্য করা না হয় তবে আমি এই পদ গ্রহণ করিতে রাজী আছি।

খলীফা বলিলেন ঃ

> আপনি ন্যায়ভাবে শাসন করিবেন, তাহাতে যদি রাজকোষে এক কপর্দকও না আসে, না আসুক।

উমর মদীনায় পৌঁছিয়াই সেখানকার বিদ্বান ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে একত্র করিয়া বলিলেন—আপনাদের যদি কোথাও তিল পরিমাণ জুলুম-অত্যাচার দৃষ্টিগোচর হয়, আল্লাহ্‌র শপথ, আপনারা অবশ্যই আমাকে সংবাদ দিবেন। তিনি যতদিন মদীনার শাসনকর্তা ছিলেন, ততদিন তাঁহার মধ্যে ন্যায়বিচার, সততা, উদারতা এবং সহানুভূতির কণামাত্র অভাব দেখা যায় নাই।

খলীফা সোলায়মানের অন্তিম রোগের সময় উমর ইব্‌নে আবদুল আজীজ আশঙ্কা করিতেছিলেন যে, খলীফা হয়ত তাঁহাকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়া যাইবেন। তিনি শঙ্কিত হইয়া প্রধানমন্ত্রী রেজা ইব্‌নে হায়াতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন ঃ

> আমি আশঙ্কা করিতেছি, খলীফা হয়ত আমাকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করার ওসিয়্যত করিয়া বসিবেন। আপনি যদি এই সম্বন্ধে কিছু

> অবগত হইয়া থাকেন, তবে আমাকে এখনই বলুন, যেন আমি আমার পদে ইস্তফা দিয়া পূর্বেই দায়মুক্ত হইতে পারি এবং খলীফাও যেন জীবিত থাকিতেই অন্য ব্যবস্থা করিয়া যাইতে পারেন।

খিলাফতের পথে

রেজা অন্যান্য কথা পাড়িয়া উমরের একথা এড়াইয়া গেলেন। কিন্তু খলীফার ওসিয়্যতনামা যখন সম্মুখে আসিল, তখন দেখা গেল যে, হযরত উমর ইব্‌নে আবদুল আজীজের আশঙ্কাই সত্যে পরিণত হইয়াছে। খলীফা সোলায়মান তখন দুনিয়া ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন।

অতঃপর উমর ইব্‌নে আবদুল আজীজ জনসাধারণকে সমবেত করিয়া বলিলেন :

> ভাইসব! আমার ইচ্ছা এবং আপনাদের সম্মতি ব্যতীতই আমাকে আপনাদের খলীফা নিযুক্ত করা হইয়াছে। আপনাদিগকে আমার আনুগত্য হইতে মুক্তি দিতেছি। আপনারা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী খলীফা নির্বাচন করিয়া লউন।

জনতা সমস্বরে বলিয়া উঠিল : আমিরুল মোমেনীন! আপনিই আমাদের খলীফা। খলীফা বলিলেন : মাত্র সেই দিন পর্যন্ত—যতদিন আমি আল্লাহ্‌র সীমা লংঘন না করি।

জনসাধারণের আস্থা লাভ করার পর খলীফার মহলে প্রবেশ করিবার জন্য সুসজ্জিত রাজকীয় সোয়ারীসমূহ উপস্থিত করা হইলে তিনি বলিলেন : এসব ফিরাইয়া লইয়া যাও, আমার জন্য নিজের খচ্চরই যথেষ্ট।

শাহী মহলের দিকে খলীফা রওয়ানা হইয়াছেন, দেহরক্ষী-বাহিনী যথারীতি বর্শা কাঁধে তুলিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। খলীফা তখন তাহাদিগকে বারণ করিয়া বলিলেন : আমি একজন সাধারণ মুসলমান বৈ আর কিছুই নহি। আমার জন্য এত আড়ম্বরের প্রয়োজন কি?

পূর্ব-প্রথানুযায়ী আলেমগণ খোত্‌বার মধ্যে খলীফার নামে দোয়া করিতে লাগিলেন। তখন খলীফা বলিলেন :

> শুধু আমার জন্য দোয়া না করিয়া বরং সকল মুসলমান নর-নারীর জন্য দোয়া করুন। আমি যদি মুসলমান হই, তবে সে দোয়া আমার ভাগেও পড়িবে।

শাহী মহলে পৌঁছিয়া তিনি দেখিলেন, মরহুম খলীফা সোলায়মানের পরিবার-পরিজন সেখানে রহিয়াছেন। তাঁহারা খলীফাকে স্থান ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। ইহা দেখিয়া তিনি বলিলেন ঃ আমার জন্য বাহিরে তাঁবুর ব্যবস্থা কর, আমি সেখানে বাস করিব। আমি মহলে থাকিতে চাই না। এই নির্দেশানুযায়ী তাঁহার জন্য তাঁবুর ব্যবস্থা করা হইলে তিনি তথায় পৌঁছিলেন। তখন তাঁহার চেহারা বিমর্ষ, চোখ দুইটি চঞ্চল এবং ফ্যাকাশে হইয়া পড়িয়াছিল। দাসী ইহা দেখিয়া বলিল ঃ আপনি আজ এত ক্লান্ত কেন, জাঁহাপনা ?

খলীফা বলিলেন : প্রত্যেক মুসলমানের দাবী চাহিবার পূর্বেই পূরণ করার দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত হইয়াছে। আজ দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যত এতীম, মিস্‌কীন, বিধবা এবং গৃহহারা রহিয়াছে, সকলের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আমার উপর সোপর্দ করা হইয়াছে। সুতরাং আজ আমার চেয়ে অধিক করুণার পাত্র আর কে হইতে পারে ?

জায়গীর উচ্ছেদ

আমীর মাবিয়া হইতে খলীফা সোলায়মানের আমল পর্যন্ত যে সকল ভাল ভাল এলাকা, উর্বর জমি এবং জায়গীর মুসলমানদের হস্তগত হইয়াছিল, উহার দুই-তৃতীয়াংশই শাহী-সনদের বলে উমাইয়া বংশের লোকদের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছিল। হযরত উমর ইব্‌নে আবদুল আজীজ সে সকল সম্পত্তি ভোগকারীদের ডাকিয়া বলিলেন ঃ তোমাদের অন্যায়ভাবে দখলকৃত সম্পত্তি উহার ন্যায্য উত্তরাধিকারিগণের দখলে ফিরাইয়া দাও।

তাহারা বলিলেন ঃ আমাদের হত্যা করার পরেই উহা হইতে পারে।

খলীফা মুসলমান সর্বসাধারণকে মসজিদে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা সেখানে সমবেত হইলেন। খলীফা নিজ বংশের সকল জায়গীর এবং রাজকীয় শাহী দলিল ও সনদসমূহ সঙ্গে লইয়া মজ্‌লিসে উপস্থিত হইলেন। মীর মুন্‌সী উহার এক একখানা সনদ হাতে লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন এবং খলীফা ঘোষণা করিলেন ঃ আমি এই সম্পত্তি উহার প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে ফিরাইয়া দিয়াছি। অতঃপর সেখানেই শাহী-সনদগুলি কাটিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলিয়া দিলেন। ভোর হইতে জোহর

পর্যন্ত এইভাবে তিনি তাঁহার নিজস্ব এবং গোত্রীয় সকল সম্পত্তির শাহী-সনদগুলি এক একটি করিয়া নষ্ট করিয়া দিলেন। তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পত্তির সমস্তই বায়তুলমালের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিলেন।

অতঃপর ঘরে ফিরিয়া স্বীয় স্ত্রী (প্রতাপশালী খলীফা আবদুল মালেকের কন্যা) ফাতেমাকে বলিলেন: খলীফার দেয়া তোমার মূল্যবান মণি-মুক্তাগুলি বায়তুলমালে দান করিয়া দাও, অন্যথায় তুমি আমার সহিত সম্পর্ক চুকাইয়া লইতে পার। পতিভক্তা স্ত্রী তৎক্ষণাৎ উঠিয়া নিজের মূল্যবান মণিমানিক্য বায়তুল্‌মালে পাঠাইয়া দিলেন।

অর্থনৈতিক বিপ্লব

ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতে খলীফা নিজেকে এবং তাঁহার গৃহ মুক্ত করিয়া এবার শাহী বংশের দিকে মনোযোগ দিলেন। আমীর মাবিয়া এবং ইয়াজীদ হইতে আরম্ভ করিয়া খলীফা সোলায়মান পর্যন্ত যত সম্পত্তি অন্যায়ভাবে দখল করিয়া রাজভাণ্ডারে জমা করা হইয়াছিল, এবার তাহা তিনি উহার প্রকৃত ওয়ারিশগণের হাতে ফিরাইয়া দিলেন। ইহাতে ইরাকের প্রাদেশিক রাজকোষ হইতে এত বিপুল পরিমাণ অর্থ বাহির হইয়া গেল যে, উহা প্রায় শূন্য হইয়া পড়িল। ফলে ইরাক-সরকারের ব্যয় বহনের জন্য কেন্দ্রীয় রাজধানী দামেশ্‌ক হইতে অর্থ পাঠাইতে হইয়াছিল।

খলীফার হিতাকাঙ্ক্ষীরা কেহ কেহ বলিলেন: আপনি আপনার সন্ততি-গণের জন্য কিছু অবশিষ্ট রাখুন। তদুত্তরে খলীফা বলিলেন: আমি তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র হাতে সোপর্দ করিতেছি।

মারওয়ানের বংশধরগণের পক্ষ হইতে খলীফাকে অনুরোধ করিয়া এই মর্মে এক লিপি প্রেরণ করা হইল যে, তিনি ব্যক্তিগত ব্যাপারে নিজ মরজি অনুসারেই চলিতে পারেন—কিন্তু তাঁহার পূর্ববর্তী খলীফাগণের কার্যাবলীকে যেন একেবারে নস্যাৎ না করেন। খলীফা উত্তরে বলিলেন: আপনারা আমায় একটি কথার উত্তর দিন। যদি কোন বিতর্কমূলক ব্যাপারে আমীর মাবিয়া এবং খলীফা আবদুল মালেকের আমলে পরস্পরবিরোধী দুইটি দলিল উপস্থিত করা হয়, তখন কোন্ দলিলের ভিত্তিতে ফয়সালা দেওয়া ন্যায়-সঙ্গত হইবে? সকলে বলিলেন: আমীর মাবিয়ার আমলের দলিল যেহেতু অধিকতর প্রাচীন, সুতরাং উহার ভিত্তিতেই ফয়সালা হওয়া বাঞ্ছ-নীয়। তখন খলীফা বলিলেন: আমিও ত এখন তাহাই করিতেছি।

আমি খলীফাদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত ছাড়িয়া প্রাচীনতম দলিল কুরআন মোতাবিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি।

আরও একবার একই বিষয়ে আলোচনা উঠিল। খলীফা বলিলেন: বাপের মৃত্যুর পর বড় ভাই যদি সকল সম্পত্তির উপর দখল কায়েম করিয়া বসে, তখন আপনারা কি করিবেন? সকলে বলিলেন: আমরা ছোট ভাইকে তাহার প্রাপ্য অংশ দেওয়াইবার চেষ্টা করিব। খলীফা বলিলেন: খোলাফায়ে রাশেদীনের পরে যাঁহারা খিলাফতে বসিয়াছেন, তাহারা দরিদ্র প্রজার সম্পত্তির উপর জোরদখল কায়েম করিয়া লইয়াছিলেন। আমি এখন সেই সম্পত্তি গরীবদিগকে ফিরাইয়া দিতেছি।

একবার মারওয়ানের বংশধরগণ আসিয়া খলীফার পুত্রের মারফত তাঁহাকে এই অনুরোধ করিয়া পাঠাইল:

আমরা আপনার জ্ঞাতিবর্গ। আগের খলীফাগণের ন্যায় আপনিও আমাদের সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য রাখুন। আপনি আমাদিগকে রাজকীয় দান ও অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত করিবেন না। খলীফা ইহার উত্তরে বলিয়া পাঠাইলেন: তোমরা আমার নিকট আল্লাহ্‌র চেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠ নও। আমি যদি আল্লাহ্‌র সেই ঘনিষ্ঠতা বিসর্জন দিই, তবে তোমরা কি কেয়ামতে আমাকে তাঁহার আজাব হইতে বাঁচাইতে পারিবে? খলীফার এই জওয়াব শুনিয়া সকলে নিরাশ মনে ফিরিয়া গেলেন।

খলীফা উমর ইব্‌নে আবদুল আজীজ নিজ পরিবারবর্গের ভাতা বন্ধ করিয়া দিলেন। তাঁহারা উহা দাবী করিলে খলীফা বলিলেন: আমার নিকট কিছুই নাই। বায়তুলমালে তোমাদের দাবী ততটুকুই, যতটুকু রহিয়াছে রাজ্যের প্রান্তসীমায় অবস্থিত প্রজাগণেরও। আমি অন্যান্য মুসলমানের তুলনায় তোমাদিগকে অধিক কোথা হইতে দিব? আল্লাহ্‌র কসম! সমগ্র দুনিয়াও যদি তোমাদের দাবী সমর্থন করে, তবুও আমি উহা পারিব না।

শাসনে বিপ্লব

খলীফা তাঁহার আমলে রাজ্যের সকল আদর্শচ্যুত দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীকে পদচ্যুত করিয়া দিলেন। জনসাধারণের প্রতি যে সকল কঠোরতা ও জবরদস্তি করা হইত, তিনি উহা বিদূরিত করিলেন। একবার পুলিশের প্রধান কর্মকর্তা খলীফার নিকট জানাইলেন যে, সন্দেহের ভিত্তিতে

অপরাধী না ধরিলে এবং শাস্তি না দিলে দেশ হইতে অপরাধ প্রবণতা উচ্ছেদ করা সম্ভবপর হইবে না। খলীফা ইহার উত্তরে এক নির্দেশনামায় তাঁহাকে লিখিলেন ঃ আপনি শুধু শরীয়তের নির্দেশমত কাজ চালাইয়া যান, তাহাতে যদি অপরাধমূলক কাজ বন্ধ না হয়, তবে উহা চলিতে দিন।

খোরাসানের শাসনকর্তার নিকট হইতে চিঠি আসিল যে, সেখানকার লোকেরা বড়ই গোঁয়ার প্রকৃতির। তরবারী এবং বেত্রদণ্ড ব্যতীত আর কোন কিছুই তাহাদের শায়েস্তা করতে পারে না। খলীফা তাঁহাকে জওয়াব দিলেন ঃ আপনার ধারণা ভুল। পক্ষপাতহীন ন্যায়নিষ্ঠা এবং নিরপেক্ষ বিচার নিশ্চয়ই তাহাদিগকে ঠিক পথে পরিচালিত করিতে সক্ষম। আপনি ব্যাপকভাবে এই নীতির অনুসরণ করিয়া চলুন।

খলীফা ফরমান জারি করিয়াছিলেন যে, কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করা মাত্রই যেন তাহার 'জিজিয়া' মওকুফ করিয়া দেওয়া হয়। খলীফার এই ফরমানের সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করিল। ইহা এমন ব্যাপকভাবে শুরু হইল যে, 'জিজিয়া' খাতে সরকারের আমদানী একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। হায়্যান ইব্‌নে শরীহ্ নামক জনৈক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী রিপোর্ট দিলেন ঃ খলীফার সেই ফরমানের ফলে অমুসলমানগণ এরূপ অধিক সংখ্যায় ইসলামে দীক্ষিত হইতে শুরু করিয়াছে যে, জিজিয়ার আয় একেবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাঁহাকে এখন কর্জ করিয়া কর্মচারিগণের বেতন দিতে হইতেছে।

খলীফা জানাইলেন ঃ যাহাই ঘটুক না কেন, জিজিয়া রহিত করিয়া দাও—আর ইহা স্মরণ রাখ যে, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ)-কে হেদায়েতকারীরূপেই প্রেরণ করা হইয়াছিল, কর আদায়কারী তহশীলদার হিসাবে নয়। আমি চাই যে, সকল অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করুক। তারপর যদি তোমার এবং আমার স্থান সাধারণ একজন কৃষকের স্তরে আসিয়া দাঁড়ায়, তখন আমরা শরীরে খাটিয়া, হাতে উপার্জন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিব।

আদী ইব্‌নে আরতাত পারস্যের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি জনসাধারণের বাগান হইতে অনুমানের ভিত্তিতে কম মূল্যে ফল ক্রয় করিতেন। এই সংবাদ খলীফার গোচরীভূত করা হইলে তিনি তিন ব্যক্তি-বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিশন নিয়োগ করিয়া তথায় প্রেরণ করিলেন এবং আদীকে

লিখিলেন ঃ যদি এই অন্যায় কাজ তোমার নির্দেশক্রমে হইয়া থাকে, তবে আমি তোমাকে রেহাই দিব না। আমি সরেজমিনে তদন্তের জন্য একটি কমিশন নিয়োগ করিয়া পাঠাইলাম। তদন্তের পর যদি আমার পাওয়া সংবাদ সত্য প্রমাণিত হয়, তবে তাহাদের সমস্ত বাগানের ফল উহার প্রকৃত মালিকগণকে ফিরাইয়া দিবে—তুমি তাহাদের কাজে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না।

একবার ইয়ামনের রাজকোষ হইতে একটি সোনার মুদ্রা হারানোর সংবাদ পাইয়া খলীফা উমর ইব্‌নে আবদুল আজীজ অস্থির হইয়া পড়িলেন। তখনই তিনি কলম উঠাইয়া ইয়ামনের খাজাঞ্চীকে লিখিলেন ঃ আমি তোমাকে তসরূপকারী বলিয়া মনে করি না। তবুও আমার ধারণা যে, তোমার উদাসীনতাই এই ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে দায়ী। কাজেই আমি জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে তাহাদের পক্ষ হইতে সেই মুদ্রা দাবী করিতেছি। তুমি আল্লাহ্‌র নামে হলফ করিয়া প্রমাণ করিয়া দাও যে, উহা হারাইবার ব্যাপারে তোমার কোন হাত ছিল না।

ব্যয় সংকোচ

উমর ইব্‌নে আবদুল আজীজ খিলাফতের মস্‌নদে আসীন হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, কর্মচারিগণ সরকারী কাজে কাগজ, কলম, দোয়াত, লেফাফা ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিতেছে। তখন তিনি এসব অপব্যয় ও ব্যয়-বাহুল্যের দিকে দৃষ্টি দিলেন এবং আবু বক্‌র ইব্‌নে হাজাম ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে লিখিলেন ঃ

> তোমরা স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন তোমরা বাতির অভাবে অন্ধকারেই মসজিদে-নববীতে গমন করিতে। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আজ তোমাদের অবস্থা উহা হইতে অনেক উন্নত। তোমাদের কলমগুলি চিক্কন করিয়া লও, দুই লাইনের মাঝে কম ফাঁক রাখিয়া লিখিতে অভ্যাস কর, সরকারী কাজে ব্যয়-বাহুল্যের নীতি পরিহার কর। আমি এরূপ কাজে মুসলমানদের অর্থব্যয় করিতে চাই না—যাহাতে তাহাদের কোনও সত্যিকার উপকার হয় না।

খলীফা শাহী-বংশের সকল ভাতা বন্ধ করিয়া দিলেন। রাজকীয় জাঁকজমক প্রকাশের জন্য যে সকল ব্যয় নির্ধারিত ছিল, উহা তিনি

বাতিল করিয়া দিলেন। শাহী আস্তাবলের ঘোড়াগুলি বিক্রয় করিয়া উঁহার সকল অর্থ বায়তুলমালে জমা করিয়া দিলেন। অতঃপর খলীফা সকল বেকার লোকের একটি তালিকা প্রস্তুত করাইলেন এবং যাহারা উপার্জনে অক্ষম ছিল, তাহাদের জন্য রাজকোষ হইতে বৃত্তি নির্ধারিত করিয়া দিলেন। খলীফার সাধারণ হুকুম ছিল যে, তাঁহার রাজ্যে কেহ যেন অনাহারে না থাকে। কোন কোন এলাকার শাসনকর্তা খলীফাকে লিখিলেন যে, তাঁহার এই নির্দেশ পুরাপুরি কার্যকরী করিতে গেলে রাজকোষ অর্থশূন্য হইয়া পড়িবে। খলীফা জওয়াব দিলেন: আল্লাহ্‌র সম্পত্তি যতক্ষণ থাকে, তাঁহার বান্দাদিগকে দিতে থাক, ভাণ্ডার যখন খালি হইয়া যাইবে তখন উহাতে ধূলা-বালি আবর্জনা ভরিয়া রাখিয়া দিও।

অমুসলমানদের সমান অধিকার

হযরত উমর ইব্‌নে আবদুল আজীজ তাঁহার খিলাফতের আমলে মুসলমান এবং অমুসলমানকে সমপর্যায়ের নাগরিক অধিকার দান করিয়াছিলেন।

হিরা অঞ্চলের একজন মুসলমান একজন অমুসলমানকে হত্যা করিয়াছিলেন। খলীফা হত্যাকারীকে গ্রেফতার করিয়া নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের হাতে সোপর্দ করিলেন। তাহারা তাহাকে হত্যা করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিল।

রবীয়া ইব্‌নে সউদ সরকারী প্রয়োজনে কোথাও যাওয়ার জন্য একজন অমুসলিম প্রজার ঘোড়া বলপূর্বক আনিয়া উহাতে আরোহণ করিলেন। খলীফার নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে তিনি রবীয়াকে ডাকাইয়া ৪০টি বেত মারার হুকুম দিলেন।

খলীফা ওয়ালীদ নিজ পুত্র আব্বাসকে এক জিম্মীর ভূমি জায়গীর স্বরূপ দান করিয়াছিলেন। জিম্মী উহা দাবী করিলে খলীফা উমর আব্বাসকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: তোমার কি ইহাতে আপত্তি আছে? আব্বাস বলিলেন: খলীফা ওয়ালীদের সনদবলে আমি এই ভূমির অধিকারী, সেই সনদ আমার নিকট রহিয়াছে। খলীফা বলিলেন: জিম্মীর ভূমি ফিরাইয়া দাও। ওয়ালীদের সনদকে কুরআনের উপর স্থান দেওয়া যাইতে পারে না।

একজন খ্রীস্টান খলীফা আবদুল মালিকের পুত্র হিশামের বিরুদ্ধে এক নালিশ রুজু করিয়া বসিল। বাদী-বিবাদী হাজির হইলে খলীফা উমর উভয়কেই একত্রে কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া দিলেন। হিশামের মুখমণ্ডল অপমানে ও ক্ষোভে রক্তিম বর্ণ ধারণ করিল। ইহা দেখিয়া খলীফা তাঁহাকে বলিলেন : দুইজন সমানে দাঁড়াইয়া থাক। ইহাই ইসলামী আদালতের বৈশিষ্ট্য। এখানে শাহ্জাদা আর একজন সাধারণ খ্রীস্টানের মধ্যে কোনই প্রভেদ নাই।

অভাবহীন সমাজ

উমর ইব্‌নে আবদুল আজীজ মাত্র আড়াই বছর কাল খিলাফতের মস্‌নদে আসীন ছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে জনসাধারণ অনুভব করিত যে, আসমান ও জমিনের মধ্যে ইন্‌সাফের দাঁড়িপাল্লা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং বিশ্ব-প্রকৃতি যেন নিজেই মানুষকে স্বাধীনতা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মুকুট পরাইয়া দিবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। ভিখারীর সন্ধানে তখন মানুষেরা ভিক্ষা লইয়া ফিরিত, কিন্তু ভিখারী খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। অবশেষে তাহারা বায়তুলমালের খাজাঞ্চীর নিকট উহা পাঠাইয়া দিত। কিন্তু সেখানেও অভাবগ্রস্ত কেহ ছিল না বলিয়া খাজাঞ্চী উহা আবার ফেরত পাঠাইয়া দিতেন।

পারস্যের শাসনকর্তা একবার খলীফার নিকট লিখিলেন যে, সেখানে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এরূপ বাড়িয়া গিয়াছে যে, জনসাধারণের মধ্যে অহংকার ও ঔদ্ধত্য আসিয়া পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। খলীফা জওয়াব দিলেন : লোকদিগকে আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করার তালিম দিতে থাক।

অন্যদিকে

একদিকে মুসলিম জাহানের কোটি কোটি লোক নিরাপত্তা, আনন্দ ও সুখের সাগরে হাবুডুবু খাইতেছিল—অপরদিকে সেই মহান ব্যক্তি, যাহার পুণ্য-পরশে এত সব কিছু হইতেছিল, তিনি দিন দিন ক্ষীণ ও দুর্বল হইয়া চলিয়াছিলেন। তাঁহার না ছিল দিবসের আরাম, না ছিল রাত্রির নিদ্রা।

এই খলীফা উমর ইব্‌নে আবদুল আজীজকে যখন মদীনার শাসনকর্তা করিয়া পাঠান হইয়াছিল, তখন তাঁহার ব্যক্তিগত আস্‌বাবপত্র ত্রিশটি উটে বোঝাই হইয়া মদীনায় আসিয়াছিল। স্বাস্থ্য এরূপ নাদুসনুদুস ছিল যে, পায়জামার ফিতা পেটের চামড়ার ভিতরে অদৃশ্য হইয়া যাইত।

তিনি উৎকৃষ্ট পোশাক-পরিচ্ছদ এবং সুগন্ধি খুবই পছন্দ করিতেন। সৌখিনতার এতখানি বাড়াবাড়ি ছিল যে, যে পোশাক একবার তাঁহার দেহে দেখা গিয়াছে, দ্বিতীয়বার আর তাহা তাঁহাকে পরিতে দেখা যায় নাই। চার-পাঁচ শত টাকা মূল্যের পোশাক তাঁহার জন্য আনা হইত, কিন্তু তাহাও তিনি আমলে আনিতেন না। তিনি মেশ্ক, আম্বর ইত্যাদি সুগন্ধি হিসাবে ব্যবহার করিতেন। খলীফা ওয়ালীদের প্রধানমন্ত্রী রেজা ইব্নে হায়াত বলিতেন: আমাদের রাজ্যে উমর ইব্নে আবদুল আজীজ বেশভূষায়, পরিপাট্যে, সুগন্ধিতে এবং প্রফুল্লতায় সবচেয়ে সেরা ব্যক্তি। তিনি যে পথ দিয়া চলিতেন, উহা সুগন্ধিতে ভরিয়া উঠিত। কিন্তু এই সৌখিন ও বিলাসপ্রিয় ব্যক্তি যে দিন খলীফার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন, সেই দিনই তিনি নিজের জায়গীরসমূহ জমির মালিকদিগকে প্রত্যর্পণ করিলেন এবং সাজ-সজ্জা, পোশাক-পরিচ্ছদ, দালান-কোঠা ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া উহার অর্থ বায়তুলমালে জমা করিয়া দিলেন। তাঁহার নিকট কেবলমাত্র এক প্রস্থ পোশাকই সব সময় থাকিত। ময়লা হইলে উহা ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া পরিধান করিতেন।

সর্বহারা খলীফা

অন্তিম শয্যায় শায়িত খলীফার শ্যালক তাঁহার ভগ্নী ফাতেমাকে বলিলেন: আমীরুল মো'মেনীনের জামা অত্যধিক ময়লা হইয়া গিয়াছে, উহা পরিবর্তন করিয়া দাও, লোকজন সর্বদা তাঁহাকে দেখিতে আসিতেছে। ফাতেমা কোন জওয়াব না দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। ভাই আবার সেই একই কথা বোনকে জানাইলেন। ফাতেমা এবার বলিলেন: আল্লাহ্‌র কসম! খলীফার তো ঐ একটি ছাড়া আর জামা-ই নাই! আমি কোথা হইতে উহা বদলাইয়া দিব? তদুপরি সেই জামাটিও ছেঁড়া এবং তালিযুক্ত ছিল।

খলীফা-তনয়ার একবার জামা ছিল না। খলীফা পরিষ্কারভাবে কন্যাকে জানাইয়া দিলেন: এখন আমার কোন সঙ্গতি নাই; বিছানার চাদর কাটিয়া জামা বানাইয়া লও। খলীফার ভগ্নী এই সংবাদ জ্ঞাত হইলেন। তিনি ভাতিঝির পোশাকের জন্য এক থান কাপড় আনাইয়া দিলেন এবং বলিলেন: আমীরুল মো'মেনীনকে ইহা জানাইও না।

একবার খলীফার পুত্র আসিয়া পিতার নিকট কিছু কাপড়ের আবেদন জানাইলেন। খলীফা বলিলেন: মেয়ার ইবনে রিয়াহ্‌-এর কাছে যাও।

আমার কাপড় তাহার নিকট রহিয়াছে। খলীফার পুত্র আনন্দ চিত্তে খেয়ারের নিকটে গেলেন। খেয়ার তাঁহাকে একটি মোটা খদ্দরের জামা বাহির করিয়া দিলেন। খলীফা-তনয় বড় নিরাশ হইলেন এবং পুনরায় পিতার নিকট আসিলেন। পিতা বলিলেন: বাবা! আমি তো এর বেশী কিছু করিতে পারিতেছি না। তারপর আবার তিনি একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন: আচ্ছা যদি সন্তুষ্ট না হইয়া থাক, তবে তোমার মাহিনা হইতে আগাম এক শত দিরহাম লইয়া যাও, পরে যখন তোমার বেতন হাতে আসিবে, উহা হইতে পরিশোধ করিয়া দিবে। সেইভাবে তাঁহাকে আগাম মাহিনা দেওয়া হইল। পরে বেতনের সময় উহা কাটিয়া লওয়া হইল।

খলীফার ঘরের চাকর একদিন খলীফা-বেগমকে জানাইল যে, রোজ রোজ ডাল রুটি খাইয়া চলে না। বেগম বলিলেন: আমি কি করিব বল, আমীরুল মো'মেনীন তো রোজ ইহাই খাইতেছেন। ইহাও আবার পেট ভরিয়া খান না। খলীফার একদিন আঙ্গুর খাওয়ার ইচ্ছা হইয়াছিল। তিনি বিবিকে বলিলেন: তোমার নিকট কি একটা দিরহাম হইবে, কিছু আঙ্গুর কিনিতাম। বিবি বলিলেন: খলীফাতুল মুসলেমীন হইয়া একটি পয়সা ব্যয় করার অধিকারও কি আপনার নাই? খলীফা বলিলেন: জাহান্নামের হাতকড়ির চেয়ে ইহা আমার জন্য অনেক নিরাপদ।

খিলাফতের পর্বতপ্রমাণ দায়িত্ব মাথায় চাপিয়া পড়ার পর খলীফা শুধু খাওয়া-পরাই যে ত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা নয়, বরং দাম্পত্য সুখ-শান্তিও বিসর্জন দিয়াছিলেন। তিনি সারাদিন রাজকার্যে লিপ্ত থাকিতেন—রাত্রে এশার নামাজের পরেই একাকী মসজিদে চলিয়া যাইতেন এবং শয়নে-জাগরণে কান্নাকাটি করিয়া কাটাইতেন। বিবি ফাতেমা ইহা সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি একদিন এ সম্পর্কে খলীফাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। খলীফা বলিলেন: আমি আমার দায়িত্বের কথা চিন্তা করিয়া এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি যে, প্রজাবৃন্দের ছোট বড় সকল ভালমন্দের জন্য আমি দায়ী। রাজ্যের মধ্যে যে সকল গরীব-মিস্কীন, এতিম, প্রবাসী ও নিপীড়িত বন্দী রহিয়াছে, তাহাদের সকলের জিম্মাদারী আমার উপরেই ন্যস্ত; আল্লাহ্ যখন তাহাদের প্রতি দায়িত্ব পালনের বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করিবেন এবং হযরত রসূলে করীম (সঃ) ইহার দাবীদার হইবেন, তখন আমি উত্তর দিতে না পারিলে আমার পরিণাম কি হইবে? আমি

যখন সেই কথা ভাবি, তখন আমার সকল শক্তি রহিত হইয়া যায়, হৃদয় দুর্বল হইয়া পড়ে, চোখ হইতে অশ্রু ঝরিতে থাকে।

খলীফা তাঁহার মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের চিন্তায় রাত্রির পর রাত্রি কাঁদিয়া কাটাইতেন। এক এক সময় তিনি বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া যাইতেন। স্ত্রী তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেন, কিন্তু উহাতে তাঁহার মনস্থির হইত না। খিলাফতের আড়াই বছর কাল এইভাবেই তিনি অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

মৃত্যুর দুয়ারে

১০১ হিজরীর রজব মাসে উমাইয়া বংশের কতিপয় লোক খলীফার চাকরকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা ঘুষ দিয়া খলীফাকে বিষ পান করাইল। খলীফা এই বিষয় জানিতে পারিলে চাকরকে ডাকিয়া নিয়া ঘুষের মুদ্রাগুলি লইয়া বায়তুলমালে জমা করিয়া দিলেন এবং তাহাকে বলিলেন ঃ যাও আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ক্ষমা করিলাম এবং মুক্ত করিয়া দিলাম।

চিকিৎসকগণ আসিয়া বিষ বাহির করার সিদ্ধান্ত করিলেন। কিন্তু খলীফা আর একটি মুহূর্তের জন্যও খিলাফতের দায়িত্ব বহন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি বলিলেন ঃ আমি যদি জানিতে পারি যে, আরোগ্য আমার কানের লতিকার নিকটেই রহিয়াছে, তবুও আমি হাত বাড়াইয়া আনিব না।

পূর্ববর্তী খলীফা সোলায়মান, ইয়াজীদ ইব্‌নে আবদুল মালেককে উমর ইব্‌নে আবদুল আজীজের স্থলাভিষিক্ত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। খলীফা অন্তিম-শয্যায় থাকিয়া ইয়াজিদ ইব্‌নে আবদুল মালেকের জন্য নীচে লিখিত ওসিয়্যত-নামা লিখাইলেন ঃ

> আমি পরকালের পথে চলিয়াছি। আল্লাহ্ সেখানে আমাকে প্রশ্ন করিবেন, হিসাব গ্রহণ করিবেন, সেখানে কিছুই গোপন করার আমার সাধ্য থাকিবে না। আল্লাহ্ যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, তবে তো আমি সার্থক, আর যদি তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট না থাকেন, তবে আমার পরিণামের জন্য অনুতাপ। আমার পরে তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় করিবে, প্রজাবৃন্দের প্রতি দৃষ্টি

রাখিবে। স্মরণ রাখিবে যে, তোমাকেও শীঘ্রই মৃত্যুর সহিত মোলাকাত করিতে হইবে। এমন যেন না হয় যে, তুমি অসাবধান হইয়া পড় এবং শেষে সংশোধনের সুযোগ হারাও!

খলীফার পরিবারবর্গের প্রতি সাল্‌মার খুব দৃষ্টি ছিল। তিনি আমীরুল মো'মেনীনকে বলিলেন: আপনি যদি এই শেষ সময়ে তাহাদের জন্য কিছু ওসিয়্যত করিয়া যাইতেন! খলীফা তখন অত্যধিক দুর্বল ছিলেন। তিনি বলিলেন: আমাকে কোন বস্তুতে ঠেস্ লাগাইয়া বসাইয়া দাও। সেইভাবে উপবেশন করান হইলে খলীফা বলিলেন: আমি আমার সন্তান-সন্ততিগণের কোনও ন্যায্য দাবী নষ্ট করি নাই। অবশ্য যেটা অন্যের ছিল, তাহা আমি তাহাদিগকে দিই নাই। আল্লাহ্ আমার এবং আমার পরিবারবর্গের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিভাবক। আমি তাহাদের সকলকে আল্লাহ্‌র হাতে সোপর্দ করিয়াছি। তাহারা যদি আল্লাহ্‌কে ভয় করে, তবে তিনি তাহাদের জন্য নিশ্চয়ই কোনও সুরাহা করিয়া দিবেন। আর যদি তাহারা গোনাহে লিপ্ত হয়, তবে আমি তাহাদিগকে অর্থ-সম্পদ দিয়া আরও শক্তিশালী করিয়া যাইব না।

অতঃপর খলীফা নিজ সন্তানগণকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন: হে প্রিয় বৎসগণ! তোমাদের আব্বার জন্য মাত্র দুইটি পথই খোলা ছিল—হয় তোমরা ধনী হও এবং তোমাদের আব্বা দোজখে চলিয়া যাক অথবা তোমারা দরিদ্র থাকিয়া যাও—আর তোমাদের আব্বা বেহেশতে গমন করুক। আমি দ্বিতীয় পন্থাই বাছিয়া লইয়াছি। এখন আমি তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র হাতে সোপর্দ করিয়া যাইতেছি।

একজন বলিল: হযরত রসূলে করিমের (সাঃ) রওজা মোবারকের পাশে চতুর্থ স্থান খালি রহিয়াছে, সেখানে যেন আপনাকে সমাহিত করা হয়। অন্তিম-শয্যায় শায়িত খলীফা ইহা শুনিয়া বড়ই ব্যথিত হইলেন এবং বলিলেন: আল্লাহ্‌র কসম! যে কোন শাস্তি আমি স্বীকার করিতে রাজী আছি, কিন্তু রসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) পবিত্র দেহের পাশাপাশি আমার দেহ স্থাপন করাইব, এই বেয়াদবী আমি সহ্য করিতে পারিব না।

ইহার পর তিনি একজন খ্রীস্টানকে ডাকিয়া তাহার নিকট হইতে নিজ কবরের জন্য ভূমি ক্রয় করিলেন। সে বলিল: এটা আমার জন্য পরম গৌরবের বিষয় যে, আপনার পবিত্র দেহ আমার ভূমিতে রক্ষিত

হইবে। আমি এই সম্মান লাভের বিনিময়ে মূল্য গ্রহণ করিতে চাই না। খলীফা বলিলেনঃ না। তাহা হইতে পারে না। এই বলিয়া তিনি জোর করিয়া তাঁহাকে ভূমির মূল্য দান করিলেন এবং উপস্থিত লোকগণকে বলিলেনঃ দাফন করার সময় হযরত রসূলে করিমের (সঃ) পবিত্র নখ এবং কেশ যাহা আমার নিকট রক্ষিত আছে উহা আমার কাফনের মধ্যে রাখিয়া দিবে।

এই কথা বলার সংগে সংগে তাঁহার প্রতি অন্তিম আহ্বান আসিয়া গেল।

ইসলামী রাষ্ট্র সম্পর্কে

আবুল মনসুর আহমদ

[মরহুম আবুল মনসুর আহমদ আমাদের সমাজের শুধু একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও সমালোচক ছিলেন না—তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদও। রাজনীতিতে তাঁকে একজন ধর্ম-নিরপেক্ষবাদী (সেকুলারিস্ট) ও গণতন্ত্রী বলে আমরা জানি। সেকুলারিস্ট বা ধর্ম নিরপেক্ষবাদী হয়েও তিনি ইসলামী রাষ্ট্র সম্পর্কে যা বিশ্লেষণ দিয়েছেন তাতে আমাদের যথেষ্ট চিন্তার খোরাক আছে।

ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মহল হতে আর যতরকম যুক্তি খাড়া হতে পারে—এর সব কয়টি বিচার বিশ্লেষণ করে তিনি নীচের সিদ্ধান্তে পেঁাছেছেন।

লেখাটি বের হয়েছিল পাকিস্তান অবজারভারের ১৯৬৫ সনের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে। লেখাটির শেষ অংশটুকু এখানে তুলে দেওয়া হল।]

রাজনীতির সাথে ধর্মের যোগ একটা পিছ মুখী কাজ—যাতে আমাদের আধুনিক সভ্য রাষ্ট্র হতে বহু দূরে মধ্যযুগীয় অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু সবখানে স্বীকৃত আধুনিক রাষ্ট্র ফ্রান্স, জার্মানী, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড আর ইটালীর দিকে একটুখানি নজর দিলেই আমাদের নিঃসন্দেহ করবে যে, আর যা-ই হোক রাজনীতির সাথে ধর্মের যোগ এত পিছমুখী বা সভ্যতাবর্জিত ব্যবস্থা নয় যা আমাদের প্রগতিশীলরা আমাদের এত দিন বিশ্বাস করতে বলে আসছেন। ইউরোপের এই সমস্ত দেশ ও অন্যান্য দেশে খ্রীস্টান সোশালিজম, খ্রীস্টান ডেমোক্রেসী, খ্রীস্টান রেডিক্যালিজম ইত্যাদি রাজনীতিক তত্ত্বগুলি বেশী লোকপ্রিয় হয়েছে। খ্রীস্টান ডেমোক্রেটিক ইউনিয়ন, খ্রীস্টান সোশ্যালিস্ট ইউনিয়ন, সোশ্যালিস্ট খ্রীস্টান পার্টি, খ্রীস্টান হিস্টরিকেল ইউনিয়ন ইত্যাদি দলগুলি সফলতার সাথে চলছে—নির্বাচনে মোকাবিলা করছে আর পার্লামেন্টারী নির্বাচনে জিতেছে। অনেকগুলি তো বর্তমানেও কয়েকটি দেশে শাসনকাজ চালিয়ে যাচ্ছে। কাজেই রাজনীতির সাথে ধর্মের যোগ আধুনিক সভ্য জগতে অচল একথা বলা বাতুলতা। রাজনীতিতে ধর্মের যোগ কিন্তু সম্পূর্ণ অযৌক্তিকও নয়।

আমরা গণতন্ত্র সম্বন্ধে শেষ কথা বলিনি। এর আদর্শগুলি যে আজও সমাজে কার্যকরী হয়নি তা সবাই স্বীকার করেছেন। এমন কি আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ গণতন্ত্রগুলিও আশানুরূপ ভাল প্রমাণিত হয়নি। গণতন্ত্রগুলি আজও

অর্থনৈতিক মুক্তি ও জ্ঞান সাধনার স্বাধীনতা দিতে পারেনি। উদাহরণ স্বরূপ উদার গণতন্ত্রী দেশ ব্রিটেনের যুক্তরাজ্য ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কথা—আর অন্যদিকে জন-গণতন্ত্র দেশ রাশিয়া ও চীনের কথা বিবেচনা করা যাক। প্রথমটির ক্ষেত্রে রাজপদের বিলাসিতা ও অহংকারী লর্ডদের ব্যবস্থা রাখার পক্ষে কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। এই ব্যবস্থা ব্রিটেনের ও তার কলোনীগুলির বুদ্ধি-মুক্তির কাজে মহা বাধাস্বরূপ কাজ করছে। স্বয়ং কমন্স সভাটি '৫১টি গাধা আর ৪৯টি ঘোড়ার' একটি ব্যয়বহুল বিতর্ক সভায় পরিণত হয়েছে—যার ক্ষতিপরায়ণতা আবশ্যকতাকে ছাড়িয়ে গেছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে রাজনীতিবিদেরা হয়ে দাঁড়িয়েছে একদল রোমান আমলের মহাপ্রভু—যারা রাজনৈতিক শক্তি লাভের জন্য ঢিলা দুইটি দলে ভাগ হয়—আর এই দলগুলিকে কঠোরভাবে পার্টি ম্যানেজারেরা নিয়ন্ত্রণ করেন এবং একটি শক্তিশালী ধনিকগোষ্ঠি এগুলিকে অবিশ্বাস্য পরিমাণে টাকা দিয়ে চালু রাখতে সাহায্য করেন।

আর রাশিয়া ও চীনের সোশ্যালিস্ট গণতন্ত্রের দেশে যা কিছু অর্থনৈতিক ভারসাম্য ও সামাজিক বিচার পাওয়া গেছে তাকে ছাড়িয়ে গেছে—বুদ্ধি-বৃত্তিকে পিষে মারার ব্যবস্থা—একদলীয় ডিক্‌টেটরশীপের যাঁতাকলে।

তাছাড়া বহুরকম রাজনীতিক ও অর্থনৈতিক খুঁত ছাড়াও এই সমস্ত রাজনৈতিক তরিকা মানবজাতিকে সাধারণভাবে নৈতিক ও আর্থিক দিক দিয়ে উন্নত করতে দারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছে বলে মনে হয়। বরং আমাদের নৈতিক মান আমাদের অত্যাশ্চর্য বৈষয়িক উন্নতির তুলনায় নেমে গেছে অনেক—অনেক নীচে। এটা অতীত-প্রীতি বা অতি-ধার্মিকতা নয়। এটা জীবনের অতি কঠোর সত্য। শাসন কাজের সকল শাখায় ঘুষ আর দুর্নীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-কারখানায় সব জায়গায় মুনাফা-লোভীতা ও কালো বাজারী, আর দৈনিক জীবনে সত্য-মিথ্যার গোঁজামিল আমাদের সভ্যতা-গর্বী সামাজিক জীবনী-শক্তিকে খেয়ে নিঃশেষ করে ফেলেছে। সাধারণ সৎ লোকের আজ নিষ্পাপ ও দুর্নীতি-মুক্ত জীবন যাপন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। মনে হচ্ছে মানবজাতি তার ভিত্তি হারিয়ে ফেলেছে। এই সমাজে ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে শঠতা—নিষ্ঠা নয়, রাজনীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্যবসায়—দেশ-সেবা নয়, আর যুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে বর্বরতা—মহত্তর শৌর্য-বীর্য চর্চা নয়। সামান্যতম বিবেক দংশন

ছাড়াই ধর্মযাজকেরা ধর্মের ব্যবসা করছেন, জন-নেতারা তাদের নির্বাচকদের দারিদ্র্য ও রোগের চরম পরিবেশে বড় বড় বেতন ও অন্যান্য এলাউন্স ইত্যাদি নিয়ে রাজকীয় বিলাসিতায় মগ্ন হয়ে আছেন। মুখোমুখি যুদ্ধের প্রয়োজন নেই আজ—এটম বোমা দিয়ে লাখ লাখ মানুষকে ধ্বংস করা হয়েছে। আর এই সমস্তই ঘটছে শান্তি, গণতন্ত্র ও সভ্যতার নামে। এই ধরনের জঘন্য প্রতারণা ও বর্বরতা আজ যেন লজ্জা ও অসম্মানের বিষয় নয়—বরং বিবেচিত হচ্ছে গর্ব ও গৌরবের বিষয় বলে। উন্নত বলে পরিচিত গণতন্ত্রের নেতৃদেশ আমেরিকা যে বর্বর উপায়ে ১৯৮৬ সনের প্রথম ভাগে ক্ষুদ্র ও দুর্বল লিবিয়ার জনগণতান্ত্রিক দেশের উপর অপ্রমাণিত তুচ্ছ কারণে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে অতর্কিত আক্রমণ করে নিরীহ বেসামরিক শিশু নারী সমেত বিরাট সংখ্যক অসহায় মানুষকে হত্যা ও বিরাট সম্পদের ক্ষতি সাধন করেছে তাতো বর্বর হিটলারিজম ও শক্তি মদমত্ত অসভ্যতার পরাকাষ্ঠা ছাড়া আর কিছু নয়। এই সমস্ত অবস্থার সৃষ্টি হওয়ার পর যদি মানুষের রাজনৈতিক চিন্তার মোড় ঘুরে উন্নততর ব্যবস্থার খোঁজে দানা বাধে, আর যদি দুনিয়ার যত দেশ আছে তত রকমের সোশ্যালিজম প্রতিষ্ঠায় কারো আপত্তি না থাকে—তা হলে শুধু রাজনীতি ও অর্থনীতি নয়—নৈতিকতা ও আদর্শের ভিত্তিতে যদি কোন ব্যবস্থা কায়েমের চেষ্টা হয়, তবে তাতে ক্ষতির কোন কারণ দেখি না।

এখানেই ইসলামী আদর্শের যৌক্তিকতা এসে পড়ে। যখন স্বাধীন ব্যবসায় ব্যর্থ হয়েছে তখন আমরা সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করেছি, আর যখন স্বাধীন রাজনীতি দারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছে তখন আমরা ধর্মীয় অনুশাসন কায়েম করি না কেন? যখন আমাদের জনগণ দারিদ্র্য, রোগ ও অশিক্ষায় ডুবে আছে আর আমাদের শাসকেরা ঐ হতভাগাদের টাকায় রাজকীয় জীবন যাপন করছে, তখন তাদেরকে মহানবী ও সাম্যবাদী খলীফাদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া খারাপ চিন্তা তো নয়।

তবে একটা কথা, যত ধারাল অস্ত্র ব্যবহার করতে যাব—সতর্ক হতে হবে তত বেশী।

ইসলামী নীতির কারণে

তফাজ্জল হোসেন

(মুসাফির প্রখ্যাত দৈনিক পত্রিকা ইত্তেফাকের 'রাজনৈতিক মঞ্চে'র লেখক। মুসাফির মরহুম সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন সাহেবের ছদ্মনাম। ধারালো যুক্তি, ক্রমিক বিশ্লেষণ, নির্ভীকতা ও গণতন্ত্র-প্রীতির জন্য 'মুসাফির' লিখিত 'রাজনৈতিক মঞ্চ' খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এই মুসাফিরই ইত্তেফাকের বাঙলা ১৩৬১ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখের রাজনৈতিক মঞ্চে আমাদের রাজনৈতিক ধারা ও আদর্শ সম্পর্কে একটি বিশ্লেষণ লেখেন। সেই লেখার কিছু অংশ আমরা নিচে তুলে দিলাম।

মরহুম তফাজ্জল হোসেন একজন যুক্তিবাদী, ধর্ম-নিরপেক্ষবাদী ও নিরাপোষ গণতন্ত্রবাদী ব্যক্তিত্ব বলে খ্যাত। এইজন্য ইসলাম সম্পর্কীয় তার লেখা যে খুব নিরপেক্ষ ও ভাবপ্রবণতামুক্ত হবে তা বলাই বাহুল্য।

আমাদের রাজনৈতিক মতবাদ অতি সহজ—স্পষ্ট। আমরা চাই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন। আমরা চাই দেশের সম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহার এবং জনগণের মধ্যে এই সম্পদের ন্যায্য বন্টন। মানুষে মানুষে আকাশ প্রমাণ ব্যবধানে আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা ইসলামের ন্যায়নীতি ও সমতার আদর্শে বিশ্বাস করি।

ধর্মকে যাহারা ব্যবসায় হিসাবে ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে, তাহারাই ইসলামের বর্তমান অধঃপতনের মূলে রহিয়াছে। রাজনৈতিক দলের নিকট সাধারণত মানুষ দেশের শাসন ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নতি আশা করে।

অবশ্য এই অর্থনৈতিক সংস্থা গড়িয়া উঠিবে ইসলামের ন্যায়নীতি ও সাম্যের ভিত্তিতে। রাজনৈতিক দল তাহাদের অর্থনৈতিক কর্মপন্থায় এই আদর্শের অনুসারী হইবে। কিন্তু কেহ যদি বলে যে, অসৎ উপায়ে অর্জিত বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন-সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করা চলিবে না, কারণ ইসলাম ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষার ওয়াদা দিয়াছে, তবে সেই মতবাদের সহিত আমরা একমত হইতে পারিব না। কারণ আমাদের মতে ইহা ইসলাম বিরোধী। সমস্ত সম্পত্তি আল্লাহ্‌র এবং তাঁহার উপর মানুষের সমান অধিকার রহিয়াছে। এই মহান নীতি প্রবর্তন করিতে হইলে কায়েমী স্বার্থবাদী সমাজ-ব্যবস্থাকে নিশ্চয়ই ঢালিয়া সাজাইতে হইবে।

সেই জন্যই আমরা যেসব লোক ইসলামের দোহাই দিয়া বা প্রগতির বুলি আওড়াইয়া কেহবা সংস্কারের বিরোধিতা করেন—অথবা কেহবা স্টেটলেস সোসাইটির ধুয়া তুলিয়া পাকিস্তানের সীমানাটি তুলিয়া দিতে চান, তাহাদের আমরা বিরোধিতা করি। আমরা বিশ্বাস করি নিরঙ্কুশ গণতন্ত্রে, আমরা বিশ্বাস করি জনসাধারণের দেশপ্রেম ও বিচার-বুদ্ধিতে। আমরা বিশ্বাস করি যে, জনগণের মনে এই ধারণা ও সন্তুষ্টি সৃষ্টি করিতে হইবে—যদ্দ্বারা তাহারা মনে করে যে এই রাষ্ট্র তাহাদের ইচ্ছা অনুসারেই সরকার চলে; তাহারা ইচ্ছা করিলেই সরকার পরিবর্তন করিতে পারে। এই অনুভূতিই গণতন্ত্র, এবং এই গণতন্ত্রই পাকিস্তানকে যে কোন ইজম বা বহিঃশত্রুর হাত হইতে সর্বদা রক্ষা করিয়া চলিবে। সাধারণ মানুষ রাজনীতিকদের নিকট হইতে ধর্ম-সংক্রান্ত বিশদ আলোচনা শুনিতে চায় না, তাহারা চায় দেশের কাজ। মানুষ সাধারণ অভাব-অভিযোগের হাত হইতে রক্ষা পাইলে আপনা আপনি ধর্ম পালনে লিপ্ত হইবে—ধর্ম-কর্ম পালনও সম্ভবপর হইয়া উঠিবে। দেশের শাসনব্যবস্থা ও অর্থনীতি ক্ষেত্রে ইসলামের ন্যায়নীতি ও সমতা কার্যকরী করা হইলে মানুষ আপনা-আপনি ইসলামের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিবে। আজ পাকিস্তান দুনিয়ার মধ্যে একটি উন্নতিশীল রাষ্ট্র হিসাবে পরিগণিত হইলে দুনিয়াভর মানুষই আমাদের কৃতিত্বের প্রশংসা করিবে, আপনা হইতেই ইসলামের যশ চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িবে। কারণ পাকিস্তানের শতকরা ৯০ জন লোক ইসলামবাদী। দুনিয়ায় আরও মুসলিম রাষ্ট্র রহিয়াছে; কিন্তু তথাকার সমাজ ব্যবস্থা এমনি জঘন্য, যার ফলে তাহাদের সুনাম দূরের কথা, দুনিয়ার অন্যান্য জাতি তাহাদের করুণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। পাকিস্তান অর্জনের পর 'ইসলাম কায়েম করিব,' 'ইসলাম কায়েম করিব' বলিয়া বহু চীৎকার আমাদের দেশবাসীরা শুনিয়াছে, দুনিয়াভর মানুষও শুনিয়াছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে যখন ইসলামের কোন নীতিই অনুসৃত হয় নাই বরং ভিক্ষার ঝুলি নিয়া দেশ-বিদেশে ধর্ণা দেওয়া হইয়াছে ও দেশের সর্বত্র দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও চোরাকারবারী চলিয়াছে, তখন সে চীৎকার কি অসার প্রতিপন্ন হয় নাই? এই চীৎকার দ্বারা কি আমাদের অমর্যাদা করা হয় নাই? তেরশত বছর পরে ইসলামের কনটেন্ট বুঝাইতে কোশেশ করিবার পূর্বে আমরা চাই মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি, অন্ততঃ তাহাদের বাঁচিয়া থাকিতে পারিবার মত ব্যবস্থা করিয়া দিবার। এখানেও

সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া আমরা মনে করি। কায়েমী স্বার্থবাদীরা ধর্মকে যুগে যুগে মানুষের মধ্যে দুর্বলতা সৃষ্টির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। তাহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় একদল ধর্ম-ব্যবসায়ী প্রচারক সমাজে গড়িয়া উঠিয়াছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ও অধিকার আদায়ের সংগ্রামে মানুষ যাতে মারমুখী হইয়া না উঠে তা প্রতিরোধ করিবার জন্যে তাহারা পরকালের সুখ শান্তির খোয়াব দেখাইয়া মানুষের প্রতিরোধ ও সংগ্রামশীল শক্তিকে অন্যদিকে প্রবাহিত করিতে চায়। আল্লাহ যে মানুষের জন্য বিশ্বের সম্পদ-সমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই সম্পদের উপর মানুষের সম অধিকার প্রদান করিয়াছেন, এইভাবে সেটা তাহারা অতি সন্তর্পণে পাশ কাটাইয়া যাইতে চায়। ইহারা ইসলামের দুশমন, মানবতার দুশমন এবং তাহারা আল্লাহ্‌র প্রতি নাফরমানী করিতেছে।

আমরা বরং বিশ্বাস করি যে—যে অধিকার আল্লাহ্‌ মানুষকে দিয়াছেন এবং জালেম ও শোষণকারীর বিরুদ্ধে জেহাদ করা যেখানে ফরজ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে—সেখানে কর্তব্যচ্যুত হইলে পরকালেও মানুষ আল্লাহ্‌র রহমত পাইতে পারে না।

পাকিস্তানে যদি সত্যিকারভাবে ইসলামের ন্যায়নীতি, সংযম ও সমতার ভিত্তি প্রচলিত থাকিত তাহা হইলে কি ক্ষমতা নিয়া এত কাড়াকাড়ি দলাদলি হয়? রসুলুল্লার (সাঃ) সময় বা খলীফাদের সময় ক্ষমতা নিয়া কি এ রকম কাড়াকাড়ি ছিল? পরবর্তী কালে যখন ইসলামকে সুলতানিয়ত বা রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত করা হইল তখন হইতেই তো ইসলামের দুর্গতি।

খুলাফায়ে রাশিদীনের আদর্শ

—নূর মোহাম্মদ আজমী*

ইসলামী সাহিত্যে "খুলাফায়ে রাশিদীন" বা আদর্শ শাসকমণ্ডলী বলিতে সাধারণত ইসলামের ইতিহাসের পয়লা চারি খলীফা—হযরত আবুবকর, উমর, উসমান, ও আলীকেই (রাঃ) বুঝাইয়া থাকে। আর তাঁদের খিলাফতকে বলা হইয়া থাকে খিলাফতে রাশেদা। খিলাফতে রাশেদা হিজরী ১০ – ৪০ মুতাবিক ৬৩২—৬৬২ ঈসায়ী সনে মোট ত্রিশ বছর কাল ছিল। তারপর সূত্রপাত হয় রাজতন্ত্রের; তবে বনি উমাইয়াদের মারওয়ানিয়া শাখার পঞ্চম খলীফা হযরত উমর বিন্ আবদুল আজিজকেও ইসলাম জগৎ একজন খলীফায়ে রাশেদ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার খিলাফতকাল ছিল মাত্র আড়াই বছর।

পরবর্তী শাসকশ্রেণী খুলাফায়ে রাশিদীনের আদর্শ অনুসরণ করিলে দুনিয়া হইতে জুলুম বা অন্যায়-অবিচারের নাম-নিশানা মুছিয়া যাইত, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে সৃষ্টি হইত না—কখনো শ্রেণী-সংগ্রাম, অথবা শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে দেখা দিত না স্বার্থ-বিরোধ।

বলা বাহুল্য যে—প্রথম খলীফা হযরত আবুবকরের খিলাফত কালও ছিল মাত্র দুই বছর (১১ ও ১২ হিঃ)। অতএব উহা খিলাফতের প্রাথমিক ব্যবস্থাদিতেই অতিবাহিত হইয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে রাজ্যশাসন ব্যাপারে ইসলামী আদর্শের পুরা বিকাশ সাধিত হয় খলীফা উমরের আমলেই। তাঁর খিলাফত কাল ছিল দশ বছর। তাঁর পরবর্তী খলিফা দুজন প্রায় তাঁরই অনুসরণ করেছেন। তৃতীয় খলীফা হযরত উসমানের খিলাফত কাল ছিল বার বছর—আর চতুর্থ খলীফা হযরত আলীর ছিল ছয় বছর।

খিলাফতের নির্বাচন

খুলাফায়ে রাশিদীনের মধ্যে প্রত্যেক নির্বাচনই জনসাধারণের ইচ্ছা অনু-যায়ী হইয়াছিল; অথচ তাঁহাদের মধ্যে কেহই খিলাফত লাভের জন্য

* 'ইসলামী রাষ্ট্র' নামক বইটিতে প্রকাশের জন্য এই রচনাটিই আমি মৌলানা সাহেবকে দিয়ে লিখিয়েছিলাম। —লেখক

পদপ্রার্থী হন নাই। ইহা ছাড়া তাঁহাদের কেহই মৃত্যুকালে পরবর্তী খলীফা হিসাবে নিজেদের কোন আত্মীয়ের নাম প্রকাশ্যে ঘোষণা বা গোপনে তাঁহার পক্ষে কোনরূপ ব্যবস্থা করিয়া যান নাই। বরং খলীফা উমর তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্কে খলীফা নির্বাচন করার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

খলীফা আবুবকরের নির্বাচনকালে মদীনার আনসারগণ তাঁহাদের মধ্যে একজন এবং মুহাজিরদের মধ্যে অপর একজনকে আমীর (নেতা) নির্বাচনের প্রস্তাব করিলে হযরত আবুবকর (রাঃ) আন্সারদের পদমর্যাদা ও যোগ্যতার কথা স্বীকার করিয়া এ ব্যাপারে মুহাজিরগণ যোগ্যতর বলিয়া যুক্তি প্রদর্শন করেন এবং হযরত উমর অথবা হযরত আবু উবায়দার হস্তে বয়াত করিতে জনসাধারণকে অনুরোধ করেন। কিন্তু উমর অগ্রণী হইয়া আবুবকরের হাতেই বয়াত করেন। ইহার পর জনসাধারণ তাঁহার অনুসরণ করেন।

খলীফা উমরের নির্বাচন ব্যাপারে ওফাতকালে খলীফা হযরত আবুবকর বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ও জনসাধারণের মতামত নিয়া পরবর্তী খলীফা হিসাবে উমরের নাম ঘোষণা করিয়া যান।

খলীফা হযরত ওসমানের নির্বাচনের ব্যাপারে এক নতুন তরিকা প্রয়োগ করা হয়। খলীফা হযরত উমর নিজের অন্তিমকালে দেশের শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তিত্ব হযরত উসমান, আলী, তালহা, জুবাইর, আবদুর রহমান বিন্ আওফ ও সাদ বিন্ ওয়াক্কাস (রাঃ)-কে লইয়া একটি কমিটি গঠন করিয়া যান এবং জনসাধারণের মতামত নিয়া নিজেদের মধ্যে একজনকে খলীফা নির্বাচন করিতে সুপারিশ করেন। সেই অনুসারেই হযরত উসমান খলীফা নির্বাচিত হন।

খলীফা হযরত আলীও জনসাধারণের ইচ্ছা অনুযায়ী নির্বাচিত হন। খলীফা ওসমান শাহাদাত পাওয়ার পর আলীকে এ পদ নিতে অনুরোধ করা হইলে তিনি উহা গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন এবং বলেন ঃ

"আমি খলীফা না হইয়া খলীফার উজির হওয়াই পছন্দ করি। তোমরা অন্য যাহাকেই খলীফা নির্বাচন করিবে আমি তাহার অনুগত থাকিব।"

কিন্তু মদীনার জনসাধারণ ইহাতে প্রবোধ মানিলেন না। বাধ্য হইয়া তাঁহাকে উহা মঞ্জুর করিতে হইল।

খলীফা উমর বিন আবদুল আজিজের নির্বাচন অবশ্য জনসাধারণ দ্বারা হয় নাই। তাঁহার অজান্তে মরণকালে খলীফা সুলায়মান বিন্ আবদুল

মালিক উমাইয়াদের প্রথা অনুসারে তাঁহাকে মনোনয়ন দান করিয়া যান। কিন্তু এ গুরুদায়িত্ব গ্রহণে তিনি ইতস্তত করেন। পরে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ও জনগণের আন্তরিক অনুরোধে উহা প্রত্যাখ্যান করিতে তিনি বিরত থাকেন।

নীতি ঘোষণা

খুলাফায়ে রাশিদীনের প্রত্যেকেই শাসনভার গ্রহণ করার পর যে খুত্বা বা বক্তৃতা দিয়েছেন, তাহাতে তাঁহাদের শাসন সম্পর্কীয় নীতির স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। খলীফা আবু বকর বলিয়াছেন ঃ

আমি তোমাদের শাসনভার পাইয়াছি অথচ আমি তোমাদের তুলনায় উত্তম নহি। কিন্তু কুরআন নাজিল হইয়াছে, রসূল সুন্নাহ্ দ্বারা তার ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। আমরা সকলেই তাহা দেখিয়া আমল করিয়াছি। (অতএব তাঁহার পথেরই আমাদের অনুসরণ করিতে হইবে।) তোমরা জানিবে,—সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমত্তা হইতেছে তাক্ওয়া ও সংযম— আর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হইতেছে অনাচার। তোমাদের নিকট যারা দুর্বল তারাই আমার নিকট সবল। জালিমেদের নিকট হইতে পাওনা আদায় না করিয়া আমি ক্ষান্ত হইব না। আর তোমাদের নিকট যারা সবল তারাই আমার নিকট সব চাইতে দুর্বল, তাহাদের নিকট হইতে মজলুম অত্যাচারীদের হক আদায় না করিয়া ছাড়িব না। তোমরা জানিবে, আমি হইতেছি রসূলুল্লাহ্‌র পথের অনুসারী, কোন নতুন পথের আবিষ্কারক নহি। আমি ভাল কাজ করিতে থাকিলে তোমরা আমার সাহায্য করিবে— আর বিপথগামী হইলে আমায় সোজা করিয়া দিবে।[১]

খলীফা হযরত উমর (রাঃ) খিলাফত লাভের পর জনসাধারণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন ঃ

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও হযরত আবু বকরের (রাঃ) পর আমি তোমাদের খলীফা নির্বাচিত হইয়াছি অর্থাৎ আমি তোমাদের দায়িত্ব নিয়াছি, এবং তোমরাও আমার দায়িত্ব নিয়াছ। সুতরাং যাহারা আমার নিকটে আছে তাহাদের ব্যবস্থা আমি নিজেই করিব এবং যাহারা দূরে আছে তাহাদের জন্য শক্তিশালী ও আমানতদার কর্মচারী নিযুক্ত করিব। যাহারা ভাল করিবে তাহাদের আমরা পুরস্কার দিব, আর যাহারা মন্দ করিবে তাহাদের শাস্তি দেওয়া হইবে।[২]

১. কিতাবুল আমওয়াল—৪ পৃঃ
২. তারীখুল খোলাফা—১২০পৃঃ

তিনি আরও বলিয়াছিলেন ঃ

হে লোক সকল ঃ তোমাদের উপর আমাদের (শাসকদের) এই হক রহিয়াছে যে, তোমরা আমাদের পেছনে আমাদের কল্যাণ কামনা করিবে এবং ভাল কাজে আমাদের সহায়তা করিবে। আর হে শাসকগণ, জানিয়া রাখিবে ইমাম বা নেতার জ্ঞান ও গম্ভীরতার ন্যায় আল্লাহ্‌র নিকট প্রিয় বস্তু এবং জনসাধারণের পক্ষে কল্যাণকর কোন বস্তুই নাই। অপরদিকে ইমামের অর্বাচীনতা ও চপলতার ন্যায় আল্লাহ্‌র নিকট ঘৃণিত এবং জনসাধারণের অনিষ্টকর আর কোন বস্তুই নাই। যে ব্যক্তি স্বীয় অধীন ব্যক্তিদের নিরাপত্তা বিধান করে, আল্লাহর তরফ হইতে তাহার নিরাপত্তার বিধান করা হয়।[১]

খলীফা হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ

ইমাম বা শাসকের কর্তব্য আল্লাহ্‌র বিধান অনুসারে রাজ্য শাসন করা ও খিলাফতে রব্বানীর কর্তব্য এই পবিত্র আমানতকে যথাযথভাবে আদায় করা। যখন ইমাম এইরূপ করিবেন, জনসাধারণের কর্তব্য, তাঁহার আদেশ পালন করা ও অনুগত থাকা এবং যখন তিনি কোন কাজের জন্য ডাক দিবেন তাতে সাড়া দেওয়া।[২]

খলীফা হযরত উমর বিন্ আবদুল আজিজের আগে উমাইয়া খলীফাগণ মনে করিতেন যে, প্রথম খলীফা চারিজনের পর তাঁহাদের ন্যায় রাজ্যশাসন করা পরবর্তী লোকদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। কারণ পরবর্তী যুগের জনসাধারণের নৈতিক মান আগেকারদের ন্যায় নহে। কিন্তু উমর বিন্ আবদুল আজিজ ইহাকে ভুল ধারণা বলিয়া মনে করিতেন এবং বলিতেন ঃ

খলীফা বা শাসক হইতেছেন বাজারের ন্যায়, বাজারে যে জিনিসের চাহিদা থাকে দেশের লোক তাহাই তৈয়ার করিতে থাকে। শাসকমণ্ডলী সৎ ও সাধু হইলে দেশের জনসাধারণও সৎ ও সাধু হইবে, আর শাসক অসাধু হইলে জনসাধারণও অসাধু হইবে।

এক কথায় আগের খুলাফায়ে রাশিদীনের মত রাজ্যশাসন করাই ছিল হযরত উমর বিন্ আবদুল আজিজের ইচ্ছা। তা ছাড়া উমাইয়া শাসকগণ

---

১. কিতাবুল খারাজ—৭ পৃঃ
২. কিতাবুল আমওয়াল—৫ পৃঃ

জনসাধারণের যে সব সম্পত্তি অন্যায়ভাবে নিজেদের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে জায়গীররূপে বিতরণ করিয়াছিলেন, তার উদ্ধার এবং সম্পদ বিতরণে জনসাধারণের মধ্যে সমতা বিধানই ছিল তাঁর নীতি।[১]

পরামর্শ গ্রহণ

খিলাফত ও স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যে প্রধান পার্থক্য হইতেছে শাসন ব্যাপারে জনসাধারণের মতামত নেওয়া।

খলীফা উমর বলেন ঃ

পরামর্শ বা জনগণের মতামত গ্রহণ ব্যতীত খিলাফতই হইতে পারে না।[২]

খুলাফায়ে রাশিদীনের সময় আজকালের ন্যায় নিয়মিত কোন মন্ত্রণাপরিষদ বা পরামর্শ সভা না থাকিলেও তাহারা সাধারণের মতামত গ্রহণ ব্যতীত প্রায় কোন কাজই করিতেন না।

খলীফা হযরত উমর দৈনন্দিন কাজে সাধারণত হযরত উসমান, আলী, আবদুর রহমান বিন্ আওফ, মুআজ বিন্ জাবাল, উবাই বিন্ কাত ও যায়দ বিন্ সাবিতের সহিত পরামর্শ করিতেন। বিষয় অধিক গুরুত্বপূর্ণ হইলে মদীনায় জনসভা ডাকিতেন। ইরাক ও শাম দেশ অধিকারের পর যখন কোন কোন সাহাবী তথাকার ভূমি মুজাহিদগণের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়ার জন্য তাঁহার প্রতি চাপ দিতে থাকেন, তখন তিনি সমস্ত মুহাজির ও আনসারদের এক সাধারণ সভা আহবান করেন। এ সভায় তিনি যাহা বলিয়াছিলেন এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছিলেন ঃ

একমাত্র এই কারণেই আমি আপনাদের কষ্ট দিয়াছি যে, আপনারা আমার ঘাড়ে আমানতের যে গুরুভার চাপাইয়াছেন তাহা উঠাইতে আপনারা আমায় সাহায্য করিবেন। কারণ, আমি আপনাদের ন্যায়ই একজন। আমি এ ইচ্ছা রাখি না যে, আপনারা কেবল আমার প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করিবেন।[৩]

ত্যাগ স্বীকার ও সাধারণের সম্পদ বাড়ানোর চেষ্টা

বায়তুলমাল বা সাধারণ তহবিল হইতে খুলাফায়ে রাশিদীনের মধ্যে খলীফা হযরত আবুবকর ও উমর যে বৃত্তি নিতেন, তাহা একজন সাধারণ

১. মুসলমানূঁকা উরূজ ও যাওয়াল—আকবরাবাদী—৭০ পৃঃ
২. কানযুল ওম্মাল—আল-ফারূক ২য় খণ্ড পৃঃ ১৪
৩. কিতাবুল খারাজ—১৪ পৃঃ

লোকের বৃত্তির সমান ছিল। খলীফা হযরত উসমান ও হযরত আলী বায়তুলমাল হইতে কোন অর্থ নিতেন না—অথচ খলীফা আলী অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, খলীফা হযরত উসমান আপন বৃত্তি লইয়া নিজের গরীব আত্মীয়দের মধ্যে বন্টন করিয়া দিতেন।

খলীফা হযরত আবূ বকর সম্পর্কে ইবনু জরীর তাবারী বলেন : হযরত আবূ বকরের ব্যবসায় ছিল। খলীফা হওয়ার পরও ছয়মাস কাল 'ছনুহে' নামক স্থানে তিনি ব্যবসায় চালাইতে থাকেন। পরে তিনি স্থায়ীভাবে মদীনায় থাকিয়া জনসাধারণের কাজে সমগ্রভাবে আত্মনিয়োগ করা আবশ্যক মনে করেন এবং বলেন : 'ব্যবসায়ের সহিত জনসাধারণের এ গুরুদায়িত্ব সম্পাদনা সম্ভবপর নহে। অতএব তাঁহার পক্ষে জনসাধারণের কাজে সমগ্রভাবে আত্মনিয়োগ করা প্রয়োজন।' ইহার পর তিনি ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন এবং হযরত উমরের অনুরোধে বায়তুলমাল হইতে তাঁহার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য বার্ষিক ৬ হাজার দিরহাম (১৫০০ টাকা) বৃত্তি আর হজ্জ ও উমরার বাহন খরচ গ্রহণ করেন।[১]

বিবি আয়েশা বলেন : খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর আমার পিতা আবূ বকর বলেন : আমার দেশবাসী জানেন যে, আমার ব্যবসায় আমার পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য যথেষ্ট ছিল, কিন্তু এখন আমি জনসাধারণের কাজে আটকাইয়া পড়িয়াছি। অতএব আমার পরিবার জনসাধারণের তহবিল বায়তুলমাল হইতে ভরণ-পোষণের খরচ নিবেন এবং আমি জনসাধারণের ব্যবসায় (কাজ) করিয়া যাইব।[২]

সাহাবী হযরত আনাস বলেন : খলীফা হযরত আবূ বকর ওফাতকালে আয়েশাকে বলিয়াছিলেন :

"আমি সাধারণের সম্পদ বাড়ানোর জন্য খুবই আগ্রহশীল ছিলাম। কিন্তু শরীর রক্ষার জন্য আমি সাধারণ-তহবিলের অর্থে কিছু গোস্ত ও দুধ খাইতে বাধ্য হইয়াছি। দেখ, আমার মৃত্যুর পর আমার এখানে যাহা আছে, সমস্তই খলিফা উমরের কাছে অর্থাৎ বায়তুলমালে সোপর্দ করিয়া দিবে।

আনাস বলেন : তাঁহার নিকট টাকা-কড়ি কিছুই ছিল না, ছিল কেবল একটি চাকর, একটি দুধাল উট ও একটি দুধের ভাণ্ড। আবূ বকরকে

১. তাবারী—৪র্থ খণ্ড ৫৪ পৃ:
২. বুখারী হইতে মিশকাত—৩১৭ পৃ:

দাফন করার পর সাথে সাথে বিবি আয়েশা ঐ সমস্ত জিনিস খলীফা উমরের নিকট পেঁাছাইয়া দেন। ইহা দেখিয়া হযরত উমর বলিলেন ঃ "আল্লাহ্ আবু বকরকে রহমত করুক, তিনি পরবর্তীদিগকে কষ্টে ফেলিয়া গেলেন।"[১]

মুহম্মদ বিন্ সীরিন বলেন ঃ ইন্তেকালের সময় খলীফা আবু বকর আয়শাকে বলেন ঃ সাধারণ তহবিল হইতে কিছু নেওয়ার ইচ্ছা আমার ছিল না, কিন্তু উমর বার্ষিক ৬ হাজার দিরহাম গ্রহণে আমায় বাধ্য করেন। অতএব অমুক জায়গায় আমার যে বাগানটি আছে তাহা সাধারণ তহবিলে দিয়া দিলাম।

ইবনে সীরিন আরো বলেন ঃ আবু বকরের ইন্তেকালের পর আয়েশা উহা খলীফা উমরের নিকট বলিয়া পাঠান। ইহা শুনিয়া উমর বলিলেন ঃ আল্লাহ্ আবু বকরকে রহম করুন, তিনি কাহারো কিছু বলিবার পথ রাখিয়া যাওয়া পছন্দ করেন নাই। দেখ, তাঁহার পর আমিই বায়তুল-মালের অভিভাবক, আমি তোমাদের বাগান তোমাদের ফেরত দিলাম।[২] (পয়লা বর্ণনাটি বুখারী।)

একবার খলীফা আবু বকরের বিবি কিছু হাল্ওয়া প্রস্তুত করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। খলীফা বলিলেন, আমার সে সামর্থ্য কোথায়? বিবি বলিলেন ঃ অনুমতি পাইলে দৈনিক খরচ হইতে সামান্য-সামান্য করিয়া বাঁচাইতে চেষ্টা করিব। খলীফা বলিলেন ঃ তা করিতে পার।

কতদিন পর বিবি বলিলেন ঃ এখন হাল্ওয়া প্রস্তুত করা যাইতে পারে। খলীফা বলিলেন ঃ ইহাতে বুঝা গেল যে, আমাদের দৈনিক খরচের পরিমাণ কম হইলেও চলিতে পারে। ইহার পর তিনি জমানো টাকা বায়তুল-মালে দাখিল করিয়া দিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে, আজ হইতে আমার বৃত্তিতে দৈনিক এই পরিমাণ টাকা কম দিবে। তাছাড়া তিনি নিজ তহবিল হইতে অতীতে নেওয়া অতিরিক্ত পরিমাণে জরিমানা আদায় করিয়া দিলেন।

—(আশহারু মাশহীরিল ইসলাম ১ম খঃ ৯৩ পৃঃ)

---

১. কিতাবুল আমওয়াল—২৬৭ পৃঃ

২. কিতাবুল আমওয়াল—২৬৭ পৃঃ

খলীফা হযরত উমর নিজের বৃত্তি সম্পর্কে বলেন :

'সাধারণের তহবিল সম্বন্ধে আমি নিজকে এতিমের অভিভাবকের ন্যায় মনে করি। আমার আর্থিক অবস্থা ভাল থাকিলে বায়তুলমাল হইতে আমি কিছুই গ্রহণ করিব না। আর অভাবগ্রস্ত হইলে ন্যায়সঙ্গতভাবে গ্রহণ করিব। অতপর আবার সচ্ছলতা দেখা দিলে নেয়া টাকা ফেরত দিব।[১]

একবার হযরত আলী, উসমান, তালহা ও জুবাইর একত্রিত হইয়া বলিলেন ঃ বায়তুলমালে খলীফার (উমরের) বৃত্তি অতি অল্প নির্ধারিত হইয়াছে। তাঁহার পরিবার অতি কষ্টে জীবন ধারণ করিতেছেন বলিয়া মনে হয়। সুতরাং তাঁহার বৃত্তি বাড়াইয়া দেওয়া হউক। কিন্তু কেহই এই প্রস্তাব লইয়া খলীফা হযরত উমরের নিকট যাইতে সাহস করিলেন না। পরামর্শে স্থির হইল ঃ উমরের কন্যা ও রসূলে-করীমের স্ত্রী হযরত হাফ্‌সার মারফত তাহা পেশ করা হইবে। এক সুযোগে হাফসা পিতার নিকট তাঁহাদের প্রস্তাব পেশ করিলেন। হযরত উমর জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তোমার নিকট এই প্রস্তাব কাহারা দিয়াছে? (জানিতে পারিলে) তাহাদের শাস্তি দিতে হইবে। তুমিই বল ঃ তোমার স্বামী রসূলে করীমের পোশাক কি ছিল?

হাফ্‌সা বলিলেন ঃ দুইটি সাধারণ গেরুয়া কাপড় ছিল, যাহা তিনি জুমআ ও প্রতিনিধি দলের সহিত সাক্ষাৎকালে ব্যবহার করিতেন।

ঃ খাওয়া কিরূপ ছিল?

ঃ যবের রুটিই তখন আমাদের সাধারণ খাদ্য ছিল।

ঃ বিছানা কিরূপ ছিল?

ঃ একটি মোটা কাপড় ছিল। গ্রীষ্মকালে উহা দুই-তিন ভাঁজ করিয়া পাতিয়া থাকিতেন এবং শীতকালে অর্ধেক পাতিতেন, অর্ধেক গায়ে দিতেন।

ইহার পর উমর বলিলেন ঃ হাফ্‌সা, তাদের বলিয়া দাও ঃ হযরত রসূলে করীম (সঃ) তাঁর জীবনে আমাদের জন্য যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন আমি তার ব্যতিক্রম করিতে পারিব না। আমাদের জন্য এই পরিমাণ বৃত্তি যথেষ্ট।

—(আশহারু মাশহীরিল ইসলাম—১ম খন্ড)

---

১. তবকাতে ইবনে সাদ—তারীখুল খুলাফা—১৮ পৃঃ

আহ্নাফ বিন্ কায়স বলেন : একদা আমরা পরস্পর আলোচনা করিতেছিলাম : 'খলীফার জন্য বায়তুলমাল হইতে কি অর্থ নেওয়া হালাল হইবে?' ইহা তাঁহার কানে গেলে তিনি আমাদের ডাকিয়া বলিলেন : শোন, আমি তোমাদের বলিতেছি : সাধারণ তহবিল হইতে আমি আমার পক্ষে যাহা হালাল মনে করি, তাহা হইতেছে দুই জোড়া কাপড়—শীতের জন্য এক জোড়া ও গ্রীষ্মের জন্য এক জোড়া। ইহা ছাড়া হজ্জ ও উমরার একটি সওয়ারী এবং আমার পরিবারের জন্য কুরাইশদের একটি সাধারণ পরিবারের ন্যায় ভরণ-পোষণ ব্যয়,—ধনীদের ন্যায়ও নহে, ফকীরদের ন্যায়ও নহে। ইহার পর আমি সাধারণের মধ্যে একজন। বায়তুলমাল হইতে তাহাদের যাহা মিলিবে, আমারও তাহা মিলিবে।[১]

ইমাম আবু ইউসুফ কিতাবুল খারাজে উল্লেখ করিয়াছেন : খলীফা হযরত উমর এই তিন ব্যক্তিকে ইরাকে কর্মচারী নিযুক্ত করিয়া পাঠান : আম্মার বিন্ ইয়াসিরকে গভর্নর, আবদুল্লাহ্ বিন্ মাসউদকে বিচারক ও খাজাঞ্চী নিযুক্ত করেন এবং উসমান বিন্ হুনাইফের প্রতি জমি জরিপের ভার অর্পণ করেন। আর তাদের তিন পরিবারের জন্য দৈনিক দুই বেলায় মাত্র একটি করিয়া বকরী নির্দিষ্ট করেন এবং বলেন : আমি নিজকে এবং আপনাদিগকে সাধারণের তহবিলের ব্যাপারে এতিমের অভিভাবকের ন্যায় মনে করি। এতিমের অভিভাবক সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন : যে অভি-ভাবক অভাবমুক্ত হইবে, সে যেন এতিমের মাল হইতে পারিশ্রমিকরূপে কিছু গ্রহণ না করে। সে যদি অভাবগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে যেন ন্যায়-সঙ্গতভাবে গ্রহণ করে (কুরআন)। আল্লাহ্‌র শপথ, আমি মনে করি : যে দেশ হইতে কেবল তার কর্মচারীদের জন্যই দৈনিক একটি করিয়া বকরী গ্রহণ করা হইবে, অচিরে সে দেশ বিরান হইয়া যাইবে।

—(কিতাবুল খারাজ)

খলীফা হযরত আলী ছয় বছর কাল খিলাফত করেন, অথচ বায়তুলমাল হইতে কিছুই নেন নাই। উয়াইনা বিন্ আবদুর রহমান বলেন : একটি জামা ও একটি চাদর ছাড়া খলীফা আলী আমাদের বায়তুলমাল হইতে কখনো কিছু গ্রহণ করেন নাই।[২]

১. কিতাবুল আমওয়াল—২৬৮ পৃ:

২. কিতাবুল আমওয়াল—২৭০ পৃ:

হারুন বিন আনতারা তাঁর পিতা প্রমুখাত বর্ণনা করেন যে, খাওয়ারনক নামক স্থানে খলীফা আলীকে আমি একটি ছেঁড়া চাদর গায়ে থর থর করিয়া কাঁপিতে দেখিয়া বলিলাম ঃ হযুর, সাধারণ তহবিলে আপনার ও আপনার পরিবারেরও অংশ রহিয়াছে, আর আপনি এইরূপ কষ্ট করিতেছেন ? আলী বলিলেন : বায়তুলমাল হইতে কিছু গ্রহণ করিতে আমি কখনো ইচ্ছা রাখি না। এই চাদরখানিও আমি আমার মদীনার বাড়ী হইতে আনিয়াছি।[১]

সাম্য ও ন্যায় বিচার

খুলাফায়ে রাশিদীন কোনরূপ তারতম্যবিহীন ও বৈশিষ্ট্য বর্জিত অবস্থায় সাধারণের মধ্যে সাধারণের ন্যায় বাস করিতেন।

একদা এক ব্যক্তি খলীফা আবু বকরের নিকট আসিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিল না এবং সালাম করিতে যাইয়া বলিল ঃ আমার সালাম হউক ঐ ব্যক্তির প্রতি, যিনি ইহাদের মধ্যে খলীফা।

খলীফা হযরত উমর অতিশয় মোটা খসখসে কাপড় ব্যবহার করিতেন এবং আবশ্যকবোধে তালি লাগাইতেন। হযরত আনাস বলেন ঃ আমি একবার তাঁহার জামায় দুই বাহুর মধ্যে চারিটি তালি লক্ষ্য করিয়াছি।

একদিন খলীফা উমর জুমআয় দেরীতে পৌঁছিলেন এবং তার কারণ দর্শাইতে যাইয়া বলিলেন ঃ আমার মাত্র এক জোড়া কাপড় আছে। ধুইয়াছিলাম, শুকাইতে দেরী হইয়া গেল।

—(ইবনে কাসীর ৭ম খন্ড ১৩৪ পৃঃ)

ইবনে সায়ীদ বলেন ; একদা আমি এক সুন্দর সুপুরুষকে কাঁচা ইঁট মাথার নীচে দিয়া মস্‌জিদে নববীতে শুইতে দেখিয়া অবাক হইলাম। ঘরে গিয়া আমার বাবার নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, মস্‌জিদে শুইয়া আছেন, ইনি কে ? আমার বাবা বলিলেন ; ইনিই তো খলীফা উসমান।

(ইবনে কাসীর ৭ম খঃ ২১৩ পৃঃ)

খলীফা হযরত আলী সম্পর্কে হারুন বিন্ আন্তারা বলেন ঃ আমি খলীফা আলীকে ছেঁড়া চাদর গায়ে শীতে থর থর করিয়া কাঁপিতে দেখিয়াছি।[২]

---

১. কিতাবুল আমওয়াল—২৭০ পৃঃ

২. কিতাবুল আমওয়াল—২৭০ পৃঃ

খলীফা হযরত উমর বিন্ আবদুল আজিজ সম্বন্ধে মাদায়েনী বলেন ঃ খিলাফতের আগে উমর বিন্ আবদুল আজিজের জন্য সহস্র দীনার (২৫০০ টাকা) মূল্যের একজোড়া কাপড় খরিদ করা হইলেও তিনি উহাকে মোটা ও খসখসে বলিয়া না পছন্দ করিতেন ; অথচ খলীফা হওয়ার পর দশ দিরহাম (আড়াই টাকা) মূল্যের জোড়াকেও অতি চিকন ও কোমল মনে করিতেন। [১]

খলীফা হযরত উমরের নিকট একদা ময়দার কোমল রুটি আনা হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ; দেশের সকল লোকই কি ইহা খাইতে পায় ? উত্তর আসিল ঃ না। উমর বলিলেন ঃ তাহা হইলে আমিও উহা খাইব না।[২]

আজারবাইজানের কর্মচারী উতবা বিন্ ফরকদ খলীফা উমরের জন্য কিছু হালওয়া উপহার পাঠাইলেন। উমর উহা ফেরত দিয়া তাহাকে বলিয়া পাঠাইলেন ঃ

তুমি কি তোমার বাবার অথবা নিজ পরিশ্রম ব্যতিরেকেই এইরূপ হালওয়া খাইয়া থাক ? জানিয়া রাখ, জনসাধারণ তাহাদের ঘরে যাহা খাইয়া থাকে, তাহা ছাড়া অন্য কোন জিনিস খাইব না।[৩]

আরবের লোকেরা সাধারণত ঘি খাইয়া থাকে। খলীফা উমরের আমলে একবার আরবে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। খলীফা হযরত উমরও সাধারণের সহিত (জৈতুন) তৈল খাইতে থাকেন। ইহাতে তাঁহার শরীর কাল হইয়া যায় এবং এক রকম রোগের সৃষ্টি হয়।

সেনাপতি হযরত আবু উবায়দা দ্বারা জেরুজালেম অবরুদ্ধ হইলে তথাকার খৃস্টানগণ নগরের চাবি হাওলা করার জন্য স্বয়ং খলীফা উমরের জেরুজালেম উপস্থিতি প্রার্থনা করেন। জেরুজালেম গমনকালে খলীফা উমর এক মঞ্জিল উটের পিঠে চড়িয়া চাকরকে উট টানিতে দিতেন (দলের আগের উটটিকে একজনকে বল্গা ধরিয়া টানিতে হয়)। অপর মঞ্জিলে চাকরকে উটে চড়াইয়া স্বয়ং খলীফাই উট টানিতেন। এভাবে পালা করিয়া উট টানিতে টানিতে জেরুজালেমের শেষ মঞ্জিলে

১. মসউদী ২য় খঃ—১৬৯ পৃঃ
২. উসদুল গাবা মুসলমানুকা উরুজ—২২ পৃঃ
৩. ফতুহুল বলদান—৩২৪ পৃঃ

যখন হাজির হন, তখন খলীফা নিজেই উট টানিতেছিলেন। ইহা দেখিয়া তখন খৃস্টানেরা বলিয়াছিলেন ঃ যে-জাতির মধ্যে এইরূপ সাম্যভাব বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে দুনিয়ার কোন শক্তিই টিকিতে পারে না, দুনিয়া তাঁদের পদানত হইতে বাধ্য।—(ইজালাতুল খিফা)

খলীফা হযরত উমরের নিজ পুত্র আবু শাহমা শরাব পান করিলে উমর নিজে তাহাকে চাবুক মারিলেন, যার ফলে সে মারা যায়।[১]

খলীফা হযরত উমরের আপন শালা কুদামা বিন্ মাজউন শরাব পান করিলে উমর তাহাকে ৮০ বার চাবুক মারেন।[২]

খলীফা হযরত উমর ও উবাই বিন্ কা'বের মধ্যে কোন বিষয়ে বিবাদ ছিল। যায়েদ বিন্ সাবিত সাহাবীর নিকট নালিশ দায়ের হইল। খলীফা উমর তথায় হাজির হইলে যায়েদ উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং হযরত উমরকে তথায় আসন নিতে অনুরোধ করিলেন। ইহা দেখিয়া উমর বলিলেন ঃ ইহা আপনার পয়লা অবিচার। ইহার পর তিনি অপর পক্ষের সাথে আসনে বসিয়া গেলেন।[৩]

আবুল ফোরাত বলেন ঃ একদা খলীফা হযরত উসমান রাগের বশে তাঁহার এক চাকরের কান মলিয়া দিলেন এবং পরক্ষণে বলিলেন ঃ আমার ভুল হইয়া গিয়াছে, তুমিও আমার কান মলিয়া দিয়া ইহার শোধ লও! অতি পীড়া-পীড়ির পর চাকর তাঁহার কানের উপর হাত লাগাইল। উসমান বলিলেন ঃ না, না, জোরে মল! এরপর বলিলেন, পরকালের প্রতিশোধ হইতে ইহকালের প্রতিশোধ কি উত্তম!

—(আশহারু মাশাহীরিল ইসলাম, ৪র্থ খঃ ৭৪৯ পৃঃ)।

খলীফা হযরত আলীর একটি বর্ম পথিমধ্যে পড়িয়া গেলে এক ইহুদী উহা লইয়া যায়। আলী কাজী সুরাইহের নিকট নালিশ দায়ের করেন। কাজী সাক্ষ্য তলব করিলে আলী বলিলেন ঃ আমার কোন সাক্ষী নাই। ইহাতে কাজী খলীফা আলীর বিরুদ্ধে ডিগ্রি দিলেন।[৪]

---

১. মাআরিফে ইবনে কুতাইবা—মুসলমানুঁকা উরুজ—২২ পৃঃ
২. তবকাতে ইবনে সা'দ—মুসলমানুঁকা উরুজ—২১ পৃঃ
৩. ইবনুল আছীর, ৩ খঃ ১৬০ পৃঃ
৪. ইবনুল আছীর—১৬০ পৃঃ

সাধারণ তহবিল সম্পর্কে সতর্কতা

খুলাফায়ে রাশিদীন সাধারণের সম্পদকে সাধারণের পক্ষে আল্লাহ্‌র পবিত্র আমানত বলিয়া মনে করিতেন। এইজন্য ইহার একটি কড়ির পর্যন্ত তাঁহারা প্রাণতুল্য হিফাজত করিতেন এবং অতিশয় সতর্কতার সহিত উহা ব্যয় করিতেন।

যায়েদ বিন আস্‌লাম তাঁর বাবার বরাত্‌ দিয়া বর্ণনা করেন যে, খলীফা উমর একদা আমাকে বলিলেন : তোমাদের যাহার নিকট (সাধারণের) যে যে মাল আছে, তার সামান্য অংশকেও তুচ্ছ মনে করিবে না। কারণ ইহা গোটা জাতির সম্পদ, ইহাতে প্রত্যেকেরই অংশ রহিয়াছে। দুঃখের বিষয়, মানুষ ব্যক্তিগত জিনিসকে তো মনে করে খুব বড়, কিন্তু জাতীয় সম্পদকে মনে করে তুচ্ছ, আর বলে : ইহা আল্লাহ্‌র মাল।[১]

একবার খলীফা উমরের অসুখ হইলে চিকিৎসক মধু ব্যবহার করিতে বলেন। বায়তুলমালে মধু ছিল বলিয়া কেহ উহা হইতে মধু নিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি সাধারণের অনুমতি ব্যতিরেকে মধু নেওয়া খেয়ানত বলিয়া মনে করেন এবং মদীনার মস্‌জিদে দাঁড়াইয়া উহার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন।[২]

এক সময় খলীফা উমর সাহাবী আবদুর রহমান বিন্‌ আওফের নিকট চারিশত দিরহাম (১০০ টাকা) ধার চাহিয়া পাঠাইলেন। আবদুর রহমান বলিলেন : আপনি আমার নিকট ধার চাহিতেছেন, অথচ অপনার হাতে বায়তুলমাল রহিয়াছে উহা হইতে ধার নিয়া পরে ফেরত দিলে কি চলে না? তখন উমর বলিলেন : আমি ভয় করি, হয়তো ইহা পরিশোধের আগে আমার মরণ আসিয়া পড়িবে, পরে তোমরা বলিবে : ইহা খলীফাকে মাফ করিয়া দেওয়া হউক। আর পরকালে আল্লাহ্‌ আমার আমল হইতে উহা কাটিয়া লইবেন। আমি তোমাকে অতি বখিল জানিয়াই তোমার নিকট ধার চাহিতেছি; আমার মরণের পর ত্যাজ্য সম্পত্তি হইতে তুমি উহা নিশ্চয়ই উসুল করিয়া লইবে।[৩]

হারুন বিন্‌ আন্তারা তাঁর পিতার বরাত দিয়া বর্ণনা করেন : ইরাকীদের এক নব বর্ষে রাহবা নামক জায়গায় খলীফা আলীর নিকট গমন করিলাম।

---

১. কিতাবুল আমওয়াল—২৬৮ পৃঃ
২. তবকাতে ইবনে সা'দ
৩. কিতাবুল আমওয়াল—২৬৮ পৃঃ

দেখিলাম, তাঁহার নিকট অনেক চাষী ও বহু দ্রব্যসামগ্রী রহিয়াছে। এসময় তাঁহার চাকর কম্বর আসিয়া বলিলঃ হুযুর, আপনি নিজের জন্য কিছুই করিলেন না, অথচ বায়তুলমালে আপনারও অংশ রহিয়াছে। আপনার জন্য আমি কিছু জিনিস গোপন করিয়া রাখিয়াছি। আলী জিজ্ঞাসা করিলেনঃ সে কি? বলিলঃ আসুন, দেখুন। অতঃপর চাকর তাঁহার হাত ধরিয়া একটি কামরায় লইয়া গেল। দেখিলেন, তথায় একটি থলি ভরিয়া সোনারূপার বাসনপত্র রাখা হইয়াছে। ইহা দেখিয়া আলী বলিলেনঃ কি সর্বনাশ! তুমি আমার ঘরে আগুন ধরাইয়া দিতে চাহিতেছ? ইহার পর তিনি উহা সমস্ত চাষীদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন।[১]

একদা খলীফা আলী বায়তুলমালের খাজাঞ্চী আবূ রাফে'র কন্যাকে বায়তুলমালের একটি মুক্তা পরিতে দেখিয়া বলিলেনঃ এ ইহা কোথায় পাইল? (ইহা তো বায়তুলমালের মুক্তা।) আমি নিশ্চয় ইহার হাত কাটিয়া ফেলিব। আবূ রাফে' আসিয়া বলিলেন, না হুযুর, ইহা সে চুরি করে নাই। আমি নিজেই ইহা তাহাকে দিয়াছি।[২]

উমর বিন্ আবদুল আজিজের স্ত্রী ফাতিমা বলেনঃ উমর বিন আবদুল আজিজ তাঁহার নিজের কাজে তাঁহার নিজের বাতি জ্বালাইতেন।[৩]

স্বজনপ্রীতি ত্যাগ

নখয়ী বলেনঃ একজন লোক খলীফা উমরকে বলিলঃ আপনি কি আপনার ছেলে আবদুল্লাহ্‌কে খলীফা মনোনীত করিয়া যাইবেন না? উমর বলিলেনঃ আল্লাহ্ তোমার সর্বনাশ করুক। কথাটি তুমি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বলিলে না। আমি কি এমন ব্যক্তিকে খলীফা করিয়া যাইব—যে কায়দা মত তালাক দিতে পর্যন্ত সমর্থ নহে? (আবদুল্লাহ্ তাঁহার স্ত্রীকে বেকায়দায় তালাক দিয়াছিলেন।)[৩]

মুহম্মদ বিন্ সীরিন বলেনঃ খলীফা উমরের এক শ্বশুর তাঁহার নিকট বায়তুলমাল হইতে কিছু টাকা চাহিলে উমর তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেনঃ আপনি কি আমাকে একজন আত্মসাৎকারী রাজা

১· কিতাবুল আমওয়াল ২৭১ পৃঃ
২· আল কামেল ৩য় খন্ড···৫৯ পৃঃ
৩· তারীখুল খোলাফা ১০৩ পৃঃ

হিসাবে আল্লাহ্‌র সমীপে হাজির করিতে চান? ইহার পর তিনি নিজ তহবিল হইতে তাঁহাকে টাকা দান করিলেন।[১]

কর্মচারীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

শা'বী বলেন: খলীফা উমর কর্মচারী নিযুক্তিকালে তাঁহার সম্পত্তির তালিকা লিখিয়া রাখিতেন।[২]

ইয়াহ্‌ইয়া বিন্ সাঈদ বলেন: কোন কোন কর্মচারীর অস্বাভাবিক-ভাবে সম্পদ বাড়িতেছে দেখিয়া কবি আমর বিন্ সা'দ একটি কবিতা দ্বারা এদিকে খলীফা উমরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। উমর সন্ধানী মারফত কর্মচারীদের মালের তালিকা চাহিয়া পাঠাইলেন: অথচ কর্ম-চারীদের মধ্যে সা'দ বিন্ ওক্কাস ও আবু হুরায়রাও ছিলেন। অতঃপর উমর তাঁদের অর্ধেক সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া দিলেন।[৩]

মুহম্মদ বিন্ সীরিন বলেন: রাজস্ব কর্মচারী আবু হুরায়রা বাহ্‌রাইন হইতে মদীনা ফিরিলে খলীফা উমর কঠোর ভাষায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন: হে আল্লাহ্‌র শত্রু ও আল্লাহর কিতাবের শত্রু। তুমি কি আল্লাহ্‌র মাল তথা জনসাধারণের তহবিল তসরুফ করিয়াছ? আবু হুরায়রা উত্তর করিলেন: আমি তহবিল তসরুফ করি নাই। উমর বলিলেন: তবে তোমার নিকট এই দশ হাজার দিরহাম (২৫০০ টাকা) কোথা হইতে আসিল? আবু হুরায়রা উত্তর করিলেন: আমার পশুদল বাচ্চা দিয়াছে, লোক আমাকে উপহার দিয়াছে এবং আমার পাওয়া অংশ এই সংগে যুক্ত হইয়াছে। ইবনে সীরিন বলেন: অতঃপর উমর তাঁহার এইসব মাল বাজেয়াপ্ত করিয়া দেন।[৪] (সম্ভবত অর্ধেক মাত্র।)

সম্পদ বিতরণে সমতা

সাধারণের মধ্যে বায়তুলমাল বা সাধারণ তহবিলের সম্পদ বিলি বিতরণের ব্যাপারে খলীফা আবু বকরের নীতি ছিল সমতার; অপর দিকে খলীফা উমরের মত ছিল: পদমর্যাদা অনুসারে বিতরণ করার। ইসলাম প্রচারে যাহাদের দান অধিক, তাহারা অধিক পাইবার যোগ্য এবং যাহাদের দান কম, তাহারা কম পাইবার যোগ্য, লোকের নিকট তাহার

---

১. তারীখুল খোলাফা ৯২ পৃঃ
২. তারীখুল খোলাফা ১৪০ পৃঃ
৩. কিতাবুল আমওয়াল ২৬৯ পৃঃ
৪. কিতাবুল আময়াল ২৬৩ পৃঃ

এই মতই প্রসিদ্ধ। এরপর তিনি খলীফা আবূ বকরের মতের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া দেখা যায়। জানা যায়, খলীফা আলীর মতও ছিল সমতা বিধানের।[১]

এজিদ বিন্ আবূ হুবাইব বলেন : একদা খলীফা আবূ বকর প্রত্যেকের আধা দীনার (সোয়া এক টাকা) করিয়া সাধারণের মধ্যে বায়তুল মালের টাকা সমানভাবে বিতরণ করেন। তিনি আরও বলেন : খলীফা আবূ বকর সাধারণের মধ্যে তাহাদের পদ ও মর্যাদা অনুসারে বিতরণের পক্ষে অনুরোধ পাইয়া বলিয়াছিলেন : তাহাদের পদ ও মর্যাদা আল্লাহ্‌র সমীপে (তাঁহার নিকট উহার প্রতিদান পাইবে), কিন্তু ইহা হইল উপজীবিকা, ইহাতে সমতাই উত্তম।[২]

ইমাম আবূ ইউসুফ লিখিয়াছেন : খলীফা আবূ বকর বায়তুল মালের অর্থ লোকদের মধ্যে সমানভাবে বিতরণ করিলে একদল লোক আসিয়া বলিল : হে রসূলে খলীফা! আপনি এই সম্পদ বিতরণে সমতা করিতেছেন, অথচ লোকদের মধ্যে অনেকে এমন আছেন যাঁদের ইসলামী খেদমত ও পদমর্যদা অধিক। আপনি যদি তাঁদের পদমর্যাদা অনুসারে বিতরণ করিতেন, উত্তম হইতে। ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন : আপনারা যে ইসলামী খিদমত ও পদমর্যাদার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আমার নিশ্চয় জানা আছে। তবে, উহার সওয়াব তাহারা আল্লাহ্‌র সমীপে পাইবেন। এই সম্পদ হইতেছে উপজীবিকা মাত্র, ইহাতে তারতম্য ও প্রভেদ অপেক্ষা সমতাই উত্তম।

কিন্তু খলীফা উমরের আমলে সম্পদের প্রাচুর্য দেখা দিলে তিনি লোকের পদমর্যাদা অনুসারে বিতরণ শুরু করিলেন এবং বলিলেন : যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ ব্যতীত অন্য লোকের সংগে থাকিয়া জিহাদ করিয়াছেন, তাহাকে আমি এমন ব্যক্তির সমান দিতে পারি না যিনি স্বয়ং রসূলুল্লাহ্‌র সংগে থাকিয়া জিহাদ করিয়াছেন। এরপর তিনি মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যাহারা বদরের লড়াইয়ের আগে মুসলমান হইয়াছিলেন—বদরে শরীক হইয়া থাকুক বা না থাকুক, তাঁহাদের প্রত্যেকের জন্য বার্ষিক 8 হাজার দিরহাম (১ হাজার টাকা) করিয়া নির্ধারিত

১· কিতাবুল আমওয়াল ২৪৬ পৃঃ
২· কিতাবুল আমওয়াল ২৬৩ পৃঃ

করিলেন। এবং বদর ও বদরের পরবর্তী মুসলমানদের জন্য ইহা হইতে কম নির্ধারিত করিলেন। অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষকে তার পদমর্যদা বা খেদমত অনুসারে দিলেন। (খারাজ)

এরপর খলীফা উমর তাঁর মত পরিবর্তন করিয়াছিলেন বলিয়া দেখা যায়।

যায়দ বিন্ আস্লাম তাঁর পিতার বরাত দিয়া বর্ণনা করেন যে, খলীফা উমর বলিয়াছিলেন: আগামী বছর পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিলে পরবর্তী লোকদের আমি পূর্ববর্তীদের সমান করিয়া দিব, যাহাতে তাহারা সকলে এক সমান হইয়া যায়।[১]

উমর বিন্ জুর বলেন: আগের উমাইয়া শাসকদের অন্যায়-অবিচারের প্রতিকার করা এবং ন্যায়ের ভিত্তিতে সমভাবে জনসাধারণের মধ্যে সম্পদ বিতরণ করাই ছিল খলীফা উমর বিন্ আবদুল আজিজের সঙ্কল্প।[২]

কর্মচারীদের প্রতি নির্দেশ

খুলাফায়ে রাশেদীন কর্মচারীদের প্রতি সাধুতা, ন্যায়বিচার, জনসাধারণের অভিযোগ শোনা ও উহার প্রতিকার, তাহাদের প্রতি কোমল ব্যবহার ও তাহাদের কল্যাণ কামনা এবং নিজেদের জীবনযাপনে সরলতা অবলম্বন করিতে আদেশ করিতেন। অপরদিকে অসাধুতা, অন্যায়-অবিচার, সাধারণের প্রতি কঠোর ব্যবহার, তাহাদের অভাব অভিযোগের প্রতি অবহেলা দুর্নীতি ও বিলাসিতা প্রভৃতি পরিহার করিয়া চলিতে উপদেশ দিতেন। ইহার ব্যতিক্রমে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিতেন।

খলীফা উমর সকল কর্মচারীর প্রতি নির্দেশ দিয়াছিলেন—কেহ তুর্কী ঘোড়ায় সওয়ার হইবে না, ছাঁকা আটা-ময়দার কোমল রুটি খাইবে না, চিকন কাপড়-চোপড় পরিবে না এবং সাহায্য প্রার্থীদের সম্মুখে দরজা বন্ধ রাখিবে না বা দারোয়ান মোতায়েন করিবে না। ইহার অন্যথা করিলে প্রথমে তোমার, তারপর তাহাদের প্রতি বিপদ আসিবে।[৩]

---

১. কিতাবুল আমওয়াল ২৬৪ পৃঃ
২. কিতাবুল খারাজ ৯ পৃঃ
৩. বায়হাকী, মিশ্কাত

খলীফা উমর বসরার শাসনকর্তা আবূ মূসা আশ'আরীর নিকট এক ফরমানে লিখিয়াছিলেন ঃ সবচেয়ে ভাগ্যবান শাসক সে, যাহার শাসনকল্যাণে তাহার প্রজারা ভাগ্যবান হয়—আর সবচেয়ে হতভাগ্য সেই শাসকই, যাহার শাসনে তাহার প্রজারা ভাগ্যহারা হয়। সাবধান! তুমি বিপথগামী হইলে তোমার সকল কর্মচারীই বিপথগামী হইবে। তখন আল্লাহ্র নিকট তুমি ঐ পশুর ন্যায় হইবে, যে পশু পুষ্ট হইবার লোভে মাঠের সবুজ ঘাস দেখিয়া তথায় যথেচ্ছা বিচরণ করিতে থাকে অথচ পুষ্টিতেই তাহার মৃত্যু রহিয়াছে।[১]

হাসান বলেন ঃ খলীফা উমর আবূ মূসার প্রতি আরও লিখিয়াছিলেন যে ঃ কখনো দিনের কাজ পরবর্তী দিনের জন্য ফেলিয়া রাখিবে না। দিনের কাজ দিনে করার নামই কাজের ক্ষমতা। যখন একদিনের কাজ পরের দিনের জন্য রাখিবে, একসঙ্গে বহু কাজ জড় হইয়া যাইবে, তখন ঠিক করিতে পারিবে না যে, কোন্‌টি প্রথমে করিবে। ফলে সব কাজই নষ্ট হইয়া যাইবে।

তিনি আরও বলেন ঃ

লোক আমীর বা শাসকের উপর নির্ভর করিবে, যখন আমীর নিজে আল্লাহ্র উপর নির্ভর করিবে। আর যখন আমীরই পশুর ন্যায় এদিক-সেদিক বিচরণ করতে থাকিবে, জনসাধারণও এদিক-সেদিক করিতে থাকিবে।

অতঃপর তিনি বলেন ঃ

ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করিতে থাকিবে, যদি ক্ষণিকের তরেও সমর্থ হও।[২]

খলীফা উমর কর্মচারী নিয়োগকালে এ সকল বিষয়ে মুহাজির ও আনসারদের এক দলকে সাক্ষী করিতেন। একদা তিনি আল্লাহ্কে সাক্ষী করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ হে আল্লাহ্! দেশের শাসকমণ্ডলী ও কর্মচারীদের প্রতি তুমি সাক্ষী থাকিও। আমি তাহাদিগকে এ জন্য কাজের জায়গায় পাঠাইয়াছি, যাহাতে তাহারা জনসাধারণকে তোমার দীন ও রসূলের সুন্নত শিক্ষা দেন, সাধারণ সম্পদ সাধারণের মধ্যে বিতরণ করেন আর তাহাদের

১. কিতাবুল খারাজ ৮ পৃঃ
২. কিতাবুল আমওয়াল-৫ পৃঃ

সহিত ন্যায়বিচার করেন ; আর কোন বিষয়ে জটিলতার সৃষ্টি হইলে আমায় জানান।[১]

কর্মচারীদের শাস্তির ব্যবস্থা

খুলাফায়ে রাশেদীন কর্মচারীদের প্রতি যে উপদেশ দিয়া থাকিতেন, উহার ব্যতিক্রম করিতে অথবা কোনরূপ অন্যায় কাজ করিতে দেখিলে তাহাদের প্রতি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিতেন।

খলীফা উমর সকল দায়িত্বশীল কর্মচারীকে হজ্জের সময় মক্কায় হাজির হইতে আদেশ দিয়া রাখিয়াছিলেন। অপরদিকে তাহাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকিলে এ সময় উহা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিতে জনসাধারণকে বলিয়া দিয়াছিলেন। অভিযোগ প্রমাণিত হইলে সকলের সামনে বিবাদীর শাস্তির ব্যবস্থা করিতেন। একবার হজ্জের সময় এক ব্যক্তি কোন এক পদস্থ কর্মচারীর বিরুদ্ধে তাহাকে বিনা অপরাধে একশত কশাঘাত করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ করিলে উমর জনমন্ডলীর সামনে কর্মচারীটিকে একশত কশাঘাত করিতে তাহাকে আদেশ দেন। ইহা দেখিয়া মিসরের শাসনকর্তা আমর বিন আস বলিলেন ঃ ইহাতে কর্মচারিগণ নিরাশ হইয়া যাইবেন। উমর বলিলেন ঃ আমি অপরাধীর শাস্তি দিব না ইহা কখনও হইতে পারে না" এরপর বিবাদী কর্মচারী বাদীকে অর্থ দিয়া রাজী করাইলে উমর তাঁহাকে মাফ করিয়া দেন।[২]

বসরার শাসনকর্তা সাদ বিন্ ওক্কাস লোকের ভীড় দমনের উদ্দেশ্যে নিজ বাড়ীর সামনে দহলিজ প্রস্তুত করাইয়া উহাতে ফটক লাগাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা খলীফা উমরের কানে গেল, তিনি মুহম্মদ বিন মাসলমাকে পাঠাইয়া সঙ্গে সঙ্গে উহা পোড়াইয়া দেন।[৩]

জাজিরার শাসনকর্তা আয়াজ বিন্ গনম চিকন কাপড় পরিতেছেন জানিতে পারিয়া খলীফা উমর মুহাম্মদ বিন্ মাসলমাকে নির্দেশ করিলেন ঃ তাহাকে যেখানে যে অবস্থায় পাইবে সে অবস্থায় নিয়া আসিবে। মুহাম্মদকে দেখিয়া আয়াজ পোশাক বদলাইতে চাহিলেন কিন্তু সুযোগ দেওয়া হইল না। ইহার পর উমরের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে চটের জামা পরাইয়া

১· কিতাবুল খারাজ—৮ পৃঃ
২· আল্ ফারুক ২য় খন্ড—২৭ পৃঃ
৩· মুহাজিরীন ১ম খন্ড, ১৪৭ পৃঃ

দিয়া বলিলেন ঃ যাও এই ছড়ি নিয়া তোমার বাবার ন্যায় মেষ চরাইতে থাক। আয়াজ কাতরকণ্ঠে ক্ষমা চাহিলে উমর আবার তাহাকে কাজে বহাল করেন।[১]

সমালোচনার অধিকার

খোলাফায়ে রাশেদীন জনসাধারণকে শুধু যে সমালোচনার অধিকার দিয়াছেন তাহা নহে বরং সমালোচনা না-করাকে জনসাধারণের কর্তব্যে অবহেলা বলিয়া মনে করিতেন।

খলীফা আবু বকর তাঁহার ঘোষণায় বলিয়াছেন ঃ "আমি ভাল কাজ করিলে আমার সহায়তা করিবে, আর বিপথগামী হইলে আমায় পথ দেখাইবে।[২]

কায়স বলেন, খলীফা আবু বকর এ সম্পর্কে ইহাও বলিয়াছিলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ মানুষ যখন কোন অন্যায় কাজ করা হইতেছে দেখিয়া বাধা না দেয়, তখন আল্লাহ্ ব্যাপকভাবে সকলকে শাস্তি দেন।[৩]

হাসান বসরী বলেন ঃ এক ব্যক্তি খলীফা উমরকে বার বার বলিতে লাগিল আল্লাহ্কে ভয় করুন! আল্লাহ্কে ভয় করুন!! ইহা শুনিয়া অপর ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, ক্ষান্ত হও। স্বয়ং খলীফাকে তুমি অধিক কথা বলিতেছ। উমর তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন ঃ তাহাকে বলিতে দাও। তাহাদের কল্যাণ নাই যদি আমাদের না বলে, আর আমাদেরও কল্যাণ নাই যদি আমরা না শুনি। অবশ্য কেহ অন্যায় বলিলে উহা তাহাতে বর্তাইবে।[৪]

খলীফা উমর একবার বক্তৃতা করিতে দাঁড়াইয়া লোকের উদ্দেশে বলিলেন ঃ আমার কথা শুন। এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল আপনি প্রথমে বলুন, বায়তুলমাল হইতে আমরা সকলে এক একটি কাপড় পাইলাম, আর আপনি দুইটি পাইলেন কোথায়? তবেই আমরা আপনার কথা শুনিব। উমর অম্লান বদনে উত্তর করিলেন ঃ আমার ছেলে আবদুল্লাহ্ তাহার অংশ আমাকে দান করিয়াছে।

---

১. কিতাবুল খারাজ, ৬৭ পৃঃ
২. কিতাবুল আমওয়াল ৪ পৃঃ
৩. কিতাবুল খারাজ ৬ পৃঃ
৪. কিতাবুল খারাজ ৭ পৃঃ

খলীফা উমর ইহাও বলিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি আমার দোষগুলি আমার নিকট প্রকাশ করিবে সে আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি।[১]

অ-মুসলিম নাগরিকদের প্রতি ব্যবহার

খলীফা উমর তাঁহার ওফাতের আগে একদিন ইরাকের রাজস্ব নির্ধারণ-কারী হুজাইফা বিন্ ইয়ামন ও উসমান বিন্ হুনাইফকে জিজ্ঞাসা করিলেন: দেখ, কোন ভূমির উপর তাহাদের শক্তির অতিরিক্ত খেরাজ (অ-মুসলিমদের উপর নির্ধারিত ভূমি-কর) নির্ধারণ কর নাই তো? উসমান বলিলেন: "যাহা করিয়াছি তাহার দুইগুণ করা হইলেও নিশ্চয় তাহারা আদায়ে সমর্থ।" হুজাইফা বলিলেন: "যাহা করা হইয়াছে, তাহার অনেক বেশী তাহাদের জন্য রাখা হইয়াছে।"[২]

একদা খলীফা উমরের নিকট প্রচুর পরিমাণে জিজিয়া (অ-মুসলিমদের প্রতি নির্ধারিত দেশরক্ষা কর) হইতে পাওয়া মাল উপস্থিত করা হইলে তিনি কর্মচারীদের বলিলেন: আমার মনে হয়, তোমরা তাহাদের সর্বনাশ করিয়াছ। কর্মচারিগণ উত্তর করিলেন: না, আমরা কাহাকেও কষ্ট না দিয়াই ইহা উসুল করিয়াছি। উমর বলিলেন: মারধর করা ব্যতীত? তাহারা বলিল: হাঁ মারধর করা ব্যতীত। অতঃপর তিনি তাহার অধীনে যে কাহাকেও কষ্ট দেওয়া হইতেছে না, তজ্জন্য আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করিলেন।[৩]

খলীফা হযরত আলী উক্‌বরায় নিযুক্ত তাহার কর্মচারীকে বলিয়াছিলেন: দেখ, খেরাজের জন্য কখনো তাহাদের (অ-মুসলিমদের) গরু, মহিষ বা শীতগ্রীষ্মের পোশাক ক্রোক করিবে না, তাহাদের প্রতি কোমল ব্যবহার করিবে। কোমল ব্যবহার করিবে!! কোমল ব্যবহার করিবে!!! যে ইহার ব্যতিক্রম করিবে সে অপসারিত হইবে।[৪]

খলীফা উমর বিন্ আবদুল আজিজ কুফার শাসনকর্তা আবদুল হামিদকে এক ফরমানে লিখিয়াছিলেন: আগের অত্যাচারী শাসকদের অত্যাচারে কুফার জনগণ জর্জরিত হইয়া গিয়াছে অথচ ন্যায়বিচার

---

১. তারীখুল খোলাফা ৯২ পৃঃ
২. কিতাবুল আওয়াল ৪০ পৃঃ
৩. তাবারী ৮ম খণ্ড ১০১ পৃঃ
৪. কিতাবুল আমওয়াল ৪৬ পৃঃ

ও ভাল ব্যবহারের উপরই দীনের ভিত্তি রচিত হইয়াছে। অতএব প্রথমে ভূমির তারতম্য ঠিক করিবে, অনাবাদী ভূমির খেরাজ আবাদী ভূমি হইতে অথবা আবাদী ভূমির খেরাজ অনাবাদী ভূমি হইতে উসুল করিবে না। তাছাড়া উসুলের ব্যাপারে তাহাদের সহিত কোমল ব্যবহার করিবে। তাহাদের নিকট হইতে কোন প্রকার আবওয়াব বা চরি দস্তরী আদায় করিবে না।[১]

দায়িত্ববোধ

খুলাফায়ে রাশিদীন জনসাধারণের অভাব-অভিযোগের জন্য নিজ-দিগকেই দায়ী বলিয়া মনে করিতেন। অতএব তাহাদের অভাব-অভি-যোগ শোনা ও উহার প্রতিকারের জন্য তাঁহারা সর্বদা যত্নবান থাকিতেন। রাজ্যের নানাদিকে গোমস্তা পাঠাইয়া জনগণের অবস্থা এবং কর্মচারীদের ব্যবহার সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হইতে চেষ্টা করিতেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা নিজেরাও রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে সফর করিতেন। এমন কি রাত্রি বেলা রাজধানীতে তাঁহারা প্রায়ই ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং সুযোগ পাইলে অনাথ-অসহায়দের কাজ নিজ হাতে করিয়া দিতেন।

খলীফা হযরত আবু বকর খলীফা হওয়ার আগে এক এতীম বালিকার 'বক্‌রী দোহাইয়া দিতেন, তিনি খলীফা হইয়াছেন শুনিয়া বালিকা দুঃখ করিয়া বলিলঃ এখন আমার বক্‌রী দোহাইয়া দিবেন কে? ইহা শুনিয়া খলীফা আবু বকর বলিলেনঃ চিন্তা করিবে না, খলীফা হওয়াতে আমার দায়িত্ব বাড়িয়াছে, কমে নাই। ইহার পর তিনি আগের মত তাহার বক্‌রী দোহাইতে থাকেন।[২]

হযরত উমর মদীনার একটি অন্ধ অসহায় বুড়ির বাড়ীতে কাজ করিয়া দিতেন। একবার উমর দেখিলেনঃ এক অজানা ব্যক্তি তাঁহার আগের রাত্রে বুড়ির মশক পুরিয়া ও কাজ করিয়া দিয়া যায়। হযরত উমর

১. তাবারী, ৮ম খণ্ড, ১৩৯ পৃঃ।

২. তারীখুল খোলাফা, ৫৯ পৃঃ।

রাত্রে তাহার খোঁজে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিলেন ঃ সে ব্যক্তি আর কেহ নহেন। তিনি হইতেছেন খলীফা আবু বকর নিজে।[১]

ইহা সত্ত্বেও খলীফা আবু বকর বলিলেন হায়! আমি যদি মানুষ না হইয়া ঘাস হইতাম, আর মেষ বকরী আমায় খাইয়া যাইত অথবা গাছ হইতাম—যাহা কাটিয়া জ্বালানি কাষ্ঠ করা হইত। হায়! আমার এ দায়িত্ব যদি অন্য কেহ গ্রহণ করিত!![২]

খলীফা উমর লোকের অবস্থা জানিবার উদ্দেশ্যে রাত্রে প্রায় মদীনার গলি গলি ও মহল্লা মহল্লা ঘুরিয়া বেড়াইতেন। একবার রাত্রিকালে এক বিধবার ছেলে-মেয়েকে খাদ্যাভাবে ক্ষুধায় কাঁদিতেছে দেখিয়া বায়তুলমাল হইতে আটার বোঝা নিজ কাঁধে বহিয়া বিধবার বাড়ী পৌঁছাইয়া দেন। খলীফার এক সহচর বোঝা বহন করিতে চাহিলে তিনি বলেন ঃ একের গুনার বোঝা অপরে বহন করিবে না।[৩]

খলীফা উমর সাধারণের অবস্থা অবগত হওয়ার জন্য মদীনা ও তার আশ-পাশের মহল্লায় রাত্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, অথচ ইহাকে তিনি যথেষ্ট বলিয়া মনে করিতেন না। তিনি একবার বলিলেন ঃ আমি যদি বাঁচিয়া থাকি, তবে ভবিষ্যতে (ইন্‌শাআল্লাহ্) পুরা বছর সারাটা দেশ রাত্রে বেড়াইব। কেননা আমি জানি—সব প্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও সাধারণের কোন কোন প্রয়োজন পুরা হইতেছে না। কারণ সে সব সংবাদ আমার নিকট পৌঁছাইতেছে না। হয়তো কর্মচারিগণ সে সবের সংবাদ আমার নিকট পৌঁছাইতেছেন না। এইজন্য আমি দুই মাস মিসরে, দুই মাস বাহরাইনে, তদ্রূপ কুফা ও বসরাতে সফর করিব।

(তবরী—ইসলাম কা ইকতেসাদী নেজাম, ৯৬)

খলীফা উমর উটের পিঠের ঘায়ে হাত দিয়া বলিতেন ঃ এই সম্পর্কেও পরকালে আমায় প্রশ্ন করা হইবে বলিয়া ভয় হইতেছে।[৪]

এ সকল সত্ত্বেও উমর বলিতেন ঃ হায়! উমরের মাতা যদি উমরকে প্রসবই না করিতেন অথবা উমর ঘাস হইত আর তাহাকে পশু খাইয়া নিত![৫]

---

১. তারীখুস খোলাফা, ৭৫ পৃঃ।
২. তারীখুল খোলাফা।
৩. তারীখুল খোলাফা, ৭৭ পৃঃ।
৪. তারীখুল খোলাফা, ৯২ পৃঃ।
৫. তারীখুল খোলাফা।

খলীফা উমর বিন আবদুল আজিজের স্ত্রী ফাতেমা বলেন : একদা উমর তাঁহার দৈনিক কাজ শেষ করিয়া সন্ধ্যায় ঘরে ফিরলেন এবং নিজের বাতি (সরকারী নহে) জ্বালাইয়া দুই রাকাত নামায পড়িলেন, পরে মাথা নীচু করিয়া চিন্তায় ডুবিয়া গেলেন। আর তাঁর দুই চোখ হইতে পানি বহিয়া চলিল। এভাবে তিনি সারা রাত্র কাটাইলেন এবং সকালে উঠিয়া রোযা রাখিলেন। আমি এইরূপ চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন : জনসাধারণের গুরু দায়িত্ব আমার ঘাড়ে চাপান হইয়াছে অথচ এই বিশাল রাজ্যের কোথাও হয়ত এমন মুসাফির রহিয়াছে, যে রাত্রি যাপনের জন্য কোথাও আশ্রয় পায় নাই। অনেক গরীব-মিসকিন রহিয়াছে, যাহারা নিজেদের অভাব পুরা করিতে না পারিয়া অতিশয় কষ্টে দিনাতিপাত করিতেছে অথবা বন্দীখানায় হয়ত এমন কোন বন্দী রহিয়াছে যাহার প্রতি সুবিচার করা হয় নাই অথচ আমি জানি আল্লাহ্ আমাকে এ সকল বিষয় নিশ্চয় প্রশ্ন করিবেন এবং হযরত (সঃ) ইহাদের পক্ষ সমর্থন করিয়া আমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবেন। তখন আমার কি উপায় হইবে? ইহার পর তিনি বলেন : হায়, যদি আমার ও এই শাসনভারের মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্ব হইত।

তাঁহার স্ত্রী আরও বলেন যে, নারী-পুরুষের চরম আনন্দ উপভোগের সময়ও যখন তাঁহার এ দায়িত্বের কথা স্মরণ হইত, তখন তিনি পানিতে পতিত চড়াইয়ের ন্যায় ছটফট করিতেন।[১]

খুলাফায়ে রাশিদীনের কর্মচারী

খুলাফায়ে রাশিদীন যে সকল গুণের অধিকারী ছিলেন, তাঁহাদের কর্মচারীদের মধ্যেও সে সকল গুণ প্রতিফলিত হইয়াছিল। খলীফা হযরত উমর আবদুল আজিজ সত্যই বলিয়াছেন : খলীফা হইতেছেন বাজারের ন্যায়; বাজারে যে সকল জিনিসের চাহিদা থাকে, সে সকল জিনিসই আসিয়া থাকে।

হযরত আবু উবাইদা

হযরত আবু উবাইদা খলীফা হযরত উমর (রাঃ)-এর সময় (বর্তমান সিরিয়া, ফিলিস্তান, জর্ডান) শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি মোটা ও খসখসে

১. কিতাবুল খারাজ, ৯ পৃঃ।

পশমী পোশাক ব্যবহার করিতেন এবং নিতান্ত সাধারণ বেশে চলিতেন। তাঁহাকে অনুরোধ করা হইয়াছিল ঃ আপনি শামের ন্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশের শাসনকর্তা, অপরদিকে শত্রুরা আমাদের পাশে রহিয়াছে। অতএব আপনার এই পোশাক পরিবর্তন করিয়া উত্তম পোশাক ব্যবহার করা উচিত। ইহার উত্তরে তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ্‌র সময়ে যে ধরনের পোশাক পরিধান করিতাম, তাহার আমি কখনও বতিক্রম করিব না।"[১]

খলীফা উমর যখন জেরুজালেমের খৃস্টানদের সহিত সন্ধিপত্রে দস্তখত করার উদ্দেশ্যে শাম গমন করেন, আবূ উবাইদা আরবের সেই সাধারণ বেশেই তাঁহার সহিত মোলাকাত করেন—পরিধানে মোটা পোশাক, সওয়ারীতে উট—(তুর্কী ঘোড়া নহে) যাহার বল্গা ছিল খেজুর পাতার তৈরী)। খলীফা তাঁহার (আবূ উবাইদার) ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, সেখানে আরও সাধারণ ভাব—ঢাল, তলোয়ার এবং উটের জিন ছাড়া বিলাসের কোন সামগ্রীই তথায় নাই। ইহা দেখিয়া উমর বলিলেন ঃ আবূ উবাইদা আবশ্যক সামান রাখিলে কেন? উত্তরে বলিলেন ঃ ইহাই আমার জন্য যথেষ্ট।[২]

ইহার পর একবার খলীফা উমর তাঁহার জন্য চারিশত দিনার (১০০০·০০) ও চারি হাজার দিরহাম (১০০০·০০) পুরস্কার পাঠাইলেন, কিন্তু আবূ উবাইদা সমস্ত অর্থই সৈনিকদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন। ইহা শুনিয়া উমর বলিলেন ঃ আল্লাহ্‌র শোকর, ইসলামে এইরূপ ব্যক্তিও বর্তমান রহিয়াছেন।[৩]

হযরত আবূ মূসা আশ'আরী

হযরত আবূ মূসা আশ'আরী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অভিযানের সরদারী এবং বিভিন্ন প্রদেশের শাসনভার লাভ করেন। কিন্তু সব সময় তিনি অত্যন্ত সরলভাবে জীবন যাপন করেন। বিলাসিতা বা গর্ব তাঁহাকে কখনও পরশ করিতে পারে নাই। তিনি ধন জমানো বা সম্পদ অর্জনের বহু সুযোগ লাভ করিয়াও তাহা করেন নাই। একদা নামকরা সাহাবী আবূ জর গিফারীর সহিত মোলাকাত হইলে

১. মারূজুজ জাহাব, ১ম খণ্ড, ৪১৮ পৃঃ।
২. ইসাবা, ৪র্থ খণ্ড, ১২ পৃঃ।
৩ তবকাতে ইবনে সা'দ, ১ম খণ্ড, ২য় ভাগ, ৩০১ পৃঃ।

তিনি আবু জরকে 'ভাই ভাই' বলিয়া জড়াইয়া ধরিতে চাহিলেন। কিন্তু আবু জর এই বলিয়া তাঁহাকে সরাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন ঃ এই পদ গ্রহণের আগে তুমি আমার ভাই ছিলে, এখন তুমি আমার ভাই নও। আবার সাক্ষাৎ হইলেও তিনি তাহার সহিত সেইরূপভাবে আলিঙ্গন করিতে চাহিলেন। কিন্তু আবু জর বলিলেন ঃ প্রথমে তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, পরে আলিঙ্গন করিবে।

ঃ তুমি শাসক নিযুক্ত হইয়াছিলে তো? বলিলেন : হ্যাঁ।

ঃ তবে তুমি দালান প্রস্তুত, কৃষি জমি গ্রহণ অথবা পশু পালন—এই সব কিছু কর নাই তো?

তিনি উত্তর করিলেন ঃ না কিছুই করি নাই।

ইহা শুনিয়া আবু জর তাঁহাকে আন্তরিকতার সঙ্গে আলিঙ্গন করিলেন।[১]

ইস্তিয়াব কিতাবে ইহাও রহিয়াছে যে, হযরত আবু মূসা গভর্নর হওয়া সত্ত্বেও চাটাই বুনিয়া জীবিকা চালাইতেন।[২]

হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)

হযরত সালমান ফার্সী খলীফা উমরের আমলে মাদায়েনের গভর্নর ছিলেন অথচ তিনি মোটা পশমী পোশাক পরিধান করিতেন; জিন ব্যতীত গদীর উপর গাধায় সওয়ার হইতেন। তিনি ময়দার কোমল রুটি খাইতেন না। মাদায়েনে তাঁহার মরণকালে তাঁহাকে কাঁদিতে দেখিয়া সা'দ বিন ওক্কাস তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলিয়াছেন ঃ কেয়ামতের মাঠে এমন একটি ঘাঁটি রহিয়াছে যাহা গরীব লোক ব্যতীত অন্যে অতিক্রম করিতে পারিবে না। আর আমার পাশে এত দ্রব্য-সামগ্রী রহিয়াছে। অথচ তাঁহার ঘরে একটি দোয়াত, একটি বাটি ও একটি খাট ভিন্ন সা'দ কিছুই দেখিলেন না।[৩]

হযরত সাদ বিন আমর (রাঃ)

খলীফা উমরের কালে তিনি হিম্সের শাসনকর্তা ছিলেন। একবার হিম্সবাসিগণ তাঁহার বিরুদ্ধে খলীফার নিকট কয়েকটি অভিযোগ পেশ করেন। খলীফা তাঁহাকে মদীনায় তলব করিলেন এবং হিম্সবাসীকে তাঁহার

১. তবকাতে ইবনে সাদ, মুহাজিরীন, ১ম খণ্ড, ৩২৫ পৃঃ।
২. উসওয়ায়ে সাহাবা, ১ম খণ্ড, ৩৩০ পৃঃ।
৩. মাসউদী, ১ম খণ্ড, ১১৮ পৃঃ।

উপস্থিতিতে অভিযোগ আবার বর্ণনা করিতে বলেন। তাঁহারা বলিলেন : (ক) অনেক বেলা হওয়া ব্যতীত তিনি দরবারে আসেন না (খ) রাতে তিনি কাহারও ডাকে সাড়া দেন না এবং (গ) প্রতি মাসে একদিন তিনি দরবারে বসেন না।

উমর তাঁহার নিকট ইহার উত্তর চাহিলেন। সা'দ বলিলেন :

(ক) আমার ঘরে চাকর নাই, আমি নিজেই রুটি তৈরিতে আমার স্ত্রীর সাহায্য করি। অতএব দরবারে আসিতে সামান্য গৌণ হয়।

(খ) ইহা প্রকাশ করা আমি পছন্দ করি না, তবে বাধ্য হইয়া বলিতেছি : দিনকে আমি জনগণের জন্য ওয়াকফ করিয়াছি এবং রাত্রকে আল্লাহ্‌র জন্য রাখিয়াছি।

(গ) আমার চাকর না থাকায় প্রতি মাসে একবার আমি নিজে আমার কাপড় কাচি, তাই সেদিন দরবারে বসিতে পারি না।

এরপর উমর তাঁহার নিকট এক হাজার দীনার পাঠাইয়া বলিলেন : ইহা তুমি নিজে আবশ্যক কাজে ব্যয় কর। ইহা দেখিয়া তাঁহার স্ত্রী বলিলেন : এবার আল্লাহ্ আমাদিগকে আপনার দ্বারা ঘরের কামকাজ হইতে মুক্তি দিলেন। সা'দ (রাঃ) বলিলেন : তাহা হইলে কি ইহা আমাদের চাইতে অভাবীদের দেওয়া হইবে না? স্ত্রী বলিলেন : তাহাই হউক। এরপর তিনি ইহা কতক পৃথক পৃথক থলিতে পুরিয়া এক বিশ্বস্ত ব্যক্তির মারফত এতিম ও দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন। কেবল সামান্য অংশ স্ত্রীর হাতে দিয়া বলিলেন : তুমি ইহা কাজে লাগাইতে পার। ইহার পর তিনি আগের মত ঘরের কাজে লাগিয়া গেলেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার স্ত্রী বলিলেন : এই সামান্য অর্থ দ্বারা একটি চাকরের বন্দোবস্ত করিলেই ভাল হয়। সা'দ বলিলেন : এত তাড়াতাড়ি খরচ করিয়া ফেলা সঙ্গত নহে। হয়তো তোমা অপেক্ষা অধিক বিপদগ্রস্ত লোকও আসিয়া পৌঁছিতে পারে।[১]

খুলাফায়ে রাশিদীন যে আদর্শ কায়েম করিয়াছেন তাহা তাঁহাদের ব্যক্তিগত চরিত্রগুণে নহে বরং ইসলামের আদেশক্রমেই করিয়াছেন। ইহাতে কি বুঝা যায় না যে, ইসলামের কোন বিধান বা নীতির অভাব নাই—অভাব রহিয়াছে বিধানকে কার্যকরী করা ও প্রচার করার লোকের। আল্লাহ্ ও ইসলামে বিশ্বাসী মুসলমানেরা ইসলামী বিধি-বিধানকে কার্যকরী করার কাজে ও ইসলামী আদর্শ প্রচারে আত্মনিয়োগ করিলে দুনিয়া সমস্ত সংকট হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে।

---

১. মাস্‌উদী, ৪১৮ পৃঃ।

কুরআনের উত্তরাধিকার আইন ও সোভিয়েত রাশিয়া

আবুল কাসেম

অনেকে প্রশ্ন করে বসেন: উত্তরাধিকার আইন অযৌক্তিক। সন্তানেরা বাপের বা অন্যান্য কুটুম্বের সম্পত্তি বসে খাবে—তা কোনমতেই যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না। অথচ কুরআনে স্পষ্টভাবে উত্তরাধিকার আইনকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং সে নীতি এ যুগে অচল ইত্যাদি।

প্রশ্নকর্তারা বুঝতে পারেন না যে, মানব জাতি পূর্ব-পুরুষদের নিকট হতে উত্তরাধিকারসূত্রে গায়ের রং, শরীরের কাঠামো, মেজাজ, বহু রোগ ইত্যাদিই শুধু পায় না, অতীতের অনেক সাধনা, জ্ঞান, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, ঘরবাড়ী, চারু-শিল্প প্রভৃতি সব কিছুই কমবেশী উত্তরাধিরারসূত্রে লাভ করে থাকে। অতীতের সভ্যতা ও জ্ঞানের সঙ্গে প্রত্যেক নতুন যুগের মানুষদের অবিচ্ছেদ্য সংযোগ রয়েছে। কোন যুগের লোকই অতীত হতে বিচ্ছিন্ন নয়। প্রতিটি যুগের লোককে যদি নতুন করে কৃষিবিদ্যা ও শিল্প-কারখানার যন্ত্রাদি আবিষ্কার করতে হত তা হলে সভ্যতার অগ্রগতি মোটেও সম্ভবপর হত না। শুধু তাই নয় উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তি ইত্যাদি না পেলে— সে আত্মীয়ের হউক বা রাষ্ট্রের হউক—শৈশব ও বাল্যাবস্থায় জীবন ধারণ ও জ্ঞান আহরণও অসম্ভব হয়ে দাঁড়াত। আমাদের পূর্বপুরুষদের জ্ঞান ও শ্রমের ফল আমরা ভোগ করব, আমাদের ফল পরবর্তীরা ভোগ করবে—ইহাই সৃষ্টির নিয়ম। এমন কি পূর্ব-পুরুষদের অপকীর্তির ফলও আমাদের ভোগ করতে হয়। কবে কখন বাংলার আগ্‌পুরুষ মিরজাফরের দল বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল—তার ফল ভোগ করতে হয়েছে যুগ যুগ ধরে পরবর্তী আমলের জনসাধারণকে।

অবাস্তব চিন্তা অযৌক্তিক। যারা উত্তরাধিকারকে নস্যাৎ করতে চান, তারা অবাস্তব চিন্তাই করেন। এদের অনেকে আবার নাস্তিক দেশগুলির নজির দিয়ে বলে থাকেন—ওখানে তো উত্তরাধিকার আইন নাই।

ইহা মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। রাশিয়াতে তো উত্তরাধিকার আইন আছেই—তা ছাড়া চীন, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, পোলাণ্ড প্রভৃতি প্রত্যেকটি দেশেই উত্তরাধিকার আইন বর্তমান রয়েছে। রাশিয়ায় যে উত্তরাধিকার আইন চালু আছে তজ্জন্য নীচের তোলা উদ্ধৃতিগুলোই যথেষ্ট।

১৯৪৭ সনের ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে সংশোধিত সোভিয়েত রাশিয়ার গঠনতন্ত্রের [মস্কো সংস্করণ ১৯৪৭—১৫ পি] ১০ম ধারার শেষের দিকে আছে ঃ

"ব্যক্তিগত সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের জন্য আইনের দ্বারা সংরক্ষিত করা হয়েছে।"

In the Land of Socialism নামক পুস্তকে (see Indian Reprint 1948 Published by International Publishing House, Calcutta) বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

"ব্যক্তিগত সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে হস্তান্তরযোগ্য। সোভিয়েত আইন অনুযায়ী স্ত্রী, পুরুষ, বয়স, জাতি, সামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে উত্তরাধিকার লাভের অধিকারী। যে কোন পরিমাণ সম্পত্তি উত্তরাধিকার হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। যখন কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে তাঁর সম্পত্তি যত বড়ই হউক না কেন তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে চলে যায়। ১৯৪২ সনে উত্তরাধিকার-ট্যাক্স বসানো হয়েছিল সত্য, কিন্তু সেই বছরই তা বাতিল করে দেওয়া হয়। এবং সেই হতে এ পর্যন্ত কোন রকমের ট্যাক্স বা কর বসানো হয় নাই।"

"সোভিয়েত আইনে তিন স্তরের উত্তরাধিকারী আছে।"

"প্রথম স্তরে স্ত্রী (বা স্বামী), সন্তান (পোষ্য সন্তানসহ) এবং (অসমর্থ) মাতা-পিতা।"

"দ্বিতীয় স্তরে আছে ঃ সমর্থ মাতা-পিতা। মৃতের স্ত্রী (বা স্বামী) কিংবা সন্তানাদি না থাকলে এই সমর্থ মাতা-পিতার কাছে সম্পত্তি (estate) চলে যায়।

"তৃতীয় স্তরে আছে ঃ ভাই ও ভগ্নীরা। প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের উত্তরাধিকার না থাকলে এই তৃতীয় স্তরের উত্তরাধিকারীরা সম্পত্তির অধিকারী হবে।

'বিজ্ঞান-সমাজ-ধর্ম'

সম্বন্ধে
বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সমালোচক অধ্যাপক সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়ের
অভিমত[১]

প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম আমাদের সুধী সমাজে স্বল্প পরিচিত নন। এক কালের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক আবুল কাসেম এ দেশের সেই সব মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে একজন, যিনি এদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি অঙ্গনে প্রায় চল্লিশ বছর ধরে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে এসেছেন। ইসলামী ধর্মীয় আদর্শের চেতনা-পুষ্ট আবুল কাসেমের চিন্তা ও কর্মে বিজ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে শ্রেয়ঃবোধের এক আশ্চর্য সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। তাই যাঁরা তাঁর কর্মপন্থার সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করেন নি, তাঁরাও তাঁর চিন্তা ও কর্মের ঐ বৈশিষ্ট্যকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে নিয়েছেন। এদেশে ধর্মীয় আদর্শ-চেতনা পুষ্ট এক সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর বিজ্ঞানবুদ্ধিই সে আন্দোলনের প্রকাশ-মাধ্যমরূপে বাংলা ভাষাকে গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাই দেখি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগে রাজনৈতিক মতাদর্শে সমকালীন শাসকগোষ্ঠীর মতাদর্শ থেকে যথেষ্ট দূরে অবস্থান না করেও অধ্যাপক আবুল কাসেম তাদের অপরিণামদর্শী ভাষানীতির তীব্র সমালোচক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে তাঁর ভূমিকার বলিষ্ঠতার কথা তাঁর বিরোধী পক্ষের লোকেরা আজও অকপটে স্বীকার করেন। ভাষা-আন্দোলন তাঁর কাছে নিছক আবেগের বস্তু ছিল না। তাই সরকার কর্তৃক বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দানের সঙ্গে সঙ্গেই আবুল কাসেম সাহেবের ভাষা আন্দোলন শেষ হয়নি। তিনি এদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিগন্তে বাংলা ভাষার বাস্তব ভূমিকা সম্পর্কে তখন থেকেই বিচিত্র ভাবনা ভাবতে শুরু করেছিলেন। সেই ভাবনারই ফলশ্রুতিরূপে একদিকে তিনি বাংলা ভাষাকে উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমরূপে

---

১ প্রয়াত অধ্যাপক সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়ের এই সমালোচনামূলক অভিমতটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকায় ১৯৮৩ সনে তেইশ বর্ষ ১ম সংখ্যায় সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।

প্রতিষ্ঠার জন্য বিচিত্র কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন—অন্যদিকে ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতি সম্পর্কে আপনার বিচিত্র ভাবনা বাংলা ভাষায় প্রকাশের বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। পেশাগতভাবে বিজ্ঞানের শিক্ষক হলেও আবুল কাসেম সাহেবের কর্মকাণ্ড কোন দিনই বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। গোটা দেশের মন ও মানসের পরিপুষ্টি বিধানের মহৎ লক্ষ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে তিনি জ্ঞান-চিন্তার বিভিন্ন দিগন্তে ব্যাপক অন্বেষা চালিয়েছেন জীবন-ভর। তাই দেখি তাঁর বিজ্ঞান-চিন্তা সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, ধর্ম ও দর্শন-চিন্তার বিরোধী না হয়ে সব-সময়ই পরিপূরক শক্তি হয়ে দেখা দিয়েছে। আবুল কাসেম আদর্শবাদী মানুষ। ধর্মীয় মূল্যবোধে পরিপুষ্ট অথচ বিজ্ঞান-বুদ্ধিতে আস্থাশীল। তাই তাঁর বক্তব্যে বিশেষ আদর্শ ও বিশ্বাসের অনুরঞ্জন থাকলেও তাতে যুক্তির সমর্থনের অভাব কোথাও ঘটেনি। আর ঐ কারণেই ভিন্নমত পোষণ করেও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর বক্তব্য শ্রবণ করা যায়।

সাম্প্রতিককালে ঢাকা ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত তাঁর 'বিজ্ঞান-সমাজ-ধর্ম' শীর্ষক গ্রন্থটি পড়তে গিয়ে এ কথাই আমার মনে বার বার উদিত হয়েছে। গ্রন্থের নামটি আমাদের মনে যে ধরনের চিন্তার দ্যোতনা সৃষ্টি করে, তার চেয়েও প্রকৃতপক্ষে ব্যাপকতর চিন্তার পরিধি নিয়েই এটি আমাদের কাছে হাজির হয়েছে।

আগেই বলেছি, 'বিজ্ঞান-সমাজ-ধর্ম' নামাঙ্কিত গ্রন্থে লেখকের চিন্তারাজি নানা বিষয়কে আশ্রয় করে উচ্ছ্রিত হয়ে উঠেছে। মননের পথ পরিক্রমায়, যাঁদের আগ্রহ রয়েছে, তাঁরা এ গ্রন্থে একাধারে ধর্মদর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, রাষ্ট্রনীতি ও সমাজ-চিন্তার বিচিত্র দিগন্তের উপস্থিতি লক্ষ্য করবেন। তাই ধৈর্য ধরে বইটি পাঠ করলে নানা বিষয়ক জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা লেখকের মন ও মানসের ঐশ্বর্যের সন্ধান পাবেন—এ কথা প্রত্যয়ের সঙ্গেই বলতে পারি। মোট আটটি বিভিন্ন পর্যায়ে লেখক এ গ্রন্থে তাঁর বিচিত্র চিন্তাভাবনা উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন। সে পর্যায়গুলো হল: 'বিজ্ঞান', 'সমাজ ও বিজ্ঞান', 'দর্শন ও বিজ্ঞান', 'সমাজ ও ধর্ম', 'সাহিত্য ও ধর্ম', 'সমাজ ও নারী', 'কুরআনিক অর্থনীতি' এবং 'ইসলামী রাষ্ট্রনীতি'। 'বিজ্ঞান' পর্যায়ে দুটি, 'সমাজ ও বিজ্ঞান' পর্যায়ে তিনটি, 'দর্শন ও বিজ্ঞান' পর্যায়ে পাঁচটি, 'সমাজ ও ধর্ম' পর্যায়ে পাঁচটি, 'সাহিত্য ও ধর্ম' পর্যায়ে দুটি, 'সমাজ ও নারী' পর্যায়ে একটি, 'কুরআনিক অর্থনীতি' পর্যায়ে আটটি এবং 'ইসলামী রাষ্ট্রনীতি' পর্যায়ে চারটি, —মোট ত্রিশটি নিবন্ধ এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রতিটি নিবন্ধে লেখক বক্তব্যকে বিজ্ঞানীসুলভ পরিমিতি

ও স্পষ্টতা দানের ক্ষমতার অভ্রান্ত স্বাক্ষর রেখে দিয়েছেন। ফলে বইটির পাঠ কখনই ক্লান্তিকর ও নিরস বলে মনে হয় না। গোটা বইতে ইসলামী ধর্ম-দর্শন চেতনার সন্ধান অনুধ্যান প্রয়াস কখনই পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না, তা ঠিক; কিন্তু তা কখনোই নিছক আদর্শের 'ধুয়াগানে' পর্যবসিত হয়নি। লেখক সর্বত্রই বিজ্ঞান-বুদ্ধির রঞ্জন-রশ্মির আলোকে তাঁর বক্তব্যের সারবত্তা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন। একালের উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত সংশয়-কণ্টকিত মনের অধিকারী মানুষদের মনে আদর্শ চেতনা সঞ্চারে ভিন্নতর কোন পন্থার কার্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ, একথা চিন্তা করেই আবুল কাসেম বিজ্ঞান বুদ্ধিকে সর্বদা তাঁর সহযাত্রী রূপে বরণ করে নিয়েছেন। আর এ জন্যই শিক্ষিত পাঠকের একটা বড় অংশের কাছে তাঁর রচনার আবেদন অপ্রতিরোধ্য হতে বাধ্য।

মনন-চর্চায় উৎসাহী একজন পাঠক হিসাবে এ গ্রন্থ পাঠের অভিজ্ঞতা বিবৃত করতে গিয়েই এত কথার অবতারণা করতে হল। আসুন, এবার আমরা গ্রন্থের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এতে সঞ্চিত চিন্তার ঐশ্বর্যরাজির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুদুর্লভ সুযোগ গ্রহণ করি। এ পরিক্রমায় লাভের অঙ্কের পরিমাণ যেমনই হোক, লোকসানের কোন সম্ভাবনাই নেই। গ্রন্থের নামের প্রথম অংশটাই 'বিজ্ঞান'রূপে চিহ্নিত। স্বভাবতই বিজ্ঞান-চিন্তা এ বইতে দীর্ঘ-প্রসারী ছায়া বিস্তার করেছে। 'বিজ্ঞান' নামাঙ্কিত প্রথম পর্যায়ের দুটি নিবন্ধের বক্তব্য একান্তই বিজ্ঞান বিষয়ক। 'বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক বিবর্তন' ও 'বিজ্ঞানের গতি-প্রকৃতি' এ দুই পৃথক শিরোনামে লেখক সংক্ষেপে আধুনিক বিজ্ঞানের বিস্ময়কর বিকাশের পটভূমি সামনে রেখে সংক্ষেপে বিজ্ঞানের বিবর্তনের ইতিহাস বিবৃত করেছেন এবং বিজ্ঞানের বিপুল সাফল্য ও প্রতিষ্ঠার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের চিন্তা ও চেতনার ক্ষেত্রে যে বিপুল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে—তা বিজ্ঞানের কোন ভবিষ্যৎ-নির্দেশক—সে সম্পর্কে নিজের সুচিন্তিত বক্তব্য রেখেছেন। জড়বাদী বিজ্ঞান যেভাবে অগ্রগতির পথে ক্রমশঃ বস্তুবন্ধন অতিক্রম করে সূক্ষ্মতর এক চেতনার জগতের দিকে অগ্রসর হয়েছে, তাতে লেখক সঙ্গতভাবেই এ সিদ্ধান্তে আসতে উৎসাহিত বোধ করেছেন যে "আধুনিক বিজ্ঞান একটি মহিমান্বিত মহান সত্তার দিকেই আমাদের জ্ঞানকে চালিত করছে।" এ অংশে লেখক বিজ্ঞানের বিকাশের যে ইতিহাস বর্ণনা করেছেন তা সাধারণ পাঠকের কাছেও সহজবোধ্য হয়ে উঠেছে বলে আমার ধারণা। তা ছাড়া বিজ্ঞান সত্যিকার কি জিনিস, কি তার কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত, তা'ও লেখক সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি যথার্থই বলেছেন, বৈজ্ঞানিক সাধনা নিছক ঘটনা আবিষ্কারেই সীমাবদ্ধ নয়;

সুষ্ঠুভাবে তার কার্যকারণের ব্যাখ্যা দেওয়াও বিজ্ঞানের কাজ। বিজ্ঞানচর্চার সীমাহীন অভিযাত্রার ফলশ্রুতি হিসেবে লেখক আইনস্টাইনের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছেনঃ 'ধর্মহীন বিজ্ঞান খোঁড়া এবং বিজ্ঞানহীন ধর্ম অন্ধ।' লেখকের মতে বিজ্ঞান-বুদ্ধির সীমাবদ্ধতাই ধর্মের অস্তিত্বকে স্পষ্ট করে তোলে; তবে লেখক এও স্বীকার করেন যে, বিজ্ঞান-বুদ্ধির সমর্থনহীন ধর্মবোধ একটা অন্ধ আবেগ মাত্র। গ্রন্থের প্রথম পর্যায়ের এ দুটি নিবন্ধের বক্তব্য থেকে লেখকের বিশিষ্ট জীবনবোধটি পরিস্ফুট হয়ে উঠে। লেখককে আমরা এক-জন প্রবুদ্ধ ধর্মচেতনার অধিকারী বিজ্ঞানী অথবা বিজ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন ধার্মিক ব্যক্তি বলে চিহ্নিত করতে পারি অনায়াসে।

এরপর 'সমাজ ও বিজ্ঞান শীর্ষক' দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনটি নিবন্ধ সন্নি-বেশিত হয়েছে। এ তিনটি নিবন্ধের নাম যথাক্রমে 'বিজ্ঞান, বিবর্তন ও সামাজিক ধর্ম, 'বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে শ্রেণী সংগ্রাম' এবং বিজ্ঞান, গণতন্ত্র কম্যুনিজম ও ইসলাম। নিবন্ধগুলোর নাম দৃষ্টেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, লেখক বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্র থেকে আপন দৃষ্টিকে মানুষের সামাজিক জীবনের নানা সমস্যার ক্ষেত্রে প্রসারিত করে দিয়েছেন। বিজ্ঞান বুদ্ধি এখানে অক্ষুণ্ণ থেকেছে, কিন্তু তা জীবন বাস্তবের নানা সমস্যারস্বরূপ অন্বেষায় ও তাদের সমাধানের পথ নির্দেশে নিয়োজিত হয়েছে। এ পর্যায়ের প্রথম নিবন্ধটিতে লেখক বিজ্ঞান বুদ্ধির আলোকে মানব-সমাজে বিবর্তন ও বিপ্লবের যথাক্রমে ধীরক্রিয় ও তীব্রগতি দুর্বার পরিবর্তন প্রক্রিয়ার স্বরূপ ও ভূমিকা আলোচনা করেছেন এবং প্রসঙ্গত মার্কসবাদী [দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী] দর্শনের সমাজ বিপ্লব, শ্রেণী-বিপ্লব সম্পর্কিত নানা ধারণার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি নির্দেশ করেছেন। লেখকের মতে বিবর্তনের মাধ্যমেই পরিবর্তন অধিকতর কাম্য। তবে বিপ্লব যে অবস্থা বিশেষে অনিবার্য হয়ে ওঠে, সে কথা লেখক পুরো-পুরি অস্বীকার করতে পারেননি। কারণ ইতিহাস তার সাক্ষ্য। সে ক্ষেত্রে লেখক বলতে চান রক্তাক্ত সংঘর্ষ ছাড়াও বিপ্লব হয়। সামাজিক পরি বর্তনের আগে ব্যক্তির মনে বিপ্লব আনয়ন করেই নাকি তা করা সম্ভব। কিন্তু তার প্রক্রিয়াটি কি তা লেখক পুরোপুরি ব্যাখ্যা না করায় বক্তব্য একটু যেন অস্পষ্ট থেকে যায়। 'এরপর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে শ্রেণী-সংগ্রাম' নামক নিবন্ধে লেখক মার্কসীয় দর্শনের একটা বড় স্তম্ভ 'শ্রেণী সংগ্রামের' তত্ত্বকে নানা দিক থেকে ব্যাখ্যা করেছেন এবং এ বিষয়ে ঐ দর্শনের প্রবক্তাদের মধ্যকার মতভেদের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। এ শ্রেণী সংগ্রাম তত্ত্বের মূল হিসেবে মার্কসবাদীরা যে অর্থনৈতিক কারণ নির্দেশ করেন

লেনিন ইতিহাস থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে তার অসম্পূর্ণতা নির্দেশ করেছেন। প্রসঙ্গত শ্রেণী-সংগ্রাম তত্ত্বের মূলে কাজ করেছে যে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ তার বহু ত্রুটি নির্দেশ করে এ কথাই বলতে চেয়েছেন যে, মার্কসবাদ দর্শন অত্যন্ত একপেশে, কারণ ঐ দর্শন শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে শ্রেণী সংগ্রামের পথ ধরে মযলুম মানুষের জীবনে আর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য আনার কথা ভাবলেও এ সত্য ভুলে যায় যে, মানুষের আত্মিক সমৃদ্ধি না ঘটলে কোন বাস্তব পরিবর্তনই অর্থবহ হয়ে ওঠে না। এ ব্যাপারে মার্কসবাদী দর্শনের নীরবতা লেখককে রীতিমত পীড়া দিয়েছে। এ পর্যায়ের তৃতীয় ও শেষ নিবন্ধে লেখক বিখ্যাত দার্শনিক ও রাজনীতিক হুমায়ুন কবিরের Science, Democracy & Islam নামক পুস্তকের বক্তব্য সামনে রেখেই অগ্রসর হয়েছেন। মতভেদ সত্ত্বেও হুমায়ুন কবিরের অনেক বক্তব্যের সঙ্গে লেখক আপন চিন্তার সাযুজ্য খুঁজে পেয়েছেন—তাও প্রবন্ধের ভূমিকায় স্বীকার করে নিয়েছেন। বিজ্ঞানের মূলনীতিসমূহের আলোকে লেখক এ প্রবন্ধে গণতন্ত্র, কম্যুনিজম ও ইসলামকে পরীক্ষা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে একমাত্র ইসলামই বিজ্ঞানের তিনটি মৌলিক নীতির ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত জীবনাদর্শ। সে তিনটি মূলনীতি হল ঃ সৃষ্টির ঐক্য, নীতির ঐক্য ও ব্যক্তির উপর গুরুত্ব দান। গণতন্ত্রে সৃষ্টির ঐক্যে আস্থা নেই। মার্কসবাদ বা কম্যুনিজমে ব্যক্তির কোন গুরুত্ব নেই। গণতন্ত্রে ব্যক্তির মর্যাদাও সর্বদা স্পষ্ট নয় আর কম্যুনিজমে সামাজিক ভ্রাতৃত্বের চেয়েও স্বার্থগত ধারণারই প্রাবল্য দেখা যায়। সেজন্য লেখকের মতে গণতন্ত্র এবং কম্যুনিজম কোনটি পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক মতবাদ নয়। তুলনায় লেখকের মতে, ইসলাম অনেক বেশী বৈজ্ঞানিক যুক্তিবহ আদর্শ। লেখকের এ সিদ্ধান্ত বিশেষভাবে পরীক্ষিত ও বিবেচিত হওয়ার দাবি রাখে।

এবার আসা যাক 'দর্শন ও বিজ্ঞান' পর্যায়ের প্রবন্ধগুলোর প্রসঙ্গে। এ প্রবন্ধগুলোর প্রথমটির নাম 'যুক্তি, প্রমাণ ও বিজ্ঞান'। যুক্তি ও প্রমাণের ভিত্তিতে কোন সত্যে উপনীত হওয়ার সাধনাই বিজ্ঞানের সাধনা। এ যুক্তি ও প্রমাণের নিরিখে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় কি না, এমন একটি প্রশ্ন মনের সামনে রেখে লেখক যুক্তি ও প্রমাণের নিজস্ব স্বরূপ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, ওগুলোর সঙ্গেও আসলে কল্পনা, অনুভূতি, উপলব্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তির মত অদৃশ্য ভাব ও ভাবনা জড়িয়ে রয়েছে। আসলেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণের কথাটা কোন ক্ষেত্রেই বেশী দূর এগোয় না। সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য জগত সম্বন্ধে সুনিশ্চিত ধারণা ও জ্ঞান পেতে হলে দরকার—ধরে নেওয়ার বা কল্পনার সাহায্য নেওয়ার। পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের বহির্ভূত 'বিষয়ের

প্রকৃতি সম্পর্কে কল্পনা ছাড়া কোন দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সম্ভব নয়।' আল্লাহ্ সম্পর্কে ঐ একই কথা। যৌক্তিক বিবেচনায় এ ফাঁক থেকে যাচ্ছে বলেই তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে অনেকে সন্দেহবাদী হয়ে ওঠেন। কিন্তু তাতে প্রমাণ হয় না যে আল্লাহ্ নেই। বরং অনস্তিত্বের প্রশ্নটি অস্তিত্বের সমস্যার দিকেই আমাদের দৃষ্টিকে বারবার ফিরিয়ে নেয়। দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'সৃষ্টি সম্পর্কিত নীতির বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব'-এ লেখক সৃষ্টির আদি কারণ জানার মানবিক আগ্রহের ইতিহাসই সংক্ষেপে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। প্রসঙ্গত তিনি 'সৃষ্টির বিকাশ তত্ত্ব', 'নীহারিকা তত্ত্ব' ও 'বিবর্তনতত্ত্ব' সমূহের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে কল্পনানির্ভর এসব তত্ত্বের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক যুক্তিনির্ভর প্রশ্ন তুলেছেন। একজন বিজ্ঞানীর দৃষ্টি দিয়েই তিনি সমগ্র বিষয়টির পর্যালোচনা করেছেন এবং এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ভন উইজেকার, হোইলি ও কুইপারের মতামত পরীক্ষা করে দেখেছেন। নাস্তিক্য-বাদের এ তত্ত্বগুলো আজকাল অনেকাংশে অযৌক্তিক বলেই বর্জিত হয়েছে বলে লেখক আমাদের জানিয়েছেন। আসলে সৃষ্টি সম্পর্কে মানুষের অন্ত-হীন জিজ্ঞাসার কোন পরিসমাপ্তি নেই। ঐ প্রসঙ্গেই আল্লাহ্র অস্তিত্বের ধারণা বারবার বিজ্ঞানীদের মনেও উঁকি মারছে। তাতে সন্দেহ দেখা দিলেও আল্লাহ্র অস্তিত্ব অপ্রমাণিত হয়নি কোন দিন। এ বক্তব্যের জের টেনেই তৃতীয় প্রবন্ধে লেখক আল্লাহ্র অস্তিত্বের যৌক্তিকতার বা প্রমাণ হিসেবে উদ্ভাবিত বিভিন্ন তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। এ তত্ত্বগুলোর নাম হল 'অভিজ্ঞতা-ব্যাখ্যা তত্ত্ব'। 'অনুভূতি ও মনোস্বভাবনির্ভর তত্ত্ব'; 'আবশ্যকতা ও নৈতিকতা তত্ত্ব' 'পূর্ণতা তত্ত্ব', 'অসীমতা তত্ত্ব' ইত্যাদি। এর মধ্যে লেখকের মতে অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা তত্ত্বই প্রধানত বিজ্ঞান-নির্ভর। বাকীগুলো দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক চিন্তা এবং কল্পনার ফসল। বৈজ্ঞানিক যুক্তির আলোকে সমগ্র বিষয় ব্যাখ্যা করে লেখক সামগ্রিকভাবে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক চিন্তা-পদ্ধতির অসম্পূর্ণতার ছবিটি তুলে ধরে সমস্যার সমাধানের কুঞ্জিকা নির্দেশ করেছেন এ বলে ঃ 'সৃষ্টির আদি কারণ কোন নির্মন নির্জীব বস্তু হতে পারে না— হতে পারে মহামনের অধিকারী একটি একক সত্তা।' মানব-প্রকৃতির নিজস্ব স্বভাবধর্ম শেষ পর্যন্ত তাকে সংশয়, সন্দেহের স্তর পার করে আল্লাহ্র অস্তিত্বের ধারণায়ই আস্থাবান করে তোলে। একথাই লেখক শেষ পর্যন্ত বলতে চেয়েছেন। সৃষ্টি সম্পর্কিত অন্যান্য তত্ত্বের কথাও লেখক সংক্ষেপে বলেছেন। সর্বত্রই লেখক আল্লাহ্র অস্তিত্বের ধারণার মধ্যে সকল রকম অর্থহীন জটিলতা থেকে মুক্তি খুঁজে পেয়েছেন। এরপর 'দর্শন, বস্তুবাদ ও বিজ্ঞান' নামীয় আর একটি অধ্যায়ে লেখক মূলত বস্তুবাদী

দর্শনের স্বরূপ উন্মোচনের চেষ্টা করেছেন। এর উদ্ভব, বিকাশ ও ভাববাদের সঙ্গে এর দ্বন্দ্বের চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে তিনি মুখ্যত মার্কসীয় বস্তুবাদের কাঠামো দ্বান্দ্বিক, কতটুকু বা চিন্তাশক্তি ও চেতনশক্তির উপর নির্ভরশীল, তা স্পষ্ট করে নির্দেশ করেছেন। তাতে নিছক বস্তুবাদ নয়, মানব-চৈতন্যেরই যে জয় লক্ষ্য করা যায়, তাই লেখক বলতে চেয়েছেন। তাঁর এ ব্যাখ্যা অনুধাবনযোগ্য। এ অধ্যায়ে বিজ্ঞান ও বস্তুবাদের সহমর্মিতার প্রসঙ্গ তুলে লেখক শেষ পর্যন্ত আধুনিক বিজ্ঞানের অভাবিত-পূর্ব বিকাশের আলোকে বস্তুবাদী চিন্তার সীমাবদ্ধতাকে প্রকট করে তুলেছেন। বিজ্ঞানী ও দার্শনিকরা শেষ পর্যন্ত বস্তুর জগত [matter] থেকে এগিয়ে গিয়ে আত্মা [spirit] জগতে অভীষ্ট সত্যকে খুঁজতে প্রলুব্ধ বোধ করেছেন, এ তো এক ঐতিহাসিক সত্য। নিরীশ্বরবাদী চিন্তা আজ আর তাই খেই পাচ্ছে না। বর্তমান পর্যায়ের চতুর্থ নিবন্ধে লেখক প্রকৃত একজন শিক্ষকের ন্যায়ই সত্যের অন্বেষায় মানুষ যে-সব প্রশ্নের সম্মুখীন হয়, সেসব প্রশ্নের জবাব খুঁজে ফিরেছেন। প্রশ্নগুলো হল ঃ ক. মানুষের শক্তি ও জ্ঞান কি সীমিত ? খ. অনুমান ছাড়া কি বিজ্ঞান চলে না ? গ. পূর্ণজ্ঞান কি সম্ভব নয় ? ঘ. আল্লাহ্‌র আগে কি ছিল ? ঙ. সৃষ্টিতে বিশৃঙ্খলা কেন ? চ. পরলোক তত্ত্বের পেছনে কি যুক্তি আছে ? ছ. আল্লাহ্ নাই—তার প্রমাণ কি ? জ. ভাগ্য বা তক্‌দীর বলতে আমরা কি বুঝব ? মানুষ কি তক্‌দীরে আবদ্ধ ? —অধ্যাত্ম-চিন্তার রাজ্যে বিচরণকামী মানুষ এসব প্রশ্নের জবাব পেতে স্বভাবতই সমুৎসুক। প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম আপন বিজ্ঞান বুদ্ধির আলোকে এ সব প্রশ্নের যুক্তিনির্ভর উত্তর দেওয়ার প্রশংসনীয় চেষ্টা করেছেন এ অধ্যায়ে। এ পর্যায়ের শেষ অধ্যায়ের নাম 'বিবর্তনবাদ ও আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব'। এখানে জীব-সৃষ্টি তত্ত্বের ব্যাখ্যা হিসেবে বিশেষ সৃষ্টিতত্ত্ব [Special Creation Theory] এবং বিবর্তন তত্ত্ব [Theory of Evolution] এর উপ-যোগিতাকেই পরীক্ষা করে দেখেছেন লেখক। বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে বিজ্ঞানীর প্রশ্ন-কন্টকিত মন নিয়েই তিনি এ আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন। তিনি ডারউইনের যুগান্তকারী বিবর্তন তত্ত্বের উদ্ভব, বিকাশ ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ-উপযোগিতা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। এ মতবাদের ব্যাপক প্রভাব, এর সর্বাধুনিক ব্যাখ্যা সংশোধিত রূপের ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরে তিনি মন্তব্য করেছেন : 'যে বিবর্তনবাদ নাস্তিকতার পোষক হিসেব দেখা দিয়েছিল, তারই আধুনিক রূপ আজ তাকে আস্তিকতার মাহাত্ম্যে উন্নত করে তুলে ধরেছে।' প্রসঙ্গত লেখক বস্তুবাদী বিজ্ঞানের বস্তুত্বের চিন্তাধারার অতি আধুনিক বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে বিবর্তন-

তত্ত্বের অসম্পূর্ণতাকে প্রকট করে তুলেছেন। সংশোধিত বিবর্তনবাদকে তিনি কুরআনের বক্তব্যের আলোকে পরীক্ষা করে তার মধ্যে সত্যের যথেষ্ট সমর্থন রয়েছে বলে স্বীকার করেছেন। লেখকের বিজ্ঞান-বুদ্ধি ও ধর্মাদর্শের চেতনাকে সৃষ্টির মূলগত সত্য নির্ণয়ে এখানে তৎপর দেখতে পাই।

'সমাজ ও ধর্ম' পর্যায়রূপে চিহ্নিত এ গ্রন্থের পরবর্তী অংশ প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম ও অধ্যাপক শাহেদ আলীর যুগ্ম-চিন্তা ও ভাবনার ফসল। এ পর্যায়ের পাঁচটি নিবন্ধে লেখকদ্বয় মূলত ইসলামী ধর্মদর্শনের আলোকে মতবাদ ও আদর্শবাদের সংগ্রাম-উত্তাল আধুনিক মানুষের জীবন-সমস্যার সমাধান খুঁজেছেন। প্রথম নিবন্ধ 'একমাত্র পথ' সেই অন্বিষ্টকেই স্পষ্ট করে তুলেছে। জাগতিক সমস্যা সমাধানে এ পর্যন্ত উদ্ভাবিত যাবতীয় রাজনৈতিক মতাদর্শের ব্যর্থতাকে লেখকরা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন। পুঁজিবাদ, ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদের দুষ্ট প্রভাবে মানব-সমাজের যে দুর্গতি সূচিত হয়েছিল, তা থেকে মানুষকে মুক্তিদানের বলিষ্ঠ শপথ নিয়ে কম্যুনিজমের আবির্ভাব ঘটেছিল এ শতাব্দীর প্রথমভাগে। সে কম্যুনিজমও যে মানুষের জীবনসমস্যার সমাধানে নিখুঁত আদর্শ নয়, তা লেখকদ্বয় যথেষ্ট যুক্তি ও তথ্য সহকারে আলোচনা করে দেখিয়েছেন আসলে গণতন্ত্র, সমাজবাদ ইত্যাদি আধুনিক রাজনীতি ও অর্থনীতি-নির্ভর বস্তুবাদী আদর্শগুলো কখনোই পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ নয়। আর পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ ব্যতীত মানব-সমাজের সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও প্রগতি কখনোই নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। লেখকদ্বয়ের মতে পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শেই জীবনের বাস্তব চাহিদা মেটানোর পথনির্দেশ যেমন থাকবে, তেমনি তাতে মানবীয় ঐক্যের ভিত্তিতে বিশ্বমানবের কল্যাণ কামনার সদাজাগ্রত নৈতিক বোধের উপস্থিতি অবশ্যই কাম্য হবে। এমন কোন আদর্শের সন্ধান ধর্মবোধ-বিবর্জিত পথে লাভ করা সম্ভব নয়। ধর্মের বিকৃত ব্যবহারের সম্ভাবনা সত্ত্বেও এ সত্য অস্বীকার করা যায় না বলেই লেখকদ্বয় বিশ্বাস করেন। লেখকদ্বয়ের মতে ধর্মীয় সমন্বয়ের আদর্শের পথ ধরেই বিশ্বমানবকে কাঙ্ক্ষিত জীবনাদর্শের সন্ধান দেয়া যায়। এ প্রসঙ্গেরই জের টেনে বিভিন্ন ধর্মের সারসত্যের ঐক্য নির্দেশ করে লেখকরা দাবি করেছেন যে ইসলাম ধর্মে প্রকৃতপক্ষে সর্বধর্মের সমন্বয় রচিত হয়েছে। অতএব ইসলামী ধর্মাদর্শপ্রণোদিত জীবনপন্থা গ্রহণই সমস্যা-ক্লিষ্ট পৃথিবীর মানুষের মুক্তির একমাত্র পথ। তাত্ত্বিক দিক থেকে এ বক্তব্য গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হলেও এ বক্তব্যকে বিভিন্ন ধর্মাদর্শের অনুসারীদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার প্রক্রিয়াগত দিকটি সম্পর্কে লেখকদ্বয় কিন্তু নতুন কোন কথা বলতে পারেন

নি। যে-সব কারণে বিশ্বমানবের জীবনে প্রায় সর্বকালে সর্বদেশে ভারসাম্যের অভাব ঘটেছে এবং তার ফলে বহু অনর্থ দেখা দিয়েছে, তার প্রতিকার সমুন্নত আদর্শানুসরণের মধ্যে নিহিত থাক্‌লেও মানুষ এযাবতকাল তাতে ব্যর্থ হয়েছে আপন স্বভাবস্থ স্বার্থপরতা, সঙ্কীর্ণতা ও কুসংস্কার প্রবণতার জন্যই। এ-সব দূর করার সংগ্রামী প্রচেষ্টা প্রতি যুগেই মানব সমাজে দেখা গেছে। কিন্তু তার সাফল্য চিরকালই সীমিত থেকে গেছে। আশা করি লেখকদ্বয় তা স্বীকার করেন।

এর পর 'আধুনিকতা ও ঐতিহ্যবোধ' নামক নিবন্ধে লেখক ঐতিহ্যের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন, প্রতি দেশের জাতীয় জীবনে ঐতিহ্যের কার্যকারিতা নির্দেশ করেছেন এবং মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনে বিকাশের ঐতিহ্যের অবদানের কথা সাধারণভাবে দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ঐতিহ্য-বাদের বিরোধীদের তাঁরা অনাধুনিক বলে চিহ্নিত করেছেন। এই বক্তব্যের সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ নেই। পরবর্তী নিবন্ধ 'বিশ্ব-শান্তি ও ধর্ম' নানা কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একালে আমাদের রাজনৈতিক জীবনে ধর্মীয় শ্লোগানের ব্যবহার ও তারই প্রেক্ষিতে সাম্প্রদায়িক কলহের যে ধ্বংসাত্মক রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, তারই সূত্র ধরে অনেকে সিদ্ধান্ত করে বসেন যে, ধর্মই সমস্ত দ্বন্দ্ব ও অশান্তির মূল—স্বাতন্ত্র্যবোধ ও রক্ষণশীলতার উগ্রতা। এ সিদ্ধান্তের সমর্থনে অতীতেও যে ধর্ম-কেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব ফাসাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটেছে, তারও দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। আলোচ্য প্রবন্ধে প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম (লেখক) বিষয়টি সামগ্রিক বিশ্বের ইতি-হাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখাতে চেষ্টা করেছেন, এ সিদ্ধান্ত যুক্তিবহ নয়। লেখকের মতে দুনিয়ায় আজ পর্যন্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনে যত অনর্থ দেখা দিয়েছে, তার বারো আনার মূলেই ধর্মবিরহিত কারণই দৃষ্ট হয়। মানুষের প্রচণ্ড স্বার্থবোধ, রাজ্য লিপ্সা, শক্তির মোহ, মতবাদের উগ্রতা, অসহিষ্ণুতা ইত্যাদি নানা কারণই সামাজিক সংঘাতের প্রধান কারণ। ধর্মীয় অস-হিষ্ণুতার ক্ষতিকর ভূমিকার দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও লেখকের চিন্তাকে কিন্তু অস্বীকার করা যায় না। এ পর্যায়ের চতুর্থ নিবন্ধ 'কুরআনের আলোকে সার্বজনীন ও চিরন্তন আদর্শ' বিভ্রান্ত মানবতাকে পথ নির্দেশেরই প্রচেষ্টা-প্রসূত। এ নিবন্ধে লেখক সার্বজনীন ও চিরন্তন আদর্শ বলতে কুরআন নির্দেশিত জীবনবিধান অর্থাৎ ইসলামকেই বুঝাতে চেয়েছেন। লেখকের মতে যে আদর্শ গ্রহণে ও পালনে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী জাতির ক্ষেত্রে

২৮—

কোন তারতম্য থাকে না, জাতি ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের মঙ্গল, শান্তি ও উন্নতিই যার লক্ষ্য, তাই সার্বজনীন আদর্শ। আবার আদি মানব আদম থেকে শুরু করে মানব জাতির শেষ অবস্থা পর্যন্ত সব যুগের জন্য যে আদশ কার্যকরী, সে আদর্শ হল মানুষের জন্য চিরন্তন। সার্বজনীন ও চিরন্তন আদর্শের এ সংজ্ঞা নিয়ে দ্বিমত হওয়ার কোন কারণ নেই। কুরআনের বলিষ্ঠ ঘোষণা, 'মানুষ এক জাতি' বৈ কিছু নয়। এই যে বিশ্ব-মানব ঐক্যের ধারণার পটভূমিতে ইসলামী জীবনাদর্শ পরিকল্পিত হয়েছে, তাতে এ আদর্শকে সার্বজনীন ও চিরন্তন ভাববার যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে, লেখক কুরআন থেকে এবং নবী মুহাম্মদ (সঃ)-এর জীবন থেকে নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে নিজের বক্তব্যকে সার্থকভাবেই পরিস্ফুট করেছেন। এ পর্যায়ের শেষ নিবন্ধ 'অমরত্বের সাধনায়' লেখক বলতে চেয়েছেন ঃ 'মানুষ যে শ্রেষ্ঠ জীব বলে চিহ্নিত, তা এ জন্য নয় যে, তার শক্তি বুদ্ধি ও জ্ঞান আছে। শক্তি, বুদ্ধি বা জ্ঞানের সঙ্গে চারিত্রিক মহত্ত্ব সংযোজিত হলেই মানুষ সত্যিকার শ্রেষ্ঠ জীব পদবাচ্য হতে পারে। স্বার্থহীন মানব সেবা ও মানব-কল্যাণের মধ্যে দিয়েই কেবল পারে মানুষ সেই শ্রেষ্ঠত্বকে অর্জন করতে। সেখানেই রয়েছে তার অমরত্বের পথ নিহিত। শক্তিমদগর্বী মানুষের মহিমা পৃথিবীতে যত জোরে জোরেই প্রচার করা হোক না কেন, জ্ঞানের সাধনায় অসীম সাফল্য অর্জনে অহংকারে যতই কেননা তাঁরা স্ফীত বোধ করেন, মানুষের মনে স্থায়ী দাগ তাঁরা কাটতে পারেন না। স্থায়ী দাগ কাটেন মানববন্ধু হযরত মুহাম্মদ (সঃ)। হযরত উমর, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ মানুষের শান্তি ও কল্যাণকামী মানুষই বটে। মানুষের অমরত্ব অর্জিত হয় মানুষের জন্য শান্তি ও কল্যাণের সাধনা দ্বারাই। লেখকের এ বক্তব্যের সঙ্গে আমরা একমত।

'সমাজ ও ধর্ম পর্যায়ের পর সন্নিবেশিত হয়েছে 'সাহিত্য ও ধর্ম' পর্যায়ের দু'টি নিবন্ধ। এর প্রথমটির নাম 'সাহিত্যে আদর্শের স্থান' এবং দ্বিতীয়টির—'সাহিত্য সৃষ্টি ও উদ্দেশ্য'। চিন্তা ও মননের পথে স্বচ্ছন্দবিহারী প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম সাহিত্য-চিন্তার ক্ষেত্রেও যে পশ্চাৎ-পদ নন, এ দুটো প্রবন্ধ তারই পরিচয় বহন করে। প্রথম প্রবন্ধে তিনি টলস্টয়, গোর্কি, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম, নজরুল ইসলাম প্রমুখের সৃষ্টিকর্মের অংশ বিশেষ থেকে দৃষ্টান্তের আলোকে এটাই বলতে চেয়েছেন যে, সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সাধকই মহৎ জীবনাদর্শের ব্যাখ্যাতা। তাঁদের দৃষ্টি-ভঙ্গির সংগঠনে ধর্মীয় মূল্যবোধগুলো আশ্চর্যরূপে সক্রিয়। তাই দেখা যায়, ইউরোপীয় সাহিত্যচিন্তায় খৃস্টীয় ধর্ম-দর্শন, প্রাচ্যের মুসলিম জগতের

সাহিত্য-চিন্তায় ইসলামী ধর্মদর্শন এবং ভারতের হিন্দু সমাজের সাহিত্য-চিন্তায় হিন্দু তথা বৈদিক, বৈষ্ণব, শাক্ত, ব্রাহ্ম ইত্যাদি দর্শনের প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সাহিত্যের সংগঠনে মানুষের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক বোধও ক্রিয়াশীল, সন্দেহ নেই। কিন্তু সাহিত্যে চিরকালই প্রাণসঞ্চার করেছে ধর্মীয় মূল্যবোধ উদ্দীপ্ত এক আশ্চর্য আদর্শ-চেতনা। লেখকের মতে আদর্শ-নিরপেক্ষ কোন সাহিত্য-রচনা সম্ভব নয়: ধর্ম-নিরপেক্ষ সাহিত্যের নামে যারা মানবতা ও বিশ্বমানবতার কথা উচ্চারণ করেন, তাদের মনে রাখা উচিত—তা'ও একটা আদর্শই বটে এবং তা ধর্মীয় আদর্শ থেকে তেমন বেশী দূরের জিনিস নয়। ফরমায়েস দিয়ে সাহিত্য রচনা করা যায় না বলে অনেকে সাহিত্যে বিশিষ্ট আদর্শের সন্ধান-প্রচারণাকে অবাঞ্ছনীয় মনে করেন। সেখানেও বক্তব্য এই যে, তার পিছনে কোন প্রেরণা কার্যকরী হলে তাতে দোষ দেখা সমীচীন নয়। সাহিত্যকে লেখক সম্পূর্ণ কলাকৈবল্যবাদী দৃষ্টিতে যেমন দেখেন নি, তেমনি তাকে নিতান্ত সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার রূপেও বিবেচনা করেন নি। তাঁর মতে 'সৌন্দর্য, কল্পনা, হৃদয়াবেগ এবং সমাজ ও ব্যক্তি-মানুষের শিল্পময় রসঘন সত্যাশ্রয়ী প্রকাশই সাহিত্য।' সাহিত্যের সার্বজনীনত্ব ও সর্বকালীনত্বের ধারণাটির দোহাই পেড়ে যাঁরা বলেন, 'সাহিত্য কোন বিশেষ ধর্মের নয়, দেশের নয়, আদর্শের নয়' তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে যে একটা ফাঁকি রয়ে যায়, তা লেখক অতি স্পষ্টভাবেই নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে সাহিত্য সার্বজনীন ও সর্বকালীন হয়েও বিশেষ দেশ, কাল, সমাজ ও ব্যক্তি তথা ধর্মীয় মানুষের স্বাক্ষর বহন করতে বাধ্য। সে অর্থে খ্রীস্টীয় সাহিত্য, ইসলামী সাহিত্য, হিন্দু সাহিত্য ইত্যাদি বলে বিশেষ আদর্শস্থিত সাহিত্যকর্মকে চিহ্নিত করলে তা দোষের বলে বিবেচিত হওয়া উচিত নয়। তবে তৎসত্ত্বেও আমরা বলব—যে কোন দেশের, যে কোন ভাষার, যে কোন ধর্মাবলম্বী মানুষের সৃষ্ট সাহিত্যের আবেদন চিরকালই জাতি, ধর্মের গণ্ডী ছাড়িয়ে যায় বলে তার বিশেষ পরিচয়টি গৌণ হয়ে যেতে বাধ্য। এ পর্যায়ের দ্বিতীয় ও শেষ প্রবন্ধে লেখক পূর্ববর্তী প্রবন্ধেরই জের টেনেছেন। এখানে লেখক সাহিত্য সম্পর্কে বহু আলোচিত একটি উক্তির তাৎপর্য বিশ্লেষণে ব্রতী হয়েছেন। উক্তিটি হল: 'সাহিত্য হচ্ছে সৃষ্টি, কোন ঘটনার বিবরণ বা ফটোগ্রাফি নয়।' লেখকের মতে মহৎ যে কোন সৃষ্টিকর্মের পেছনেই উন্নতমানের কল্পনা বা পরিকল্পনা আসতে বাধ্য। এ পরিকল্পনা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য-সাধন বলেই সে কাজের পেছনে প্রচুর আয়াসও প্রদান করতে হয়। সেখানে ভাবনা-

চিন্তা ও বিবেচনার অনেক ব্যাপার থাকে। সমাজ ও ব্যক্তিমানসের যৌগ-পদ্য ঘটে বলেই সাহিত্যে রূপ-রসের আশ্চর্য বৈচিত্র্য ঘটে। সাহিত্য তাই ফটোগ্রাফির মতো ঘটনা বা দৃশ্যের ছবি মাত্র তুলে ধরে না। লেখকের অভিজ্ঞতা ও অবচেতনাবোধ সাহিত্যকে ফটোগ্রাফি থেকে আশ্চর্যরূপে বিশিষ্ট সম্পূর্ণ নতুন জিনিস করে তোলে। লেখকের এ বক্তব্যও গ্রহণযোগ্য।

'সাহিত্য ও ধর্ম' পর্যায়ের দু'টি প্রবন্ধের পর 'সমাজ ও নারী' পর্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ। 'নারী প্রগতি ও নারীর মর্যাদা', শীর্ষক এ প্রবন্ধে লেখক সমাজতাত্ত্বিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নারী ও পুরুষের সম্পর্কের ভারসাম্য বিধান করে কিভাবে মানবজাতির শান্তিময় প্রগতি সম্ভব ও সহজ হয়, সেই চিরন্তন প্রশ্নটিরই উত্তর খুঁজেছেন। আদিকাল থেকেই মানুষ সেই সম্পর্কের ভারসাম্য অনুসন্ধান করে এলেও আজ বিংশ শতাব্দীতে এসেও সেই লক্ষ্যে পেঁছার পথ খুঁজে পায়নি। ফলে মানুষের সামাজিক জীবনে আজও রয়েছে প্রচণ্ড অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা। পাশ্চাত্য দেশে ও প্রাচ্যে কোথাও নর ও নারী সম্পর্কের বাঞ্ছিত অবস্থায় পেঁছানো সম্ভব হয়নি। পাশ্চাত্য জগত স্বাধীনতা দেয়ার নাম করে নারীকে বানিয়েছে প্রদর্শনী ও বিজ্ঞাপনের বস্তু। অপরদিকে প্রাচ্যে সতীত্ব রক্ষার নাম করে তাকে করেছে পঙ্গু ও অবরুদ্ধ। অতি আধুনিককালে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে নারী-প্রগতি বিধানের আবশ্যকতার কথা বেশ জোরেশোরেই আলোচিত হয়েছে। প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম বর্তমান সেই প্রেক্ষিতে নারী-পুরুষের গোটা সম্পর্কের একটা মূল্যায়নের প্রয়াস পেয়েছেন। জীববিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের আলোকে সমাজে নারী পুরুষের পরিপূরক অবস্থানকে স্পষ্ট করে তুলে লেখক উভয়ের প্রবৃত্তির স্বাতন্ত্র্য ও মনোধর্মের বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে পরিবার, সমাজ, দেশ তথা জাতীয় জীবনে তাদের ভারসাম্যযুক্ত অবস্থানকে নিশ্চিত করে তোলার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। স্বাধীনতা ও প্রগতির নামে, সমানাধিকারের নামে নারী যখন উগ্র প্রদর্শনী মনোভঙ্গির অধিকারিণী হয়, ব্যভিচার ও বিলাস-স্রোতে ভেসে যেতে উদ্যত হয় এবং প্রেম-ভালবাসার সম্পর্কটাকে নিছক জৈবিক তাগিদ পরিতৃপ্তির ব্যাপার বলে গণ্য করতে অভ্যস্ত হয়, তখন সে প্রকৃতপক্ষে আত্মঘাতিনীই হয়। নিজেরাই মর্যাদাকে ধূলায় লুটিয়ে দেয়। নারীকে সত্যিকার মানুষের মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে হলে সুশিক্ষিতা হতে হবে। দেহ-প্রদর্শনীর বাতিক ত্যাগ করতে হবে। নিজ চরিত্রের অপরিমেয় ঐশ্বর্যের গুণে সমাজের মানুষের শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম আকর্ষণ করতে হবে। সমাজে পুরুষের চেয়ে নারীর স্থান কোনক্রমেই নীচে নয়—এ সত্যের স্বীকৃতিও সমাজকে দিতে হবে কর্মে, আচরণে ও

চিন্তায়। মোটকথা, সামাজিক মানুষের তথা বিশ্বের শান্তির প্রয়োজনেই নারী ও পুরুষকে স্বাস্থ্যকর সহযোগিতার পথে এগিয়ে আসতে হবে। নারী প্রগতির মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত পুরুষের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আত্ম-মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে সুখ, শান্তি ও উন্নতির দিকে এগিয়ে যাওয়া। এ লক্ষ্যে পৌঁছানোর ব্যাপারে কুরআন বর্ণিত জীবনাদর্শ যে ব্যাপকভাবে সাহায্য করতে পারে, লেখক যথেষ্ট দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করে তা পরিষ্কার-ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

'সমাজ ও নারী' পর্যায়ের একটি প্রবন্ধের পরই 'কুরআনিক অর্থনীতি' পর্যায়ে বিভিন্ন শিরোনামের আটটি অধ্যায়ে লেখক কুরআন তথা ইসলামী জীবনাদর্শভিত্তিক অর্থনীতির রূপ উদ্ঘাটন করেছেন। প্রারম্ভেই 'অর্থনীতি ও আধুনিক সমাজ' শীর্ষক উক্ত আলোচনার পটভূমি হিসেবে রচিত নিবন্ধে তিনি অর্থনীতির অভাব, উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার মৌলিক সহজ রূপের কথা উল্লেখ করে আধুনিক পুঁজিবাদ ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজের শোষণ-প্রক্রিয়ার ধারক হয়ে সে অর্থনীতি কি জটিল রূপ ধারণ করেছে—তার অত্যন্ত বাস্তব বলিষ্ঠ রূপ তুলে ধরেছেন। পৃথিবীব্যাপী মানুষের জীবনের সকল সুখ-শান্তি কেড়ে নিয়েছে এ শোষণকামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। লেখকের মতে 'এ দুষ্ট অর্থনীতির চক্রজাল থেকে মানুষকে মুক্ত করে শান্তি, ন্যায় ও সমতার সন্ধান দিতে থাকবে একমাত্র কুরআনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।' এ সবের পরপরই লেখক কুরআনিক অর্থনীতির মূল-নীতি সম্পর্কিত আলোচনার অবতারণা করেছেন। লেখকের মতে কুর-আনের ১১৪টি সূরার মধ্যে ৬৬৬৬টি আয়াত রয়েছে, তার মধ্যে আড়াই শতেরও অধিক আয়াতে অর্থনীতি সম্পর্কিত বক্তব্য রয়েছে। আলোচনার পরিশিষ্টে তিনি সেই আয়াতগুলোর আংশিক তালিকা সন্নিবেশিত করেছেন। 'কুরআনিক রেফারেন্স' হিসেবে, এ সব আয়াতের কতকগুলোতে অর্থনীতির মূলনীতিগুলো চমৎকারভাবে নির্দেশিত হয়েছে। মূলনীতিগুলো হল: (ক) দুনিয়ার সকল সম্পদের মালিক আল্লাহ্। মানুষ কোন কিছুর মালিক নয়—উত্তরাধিকারী মাত্র। আল্লাহ্র সম্পদে সকলের সমান অধিকার রয়েছে। (খ) সম্পদে তারই প্রকৃত অধিকার, যে শ্রমের দ্বারা তা উৎ-পাদন ও ব্যবহারযোগ্য করে তোলে। (গ) মানুষ আল্লাহ্র সৃষ্ট এক জাতি। সবাই সমান। এই ভিত্তিতে সম্পদ বন্টিত হওয়া উচিত। (ঘ) ধনসম্পদ মহত্তর জীবন লাভের উপায় মাত্র। সম্পদ অর্জনই জীবনের উপায়-উদ্দেশ্য নয়। (ঙ) প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ সমাজের কল্যাণে খরচ করা উচিত। এ সহজ মূলনীতিগুলো অনুসৃত হলে সত্যি সত্যিই সমাজে

ধনবৈষম্যের অভিশাপ সৃষ্টি হয়ে সমাজকে কলুষিত করতে পারত না। লেখক এ মূলনীতিগুলোকে সামনে রেখেই সম্পদের রকম, সম্পদের অধিকার, অধিকার ও মালিকানা, ধর্ম ও অধিকার, মওজুতদারী ও সম্পদের ব্যবহার, সম্পদ ও মানুষের প্রভুত্ব ইত্যাদি খণ্ড শিরোনামায় কুরআনিক অর্থনীতির বিভিন্ন তাৎপর্যপূর্ণ দিকগুলোকে পরিস্ফুট করে তুলেছেন। এর পর 'জীবন, ব্যক্তি ও সমাজ', অধ্যায়ে তিনি জীবনের প্রকৃত কাম্য কি হওয়া উচিত, তা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে বিচার করেছেন এবং ঐ প্রসঙ্গের জের টেনে ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্কের হেরফের সম্পর্কে মূল্যবান কথা বলেছেন। তারপর গণতন্ত্র, ব্যক্তি-সম্পত্তি, উৎপাদন ব্যবস্থার ব্যক্তিপ্রেরণা, কম্যুনিস্ট দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে বক্তব্য রেখে শ্রেষ্ঠ অর্থনীতির মূল লক্ষ্য নির্দেশ করে পশ্চিমা পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও কম্যুনিস্ট অর্থনীতির তুলনায় কুরআনী আদর্শ নির্ভর অর্থনীতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেছেন। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে তিনি কুরআনী অর্থনীতির আলোকে জমিসমস্যা 'শিল্প সমস্যা, জমি এবং শিল্পের রাষ্ট্রীয়করণ বনাম রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ এবং সুদ, ব্যাংকিং ও ইনসিওরেন্স ইত্যাদি সম্পর্কে সুচিন্তিত বক্তব্য রেখেছেন। এ বিভিন্ন সমস্যাগুলোর সমাধানে পুঁজিবাদী ও সাম্যবাদী অর্থনীতির সীমাবদ্ধতার ইঙ্গিত দিয়ে লেখক কুরআনী অর্থনীতির ভারসাম্যযুক্ত ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেছেন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বিশেষ শ্রেণীর শোষণ কায়েমের পোষকতা করে। দুর্নীতির প্রশ্রয় দেয়া ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারকে বড় করে তোলে। সুদ, ব্যাংকিং ও ইন্সিওরেন্স পুঁজিবাদী শোষণের এক একটা হাতিয়ার। সাম্যবাদী অর্থনীতি সামাজিক অসমতা অনেকটা দূর করে। দুর্নীতিকেও অনেকটা দূর করে কিন্তু ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব খর্ব করে এবং রাষ্ট্রযন্ত্রকে মানুষের প্রভুর পর্যায়ে স্থাপন করে। কুরআনী অর্থনীতি আদর্শ শোষণমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের সবচেয় অনুকূল ব্যবস্থা। কারণ সেখানে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি যেমন আছে, তেমনি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণও আছে। সেখানে সর্বত্রই ভারসাম্য রক্ষা করে চলার প্রয়াস রয়েছে বলে মানুষ চরম কোন অবস্থার শিকার হয় না। লেখকের এ বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তবে কুরআনী অর্থনীতির বাস্তব প্রয়োগ নিরীক্ষার অভাবে এর কার্যকারিতা সম্পর্কে আমাদের মনে সুষ্ঠু কোন ধারণা দিতে আজও সমর্থ হয় নি—একথা স্মরণ রাখা দরকার।[১]

---

১. বর্তমান সংস্করণে কুরআনিক অর্থনীতির রূপরেখার বাস্তব দৃষ্টান্ত হিসাবে ইহার শেষভাগে খুলাফায়ে রাশিদীনের আদর্শ ও অন্যান্য প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হওয়ার ফলে এই প্রশ্নের উত্তর মিলবে বলে লেখক আশা করেন। —লেখক

গ্রন্থের সর্বশেষ অধ্যায়ে 'ইসলামী রাষ্ট্রনীতি' পর্যায়ে প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম প্রথমে মওলানা আবুল কালাম আযাদ, আবুল মনসুর আহমদ ও তোফাজ্জল হোসেন—এই তিন চিন্তাশীল রাজনীতিবিদের ইসলামী রাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত ভাবনার পরিচয়বাহী তিনটি প্রবন্ধ উপস্থাপিত করে তারই সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই যেন আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্রের রূপ, আদর্শ সরকার ও খিলাফতের সংগঠন সম্পর্কে নিজস্ব বক্তব্য পেশ করেছেন। মওলানা আযাদ তাঁর 'আদর্শ খিলাফতের নমুনা'য় উমাইয়া বংশের খলীফা 'উমর ইব্‌নে আবদুল আজীজের [দ্বিতীয় উমর] স্বল্পকালীন শাসন-কালকে আদর্শ খিলাফতের দৃষ্টান্ত রূপে উপস্থাপিত করেছেন। আবুল মনসুর আহমদ 'ইসলামী রাষ্ট্র' নামক সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে ইসলামী রাষ্ট্রের ধারণার বিরুদ্ধে বিভিন্ন মহল থেকে যত আপত্তি উঠতে পারে—তা উল্লেখ ও বিশ্লেষণ করে ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের যৌক্তিকতাকেই শেষ পর্যন্ত মেনে নিয়েছেন। তোফাজ্জল হোসেন একজন যুক্তিবাদী, গণতন্ত্রবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিতে বিশ্বাসী ব্যক্তি হয়েও 'ইস্‌লামী নীতি' নামক নিবন্ধে ইস্‌লামের ন্যায়নীতি ও জনতার আদর্শে বিশ্বাস স্থাপন করছেন। তবে এ আদর্শের বাস্তবায়নের পথের বাধাগুলোর কথা তিনি বিশেষ জোর দিয়েই উল্লেখ করেছেন। এ তিনটি প্রবন্ধকে আপন বক্তব্যের সমর্থনে শক্তিশালী সাক্ষ্যরূপে গ্রহণ করেই যেন প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম জটিল শিশু রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতির কথা স্মরণ রেখে আপন পরিকল্পিত আদর্শ রাষ্ট্রের [বলা বাহুল্য, ইস্‌লামী রাষ্ট্রের] রূপ নির্দেশ করেই ক্ষান্ত হননি। আদর্শ রাষ্ট্রের আদর্শ সরকার কিরূপ হওয়া উচিত, তার গঠনগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সবশেষে ইস্‌লামী রাষ্ট্রের রূপ, খিলাফতের গঠন, নির্বাচন ও কর্তব্য সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যসমৃদ্ধ বক্তব্য রেখেছেন। এ অংশে লেখকের রাষ্ট্রদর্শনের স্বরূপ স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। মোটকথা, ইসলামী ধর্মীয় চেতনাপুষ্ট আদর্শবাদের অনুসারী প্রিন্সিপাল আবুল কাসেমের বৈজ্ঞানিক, সামাজিক, ধর্মদার্শনিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তাধারার সামগ্রিক পরিচয়বাহী এ গ্রন্থ, তাঁর প্রজ্ঞা ও মনীষার শ্রেষ্ঠ ফসল রূপে চিহ্নিত হওয়ার দাবি রাখে।

আগেই বলেছি, বিজ্ঞানের অধ্যাপক আবুল কাসেম আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি জগতে এক ব্যতিক্রমধর্মী উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। তাঁর জীবন ও কর্মধারার সঙ্গে যাঁরাই পরিচিত আছেন, তাঁরাই স্বীকার করবেন তাঁর সঙ্গে নানা ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণের অবকাশ থাকলেও ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁর রচনায় যে গভীর চিন্তা ও

অনুশীলনের ছাপ পাওয়া যায়, তা তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধান্বিত করে তোলে। দৃপ্ত আত্ম-প্রত্যয় ও আদর্শ-বিশ্বাসে সমুজ্জ্বল এ মানুষটি মুসলমান সমাজকে জীবনভর স্ব-আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য প্রেরণা যুগিয়েছেন। কিন্তু কোথাও তিনি চিন্তার ক্ষেত্রে কোন সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেননি। বিশ্বের সকল জাতির জ্ঞানভাণ্ডার থেকেই তিনি আপন চিন্তার খোরাক সংগ্রহ করেছেন। আপন ধর্মে চূড়ান্ত রূপে আস্থাশীল থেকেও তিনি আশ্চর্যরূপে পরমত সহিষ্ণুতা দেখিয়েছেন। তাই নি:সন্দেহে তিনি এক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও দর্শন, সাহিত্য, অর্থনীতি ও ইতিহাসের রাজ্যেও যে তাঁর অবাধ গতি ছিল, তাঁর গ্রন্থ পড়লে তা বুঝতে কষ্ট হয় না। শুধু তাই নয়। ঐ সকল বিষয়ে মাতৃভাষায় আপন বক্তব্য প্রকাশেও তিনি আশ্চর্যরূপ স্বচ্ছন্দ। ইসলামী আদর্শে পুষ্ট হয়েছেন বলেই কোথাও তাঁর বক্তব্যের ভাষা অপ্রয়োজনীয় আরবী-ফার্সী শব্দের বাহুল্যে কন্টকিত হয় নি। প্রকাশ-মাধ্যম হিসেবে ভাষার প্রয়োগোপযোগিতা সম্পর্কে তিনি আশ্চর্যরূপে সচেতন। তাঁর বই তাই জটিল চিন্তার রাজ্য পরিক্রমণশীল হলেও কখনই আমাদের কাছে নিরস বস্তু হয়ে ওঠেনি। তথ্য ও যুক্তিসমৃদ্ধ তাঁর রচনায় সর্বত্র একটি নৈয়ায়িক মন উপস্থিত। তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত স্বচ্ছ ও স্পষ্ট, কোথাও ঘোলাটে বা অস্পষ্ট নয়। তাই প্রায় সাড়ে তিনশত (বর্তমানে সংস্করণে প্রায় চার শতাধিক) পৃষ্ঠার বইটিতে দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজ ও অর্থনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ের গুরুগম্ভীর আলোচনা কখনোই আমাদের কাছে ক্লান্তিকর ঠেকে না। এজন্য অবশ্যই তিনি আমাদের প্রশংসা ও ধন্যবাদের পাত্র।

ঢাকা ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এমন একটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করে দেশের সুধী-সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন, একথা বলতে আমার কোন দ্বিধা নেই। সুন্দর প্রচ্ছদযুক্ত বইটিতে মুদ্রণ-প্রমাদের ছড়াছড়ি অনেক সময় দারুণ পীড়াদায়ক মনে হলেও লেখকের সারগর্ভ বক্তব্যের আকর্ষণে আমরা সে বাধা অগ্রাহ্য করে অনায়াসে বইটি পড়ে যেতে উৎসাহ বোধ করি। আমাদের সমাজে চিন্তা ও মননের ক্ষেত্রে যে দৈন্য রয়েছে, আবুল কাসেম সাহেবের 'বিজ্ঞান-সমাজ-ধর্ম' গ্রন্থটি পাঠ করার পর এমন কথা আর স্বীকার করা যায় না।[১]

সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়
[প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়]

IFB—86-87—P/4394—3250—1. 10. 1986

ভুল	পৃষ্ঠা	প্যারা/লাইন	শুদ্ধ
২৭৩	২৭৭	২য় লাইন	২৭৯
ভলীখেল	৩৪৯	৩য় প্যারার ৪র্থ লাইন	ভলি খেলা
উন্নত বলে পরিচিত……আর কিছু নয়।	৩৯২	৭ম লাইন থেকে শুরু	এই পর্যন্ত সম্পাদকের নিজস্ব মন্তব্য বাক্যটি ভুলবশত ফুটনোটে না নিয়ে প্রবন্ধের অংশ হিসাবে সংযোজিত হয়েছে।

ইসলামী মেনিফেস্টোর ৩৫০ পৃষ্ঠায় মূল বই থেকে পুনঃ মুদ্রণে মুদ্রণ-ভুল হেতু ১নং ফুট নোটের iv-১ [৪২ ঃ ১৩ ঃ ১৪] বাদ যাবে এবং ২-১৯৩ এর স্থলে ২৩-৫২ হবে।
৩৫১ পৃষ্ঠার শেষ লাইনে শেষ অংক ৫৪ বাদ যাবে।
৩৫৩ পৃষ্ঠার ১নং ফুটনোটে শুধু 'কুরআন' হবে।
৩৫৬ পৃষ্ঠার ২নং ফুটনোটে শুধু 'কুরআন' হবে।
৩৫৭ পৃষ্ঠার ৪নং ফুটনোটের ২ ঃ ৬২ ; ৬ এর ৬ বাদ যাবে।

৮৫ পৃষ্ঠার ৩ নম্বর ফুটনোট হিসাবে নিচের লেখাগুলো বসবে।

সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা বলছেন চন্দ্র পৃথিবীর অংশচ্যুত উপগ্রহ নহে। পৃথিবী চন্দ্রকে অন্য কোন গ্রহের নিকট থেকে আপন বলয়ে নিয়ে আসে। তপ্ত কোন নীহারিকা থেকে নয়, হিম মেঘপুঞ্জ থেকে ৫০০ কোটি বছর আগে সূর্যসহ গ্রহগুলির উদ্ভব ঘটে। তাদের মতে মহাজাগতিক বিস্ফোরণে বিলুপ্ত অতীতে কোন নক্ষত্রের ধূম্রপুঞ্জরূপী মেঘ হতেই সৌর জগতের আবির্ভাব। জন্মলগ্নে আবর্তন শক্তি ভৌত আকর্ষণে অন্তঃস্থল বিদারী চাপে তাপ শক্তিতে ও পরে পরমানু বিচূর্ণী ও একীভবনের পারমানবিক শক্তিতে রূপান্তরিত বস্তুপিণ্ডকেই সূর্যের বর্তমান রূপ বিকশিত হয়েছে।

দেখুন 'মহাবিশ্বে পৃথিবী ও আমরা' শীর্ষক
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব
ভূতত্ত্ববিদ সচীনাথ মিত্রের ভাষণ
—ইত্তেফাক, ২৩/৭/৮৫

ভুল	পৃষ্ঠা	প্যারা/লাইন	শুদ্ধ
২৭৩	২৭৭	২য় লাইন	২৭৯
ভলীখেল	৩৪৯	৩য় প্যারার ৪র্থ লাইন	ভলি খেলা
উন্নত বলে পরিচিত……আর কিছু নয়।	৩৯২	৭ম লাইন থেকে শুরু	এই পর্যন্ত সম্পাদকের নিজস্ব মন্তব্য বাক্যটি ভুলবশত ফুটনোটে না নিয়ে প্রবন্ধের অংশ হিসাবে সংযোজিত হয়েছে।

ইসলামী মেনিফেস্টোর ৩৫০ পৃষ্ঠায় মূল বই থেকে পুনঃ মুদ্রণে মুদ্রণ-ভুল হেতু ১নং ফুট নোটের iv-১ [৪২ ঃ ১৩ ঃ ১৪] বাদ যাবে এবং ২-১৯৩ এর স্থলে ২৩-৫২ হবে।

৩৫১ পৃষ্ঠার শেষ লাইনে শেষ অংক ৫৪ বাদ যাবে।

৩৫৩ পৃষ্ঠার ১নং ফুটনোটে শুধু 'কুরআন' হবে।

৩৫৬ পৃষ্ঠার ২নং ফুটনোটে শুধু 'কুরআন' হবে।

৩৫৭ পৃষ্ঠার ৪নং ফুটনোটের ২ ঃ ৬২ ; ৬ এর ৬ বাদ যাবে।

৮৫ পৃষ্ঠার ৩ নম্বর ফুটনোট হিসাবে নিচের লেখাগুলো বসবে।

সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা বলছেন চন্দ্র পৃথিবীর অংশচ্যুত উপগ্রহ নহে। পৃথিবী চন্দ্রকে অন্য কোন গ্রহের নিকট থেকে আপন বলয়ে নিয়ে আসে। তপ্ত কোন নীহারিকা থেকে নয়, হিম মেঘপুঞ্জ থেকে ৫০০ কোটি বছর আগে সূর্যসহ গ্রহগুলির উদ্ভব ঘটে। তাদের মতে মহাজাগতিক বিস্ফোরণে বিলুপ্ত অতীতে কোন নক্ষত্রের ধূম্রপুঞ্জরূপী মেঘ হতেই সৌর জগতের আবির্ভাব। জন্মলগ্নে আবর্তন শক্তি ভৌত আকর্ষণে অন্তঃস্থল বিদারী চাপে তাপ শক্তিতে ও পরে পরমানু বিচূর্ণী ও একীভবনের পারমানবিক শক্তিতে রূপান্তরিত বস্তু-পিণ্ডকেই সূর্যের বর্তমান রূপ বিকষিত হয়েছে।

দেখুন 'মহাবিশ্বে পৃথিবী ও আমরা' শীর্ষক
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব
ভূতত্ত্ববিদ সচীনাথ মিত্রের ভাষণ
—ইত্তেফাক, ২৩/৭/৮৫

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ